৭২২/৪
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক
শ্রেণী সং
কলিকাতা

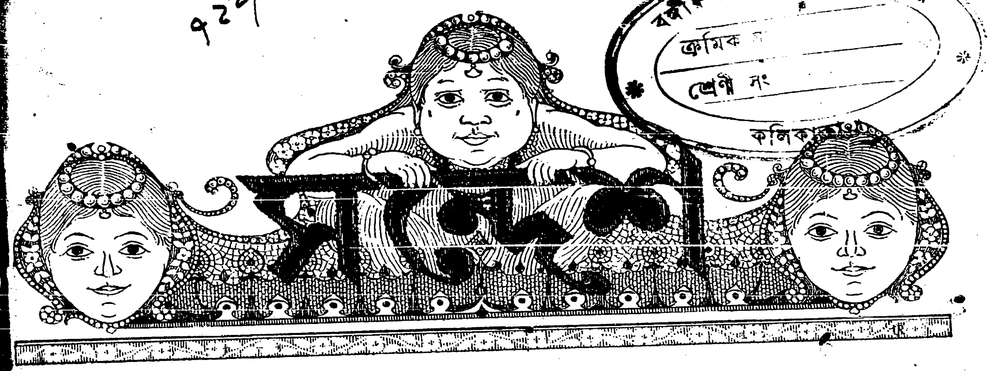

চতুর্থ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩২৩ | প্রথম সংখ্যা

গ্রীষ্ম।

ঐ এল বৈশাখ ঐ নামে গ্রীষ্ম
খাই খাই রবে যেন ভয়ে কাঁপে বিশ্ব!
চোখে যেন দেখি তার ধূলিমাখা অঙ্গ,
বিকট কুটিলজটে ভ্রূকুটির ভঙ্গ,
রোদে রাঙা দুই আঁখি শুকায়েছে কোটরে,—
ক্ষুধার আগুন যেন জ্বলে তার জঠরে!
মনে হয় বুঝি তার নিঃশ্বাস মাত্রে
তেড়ে আসে পালাজ্বর পৃথিবীর গাত্রে!
ভয় লাগে হয় বুঝি ত্রিভুবন ভস্ম—
ওরে ভাই ভয় নাই পাকে ফল শস্য!
তপ্ত ভীষণ চুলা জ্বালি নিজ বক্ষে
পৃথিবী বসেছে পাকে, চেয়ে দেখ চক্ষে,—
আম পাকে জাম পাকে ফল পাকে কত যে
বুদ্ধি যে পাকে কত ছেলেদের মগজে!

গর্গনের মুণ্ডু।

পার্সিয়ুসের মায়ের নাম ছিল ড্যানি, তিনি ছিলেন এক রাজার মেয়ে। পার্সিয়ুস্ যখন ছোট্ট শিশুটি ছিল তখন কতগুলি দুষ্টু লোক তাকে আর তার মাকে একটা সিন্ধুকের মধ্যে ভরে সেই সিন্ধুকটা সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিল। বেচারি ড্যানি শিশুটিকে বুকে করে সিন্ধুকের মধ্যে বসে কত রকম বিপদেরই আশঙ্কা করেছিলেন! কিন্তু দেবতার অনুগ্রহে তিনি রক্ষা পেলেন। সমস্ত দিন জলে ভেসে ভেসে সন্ধ্যার সময় সিন্ধুকটা একটি দ্বীপে গিয়ে এক জেলের জালে জড়িয়ে গেল। জেলে তখন সেটাকে ডাঙ্গায় তুলে নিল। এই দ্বীপের নাম ছিল সেরিফু, দুষ্ট পলিডেক্‌টিস তখন সেই দ্বীপের রাজা ছিলেন, সেই জেলে ছিল তারই ভাই।

জেলেটি ছিল খুব ভাল মানুষ, সাধু লোক। ড্যানি ও তাঁর শিশুটিকে বাড়ী নিয়ে সে খুব আদর যত্ন করতে লাগল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পার্সিয়ুস্ বেশ বড় সড় হয়ে উঠ্‌ল। সুন্দর রাজপুত্রের মত তার চেহারাখানি শরীরে বলও ছিল তার যথেষ্ট, যত রকমের যুদ্ধ বিদ্যা কোনটিই তার শিখ্‌তে বাকি ছিল না। এই বিদেশী মাতা পুত্রের সংবাদ ইতিপূর্ব্বেই দুষ্ট রাজার কাণে পৌঁছেছিল। রাজা একদিন পার্সিয়ুস্‌কে ডেকে পাঠালেন।

পার্সিয়ুস্ রাজবাড়ী গিয়ে উপস্থিত। দুষ্টবুদ্ধি রাজা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসে তাকে বল্‌লেন—"পার্সিয়ুস্! তুমি আর তোমার মা আমার রাজ্যে এসে আমার কাছ থেকে কত উপকার পেয়েছ, আমার ভাই তোমাদের কত যত্ন করেছেন। তার প্রতিদানে আমার একটা কাজ কর্‌তে বোধ করি তোমার কোনও আপত্তি হবে না।"

পার্সিয়ুস্—"সে কি মহারাজ! আপনি হুকুম করুন আমি প্রাণ দিয়ে পর্য্যন্ত তা করতে রাজি আছি।"

শয়তান রাজা তখন হাস্‌তে হাস্‌তে আবার বল্‌লেন—"পার্সিয়ুস্! আমি জানি তুমি খুব সাহসী এবং বীরপুরুষ। আমার বিশ্বাস ভারি অসমসাহসের কাজ হলেও তুমি তা কর্‌তে ভয় পাবে না। আসল কথাটা কি জান? আমি সেই সুন্দরী রাজকুমারী হিপোডামিয়াকে বিয়ে কর্‌তে চাই। এখন এসব কাজে দস্তুর হচ্ছে যে কন্যাকে একটা কিছু খুব আশ্চর্য্য জিনিষ উপহার দিতে হয়। অনেক ভেবে চিন্তে আমি একটা উপহারের জিনিষ ঠিক করেছি।"

রাজার কথা শুনে পার্সিয়ুস্ ভারি ব্যস্ত হয়ে বল্‌ল—"মহারাজ! আমা দ্বারা কি তার কোন সাহায্য হতে পারে?"

রাজা—হাঁ, নিশ্চয়! তোমার যা সাহস, তুমি নিশ্চয় সে জিনিষ আন্‌তে পারবে। আমার ইচ্ছে গর্গন মেডুসার মাথাটা এনে রাজকুমারীকে উপহার দিব, এখন তুমি যত শীগ্‌গির পার মেডুসার মাথাটা এনে আমাকে দাও।"

পার্সিয়ুস্ বল্‌ল—"যে আজ্ঞা মহারাজ! কাল সকালেই আমি রওয়ানা হব।"

পার্সিয়ুস্‌ত রাজাকে কথা দিল সে গর্গন মেডুসার মুণ্ডু আন্‌বে। তিনটি গর্গন, তারা তিন বোন। এই গর্গন কি রকম ভয়ানক রাক্ষুসে জন্তু তা শুন্‌বে? এদের চেহারার সঙ্গে নাকি স্ত্রীলোকের চেহারার কতকটা সাদৃশ্য ছিল। তাদের প্রত্যেকের মাথায় চুলের বদলে ছিল প্রকাণ্ড বড় একশটা করে জ্যান্ত বিষাক্ত সাপ। মুখে ছিল তাদের বেজায় লম্বা লম্বা দাঁত। তাদের হাতগুলি ছিল পিতলের, সমস্ত গায়ে ছিল মাছের মত আঁইস—সে কি যেমন তেমন আঁইস? লোহার মত শক্ত, তাতে অস্ত্রের আঘাত বিফল হয়ে যায়। তাদের দুটি করে পাখা ছিল তার পালকগুলি উজ্জ্বল চক্‌চকে সোনার তৈরি। দুই হাতে আঙ্গুলের বদলে বাজ পাখীর মত নখ ছিল—সে নখগুলি আবার তামার তৈরি। এই ভীষণ গর্গনের মুখের দিকে চাইলে পরে মানুষ মাত্রেই তৎক্ষণাৎ পাথর হয়ে যেত। এই তিন গর্গনের মধ্যে মেডুসাই ছিল সকলের চেয়ে ভীষণ। এখন ভেবে দেখ পার্সিয়ুস্ কি রকম ভয়ানক কাজের ভার নিল!

রাজার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পার্সিয়ুস্ বাড়ী গেল। মাকে কিছু বল্‌তে তার আর ভরসা হলোনা চুপি চুপি ঢাল্‌টি এবং তলোয়ার খানা নিয়ে দ্বীপ পার হয়ে গিয়ে একটা নির্জ্জন জায়গায় বসে মাথায় হাত দিয়ে চিন্তা কর্‌তে লাগল। খানিকক্ষণ পরেই হঠাৎ সে শুন্‌তে পেল কে যেন তাকে জিজ্ঞাসা করছে "পার্সিয়ুস্! তুমি এত ভাবছ কেন তোমার কিসের দুঃখ?" মুখ তুলে পার্সিয়ুস্ চেয়ে দেখ্‌লে তার সম্মুখে একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখখানি বড়ই মিষ্টি, ভারি চালাক চট্‌পটে তার চেহারাটি, তার কাঁধে আলখাল্লার মতন একটা জামা, মাথায় একটা অদ্ভুত ধরণের টুপি, সাপের মতন বাঁকা চোরা একটা লাঠি হাতে আর তার কোমরে ছোট একটি তলোয়ার ঝুলান রয়েছে।

লোকটি আবার বল্‌ল—"তোমার মত অনেক যুবাকে আমি বিপদের সময় সাহায্য করেছি। আমার নাম বোধ করি তুমি শুনে থাক্‌বে—লোকে আমাকে মার্কারি বলে। এখন ব্যাপারটা কি বল দেখি?"

অপরিচিত যুবকের এরূপ ভদ্রতা এবং বন্ধুর মত আচরণ দেখে পার্সিয়ুসের মনে নূতন উৎসাহ জেগে উঠ্‌ল। সে তখন গর্গন মেডুসার মাথা আনবার কথা সব মার্কারির নিকট বল্‌ল।

মার্কারি বল্‌ল—"তাই ত হে, বিষয়টা দেখ্‌ছি বড়ই গুরুতর, মেডুসার মাথা আনতে গেলে হয়তো বা তুমি পাথর হয়েও যেতে পার। যাহোক্ তোমার কোন ভাবনা নাই, তুমি ঠিক লোকের কাছেই সাহায্য চেয়েছ। আমি আর আমার বোন আমরা দুজনে মিলে যদি তোমাকে সাহায্য করি তা হলে বোধ করি মেডুসার মাথা নিয়ে তুমি নিরাপদেই ফিরে আসতে পারবে। এখন এক কাজ কর দেখি—তোমার ঢালটাকে খুব মেজে ঘসে আয়নার মতন উজ্জ্বল এবং চক্‌চকে করে নাও।"

মার্কারি

পার্সিয়ুস্ বসে বসে তার ঢালটাকে পালিস করতে লাগল। ক্রমে সেটা যখন খুব উজ্জ্বল হলো তখন মার্কারি বল্‌ল—"বেশ হয়েছে, এখন আমার এই তলোয়ারটি তুমি নাও। আমার তলোয়ার সাধারণ নয় এ দিয়ে তুমি লোহা বল পিতল বল অনায়াসে সব কেটে ফেলতে পারবে।" এই বলে মার্কারি তার তলোয়ারটি পার্সিয়ুসের কোমরে ঝুলিয়ে দিয়ে আবার বল্‌ল—"এখন আমাদের এক কাজ করতে হবে। আদ্যিকালের তিন বুড়ি আছে তাদের খুঁজে বার করা চাই তারা

জলদেবীদের সংবাদ জানে। জলদেবীদের সাহায্য ছাড়া গর্গনদের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব।"

মার্কারির কথা শুনে পার্সিয়ুস্ অবাক্ হয়ে বল্‌ল—"এসব বুড়ি টুড়ির কথা ত আমি কখনো শুনিনি—এরা কে?"

মার্কারি তখন হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল—"এই তিন বুড়ির কথা অতি আশ্চর্য্য, তাদের তিন জনের মধ্যে একটা মোটে চোখ আর একটা লম্বা দাঁত। ঠিক সন্ধ্যা হবার সময় কিম্বা তারার আলোতে এদের খুঁজে বার করতে হবে কারণ দিনের বেলা কিম্বা রাত্রে চাঁদের আলোতে এরা কখনও দেখা দেয় না।"

পার্সিয়ুসের তখন তার এই নূতন বন্ধুটির উপর অগাধ বিশ্বাস জন্মে গেছে কাজেই সে আর বাক্যব্যয় না করে তখনি তার সঙ্গে রওয়ানা হল।

আগে আগে মার্কারি তার পিছনে পার্সিয়ুস্। খানিক দূর গিয়েই পার্সিয়ুস্ দেখল যে বন্ধুর সঙ্গ রেখে চলা তার পক্ষে এক বিষম ব্যাপার! তার বোধ হলো যেন মার্কারির পায়ে পাখাওয়ালা জুতা পরা। চল্‌তে চল্‌তে চোখ্ বাঁকিয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তার মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল যেন তার মাথায়ও দুটো পাখা আছে। আবার ভাল করে চেয়ে দেখলে দেখতে পায় পাখা টাখা কিছু নাই মাথায় শুধু সেই বিদ্‌ঘুটে টুপি। যাহোক্ এটা সে স্পষ্ট বুঝতে পারল যে সেই বাঁকা চোরা লাঠিটার সাহায্যেই মার্কারি বেজায় তাড়াতাড়ি চল্‌ছে। বেচারি পার্সিয়ুস্ খানিকদূর গিয়েই হাঁপিয়ে পড়ল।

মার্কারি তখন তার সেই বাঁকা লাঠিটা তাকে দিয়ে বল্‌ল—"ধর, আমার লাঠিটা নাও তাহলে আর চল্‌তে কষ্ট হবে না।"

এর পর বন্ধুর লাঠির সাহায্যে পার্সিয়ুস্ বেশ চল্‌তে লাগল তার আর কোন কষ্টই বোধ হলো না। সে তখন বুঝতে পারল যে তার বন্ধু মার্কারি যে সে লোক নয়—এমন আশ্চর্য্য জ্ঞান মানুষে সম্ভব নয়।

ততক্ষণে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চারিদিক অন্ধকার—কেবল একটা নির্জ্জন মাঠের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝোপ জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। (ক্রমশঃ)

কাক।

আমাদের বাড়ীর পাশে আম গাছে কাকেরা বাসা ক'রেছে। কত যত্ন ক'রে, কত জায়গা ঘুরে, খুঁজে, বেছে, কত গাছের ডাল, খড়, কুটো, সংগ্রহ ক'রে, তারা দুজনে মিলে বাসাটি বানিয়েছে। একদিন সকালে দেখি একটা কাক আমাদের বাড়ীর পিছনের মাঠে পায়চারি করছে আর বুদ্ধিমানের মত ঘাড় নাড়ছে। খানিক পরে সে এক টুকরো খড় ঠোঁটে ক'রে তুলে নিল। কিন্তু কেন জানি না, সেটা তার পছন্দ হ'লো না,—সে সেটা ফেলে দিল। এম্‌নি ক'রে ২।৩ বার বাছাবাছি ক'রে একটা খড় তার পছন্দ হ'লো, আর অম্‌নি সেটা ঠোঁটে ক'রে নিয়ে সে তার বাসায় উড়ে গেল। এমনি ক'রে কত দেখে শুনে নেড়েচেড়ে, সে তার বাসার মাল মসলা সংগ্রহ করল, আর তা' দিয়ে কেমন সুন্দর মজবুত বাসা তৈয়ারী করল।

কয়দিন পরে দেখি তার বাসায় ছোট্ট ছোট্ট ৪টি নীল রঙের ডিম রয়েছে। সেইগুলির জন্য তার কত যত্ন! সারাদিন সে কত সাবধানে ডিমগুলি পাহারা দেয়! তার বাসার কাছে যদি কেউ জল ফেলে তবে সে ব্যস্ত হয়ে 'কা-কা' শব্দ করে। ঝড় বৃষ্টি এলে সে নিজে ডিমের উপর ব'সে ডিমগুলিকে রক্ষা করে! এমন সুন্দর আর মজবুত ক'রে বাসাটি বানান হয়েছে যে ঝড়ে তার কিছুই হয় না। যখন একজন খেতে যায় তখন আরেকজন সে ডিম পাহারা দেয়,—এমনি ক'রে দুজনে মিলে সারা দিন রাত ডিম-গুলিকে পাহারা দেয়।

আমি ভেবেছিলাম যে বৈশাখ মাসের আগেই তার ডিম ফুট্‌বে, কিন্তু একদিন ভোর বেলা উঠে দেখি যে বেচারার বাসা একেবারে খালি—একটিও ডিম নাই। কাক-বেচারা তো খালি 'কা-কা' ক'রে ডাক্‌ছে আর এ ডাল থেকে ও ডালে উড়ে বস্‌ছে। বোধ হয় কোন দুষ্টু ছেলে, কিম্বা কোন জন্তু ডিমগুলি নিয়ে গেছে। সেদিন কাকেদের মস্ত সভা হলো। সকলেই ভারি গম্ভীর, আর সকলেই যেন কি পরামর্শ করছে। তারা সব গোল হয়ে ঘিরে ব'সেছে আর গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ছে। অনেকক্ষণ এমনি ভাবে থেকে শেষে সকলেই 'কা-কা' করে উড়ে গেল;—সভায় যে কি ঠিক হ'লো কিছুই বোঝা গেল না। যার ডিম হারিয়েছে সে বেচারা কিন্তু এখনও রোজ বাসায় আসে আর অনেকক্ষণ চুপ ক'রে যেন কি ভাবে।

বাস্তবিক, এদের চাল চলন দেখ্‌লেই মনে হয় যে এরা বড় বুদ্ধিমান। অনেক সময় এদের বুদ্ধি দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। একজনদের বাড়ীতে একটা কুকুরকে খাবার দেওয়া হয়েছে, আর দুটো কাক সেই খাবার দেখ্‌ছে; কিন্তু কুকুরটার জন্য তারা আর খাবারের ভাগ নিতে পারছে না। তখন দুজনে মিলে এক বুদ্ধি করল। কুকুরটা যাই খাবারে মুখ দিতে যায় অমনি একটা কাক এসে ঠোঁট দিয়ে তার ল্যাজে ধরে। কুকুর বেচারা কাককে তাড়াবার জন্য যাই পিছন দিকে ঘাড় ফেরায়, আর অমনি আরেকটা কাক এসে কপ্ কপ্ ক'রে কয়েক গ্রাস খেয়ে যায়। তারপর, যে কাকটা খাবার খেল, সে এসে কুকুরের ল্যাজে ধরে, আর অন্য কাকটা খাবার খায়।

খুব ছোট থাক্‌তে পুষ্‌লে কাকেরা অনেক সময় বেশ পোষ মানে। এমন কি, কখনও কখনও এরা অনেক শব্দের আর কথার নকল করতেও শেখে। পোষা কাককে ডাক্‌লে কাছে আসে, আর বেজায় ট্যাঁটা, বেয়াদব, আর চোর হয়। তামাসা করতে এরা বড় ভালবাসে। এক সাহেবের দুটো পোষা দাঁড়কাক ছিল। তারা রোজ বাগানে মালীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। মালী বেচারা অনেকক্ষণ পরিশ্রম ক'রে বাগানের এক জায়গায় কতকগুলো গাছ পুঁতে যাই অন্য দিকে যেত, আর অমনি দাঁড়কাক দুটো একে একে সব গাছ শিকড় শুদ্ধ উপ্‌ড়ে ফেলে পালিয়ে যেত। বইএর পাতা উল্টাতে আর মাকু থেকে টান দিয়ে সুতো খুল্‌তে এদের ভারি আমোদ হ'তো।

কাক যে কেবল আমাদের জ্বালাতনই করে, এমন কথা মনে করা বড় ভুল। এরা আমাদের অনেক উপকারও করে। অনেক ময়লা জিনিষ এরা খেয়ে ফেলে পথ ঘাট পরিষ্কার রাখে! তা' ছাড়া অনেক অনিষ্টকর পোকা, মাকড়, ফড়িং লাখে লাখে কাকের পেটে যায়। বার্ব্বাডোস দ্বীপে অনেক আরশুলা জন্মায়, কিন্তু কাকেরা পেট ভরে আরশুলা খেয়ে সে দেশের লোকেদের আরশুলার উৎপাত থেকে রক্ষা করে। এই জন্য সে দেশে কাকের ভারি খাতির।

ফুলের সাজি।

ফুল ফোটে যত গাছ-পালা, বা লতায়,
তাহাদের সংখ্যা নাহি করিব হেথায়।
'ফুলগাছ' নামে আছে যাহাদের খ্যাতি,
বিলাতী-বিদেশী নয়,—ডালিয়া ইত্যাদি,
পূজা হয়, তোড়া বাঁধে, যাহাদের ফুলে,
সেই গাছ হ'তে ফুল আনিয়াছি তুলে।
পরিচিত দেশী-নামে গুছাইয়া আজি,
দিতেছি সে ফুলগুলি, ভ'রে এই সাজি।
অতসী, অপরাজিতা, অশোকের ফুল,
গন্ধহীন বটে কিন্তু রূপেতে অতুল।
আকন্দের ফুল আর পাতা একসাথে,
সূর্য্য-অর্ঘ্যে দেয় লোকে মাঘ-মাসে প্রাতে।
অন্য স্বরবর্ণের বাগানে ফুল নাই ;
ইন্দীবর, উৎপলাদি সংস্কৃতে পাই।
করবী, কলিকাফুল, কামিনী, কাঞ্চন,
কাঁঠালি চাঁপা (সে চাঁপা নহে কদাচন),
কুন্দ, কুরুবক আর কুমুদ বা না'ল
কুসুম, যাহার রঙ্গে বস্ত্র করি লাল।
কূটরাজ, কৃষ্ণকলি, কৃষ্ণচূড়া রাঙ্গা,
কাঁটা ভরা কেয়া ফুল বড় শক্ত ভাঙ্গা।
কদম কৃষ্ণের প্রিয় পূজায় না লাগে,
এই হেতু ওই নাম লিখি নাই আগে।
খাঁ খাঁ করে খ-বানান কোন ফুল নাই ;
গ-এর গহনে গন্ধরাজের বড়াই।
শীতকালে গাদা গাদা গাঁদা ফুল পাই,
গেঁথে মালা উৎসবের আসর সাজাই।

গোলাপ বিদেশী তবু যত্নে আনি তুলে ;
বালিকারা ইতু পূজা করে ঘেঁটু ফুলে।
চাঁপা চমৎকার, কিন্তু উগ্র গন্ধ পাই ;
চামেলি বিদেশী কথা দেশী নাম জাই।
চন্দ্রমল্লিকার বটে খাসা দেশী নাম,
জাপানে উহার জন্ম,—ক্রিসেন্‌থিমাম্।
জবাফুল বাঙ্গালায় আছে নানা জাতি ;
জাই ফুল যাহা, তাই সংস্কৃতে জাতী।
জাঁকাল ঝালর গায়ে ঝুমকাটি ফোটে ;
টগর ডাগর হলে খাসা গন্ধ ছোটে।
তরুলতা বলে কেহ, কেহ কুঞ্জলতা,
বাগানে বেড়ার গায়ে ফোটে যথা তথা।
স-এর বেড়ার নীচে থ-এর বাগানে,
স্থলপদ্ম ফুটে থাকে, কে তাকে বাখানে ?
দোপাটি, দোলনচাঁপা দেশেতে দেদার ;
শিবের পূজন হয় ফুলে ধুতুরার।
না'লের করেছি নাম কুমুদ বুঝাতে ;
ন-এ নাই অন্য ফুল লাগে যা পূজাতে।
পলাশ, পাটলা, পদ্ম বিবিধ প্রকার,
মন্দারটি কলিকালে পালদা মাদার।
ফ-এ সব ফাঁকা নাহি ফোটে কোন ফুল ;
বসন্তের বাগানেতে বিরাজে বকুল।
বকফুল লাগে বেশ ভাজা ও পূজায় ;
বেলা কিংবা বেল অর্থে মল্লিকা বুঝায়।
কুন্দের মতন দল বাঁধুলির ফুল,
কুন্দ সাদা, কিন্তু এটি বর্ণেতে হিঙ্গুল।
ভাণ্ডীর ফুলের নাম ভাঁটি বাঙ্গলায় ;
ভুঁই চাঁপা ফোটে বনে ছায়ার তলায়।

মল্লিকা, মালতী, মুচুকুন্দ ও মাধবী,
মধুমালতীর ফুল ভালবাসে কবি।
যুঁই আর রজনীগন্ধার মত সাদা,
লোধ ফুল ফোটে শীতে নহে নামজাদা।
শেফালি বা শিউলির গন্ধ মনোহর,
শরদে উৎসব-রসে মাতায় অন্তর।
কেহ বলে 'কেনা' তাকে, কেহ কলাফুল,
সর্ব্বজয়া নাম তাঁর কেন করে ভুল?
সূর্য্যমুখী ঊর্দ্ধমুখে সূর্য্য পূজা করে।
সাঙ্গ হ'ল ফুলতোলা, সাজি তোল ঘরে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

খোঁড়া সুধীর।

গ্রামের স্কুল ছাড়িয়া আমি প্রথম যে সহরের স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হইলাম, সেখানে আমার মাসতুতো ভাই খগেন্দ্রও থাকিত। সে আমার তিন বৎসর আগে এখানে আসিয়াছে। খগেন্দ্র আর আমি এক ক্লাসে পড়ি, বোর্ডিংএও এক ঘরেই থাকি।

আমাদের পাশের ঘরে নরেন ও সুধীর বলিয়া দুইটি ছেলে থাকে। তাহাদের দুইজনে দেখি খুব ভাব, তেমন ভাব আর কোন ছেলেদের মধ্যে দেখি নাই। অথচ তাহাদের চেহারা যেমন উল্টা, স্বভাবও তেমনি ভিন্ন রকমের। নরেনের রং ময়লা, দেখিতে লম্বা চওড়া, বেজায় ষণ্ডা, খুব হৈ চৈ করিয়া বেড়ায়; সুধীর ফর্সা রোগা ছোট খাট দেখিতে, আর খোঁড়া; সব সময়ে চুপচাপ থাকে।

একদিন আমি স্কুলের পর বোর্ডিংএর দিকে যাইতেছিলাম; হঠাৎ সাম্নে চাহিয়া দেখি বেচারা সুধীর খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া যাইতেছে, আর তাহার পিছু পিছু একটা ছেলে তাহাকে ভ্যাঙ্চাইয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছে। নরেন যে পিছনে আসিতেছে তাহা সে দেখিতে পায় নাই। শুধু ভ্যাঙ্চাইয়া তাহার মন উঠিল না, সে বলিতে লাগিল—"খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং, কার বাড়ীতে—" তাহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে

নরেন আসিয়া বাঘের মত তাহার উপরে পড়িল, আর দুই কাঁধে দুই হাত দিয়া এমন ঝাঁক্ড়ানি দিল যে ছেলেটা প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে।

সেদিন রাত্রে শুইবার সময় আমি খগেন্দ্রের কাছে এই গল্প করিলাম। খগেন্দ্র বলিল, "আমি থাক্‌লে আমিও দু চার ঘা দিতাম।" আমি বলিলাম, "সুধীর খোঁড়া বলেই বোধ হয় তার উপরে নরেনের এত মায়া।" খগেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "ওঃ, তা বুঝি জানিস্ না! এখন ওদের এত ভাব দেখ্‌ছিস্, কিন্তু এমন সময় ছিল যখন নরেন সুধীরকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পার্‌ত না।" আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "সত্যি?" "তা না ত কি?" বলিয়া খগেন্দ্র লেপটা ভাল করিয়া টানিয়া গায়ে দিয়া বলিতে লাগিল, "সুধীর যখন নূতন এ'ল তখন তার ছোটখাটো ভালমানুষের মত চেহারা দেখে কেউ তাকে বড় একটা গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে পড়াশোনায় সে খুব ভাল। আগে নরেন ক্লাসে সবচেয়ে ভাল ছিল; সুধীর এলে সুধীরই ফার্ষ্ট হতে লাগ্‌ল। তাতে নরেন তার উপর ভারি চটে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্লাসে দুইটা দল হ'য়ে উঠ্‌ল। নরেন বড়লোকের ছেলে, খেলাধূলায় সকলের সর্দ্দার, তার অনেক চেলা। হ্যাঁ, আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি, সুধীর কিন্তু তখন খোঁড়া ছিল না। তার কোঁক্‌ড়ান চুল, বড় বড় চোখ আর সুন্দর মুখখানা দেখে, নরেন তার নাম রাখ্‌ল খোকাবাবু—সেই নাম স্কুলময় প্রচার হ'য়ে গেল। একদিন সুধীরের বাড়ী থেকে কি চিঠি এল তাই প'ড়ে সুধীর কেঁদেছিল। সেদিন রাত্রে পড়্‌বার সময় টেবিলের এক কোণে একজন বল্ল বেবি (baby), আর একজন জোরে বল্ল 'মাষ্টার মশাই বেবি মানে কি খোকা?' একজন জোরে জোরে বল্‌তে লাগ্‌ল 'c-r-y ক্রাই,—ক্রাই মানে কান্না।' সুধীর বেচারা চুপ ক'রে বসে রইল।

একবার হ'ল কি, এই গত বছর পূজার ছুটীর পরে, প্রাইজের দু মাস আগে ব'লে দেওয়া হ'ল যে 'এবার ইংরাজি রচনার জন্য একটা আলাদা প্রাইজ দেওয়া হবে।' নরেনের দলের ছেলেরা বল্ল, 'নরেন প্রাইজ পাবে' অন্য ছেলেরা বল্ল, 'সুধীর পাবে'। খুব একটা রেষারেষি চল্ল।

তখন সুধীর আমাদের এই পাশের ঘরটাতেই থাক্‌ত। প্রাইজের রচনা দেবার আর এক দিন মাত্র বাকী আছে—সুধীরের রচনা প্রায় লেখা হয়ে গেছে, নরেনেরও হয়েছে। রাত্রে সুধীর সেটাকে ভাল ক'রে তুল্‌বে ব'লে দেরাজ খুলে দেখে রচনার খাতা নেই। কত খুঁজল কোথাও পেল না। সে মনে কর্‌ল বোধ হয় ভুলে

বইএর সঙ্গে স্কুলে নিয়ে গিয়েছে, কোথায় পড়ে গেছে। লণ্ঠন নিয়ে কত খুঁজল কিন্তু কোথাও পেল না। তখন তার ঘরে রাজেন বলে একটি ছেলে থাক্‌ত সে বল্ল—'আমি বল্‌ছি এ নিশ্চয় নরেনের কাজ। কাল সন্ধ্যার সময় আমি একবার পড়তে পড়তে উঠে এসেছিলাম, তখন বোধ হল নরেন আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এ নিশ্চয় ওর কাজ।' সুধীর বল্ল 'ছি! অমন বলতে নেই। আমরা ত ঠিক জানি না।'

সুধীর আর কি করবে, তখন তাড়াতাড়ি ক'রে আরেকটা রচনা লিখে দিল বটে, কিন্তু বেচারার ভাল ক'রে লেখাই হ'ল না। নরেনই প্রাইজ পেল। প্রায় মাস খানেক পরে একদিন সুধীর আর রাজেন নরেনের ঘরের নীচে উঠান দিয়ে যাচ্ছিল; এমন সময় কতগুলো ছেঁড়া কাগজ ঝুর ঝুর ক'রে তাদের মাথার উপরে পড়ল। রাজেন

রেগে মাথা ঝাড়তে ঝাড়তে উপরের দিকে চেয়ে নরেনের হাতটা দেখ্‌তে পেল। তারা চলেই যাচ্ছিল; হঠাৎ এক টুক্‌রো লেখা কাগজের উপর তাদের চোখ পড়ল। সেটা সুধীরের সেই হারানো খাতার পাতার টুক্‌রো। রাজেন বল্ল, 'আমি এক্ষুণি যাচ্ছি, মাষ্টারদের এটা দেখাব।' সুধীর তাকে বাধা দিয়ে বল্ল, 'এ নিয়ে আর গোলমাল ক'রে কি হবে?'

সেদিন ছুটীর পর রাজেন নরেনকে পাক্‌ড়াও কর্‌ল। নরেন তখন দোতালায় ঐ কাঠের সিঁড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজেন গিয়ে বল্ল "তুমি সুধীরের রচনার খাতা চুরি করেছিলে! এই দেখ তার প্রমাণ। তা ছাড়া সেদিন রাত্রে আমি তোমাকে আমাদের ঘরে যেতে দেখেছিলাম।' নরেন একটু ঠাট্টার হাসি হেসে বল্ল 'দেখেছিলে ত ব'লে দিলে না কেন? সাহসে বুঝি কুলায়নি?' কথায় কথায় রাগারাগি

হ'য়ে শেষে নরেন যাই রাজেনকে মার্‌তে যাবে এমন সময় হঠাৎ পা পিছ্‌লিয়ে সে রেলিঙের উপর পড়ে গেল। নরেনের প্রকাণ্ড শরীর, রেলিংটা তার ভার সাম্‌লাতে পারল না। রেলিং ভেঙে সে একেবারে খাড়া সিঁড়ি দিয়ে ঘুরপাক্ খেয়ে পড়ছে দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। ঠিক সেই সময়ে সুধীর সিঁড়ি দিয়ে উঠে আস্‌ছিল, সে বইটই ফেলে দৌড়ে নরেনকে ধ'রে ফেল্ল। কিন্তু তার ভার সুধীর সইতে পারবে কেন? দুজনে জড়াজড়ি ক'রে সিঁড়ীর নীচে পড়ে গেল! নরেন পড়ল উপরে সুধীর পড়ল নীচে! একটু বাদেই নরেন গাঝাড়া দিয়ে উঠ্‌ল কিন্তু সুধীর আর ওঠেই না। সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে তাকে ঘরে আন্‌ল। ডাক্তার এসে বল্লেন, 'একটি পা ভেঙ্গেছে দেখা যাচ্ছে, জ্ঞান না হ'লে আর কিছু বলতে পারছি না।' মাস খানেক ভুগে সুধীর সেরে উঠ্‌ল, কিন্তু খোঁড়া পা আর সারল না।

এই এক মাসে নরেন একেবারে বদ্‌লে গেল—যতদিন সুধীর বিছানায় প'ড়েছিল, নরেন প্রাণপণে তার সেবা কর্‌ত, নিজে বাজার থেকে তার জন্য ফল কিনে আন্‌ত, কত সময়ে রাত জেগে তাকে বাতাস কর্‌ত—দুবেলা ডাক্তারের বাড়ী যাওয়া আসা কর্‌ত। সেই অবধি তাদের একেবারে গলাগলি ভাব।"

ডেভিড্ লিভিংষ্টোন্।

স্কট্‌ল্যাণ্ডের এক গরীব তাঁতীর ঘরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ডেভিড্ লিভিংষ্টোনের জন্ম হয়। খুব অল্প বয়স হতেই ডেভিড্ তার বাপের সঙ্গে কারখানায় কাজ কর্‌তে যেত, সেখানে তাকে প্রতিদিন চৌদ্দ ঘণ্টা খাট্‌তে হ'ত। কিন্তু তার উৎসাহ এমন আশ্চর্য্য রকমের ছিল যে, এত পরিশ্রমের পরেও সে রাত্রে একটা গরীব স্কুলে পড়্‌তে যেত। যখনই একটু অবসর হ'ত সে তার বই নিয়ে পড়্‌ত, না হয়, মাঠে ঘাটে ঘুরে নানারকম পোকা মাকড় গাছ পাথর প্রভৃতি সংগ্রহ ক'রে বেড়াত।

এম্‌নি ক'রে লিভিংষ্টোনের বাল্যকাল কেটে গেল। তারপর উনিশ বৎসর বয়সে তাঁর মাইনে বাড়াতে বাড়ীর অবস্থা একটু ভাল হ'ল। তখন তিনি কারখানার মালিকের সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত ক'রে নিলেন, যাতে তিনি বছরে ছয় মাস কাজ কর্‌তেন আর বাকী ছমাস গ্লাস্‌গো সহরে গিয়ে পড়াশুনা কর্‌তেন। সেখানে কয়েক বছর ডাক্তারি পড়ে এবং ধর্ম্মশিক্ষার পরীক্ষা পাশ ক'রে, ২৭ বৎসর বয়সে তিনি অসভ্য

জাতিদের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচারের জন্য চাকুরি নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলেন। আফ্রিকায় তখনও সাহেবেরা বেশী যাতায়াত আরম্ভ করে নি—ম্যাপের অনেক স্থানই তখন অজানা দেশ ব'লে লেখা থাক্‌ত। সেই অজানা দেশে অচেনা লোকের মধ্যে লিভিংস্টোন্ বাস করতে গেলেন।

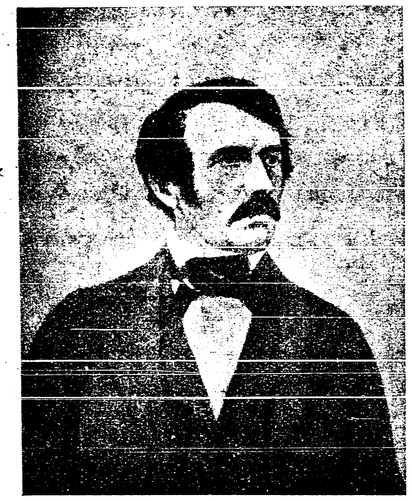

ডেভিড্ লিভিংষ্টোন্।

পাদ্রী-ডাক্তার লিভিংস্টোন দেখ্‌তে দেখ্‌তে আফ্রিকার নানা ভাষা শিখে ফেল্‌লেন, সেখানকার লোকেদের সঙ্গে মিশে তাদের সুখ দুঃখের কথা সব জান্‌লেন—আর দেশটাকে তাঁর এত ভাল লাগ্‌ল, যে তার সেবায় জীবনপাত করতে তিনি প্রস্তুত হ'লেন। সে দেশের লোকের বড় দুঃখ যে দুষ্ট পর্ত্তুগীজ আর আরব দস্যুরা তাদের ধ'রে নিয়ে দাস ক'রে রাখে, ছাগল গরুর মত হাটে বাজারে তাদের বিক্রী করে। বেচারীরা হাতীর দাঁত, পাখীর পালক, ও নানারকম জন্তুর চামড়ার ব্যবসা করে, বিলাতী জাহাজে ক'রে সওদাগরেরা তাদের জিনিষ কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু মাঝপথে এই সব দুষ্টু লোকেরা তাদের মার্‌ধর্ ক'রে বেঁধে নিয়ে যায়। লিভিংস্টোন এই সব অত্যাচারের কথা শুনে একেবারে ক্ষেপে গেলেন। তিনি বল্‌লেন যেমন ক'রে হোক্, এ অত্যাচার থামাতে হবে।

তিনি দেখ্‌লেন ব্যবসা করতে হ'লে সেই লোকদের এমন সব পথ দিয়ে যেতে হয়, যেখানে পর্ত্তুগীজ আর আরবরা তাদের সহজেই ধ'রে ফেল্‌তে পারে—সমুদ্রে যাওয়া আসার আর কোন সহজ রাস্তা তাদের জানা ছিল না। তাদের দেশে বাণিজ্যের কোন ভাল বন্দোবস্ত নাই—ভিন্ন ভিন্ন জায়গার লোকদের মধ্যে ব্যবসা চালাবার কোন সুযোগ নাই। লিভিংস্টোন তখন পথঘাটের সন্ধান ক'রে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। বড় বড় নদীর পথ ধরে দিনের পর দিন চলে চলে কত নতুন দেশ নতুন পাহাড় নতুন লোকের খবর পেলেন। এই কাজ তাঁর এত ভাল লাগ্‌ল, আর তাতে

তাঁর এত উৎসাহ হ'ল যে তিনি চাক্‌রী ছেড়ে দিয়ে পাদ্রির কাজ ফেলে এই কাজেই দিন রাত লেগে রইলেন।

ক্রমে তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন আফ্রিকার এপার ওপার পূবপশ্চিম যাওয়ার মত পথ পাওয়া গেলে তবে বাণিজ্যের খুব সুবিধা হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এই রাস্তার খোঁজে তিনি কয়েক জন সেদেশী লোকের সঙ্গে কালাহারি মরুভূমি পার হ'য়ে ক্রমাগত উত্তর পশ্চিম মুখে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে পাঁচ বছরে পর্ত্তুগীজরাজ্যে পশ্চিমসমুদ্রের উপকূলে এসে হাজির হ'লেন! পথের কষ্টে এবং জ্বরে ভুগে তাঁর শরীর তখন একেবারে ভেঙে গেছে, আর যেন নড়বার শক্তি নাই। কিন্তু তিনি সহজে থামবার লোক ন'ন; কয়েক মাস বিশ্রাম করেই তিনি আবার ফির্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লেন। এবার তিনি প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন সেখান থেকে একেবারে পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের কূল পর্য্যন্ত না গিয়ে তিনি থামবেন না।

জলের পথ দিয়ে নানা নদীর বাঁক্ ধ'রে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে তিনি ক্রমে জাম্বেসি নদীতে এসে পড়্‌লেন। তাঁর আগে আর কোন বিদেশী সে জায়গা দেখে নাই। সেখানকার লোকদের সঙ্গে তিনি আলাপ করে এক আশ্চর্য্য খবর শুন্‌লেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল "তোমাদের দেশেও কি ধোঁয়ায় গর্জ্জন করতে পারে?" লিভিংস্টোন্ বল্‌লেন "সে কি রকম"? তারা বল্ল, "তুমি ধোঁয়াগর্জ্জনের পাহাড় দেখনি"? লিভিংষ্টোনের

ভারি আগ্রহ হ'ল, এ জিনিষটা একবার দেখ্‌তে হবে। সেই জাম্বেসি নদী দিয়ে নৌকা করে তিনি অনেকদূর গিয়ে দেখ্‌লেন এক জায়গায় ধোঁয়ার মত পাঁচটা স্তম্ভ উঠেছে, তাঁর চারিদিকের দৃশ্য এত সুন্দর যে লিভিংষ্টোনের বোধ হ'ল এমন চমৎকার স্থান তিনি আগে আর কখনও দেখেন নি! কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে নদীটা গেল কোথায়? সামনে খালি চড়া আর পাহাড়; নদীর চিহ্নমাত্র নাই—আর পাহাড়ের ওদিকে খালি ধোঁয়া আর গর্জ্জন। সেইখানে নৌকা বেঁধে লিভিংষ্টোন হেঁটে দেখ্‌তে গেলেন ব্যাপারখানা কি! গিয়ে যা দেখ্‌লেন তাতে তাঁর বোধ হ'ল যে তাঁর জন্ম সার্থক—তাঁর এত বৎসরের পরিশ্রম সার্থক। তিনি দেখ্‌লেন নদীটা একটা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঢুকে পাহাড়ের পেট কেটে তিনশ'হাত খাড়া ঝরণার মত ঝরে পড়্‌ছে। এত বড় ঝরণা লিভিংষ্টোন কোন দিন চক্ষে দেখেন নি। পড়্‌বার বেগে ঝরণার জল ভয়ানক শব্দে ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে প্রায় ২০০ হাত উঁচু হ'য়ে উঠ্‌ছে—তার উপর সূর্য্যের আলো প'ড়ে চমৎকার রামধনুর ছটা বেরিয়েছে—আর সেই ঝাপ্‌সা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে রংবেরঙের গাছ পালা পাহাড় জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, ঠিক যেন ছিটের পর্দ্দা!

এম্নি ক'রে কত আশ্চর্য্য আবিষ্কার করতে করতে লিভিংষ্টোন একেবারে নূতন পথ দিয়ে দুই বছরে আফ্রিকার পূর্ব্ব কূলে এসে পড়্‌লেন। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে সকলের কাছে সম্মান লাভ ক'রে তিনি দল বল নিয়ে আবার সেই জাম্বেসি নদীর ধারে ফিরে গেলেন। এবারে তাঁর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে গেলেন—আর ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে লাগ্‌লেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন, তারপর তাঁর সঙ্গের লোকজন অনেকেই ফিরে গেলেন। ক্রমে বিলাত থেকে খরচ আসাও বন্ধ হ'য়ে গেল। কিন্তু লিভিংষ্টোন একাই নিজের খরচে ঘুরতে লাগ্‌লেন। এবার নূতন পথে তিনি উত্তরপূর্ব্ব মুখে বড় বড় হ্রদের দেশ দিয়ে একেবারে ইজিপ্টের কাছে নায়াসাতে এসে পড়্‌লেন। তাঁর সঙ্গে সেদেশী দুচারটি লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না—কিন্তু তারা তাঁকে এত ভালবাসত যে ঘোর বিপদের মধ্যেও তাঁকে ছেড়ে যেতে রাজি হয় নি।

লিভিংষ্টোনও কি তাদের কম ভাল বেসেছিলেন! সেই "আঁধার দেশের" লোকের দুঃখে তাঁর যে কি দুঃখ তাঁর বইয়ের পাতায় পাতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। পর্ত্তুগীজদের অত্যাচারের বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর কথাগুলো যেন আগুন হ'য়ে উঠ্‌ত। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর শেষ লেখা এই—"এই নির্জ্জন দেশে ব'সে আমি এই মাত্র বল্‌তে

পারি, পৃথিবীর এই কলঙ্ক (দাস ব্যবসায়) যে মুছে দিতে পারবে—ভগবানের অজস্র আশীর্ব্বাদে সে ধন্য হ'য়ে যাবে।"

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৫০ বৎসর বয়সে তিনি শেষবার আফ্রিকায় ঘুরতে গিয়েছিলেন—তারপর আর দেশে ফেরেন নি। এবার তিনি গোড়া হ'তেই নানারকম বিপদে পড়েছিলেন—তাঁর জন্য যে রসদ পাঠান হ'ল কতক তাঁর কাছে পৌঁছলই না—বাকী সব চুরি হয়ে গেল। তারপর ক'বছর ধ'রে তাঁর আর কোন খবরই পাওয়া গেল না। ক্রমে দেশের লোক ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল, লিভিংষ্টোনের কি হ'ল জান্‌বার জন্য চারিদিকে লেখা-লেখি চল্‌তে লাগ্‌ল। শেষটা ষ্ট্যান্‌লি ব'লে একজন ওয়েল্‌শ্ যুবক তাঁর খবর আন্‌তে আফ্রিকায় গেলেন। এত বড় মহাদেশের মধ্যে একজন লোককে আন্দাজে খুঁজে বার করা যে খুবই বাহাদুরির কাজ, তাতে আর সন্দেহ কি? ষ্ট্যান্‌লি বছর খানেক ঘুরে তাঁর দেখা পেলেন বটে, কিন্তু তখন লিভিংষ্টোনের মর-মর অবস্থা। তিনি এত রোগা আর দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছেন যে দেখ্‌লে চেনা যায় না। ষ্ট্যান্‌লির সাহায্যে লিভিংষ্টোন কতকটা সেরে উঠ্‌লেন এবং তার সঙ্গে কিছুদিন ঘুর্‌লেন,

ডেভিড্ লিভিংষ্টোনের মৃত্যু।

কিন্তু দেশে ফিরে যেতে রাজি হলেন না। তিনি বল্লেন "আমি এই দেশের

নির্জ্জন নিস্তব্ধ জঙ্গলের মধ্যেই এ জীবন শেষ কর্‌ব"। ষ্ট্যান্‌লি ফিরে গেলেন।

তারপর, বছর খানিক পরে একদিন লিভিংষ্টোন তাঁর বিছানার পাশে হাঁটুগেড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্‌তে বস্‌লেন,—আর উঠ্‌লেন না। তাঁর লোকেরা তাঁকে ডাক্‌তে এল, তখন দেখ্‌ল যে তিনি সেই অবস্থাতেই মারা গেছেন। বিশ্বাসী চাকরেরা অসাধারণ কষ্ট স্বীকার ক'রে পাহাড় জঙ্গল পার হ'য়ে সমুদ্রের কুল পর্য্যন্ত তাঁর মৃতদেহ ব'য়ে এনে জাহাজে তুলে দিল। ইংলণ্ডে যাঁরা বীর, যাঁরা দেশের নেতা, যাঁদের কীর্ত্তিতে দেশের গৌরব বাড়ে তাঁদের কবর দেওয়া হয় "ওয়েষ্ট্ মিন্‌ষ্টার এবি"তে। সেই ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে যদি যাও সেখানে লিভিংষ্টোনের সমাধি দেখ্‌তে পাবে।

গৌতমের তপস্যা।

কাশীর দক্ষিণে ব্রহ্মগিরি পর্ব্বতে যেখানে অনেক মুনিরা থাকেন সেখানে গৌতম মুনির আশ্রম। গৌতম আর তাঁর স্ত্রী অহল্যা ছয় মাস ভয়ানক তপস্যা করিয়া বরুণ দেবকে সন্তুষ্ট করেন। বরুণ বর দিলেন, সে দেশে কোন দিন জলকষ্ট হইবে না। সেখানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া দেখা গেল তাহাতে বার মাস পরিষ্কার জল থাকে।

গৌতমের শিষ্যেরা প্রতিদিন আশ্রমের জন্য জল লইয়া আসিত। একদিন তাহারা জল তুলিতেছিল, এমন সময় অন্য কয়েকজন মুনির স্ত্রীরা তাদের ধমক দিয়া বলিল, "এই ও! আমরা এখন জল নিব—তোরা এখন যা"! শিষ্যেরা তাহাতে রাগ করিয়া অহল্যার কাছে নালিশ করিল। অহল্যা বলিলেন "বাছারা, তোমাদের আর জল আনিয়া কাজ নাই, এখন হইতে আমিই জল আনিব।" কিন্তু দুষ্ট ঋষিপত্নীরা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া একদিন মিছামিছি অহল্যাকে খুব বকিয়া দিল এবং বাড়ীতে গিয়া উল্টা বলিল যে, "অহল্যা আমাদের গালি দিয়াছে"। অহল্যাকে সকলেই জানে সুতরাং একথা বাড়ীর লোকে বিশ্বাস করিল না। তাহাতে ঋষিপত্নীরা আরও চটিয়া গেল। তাহারা প্রতিদিন অহল্যাকে গালাগালি দিত, আর প্রতিদিন বলিত "অহল্যা বড় ছোটলোক—তাহার জ্বালায় আর টেকা যায় না"। শেষটা এমন হইল যে মুনি-ঠাকুরেরাও অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে কি উপায়ে গৌতম ও অহল্যাকে আশ্রম হইতে সরান যায়।

অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল, "গণেশের পূজা করা যাউক"। তখন ধূপধুনা ধান দুর্ব্বা সিন্দুর চন্দনের ঘটা করিয়া গণেশকে খুসী করা হইল। গণেশ বলিলেন, "তোমরা কি চাও"? মুনিরা বলিলেন "গৌতমকে এখান হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দি'ন"। গণেশ বলিলেন, "এমন কাজ কি কখন করিতে হয়? গৌতম এমন লোক—তোমাদের এত উপকার করিয়াছেন—তাঁর মনে কি কষ্ট দেওয়া উচিত"? কিন্তু ঋষিরা ছাড়িলেন না—তখন গণেশ বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই করিব, পরে যা হয় হইবে"।

তারপর গণেশ একটি অদ্ভুত রোগা গরু সাজিয়া গৌতমের ক্ষেতে শস্য খাইতে লাগিলেন। গৌতম তাহাকে তাড়াইবার জন্য একটা খড় দিয়া ছুঁইবামাত্র গরুটা চার পা ছুঁড়িয়া তৎক্ষণাৎ পড়িয়া মারা গেল। অমনি দুষ্ট মুনিরা ঝোপের আড়াল হইতে চেঁচাইয়া উঠিল "গৌতম কি করিলে"? চারিদিক হইতে সকলে ছুটিয়া আসিল, এবং "গৌতম গোহত্যা করিয়াছে" বলিয়া ভয়ানক গালাগালি আর নিন্দা করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল "এমন লোকের মুখ দেখিতে নাই। ইহাকে কোনমতেই এখানে থাকিতে দেওয়া উচিত হয় না"। গৌতম অহল্যাকে লইয়া এক ক্রোশ দূরে গিয়া তাঁহার আশ্রম বসাইলেন। তাঁহার শিষ্যেরা একে একে সকলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। একদিন ঋষিপত্নীরা পথে গৌতমের দেখা পাইয়া তাঁহাকে অপমান করিল। গৌতম মনের দুঃখে কয়দিন কাটাইলেন। তারপর দুষ্ট ঋষিদের আশ্রমে গিয়া দূর হইতে তাঁহাদের নমস্কার করিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, "আপনারা দয়া করিয়া বলুন কি করিলে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে"।

তখন মুনিরা সভা করিয়া ব্যবস্থা দিলেন, "তুমি আগে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া তোমার দুষ্কর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া আইস, তারপর একমাস ব্রতপালন করিয়া একশত বার এই ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ কর। অথবা ব্রহ্মগিরির চারিদিকে এগার পাক ঘুরিয়া শত কলসে স্নান কর তারপর গঙ্গা আনাইয়া এককোটি বার শিব পূজা কর"। ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম তাহাতেই রাজি হইলেন। তারপর পাহাড় প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি আশ্চর্য্য তপস্যা দ্বারা শিবের প্রসাদ লাভ করিলেন। শিব বলিলেন "গৌতম তুমি কিসের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেছ? তুমি ত কিছুমাত্র পাপ কর নাই"। এই বলিয়া তিনি দুষ্ট ঋষি সকলের কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন। গৌতম বলিলেন "আহা, সেই ঋষিরাই ধন্য—তাহাদের জন্যই ত আমি আজ

আপনার দেখা পাইলাম"। মহাদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "আমি তোমায় বর দিব, তুমি কি চাও"? গৌতম বলিলেন "তবে দয়া করিয়া আমায় গঙ্গা আনাইয়া দেন"। তখন মহাদেব গৌতমকে জল দিবামাত্র সেই জলের মধ্য হইতে গঙ্গাদেবী উঠিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন "গৌতমের পুণ্য হউক, তাঁহার পরিবারের সকলে পুণ্যলাভ করুন, এইখান দিয়া গঙ্গানদী বহিয়া চলুক, পৃথিবী শুদ্ধ সকলে তাহাতে স্নান করিয়া পবিত্র হউক—কিন্তু সাবধান, সেই দুষ্ট ঋষিরা যেন এখানে স্নান করিয়া সে জলকে অপবিত্র করিতে না আসে—আমি তাহাদের মুখ দেখিতে চাহি না"। তখন দেখিতে দেখিতে সে স্থান গঙ্গা-নদীর জলে ভরিয়া উঠিল, সেখানে নদী বহিয়া চলিল, চারি দিক হইতে দেবতা ঋষিরা তাহাতে স্নান করিতে আসিলেন।

এদিকে মুনিঠাকুরদের কাছে খবর পৌঁছিতে দেরী হইল না। তাঁহারা বলিলেন, "গৌতম গঙ্গা আনাইয়াছেন—বড় সুবিধা হইল। চল, সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া আসি"। সকলে মিলিয়া ঘটা করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে চলিলেন। কিন্তু তাহারা গঙ্গার কাছে আসিবামাত্র গঙ্গানদী হঠাৎ কোথায় মিলাইয়া গেল, ঋষিরা সকলের সম্মুখে এরূপ অপমানে একেবারে বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তখন গৌতম গঙ্গার স্তব করিয়া বলিলেন "ইহারা ভালই হউক আর মন্দই হউক, আপনি পৃথিবীশুদ্ধ সকলকেই যখন স্নান করিতে দিলেন, তখন এ বেচারাদেরও অনুগ্রহ করুন"। গঙ্গা বলিলেন "আগে উহারা শতবার ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করিয়া রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করুক"। দুষ্ট ঋষিরা তখন বাধ্য হইয়া সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিল। ততক্ষণে গৌতমের আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া ঋষিপত্নীদের চক্ষু ফুটিয়াছে। তাঁহারা গৌতম ও অহল্যাকে বার বার প্রণাম করিয়া তাঁহাদের কাছে ক্ষমা চাহিলেন। তারপর গৌতমের কল্যাণে গঙ্গাস্নান করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন "এমন কাজ আর কখনও করিব না"।

গৌতমের গো-হত্যা।

COLOURED DOCUMENT.

"উল্টা বুঝ্‌লি রাম।"

এক ছিল পাগলা, তাকে যা বলবে সে ঠিক করবে তার উল্টো। একটা খালের উপর একটা ঝোলানো বাঁশের সাঁকো আছে। একদিন পাগলাটা সেই সাঁকোর উপর পা ঝুলিয়ে বসে, আপনার মনে গান গাইছে, মাথা নাড়ছে, হাতে তাল দিচ্ছে, আর তার মাথা নাড়ার সঙ্গে সাঁকোটাও একটু একটু দুলছে। এমন সময় একটা বুড়ো লোক ওপারে যাবে বলে সাঁকোর কাছে এলো, তারপর সাঁকোর মাঝখানে এসে পাগ্‌লাকে বল্লে, "বাছা, একটু থামো, দেখো যেন সাঁকোটা নাড়িও না।" যেই বলা, অম্নি সে দৌড়ে ওপারে গিয়ে সাঁকোটাকে ধরে, "এই হেঁইও, এই হেঁইও" করে নাড়াতে লাগলো। "আহাহাহা করো কি, করো কি, থাম থাম, দেখতে পাচ্ছনা? বুড়ো মানুষ যদি পড়ে যাই?" বলে বুড়ো লোকটা চেঁচিয়ে উঠল। "এই যে থামছি— আগে পড়ো তবে থামব।" বলে পাগলা আরো জোরে জোরে সাঁকোটাকে নাড়াতে লাগল। বুড়ো লোকটা ভয়ে আবার বল্লে, "লক্ষি বাছা, একটু থাম, পড়ে যাব যে?" পাগলার ত তার কথা শোনবার জন্যে বয়ে গেছে, সে বল্লে, "উঁ-হু মুখে বল্লে হবে না, আগে পড়ো।" বুড়ো মানুষ টাল সামলাতে পারবে-কেন? সে কিছু ক্ষণ বাদে ঝুপ করে খালে পড়ে গেল। পাগলা তখন এক গাল হেসে সাঁকো নাড়ান বন্ধ করলে। বুড়ো লোকটা জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে রেগে বল্লে, "হতভাগা ছোঁড়া কোথাকার, এই সন্ধ্যেবেলায় আমায় জলে চোবালে তবে ছাড়লে। দে, এবার গলাটা টিপে ডুবিয়ে দে, কাজ চুকে যাক।" "হুঁ, এই যে দিচ্ছি, তোমার কথায় ডোবাব না?" এই বলে পাগ্‌লা খালে নেবে তার গলাটা ধরে হিড় হিড় করে ডেঙ্গায় টেনে নিয়ে এলো। বুড়ো দেখলে যে এ এক বদ্ধ পাগল। আবার কি ক'রে বসে, এই ভয়ে আর কোন কথা না বলে, সেই ভিজে কাপড়ে শুড় শুড় করে বাড়ী চলে গেল। পাগল তখন আপন মনে বলতে লাগল, "দেখ দেখি নি বুড়োর আস্পর্দ্ধা, উনি থাম্‌তে বলবেন তবে আমি থাম্‌ব, উনি ডোবাতে বলবেন তবে আমি ডোবাব, আমি যেন ওঁর মাইনে করা চাকর। আমার বয়ে গেছে ওর কথা শোনবার জন্যে।"

আর একদিন সে আপন মনে বকতে বকতে রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে, এমন সময় রাস্তার ওধার দিয়ে একজন অন্ধ লোক তার সামনে এসে পড়ল। অন্ধ তার গলার আওয়াজ শুনে বল্লে, "সাবধান হয়ে চলো ভাই যেন ঘাড়ে পোড়ো না।" পাগলা

বেশ এক ধার দিয়ে চলে যাচ্ছিল, যেই এই কথা বলা, অমনি, "পড়ব নাত কি ?" বলে ঝপাং করে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। কানা বেচারা কিছু জানে না, তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়াতে সে ধড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল, তার হাতের লাঠিটা গড়িয়ে গেল তিন হাত দূরে। আবার একদিন সে, রাস্তার ধারে একটা গাছ তলায় বসে আছে ; এমন সময়ে একটা সেপাই ঘোড়ায় চড়ে সেইখানে এলো, তারপর ঘোড়া থেকে নেমে, তাকে দূরে একটা সাদা বাড়ী দেখিয়ে বল্লে, "ওহে আমার ঘোড়ার মুখটা একবার ধরত আমি ঐ বাড়ীটা থেকে একবার ঘুরে আসি।" পাগলা তার কথা শুনে, দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ার ল্যাজটা দুহাতে চেপে ধরলে। ঘোড়াটা বেশ দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ ওরকম ভাবে তার ল্যাজটা ধরাতে সে মনে করলে—"না জানি কি এক অপূর্ব্ব জন্তু ল্যাজে কামড়েছে", এইনা ভেবে সে চার পা তুলে দিলে দৌড়, ভয়ানক জোরে দৌড়তে

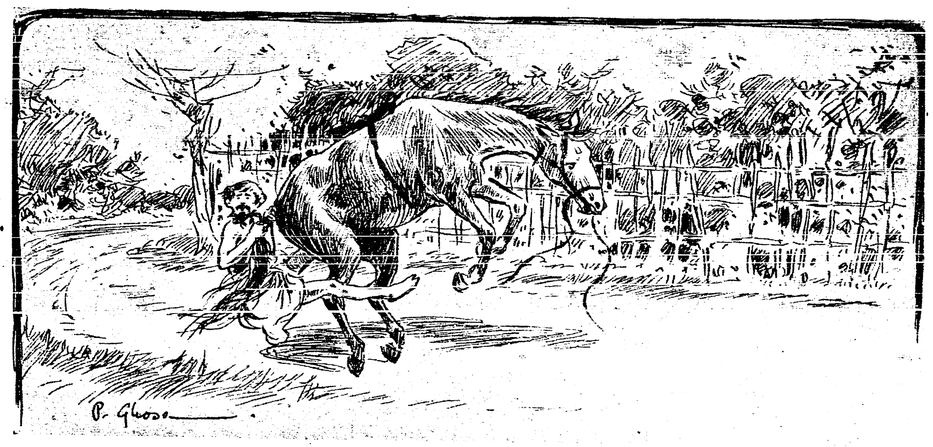

লাগল। রাস্তার লোকেরা একটা ঘোড়াকে ছুটে আস্‌তে দেখে, এ ওর গায়ে লাফিয়ে পড়ল, ও তার গায়ে লাফিয়ে পড়ল, কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, কেউ খানায় গড়িয়ে গেল, সকলে ভাবলে এ আবার কি কাণ্ড! ঘোড়ার দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে পাগলারও বুকে, পেটে পায়ে, বেশ মিষ্টি মিষ্টি লাথি লাগতে লাগল। ওদিকে সেপাই ত পাগলের কাণ্ড দেখে অবাক, তার ঘোড়া পালিয়ে যাওয়াতে সেও তার পিছু পিছু ছুটল। পাগলা

এবার ভারি জব্দ হয়েছে, কিছুক্ষণ লাথি খেয়ে সে হাত ছেড়ে দিলে, অমনি ধড়াম করে একটা পাথরের উপর মাথা ঘুরে পড়ে গেল। সেপাই পিছু পিছু ছুটে আসছিল, পাগলাকে পড়তে দেখে তার কাছে দৌড়ে গেল, তার ইচ্ছে ছিল পাগলকে আচ্ছা করে ঘা কতক দেয়, কিন্তু তার অবস্থা দেখে আর তা পারলে না। পাগলার হাত পা কেটে গেছে, নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। তার সেই সব ঘা শুকোতে ছয় মাস লাগল, তারপর সে একটু একটু করে সেরে উঠল, আর সেই সঙ্গে তার পাগলামিও আশ্চর্য্য রকম সেরে গেল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

ছাপাখানার কথা।

ছেলেবেলায় একটা ছাপাখানা দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। দেখ্‌লাম একটা লোহার কল রয়েছে, সেটাকে তারা "প্রেস" বলে। তার পাশে একটা কালি-মাখান টেবিল—আর অন্য একটা টেবিলে এক তাড়া কাগজ। প্রেসের সাম্‌নের দিকে একটা লোহার তক্তার উপর অনেকগুলো উঁচু উঁচু অক্ষর বসান রয়েছে। একটা ছেলে একটা মোটা "রুল" দিয়ে টেবিলের কালি নিয়ে সেই অক্ষরগুলাতে মাখাচ্ছে। আর একজন লোক সেই তক্তার সঙ্গে আঁটা একটা ফ্রেমের উপর কাগজ বসিয়ে, কাগজশুদ্ধ ফ্রেমটাকে মুড়ে সেই অক্ষরগুলোর উপর ফেলে দিচ্ছে। তারপর একটা হাতল ঘুরিয়ে সেইগুলোকে একেবারে প্রেসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আর একটা প্রকাণ্ড হাতল টেনে দিচ্ছে। তারপর হাতল ছেড়ে দেওয়া, তক্তা টেনে বার করা, কাগজ খুলে নেওয়া, আবার কালি দেওয়া কাগজ দেওয়া ইত্যাদি। এই রকম ক্রমাগত চল্‌ছে আর প্রত্যেকবার এক একখানা ছাপা হচ্ছে ; এম্‌নি করে ঘণ্টায় ২০০।৩০০ করে ছাপা হয়। ব্যাপারটা আমার কাছে ভারি আশ্চর্য্য লেগেছিল। কিন্তু এসব প্রেস এখন আমাদের দেশেও নিতান্ত "সেকেলে" হ'য়ে গেছে।

দেড় শ' বছর আগে বিলাতে পর্য্যন্ত কি রকম কাঠের প্রেসে ছাপার কাজ চল্‌ত পরের পৃষ্ঠায় তার একটা ছবি দিলাম। এটা আমেরিকার বিখ্যাত পণ্ডিত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্‌লিনের নিজের প্রেস্ ছিল।

WATER STAINED.

আজকালকার কোন বড় ছাপাখানায় যদি যাও, প্রেসের রকমারি দেখে অবাক হ'য়ে যাবে। তার অধিকাংশ কলে চলে, আগাগোড়াই তার কলে কাজ হয়। প্রথম যে কলের প্রেস দেখেছিলাম সে কথা আমার এখনও মনে আছে। প্রেসটাকে দরজির সেলাইকলের মত পায়ে চালাতে হয়। সেটা যখন চলে তখন বোধ হয় যেন একবার হাঁ করছে একবার মুখ বুজছে। যে প্রেস্ চালায় সে ঐ হাঁ করা প্রেসের মধ্যে তার কাগজ বসিয়ে দেয়, আর প্রেস্‌টা সেই কাগজের উপর অক্ষরের "টাইপ" দিয়ে এক কামড় বসিয়ে দেয়—তাতেই ছাপা হ'য়ে যায়! কালীর জন্য ভাব্‌তে হয় না; প্রেসের মাথায় কতগুলো রুল বসান আছে, সেগুলো কালি মেখে তৈরী হ'য়ে থাকে, যেই প্রেস্‌টা হাঁ করে, আর প্রেস্‌ম্যান তার কাগজ বদ্‌লিয়ে দেয়, অম্নি রুলগুলো সুরুৎ ক'রে সেই উঁচু উঁচু অক্ষরগুলোর উপর কালি মাখিয়ে পালায়! পায়ে না চালিয়ে প্রেসের সঙ্গে মোটর জুড়ে দিলে মোটরেই প্রেস্ চালাতে পারে।

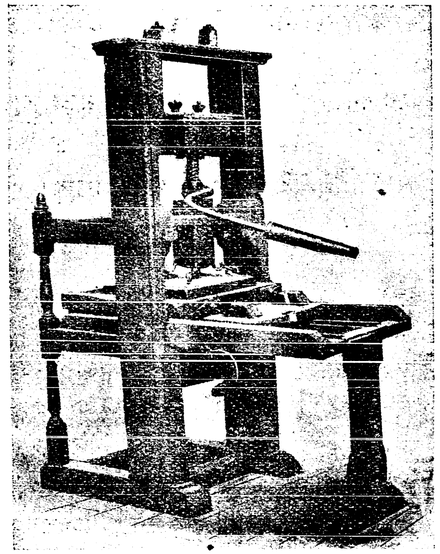

কিন্তু পড়বার বই বা মাসিক কাগজ পত্র ছাপবার জন্য যে সব বড় বড় প্রেস থাকে সেগুলো আরও কটমটে। তাতে একটা প্রকাণ্ড লোহার চোঙা থাকে, তার গায়ে কাগজ ঠেলে দিলে সে আপনি কাগজ টেনে নেয়। একটা লোহার টেবিলমত থাকে তার উপর টাইপ বসান; সেই টেবিলটা টাইপ শুদ্ধ ছুটাছুটি করে। একবার রুলের তলা দিয়ে ছুটে কালি মেখে এসে, আবার কাগজজড়ান "চোঙার" নীচ দিয়ে গড়াতে গিয়ে চোঙাটাকে চেপে ঘুরিয়ে কাগজের গায়ে ছাপ মেরে দেয়। ছাপা হ'য়ে গেলে কাগজটাকে হাতে ক'রে সরিয়ে নিতে হয় না—প্রেস্‌টা আপনি তাকে ঠিক জায়গায় এনে ফেলে দেয়। এম্নি ক'রে ঘণ্টায় ২০০০।৩০০০ বেশ সহজেই ছাপা যায়।

কিন্তু ছাপাখানা কি ভয়ানক ব্যাপার হ'তে পারে তা যদি তুমি দেখ্‌তে চাও তবে খুব বড় খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে গিয়ে দেখ। সেখানে প্রেসের ঘরে ঢুক্‌তেই মনে হবে যেন কাণে তালা লেগে গেল। প্রেসের ভন্ ভন্ শব্দে নিজের চেঁচানি নিজেই শুন্‌তে পাবে না। কল এত তাড়াতাড়ি চলে যে কখন কি ক'রে ছাপা হ'চ্ছে কিছু বুঝ্‌বার যো

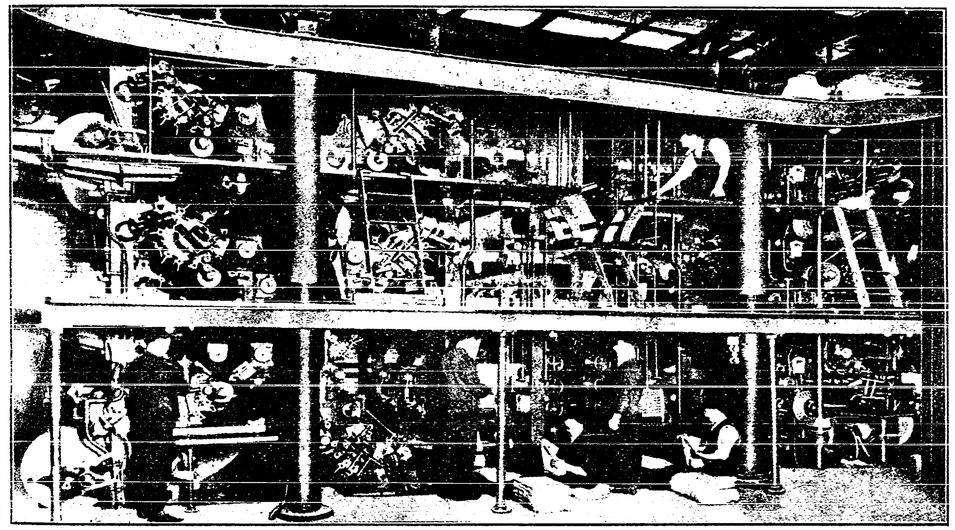

নেই। যে প্রেসটির ছবি দেওয়া হ'ল, তাতে বারো পৃষ্ঠা খবরের কাগজ প্রতি ঘণ্টায় এক লাখ ক'রে ছাপা হয়! যদি প্রেসটার ভিতর ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখ, দেখ্‌বে এক দিকে একটা লোহার ডাণ্ডায় প্রায় ৪।৫ হাত চওড়া কাগজের ফিতে জড়ান—ফিতাটা লম্বায় হয় ত ২।৩ মাইল হবে। প্রেসের মধ্যে পর পর কতকগুলা প্রকাণ্ড লোহার চোঙা ভয়ানক জোরে বন্ বন্ ক'রে ঘুর্‌ছে—আর সেই সঙ্গে হুড়্ হুড়্ ক'রে কাগজের "ফিতে" টেনে নিয়ে তার উপর ছেপে যাচ্ছে। মাইলকে মাইল কাগজ চোখের সামনে দেখ্‌তে দেখ্‌তে শেষ হ'য়ে যাচ্ছে। বিলাতে একটা বড় খবরের কাগজ (Daily Mail) ছাপ্‌তে প্রতি সপ্তাহে ৩০০ মণ কালি আর দশ হাজার মাইল কাগজ খরচ হয়।

এতে একদিন যা ছাপা হ'বে, ঐ দেড়শো বছর আগেকার কাঠের প্রেসে এক বছরেও তা পেরে উঠ্‌ত না।

বর্ণপরিচয়

(স্বরবর্ণ)

অ আ — দুভাই অজ বেয়াকুব
আসল কুঁড়ের ধাড়ি
গোঁফ দাড়ী সব পাক্‌লো তবু
বগলে পাত্‌ভাড়ি !

হ্রস্ব ই — সে ইস্কুলেতে
ইংরাজি কয় তেড়ে
দীর্ঘ ঈ — কয় "ঈস্ ! কি গরম"
রুমাল খানি নেড়ে।

(হ্রস্ব) উ — পালের গোদা
ডালের উপর থাকে,
(দীর্ঘ) ঊ — "উকু" "উকু"
উল্‌লুক-ডাক ডাকে।

ঋ ৯ — দুভাই ভিজে বেড়াল
ঋষির মত সাজ
পরের গাছে ৯চু চুরি
করতে না হয় লাজ !

এ ঐ — এল চোর ধরতে
এইসা লাঠি ঘাড়ে
মুখ শুকালো, ভয়েতে ঐ
লুকায় পুকুর পাড়ে।

ও ঔ — দুই টুক্‌টুকে বৌ
ওরাই ঘরের আলো
ও ঘর থেকে ঔষধ এনে
আমার টাকে ঢালো।

ক্রমশঃ

খুকীর লড়াই দেখা।

একদল ইংরেজসৈন্য মাঠের পাশ দিয়ে লড়ায়ের জায়গায় যাচ্ছে—এমন সময় তাদের একজন হঠাৎ দেখ্‌তে পেল, মাঠের কিনারায় একটা খুকী ঘুমাচ্ছে" ! আশে পাশে কোথাও লোকজন নাই, ঘর বাড়ী যা কিছু ছিল কোন্ কালে গোলা লেগে ছাতু হ'য়ে গেছে—এমন জায়গায় খুকী আস্‌ল কোথা থেকে ? খুকীর বয়স বছর দুই, টুক্‌টুক্ ক'রে হেঁটে বেড়ায়, অতি মিষ্টি ক'রে দুচারটি কথা বলে, ফরাসী ভাষায়। সে যে কোথা থেকে এল তা সে বুঝিয়ে বল্‌তে পারে না। সৈন্যরা ঠিক কর্‌ল, তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়া যাক, পরে খোঁজ ক'রে যা হয় একটা করা যাবে। লড়াইয়ের জায়গায় মাটির মধ্যে খাদ কেটে সৈন্যেরা সব সময় হুশিয়ার হয়ে বসে থাকে—কখন একদিন কখন দুদিন কখন বা সপ্তাহ ধ'রে এক একদলকে সেই খাদের মধ্যে থাক্‌তে হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা খুকীকে নিয়েই আস্তে আস্তে খাদের মধ্যে ঢুক্‌ল।

সাম্নে জার্ম্মানদের খাদ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে এদিক ওদিক গোলা ফাটার শব্দ হচ্ছে, কখন বা দুটো একটা বন্দুকের গুলি সোঁ ক'রে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু খুকুমণির তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সৈন্যেরা তার জন্য খড় দিয়ে আর বালির বস্তা দিয়ে সুন্দর বিছানা ক'রে দিয়েছে—তার মধ্যে সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমাচ্ছে! সকাল হ'তেই কামানের লড়াই আরম্ভ হল—প্রথমটা অল্প স্বল্প—তারপরে ক্রমেই বেশী। খুকী তখন ঘুম থেকে উঠেছে, সে প্রথম প্রথম দুমদাম শব্দে বোধ হয় একটু ভয় পেয়েছিল—কিন্তু খানিকক্ষণ শুনে শুনে আপ্‌না হতেই তার ভয় ভেঙে গেল। সে তখন খাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে লাগ্‌ল, তাদের বন্দুক দূরবীণ অস্ত্র শস্ত্র দেখিয়ে "এটা কি" ? "ওটা কি" ? জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌ল।

তারপর এক দিন যায় দুদিন যায় সৈন্যেরা তখনও সেখান থেকে বদ্‌লী হয় নি। তিন দিনের দিন জার্ম্মানরা খাদের উপর প্রকাণ্ড এক বোমা ফেল্ল। বোমা ভয়ানক শব্দে ফাট্‌বামাত্র খাদের খানিকটা ধ'সে গিয়ে কতগুলো লোক চাপা পড়্‌ল। অমনি সকলে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "আগে খুকীকে দেখ"। খুকী এক কোণে পুঁটুলি পাকিয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে আছে। পরদিন সকাল বেলা সকলে খাওয়া দাওয়া কর্‌ছে—এমন সময় একজন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "দেখ, খুকীটা কোথায় গেল" ; সকলে চেয়ে দেখে খুকীটা জার্ম্মান খাদের দিখে খুট্‌খুট্ ক'রে হেঁটে যাচ্ছে। জার্ম্মানরাত ব্যাপার দেখে অবাক্ !

খানিক বাদে তারা খুকীটাকে ডাক্‌তে লাগ্‌ল। খুকীও তাদের খাদে গিয়ে অনেক চকলেট লজঞ্চুস্ আদায় ক'রে ভারি খুসী হয়ে ফিরে এল। এম্নি ক'রে তারা এক সপ্তাহ কাটাল।

তারপর দু বছর কেটে গেছে—সেই খুকীর বাবা মার কোন খবর পাওয়া যায় নি। সেই সৈন্যদলই এখনও তাকে খরচ দিয়ে খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করছে। অবশ্য এখন সে আর লড়ায়ের জায়গায় থাকে না—সে থাকে লণ্ডনে—সকলে তার নাম রেখেছে ফিলিস্।

জাহাজ তৈয়ারী।

যদি কোন দিন জাহাজের কারখানায় যাও তবে চারিদিকের কাণ্ড কারখানা দেখে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। সেখানকার কল কারখানা যে কত রকমের তা' আর কি বল্‌ব;—কোনটা বাষ্পে চলে, কোনটা বিদ্যুতে চলে, কোনটা বাতাসে চলে, কোনটা জলের চাপে চলে। লোহার পাতকে চাপ দিয়ে যেমন ইচ্ছা বাঁকা করার বড় বড় কল আছে; ছেঁদা করার কল আছে, তা'তে মোটা মোটা ইস্পাতের তক্তা কাগজের মত ছেঁদা হ'য়ে যাচ্ছে; ইস্পাত কাটবার কল আছে, তা'তে এত সহজে ইস্পাতের টুকরো কেটে নেয়, যে দেখ্‌লে মনে হবে যেন ছুরি দিয়ে পাঁউরুটি কাটা হচ্ছে। এ ছাড়া চারিদিকে কত রকমের দৃশ্য আর শব্দ;—হাতুড়ির ঠুক্ ঠাক্ ঠং ঠং শব্দ; এঞ্জিনের হুম্ হুম্ গুম্ গুম্, ভস্ ভস্ শব্দ, মোটা মোটা শিকলের ঝন্ ঝন্ শব্দ, বিদ্যুতে চালান কলের ভন্ ভন্ শব্দ, মজুরদের আর সর্দ্দারদের চেঁচামেচি ছুটাছুটি, উনুনের জ্বল্‌জ্বলে আগুন।

জাহাজটা তৈয়ারী হবার আগে তার একটা নক্সা করা দরকার। সেও এক বিরাট ব্যাপার;—যত বড় জাহাজ হবে ঠিক তত বড় তার নক্সাটিও হওয়া চাই। তার জন্য প্রকাণ্ড বড় ঘর আছে। সেখানে মেজের উপর জাহাজের খোলের আর তার ভিতরের সব কড়ি বর্গা, কল কারখানা, লোহা লক্কড়ের অবিকল হিসাব মত নক্সা করা হয়। তাই থেকে কাঠের মাপ ("ফর্ম্মা") ক'রে নেওয়া হয়। তারপর লোহা আর ইস্পাতের কাজ আরম্ভ হয়। সেটা অবশ্যি অন্য জায়গায় হয়।

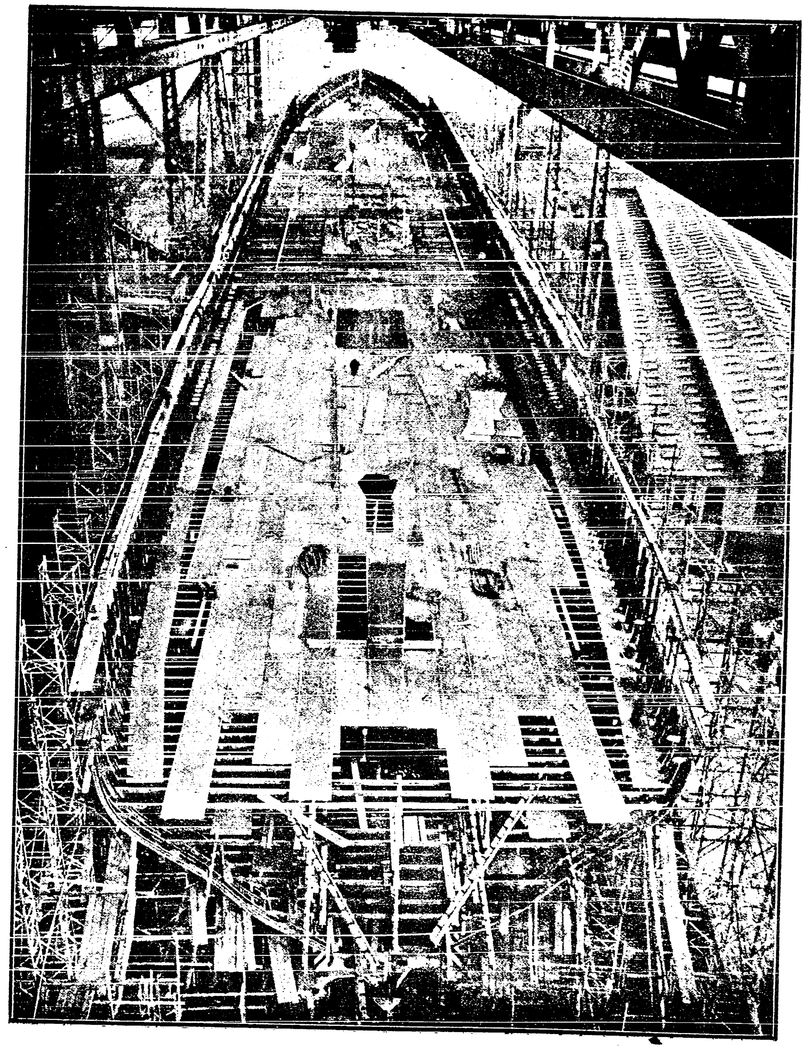

একটা প্রকাণ্ড জাহাজের অর্দ্ধেক তৈয়ারী অবস্থার ছবি।
জাহাজটা ৬৩০ হাত লম্বা, ৬৬ হাত চওড়া, আর পনের লক্ষ বার হাজার মণ ভারী!

গান।

(৺ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রচিত)

একদিন জিব্ বলে, "শোন্ ভাই
পেটটার একটুও কাজ নাই!
খেটে মরি মোরা সবে হায় রে
ওযে শুধু ব'সে ব'সে খায় রে।"
হাত বলে, "হাঁ হাঁ ভাই তাই ত
পেটটার কোন কাজ নাই ত,
ওরি জন্যে কত কষ্ট সহিয়া
মুখে তুলে ভাত দেই বহিয়া!"
পা বলিছে, "চ'ড়ে মোর ঘাড়ে
ব্যথা ক'রে দিল মোর হাড়ে;
পেট যায় নেমন্তন্নে
আমি হেঁটে মরি তার জন্যে।
আচ্ছা ভাই বল্ দেখি তোরা
আমি কিরে হই ওর ঘোড়া?"
শুনে সবাই রেগে বলে ভারি, "পেটের সঙ্গে কর সবে আড়ি।
সবাই খবরদার ওর সাথে আর কেউ ক'রো নাকো কারবার।
গলা গিল্‌বে না ঠোঁট খুল্‌বে না দিবে দাঁত কপাটি
হুড়ুকা আঁটি খাটাখাটি হাঁটাহাঁটি যাবে মিটি।"
এই ভাবে দিন গেল দুই তিন পেটে নাহি দানা পানি।
সবে বলে, "ভাই বল নাহি পাই মোদের কি হ'ল জানি।
ঐ জিব্ দুষ্ট সব কৈল নষ্ট মন্দ কথা ব'লে কাণে।
পেটে সাজা দিলে এত গোলমালে পড়ে তাহা কেবা জানে?"
হেন মতে সবে কাঁদে উচ্চরবে গালি দিয়া রসনারে।
মন্দ কথা ভাই কহিতে না চাই নাহি চাহি শুনিবারে।

স্বরলিপি।

পা । পা । মা -ধা |	পা পা মা -পা গা । |	সা । রা । রা -গা |
এক্ - দিন্ - জিব্	ব লে শো ন্ ভাই -,	পেট্ - টার্ - এক্
রা মা গা -রা সা । |	গা গা পা পা পা ধা |	পা ধা না । ধা । |
টু ও কা জ্ নাই -!	খে টে ম রি মো রা	স বে হায়্ - রে -!
গা গা পা পা গা গা |	রা রা গা -রা সা । ||	
ও যে শু ধু ব সে	ব সে খায় রে -!	
গা । গা গা পা পা |	গা -রা গা -রা সা । |	সা । রা । রা গা |
হাত্ - ব লে হাঁ হাঁ	ভাই, তাই ত -!	পেট্ - টার্ - কো ন
রা -গা পা । পা । |	পা পা পা গা পা পা |	গা পা ধা ধা পা । |
কাজ্ নাই - ত -!	ও রি জ ন্যে ক ত	ক ষ্ট স হি য়া -,
গা গা পা পা গা । |	রা । গা রা সা । ||	
মু খে তু লে ভাত -	দেই - ব হি য়া -।	
সা ধ্া সা সা সা রা |	সা -রা গা । গা । |	রা গা পা পা গা গা |
পা ব লি ছে চ ড়ে	মোর্ ঘা - ড়ে -,	বে থা ক রে দি ল
রা । গা -রা সা । |	গা । পা । পা -ধা |	না । ধা । পা । |
মোর্ হা - ড়ে -।	পেট্ - যায়্ - নে -	ম - ন্ত - ন্নে -,
গা গা পা পা গা গা |	রা । গা -রা সা । |	সা সা সা । সা -রা |
আ মি হেঁ টে ম রি	তার্ - জ - ন্যে -!	আ চ্ছা ভাই, - বল্
রা রা রা । রা । |	গা গা পা পা গা । |	রা -সা সরা -গা গা । |
দে খি তো - রা, -	আ মি কি রে হই -	ওর্ ঘো - ড়া ? |
সা সা সা সা সা সা |	সা সা সা । সা । |	সা রা রা রা রা গা |
শু নে স বাই রে গে	ব লে ভা - রি——	পে টের্ স ঙ্গে ক র
গা সা রা । রা । |	গা গা পা পা রা । |	গা । পা পা পা । |
স বে আ - ড়ি -!	স বাই খ বর্ দার্ -!	ওর্ - সা থে আর্ -

ধা া ধা া না া	ধা পা গা া রা া	রা রা সা -গা রা সা
কেউ - ক - রো -	না ক কার্ - বার্ -!	গ লা গি ল্ বে না
সা া সা -রা গা গা	পা পা রা রা রা রা	গা রা সা সা গা গা
ঠোঁট্ - খুল্ বে না	দি বে দাঁত্ ক পা টি	হুড্ কা আঁ টি- খা টা
পা পা রা রা গা গা	সা গা রা -গরা সা া ‖	
খা টি হাঁ টা হাঁ টি	যা বে মি -- টি -! ‖	
পা া পা পা পা া	গা গা রা া সা া	ধ্া ধ্া সা সা সা রা
এই - ভা বে দিন্ -	গে ল দুই - তিন -	পে টে না হি দা না
গা রা া া া া	সা সা রা রা রা া	গা -পা গা গা রা া
পা নি - - - - -	স বে ব লে "ভাই -	ব ল্ না হি পাই -
গা গা া পা পা ধা	ধা ধা া া া া	না া না া র্সা র্সনা
মো দের্ - কি হ ল	জা নি - - - - -!	ঐ - জিব্ - দু ষ্ট -
ধা া ধা ধা না নাধা	পা পা গা পা ধা পা	মা গা া া া া
সব্ - কৈ ল ন ষ্ট -	ম ন্দ ক থা ব লে	কা ণে - - - -!
সা রা রা রা পা পা	গা মা রা া সা সা	ধ্া ধ্া সা সা সা গা
পে টে সা জা দি লে	এ ত গোল্ - মা লে	প ড়ে, তা হা কে বা
রা সা া া া া	গা গা গা গা গা গা	গা মা রা গা পা পা
জা নে - - - -?"	হে ন ম তে স বে	কাঁ দে উ চ্চ র বে
গা গা পা ধা না পা	ধা ধা া া া া	পা পা পা পা ধা পা
গা লি দি য়া র স	না রে - - - -	ম ন্দ ক থা ভা ই
মা মা মা মা মা গা	রা রা গা গা রা রা	সা সা া া া া ‖
ক হি তে না চা ই	না হি চা হি শু নি	বা রে - - - -! ‖

WATER STAINED.

ভোর না হ'তে পাখীরা জোটে, গানের চোটে ঘুমটি ছোটে—
চোখ্‌টি খোলো গাত্র তোলো, আরে মোলো সকাল হ'লো !

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চতুর্থ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ | দ্বিতীয় সংখ্যা

পড়ার ঠেলা।

(কুঁড়ে ছেলে)—সেই যে কবে হাতে খড়ি ক'রে
ইস্কুলেতে দিলেন বাবা মোরে,
সেই অবধি কত বছর ধ'রে
পড়ে আস্‌ছি ভাই।

সেদিন হ'তে ঘুচে গেছে খেলা,
না খেলিতে আসে পড়ার বেলা,
তার উপরে পরীক্ষার ঠেলা,
সময় কোথা পাই ?

(কাজের ছেলে)—পড়তে বসে মন খেলার দিকে ধায়,
খেলতে গিয়ে মরে পড়ার ভাবনায়,
সে জন কোন কাজে সময় কভু পায় ?

পড়ার বেলা পড়ে, খেলার বেলা খেলে,
সময় যেবা নাহি কাটায় অবহেলে,
তারেই সবে তবে বলে কাজের ছেলে।

WATER STAINED.

(কুঁড়ে ছেলে)—মৌমাছি ঐ বেড়ায় ফুলে ফুলে,
টুনী পাখী নাচে লেজটি তুলে,
যেতে তাদের হয় না ত ইস্কুলে,
ভাবনা কিছু নাই।

সারি সারি পাঁপ্‌ড়ে চলে লুটে,
কাঠ-বিড়ালী ঐ পালাল ছুটে,
ইচ্ছা করে সবার সাথে জুটে'
আমিও ছুটে যাই।

(কাজের ছেলে)—মৌমাছি কি শুধু বেড়ায় ফুলের বনে ?
টুনী পাখী শুধুই নাচে আপন মনে ?
কাজ কি কিছু কারো নাইকো ত্রিভুবনে ?

বলত ভাই তবে, এত যতন ক'রে
কে গড়িল বাসা ছানা গুলির তরে ?
কেই বা রাখে মধু মৌচাকটি ভ'রে ?

শ্রীসুখলতা রাও।

গর্গনের মুণ্ডু।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোতে খুব মনোযোগ করে পার্সিয়ূস্ চেয়ে দেখ্‌ল তিনটি বুড়ি আসছে। তাদের মাথায় শাদাটে মতন লম্বা লম্বা চুল। দুজনের কপালের মাঝখানে গর্ত্ত আর তৃতীয় বুড়ির কপালে ধক্‌ধক্ করে প্রকাণ্ড উজ্জ্বল হীরার মত একটা চোখ্ জ্বলছে। সে কি ভীষণ চোখ্! তার দিকে তাকালেই মনে হয় যেন চোখ্‌টা মানুষের পেটের ভিতর পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পায়। চোখ্‌ওয়ালা বুড়ি অন্য দুজনের হাত ধরে এদিক্ সেদিক্ দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলেছে। মার্কারি ও পার্সিয়ূস্ একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল, তাদের ভয় হলো পাছে বা চোখ্‌ওয়ালা বুড়ি তাদের দেখে ফেলে।

ঝোপের কাছাকাছি এলে পরে অন্য একজন বুড়ি চোখ্‌ওয়ালা বুড়িকে বল্‌ল—"দিদি! তুমি ত অনেক ক্ষণ থেকে দেখ্‌ছ, এবারে আমার দেখ্‌বার পালা; চোখ্‌টা

আমাকে দাও।" তখন তৃতীয় বুড়ি বল্‌ল—"তা কেন, এবারে আমার পালা; চোখ্‌টা

আমাকে দাও।" এই বলে দুই বুড়ি এক সঙ্গে চোখ্ নেবার জন্য হাত বাড়াল। যার কপালে চোখ্ ছিল সে তখন চোখ্‌টা খুলে নিয়ে বল্ল "এই নাও, তোমাদের একজন চোখ্‌টা নাও—এ সব ঝগড়া ঝাঁটির দরকার নাই।" এদিকে চোখ্ তুলে নেওয়াতে তিন বুড়িই অন্ধ; কেউ কারো হাত দেখ্‌তে পাচ্ছে না। আন্দাজের উপরই তিন জনেই হাতড়াতে আরম্ভ করেছে।

মার্কারি পার্সিয়ূসের কাণে কাণে বল্‌ল—"শীগগির কর, এই বেলা ধাঁ করে বুড়ির হাত থেকে চোখ্‌টা কেড়ে নাও।" আর কথাটি নাই, পার্সিয়ূস্ তখন এক লাফে এগিয়ে গিয়ে চোখ্‌টা কেড়ে নিল! বুড়িরা কিন্তু ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পারল না। কাজেই তাদের ঝগড়াও থামল না। পার্সিয়ূস্ তখন বল্‌ল—"বুড়ি মা! তোমরা মিছামিছি কেন ঝগড়া করছ, চোখ্‌টা আমি নিয়েছি।"

এই কথা শুনে বুড়িরা হায় হায় ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল। "আমাদের কি উপায় হবে গো, আমরা যে অন্ধ হয়ে রইলাম। কেন বাপু আমাদের চোখ্ নিলে ? তোমার ত দুটো

দুটো চোখ্ রয়েছে, আমাদের তিন জনের মধ্যে মোটে একটি চোখ্। দাও বাপু, আমাদের চোখ্টা ফিরিয়ে দাও।”

মার্কারি তখন পার্সিয়ুসের কাণে কাণে কি বলে দিল—

পার্সিয়ুস্ বল্‌ল—“বুড়ি মা! তোমাদের কোন ভয় নাই। পাখাওয়ালা জুতো, যাদুকরা থলে আর অন্ধকারের টুপি যে জলদেবীদের কাছে আছে তাদের সন্ধান আমাকে বলে দাও তাহলে এখনি তোমাদের চোখ্ ফিরিয়ে দেব।”

বুড়িরা বুঝ্‌তে পার্‌ল যে আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছে। চোখ্ না পেলেত চল্‌বে না, কি আর করে! তখন তারা জলদেবীর সন্ধান বলে দিল। পার্সিয়ুস্‌ও বুড়িদের অনেক ধন্যবাদ দিয়ে একজন বুড়ির কপালে চোখ্টা লাগিয়ে দিয়ে তখনি মার্কারির সঙ্গে চল্‌ল জলদেবীর সন্ধানে। বুড়িরা খুব খাঁটি সন্ধান বলে দিয়েছিল; কাজেই জলদেবীদের পেতে তাদের বিশেষ মুস্কিল হলো না। জলদেবীরা খুব ভাল লোক, মার্কারির কাছে পার্সিয়ুসের সব কথা শুনে তখনি তারা সন্তুষ্ট হয়ে সেই আশ্চর্য্য জিনিষ তিনটি দিয়ে দিল।

মার্কারি তখন পার্সিয়ুস্‌কে সেই পাখাওয়ালা চটি জুতা পরতে বল্‌ল। পার্সিয়ুস্ চটি পায় দিয়ে থলে হাতে নিয়ে সেই টুপি মাথায় দিল। টুপির গুণই হচ্ছে যে মাথায় দিলে তাকে কেউ দেখ্‌তে পাবে না। পার্সিয়ুস্‌কেও তখন কেউই দেখ্‌তে পেল না। এখন পার্সিয়ুসের পায়েও পাখা দেওয়া চটি জুতা; মার্কারির সঙ্গে উড়ে যেতে তার একটুও কষ্ট হলো না।

শূন্য পথে বিদ্যুতের মতন বেগে দুজন চলেছে। রাত তখন অনেক, কত নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত পার হয়ে, কত মেঘ কুয়াশার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলোতে চারদিক দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারা যেতে লাগল। যেতে যেতে পার্সিয়ুসের মনে হলো একজন কার জানি কাপড়ের ফর্ ফর্ শব্দ তার কাণে আস্‌ছে। মার্কারি ছাড়া আরও একজন কে জানি তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। পার্সিয়ুস্ বল্‌ল—“বন্ধু মার্কারি! কার কাপড়ের ফর্ ফর্ শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি? যেন আরও একজন কে আমার পাশে পাশে চলেছে?”

মার্কারি—“এ আমার বোনের কাপড়ের শব্দ, সেও যে আমাদের সঙ্গে চলেছে। তার সাহায্য ছাড়া ত আমরা কিছুই কর্‌তে পার্‌ব না—তার অসাধারণ বুদ্ধি। তার চোখের দৃষ্টি বড় প্রখর—দেখ্‌বে এখন, সেই আগে গর্গনদের দেখ্‌তে পাবে।”

তখন তারা সমুদ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। পার্সিয়ুস্ চেয়ে দেখ্‌ল সমুদ্রের ভীষণ

ঢেউগুলি পাহাড়ের উপরে পড়ে বাজ পড়ার মতন শব্দ হচ্ছে। ঠিক এই সময়ে পার্সিয়ুস্ শুন্‌তে পেল স্ত্রীলোকের গলায় তার পাশে থেকে কে যেন তাকে বল্‌ল, “পার্সিয়ুস্! চেয়ে দেখ,—ঐ গর্গনদের দেখা যাচ্ছে।”

পার্সিয়ুস্—“কৈ, কৈ! আমি ত কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না?”

“ঐ দেখ, ঠিক তোমার নীচে সমুদ্রের মধ্যে যে একটা দ্বীপ দেখ্‌তে পাচ্ছ তারই কিনারায়।” পার্সিয়ুস্ তখন দেখ্‌ল প্রায় দুই তিন হাজার ফুট নীচে একটি ছোট দ্বীপ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। সেই দ্বীপটি লক্ষ্য করে পার্সিয়ুস্ নীচে নেমে যেতে লাগ্‌ল। খানিক নাম্‌লে পরই দেখ্‌ল একটা মিশ্‌মিশে কাল পাহাড়ের নীচে সেই ভয়ঙ্কর গর্গন তিনটা শুয়ে রয়েছে; তিনটা গর্গনই ঘুমে অচেতন। সৌভাগ্যক্রমে তিনটা গর্গনই তখন পাশ ফিরে শুয়েছিল তাই পার্সিয়ুস তাদের মুখ দেখ্‌তে পায়নি; তা না হলে তখনি সে পাথর হয়ে যেত। পার্সিয়ুস্ মার্কারির সেই তলোয়ার হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—“কোন্‌টার মাথা কাট্‌ব? তিনটাই দেখ্‌তে ঠিক এক রকম, এর মধ্যে মেডুসা কোনটা?”

এখন এই তিনটা গর্গনের মধ্যে একমাত্র মেডুসার মাথাই পার্সিয়ুসের পক্ষে কাট্‌তে পারা সম্ভব, অপর দুটোর মাথা কাট্‌তে পারা যায় এমন ধারাল তলোয়ার পৃথিবীতে কোথাও নাই! পার্সিয়ুস্ বড়ই মুস্কিলে পড়্‌ল। এমন সময় মার্কারির বোনের গলা শুন্‌তে পাওয়া গেল—“সাবধান পার্সিয়ুস্! একটা গর্গন কিন্তু ঘুমের মধ্যেই নড়তে আরম্ভ করেছে; বোধ করি এখনি সে পাশ ফির্‌বে। ওটাই কিন্তু মেডুসা, খবরদার ওর মুখের দিকে তাকিও না—পাথর হয়ে যাবে কিন্তু! তোমার উজ্জ্বল ঢালটার উপরে নিশ্চয়ই তার ছায়া পড়েছে; সেই ছায়া দেখে তোমাকে কাজ করতে হবে।”

এখন পার্সিয়ুস্ বুঝ্‌তে পার্‌ল মার্কারি কেন তার ঢালটাকে পালিস কর্‌তে বলেছিল। ঢালের দিকে চেয়ে দেখ্‌ল মেডুসার ছায়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাপ্‌রে বাপ্ কি ভীষণ চেহারা! ঘুমের মধ্যে যেন স্বপ্ন দেখে মেডুসার দাঁত কড়মড় করে উঠ্‌ল, তার মাথার সাপগুলি ঘুমন্ত অবস্থায়ই কুণ্ডলি পাকিয়ে চোখ বুঁজে ফোঁস ফোঁস কর্‌তে লাগ্‌ল।

পার্সিয়ুস্ আরও নীচে নেমে মেডুসার খুব কাছে গিয়ে তলোয়ার তুল্‌ল। সাপগুলি তখন সজাগ, পার্সিয়ুস্‌কে কামড়াবার জন্য মাথা তুলে ফোঁস্ ফোঁস্ কর্‌ছে, মেডুসাও তখন চোখ্ মেলে চাইল। সেই মুহূর্ত্তে পার্সিয়ুসের তীক্ষ্ণ তলোয়ার বিদ্যুদ্বেগে এসে দুষ্টু মেডুসার মুণ্ডু কেটে ফেল্‌ল।

মেডুসার মুণ্ডু মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে দেখে মার্কারির আনন্দ দেখে কে! "সাবাস্ পার্সিয়ূস্! খাসা কোপ মেরেছ। এখন শীগগির মুণ্ডুটা সেই থলের মধ্যে ভরে ফেল।"

পার্সিয়ূস্ দেখ্‌ল কি আশ্চর্য্য! মণি-ব্যাগের মত ছোট্ট থলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তখন প্রকাণ্ড বড় হয়ে গেল! চক্ষের নিমেষে পার্সিয়ূস্‌ও মুণ্ডুটা নিয়ে একেবারে থলের মধ্যে ভর্‌ল।

তখন পালিয়ে যাওয়াই পার্সিয়ূসের পক্ষে উচিত। মেডুসার মাথাটা তো আর নিঃশব্দে কাটা হয়নি। মুণ্ডুটা মাটিতে পড়ে শব্দও নেহাৎ কম হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে সাপগুলির ফোঁস্ ফোঁসানিও যথেষ্ট ছিল; কাজেই অন্য গর্গন দুটো গেল জেগে। জেগে যখন দেখ্‌ল যে মেডুসার মাথা নাই শুধু শরীরটা পড়ে আছে, তখন তাদের রাগ দেখে কে? প্রকাণ্ড পাখা ছড়িয়ে দাঁত কড়মড় ক'রে তারা তীরের মত আকাশ পানে ছুট্‌ল। ভাগ্যিস্ পার্সিয়ূসের মাথায় জলদেবীদের সেই টুপি ছিল তাই রক্ষা। গর্গন দুটো তাকে দেখ্‌তে পেল না।

ফিরে যাওয়ার পথেও পর্সিয়ুস্ সাহস এবং বীরত্বের অনেক কাজ করে গিয়েছিল। সমুদ্রের ভীষণ একটা জন্তু আর একটু হলেই একটি সুন্দরী মেয়েকে গিলে ফেল্‌ত। পার্সিয়ুস্ অনেক লড়াই করে সেই জন্তুটাকে মেরে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। আবার প্রকাণ্ড একটা দানবকে মেডুসার মাথা দেখিয়ে মস্ত বড় পাহাড় বানিয়ে দিয়েছিল। এইরূপ অনেক ঘটনার পর পার্সিয়ুস্ নিরাপদে সেরিফু দ্বীপে ফিরে গেল। এত বিপদ আপদ পার হয়ে ফিরে এসে বেচারি তার মাকে দেখ্‌তে পেল না। তা'র অনুপস্থিতিতে দুষ্টবুদ্ধি রাজা পলিডেক্‌টিস্ তার মাকে নানা রকমে উৎপাত করায় তিনি জেলের বাড়ী ছেড়ে একটি ধর্ম্মমন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

পার্সিয়ুস্ জেলের বাড়ী গিয়ে তার মাকে দেখ্‌তে না পেয়ে একদম রাজবাড়ী গিয়ে উপস্থিত। রাজা পলিডেক্‌টিস্ ভেবেছিলেন গর্গনদের হাতে নিশ্চয়ই পার্সিয়ূসের মৃত্যু হবে। এখন তাকে সশরীরে উপস্থিত দেখে তিনি মনে মনে ভারি বিরক্ত হলেও বাইরে তা প্রকাশ না করে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কি পার্সিয়ূস্, তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করেছ, মেডুসার মাথা আন্‌তে পেরেছ কি?"

পার্সিয়ূস্—"হাঁ মহারাজ! আপনার আশীর্ব্বাদে তা আন্‌তে পেরেছি।"

রাজা। "সত্যি সত্যি এনেছ? কই, দেখাও দেখি। লোকের মুখে শুনেছি মেডুসার মাথাটা নাকি একটা অদ্ভুত জিনিষ।"

পার্সিয়ূস্—"মহারাজ! আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে কিনা এত কষ্ট করে এমন একটা আশ্চর্য্য জিনিষ এনেছি সেটা কি শুধু আপনিই দেখবেন? আমার মনে হয় একটা দিন ঠিক করে আপনার সব লোকজনদের ডেকে পাঠান। এমন অদ্ভুত জিনিষ ত আর সহজে দেখতে পাওয়া যায় না; কাজেই সকলে এক সঙ্গে দেখবে এখন।"

রাজা পলিডেক্‌টিস্ একটা দিন স্থির করে গর্গন মেডুসার মাথা দেখবার জন্য সকলকে ডেকে পাঠালেন। সেই দিনে একটা উঁচু আসনে রাজা বসলেন, তাঁর চারি দিকে পাত্র, মিত্র সভাসদ সকলেই উপস্থিত; দুষ্টু প্রজাদেরও অনেকে গর্গনের মুণ্ডু দেখতে এল। সকলে মহা ব্যস্ত—সবাই বলে, "গর্গনের মাথা দেখাও, শীগগির দেখাও"।

দয়ালু পার্সিয়ূসের মনে বড়ই দুঃখ হলো, সে রাজাকে বল্‌ল—"মহারাজ! আপনাদের গর্গনের মাথা দেখাতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হচ্ছে না।"

উপস্থিত সকলে মেডুসার মাথা দেখ্‌বার জন্য পাগল, পার্সিয়ূসের এই কথা শুনে সকলে একেবারে ক্ষেপে গেল। তখন তারা চীৎকার করে বল্‌তে লাগল—"হতভাগা, কাপুরুষ! আমাদের সঙ্গে খেলা কর্‌ছ? গর্গনের মাথা যদি এনে থাক এখনি দেখাও, তা না হলে তোমার মাথা কেটে ফেল্‌ব।" দুষ্টু লোকদের পরামর্শে রাজাও তখন রেগে বল্লেন—"হাঁ, ঠিক! শীগগির গর্গনের মাথা দেখাও, তা নইলে এখনি তোমার মাথা কাটা যাবে।"

তখন পার্সিয়ূস্ আর করে কি? নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও "তবে এই দেখ" বলে মেডুসার মুণ্ডু বার করে সকলের সাম্‌নে তুলে ধর্‌ল। বাস্—আর যায় কোথা! সেই মুণ্ডুর দিকে তাকান মাত্র সভাস্থ সকলে—রাজা, পাত্র, মিত্র, উজির, নাজির লোকজন সব তৎক্ষণাৎ মার্ব্বেল পাথরের মূর্ত্তি হয়ে গেল। পার্সিয়ূস্ তখন মেডুসার মুণ্ডু থলের মধ্যে ভরে তার মায়ের কাছে গিয়ে বল্‌ল—"মা! তুমি এখন নিশ্চিন্ত হও, দুষ্টু রাজা পলিডেক্‌টিস্ তার পাপের সাজা পেয়েছে। সে আর তোমার কোন অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না।"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

বাঘ মামা।

রাজার বাড়ীর পিছনে, বাঁশ বনের ধারে এক মস্ত দীঘি। গ্রামের মেয়েরা রোজ সেখানে এসে স্নান করে, আর যাবার সময় কলসী ভ'রে জল নিয়ে যায়।

কয়েকটী মেয়ে জলে নেমে খুব স্নান করছে আর গল্প করছে। একটী মেয়ে বল্‌ল "জানিস? আমাদের কেমন সুন্দর বাড়ী? কেমন চারদিকে ফুল বাগান?"

আর একটী মেয়ে বল্‌ল, "আমাদের পুকুরের বাঁধান ঘাট, কেমন সাদা ধব-ধপে; যেন স্ফটিকের তৈরী।" আর একটী মেয়ে বল্‌ল "আমার বাবার কেমন গাড়ী আছে, ঘোড়া আছে। ঘোড়াটা যা ছোটে ভাই, ঠিক যেন পক্ষীরাজ।" সকলেই একটা না একটা কিছু বল্‌ছে, কিন্তু তাদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট্ট মেয়েটী চুপ করে আছে; সে কিছু বল্‌ছে না! বেচারী ভেবেই পাচ্ছেনা যে কিসের কথা বলবে। অনেক পরে সে বলে উঠ্‌ল "আমারও এক 'বাঘ মামা' আছে, সে বড্ড ভাল।" এই কথা বলতেই সকলে হেসে উঠ্‌লো; একটী মেয়ে বল্‌ল, "যা যাঃ হাবী! শীগ্গীর স্নান করে ওঠ্"—আবার আর একটী মেয়ে বল্‌ল, "উনি আর কথা খুঁজে পেলেন না, তাই বোকার মত বলতে এসেছেন আমার এক বাঘ মামা আছে"—আর একটা দুষ্টু কালো হিংসুটে মেয়ে বল্‌ল, "সব মিছে কথা! 'বাঘ মামা' আছে, না 'হাতী মামা' আছে!" তাই শুনে ছোট্ট মেয়েটী কাঁদো কাঁদো হয়ে বাড়ী চলে গেল। এদিকে হয়েছে কি, সেই বাঁশ ঝোপে এক বুড়ো বাঘ বসে তাদের কথা শুন্‌ছিল। ছোট্ট মেয়েটী তাকে 'মামা' বলাতে তার ভারি মজা লেগেছে। সে কর্‌ল কি, সকলের স্নান হয়ে গেলে, গ্রামের রাস্তা দিয়ে বরাবর ভিতরে যেতে লাগ্‌লো। একটা গাছ তলায় ৪।৫ জন পাল্কী বেহারা, পাল্কী নামিয়ে বিশ্রাম করছিল—বাঘ একলাফে তাদের সাম্‌নে গিয়েই চোখ ঘুরিয়ে বল্‌ল "এইও! তোমরা শীগ্গীর পাল্কী নিয়ে আমার সঙ্গে চল।" পাল্কী বেহারাগুলো এমন থতমত খেলো যে, পালাতেও পারলনা। তাড়াতাড়ি পাল্কী উঠিয়ে ভয়ে ভয়ে বাঘের সঙ্গে চল্‌ল। খানিক দূর যেতেই বাঘ দেখ্‌ল এক দোকানে সারি সারি মিঠাই সাজান রয়েছে। সে এক লাফ দিয়ে ঢুকে, একেবারে ময়রাদের মাঝখানে উপস্থিত। আর যে যেখানে ছিল "পালা, পালা" "খেলো, খেলো" করে একেবারে দৌড়। বাঘ তখন মজা করে হাঁড়ি হাঁড়ি মিঠাই পাল্কীতে উঠিয়ে নিল। তারপর আবার এক কাপড়ের দোকানে গিয়ে বাঘ "হালুম্" করতেই—"বাপ্‌রে, মারে", করে যে যেখানে

পারে দে ছুট্। বাঘ তখন সুন্দর সুন্দর সাড়ী বেছে, পাল্কীতে উঠিয়ে নিল। এম্‌নি করে নানান্ দোকান ঘুরে নানান্ জিনিষে পাল্কী একেবারে ভর্ত্তি হয়ে গেল। বাঘ তখন কতগুলো বাছাবাছা জিনিষ নিয়ে সেই ছোট্ট মেয়েটির বাড়ীর দিকে চল্‌ল।

মেয়েটি ঝাঁটা নিয়ে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, এমন সময় তার মনে হ'ল দরজায় যেন 'ঠুক্' 'ঠাক্' কিসের শব্দ হচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি দেখবার জন্য দরজাটা একটু ফাঁক করতেই

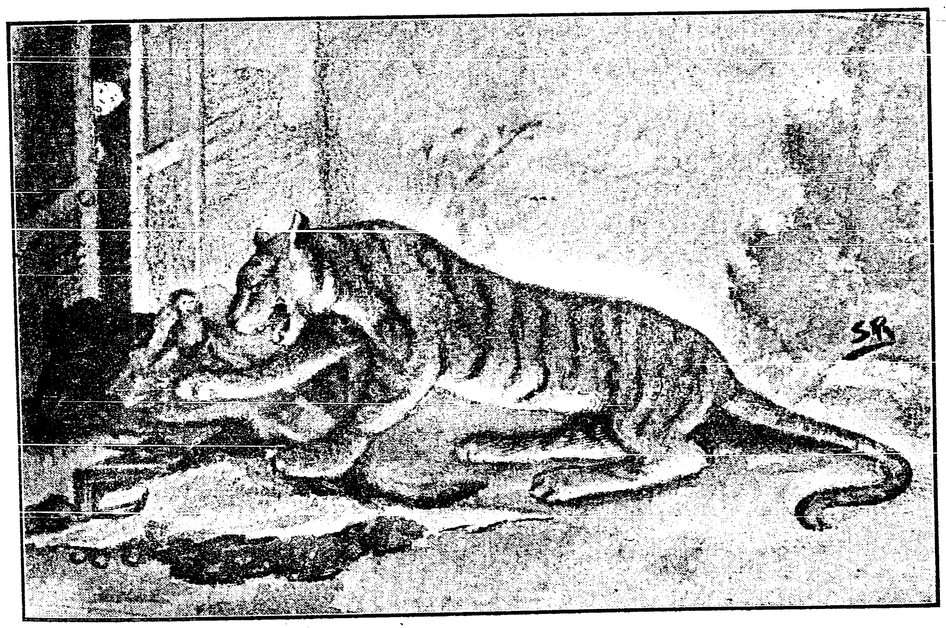

—ও বাবা! একেবারে বাঘের সঙ্গে চোখাচোখি। তখন সে "আমাকে বাঘে খেলোরে" বলে এম্‌নি চেঁচাতে লাগ্‌ল যে চীৎকার শুনে তার বাড়ীশুদ্ধ সকলেই দৌড়ে এল। বাঘ দেখ্‌ল বড়ই মুস্কিল, ওরা বড্ড ভয় পেয়েছে, এম্‌নিত দরজা খুলবেনা। তখন সে পাল্কী থেকে মিঠাই, সাড়ী, খেল্‌না বার করে দরজার সাম্‌নে রেখে, নিজে চোখ বুজে হাত পা ছড়িয়ে মাটিতে শুয়ে রইল।

তখন সকলে বলাবলি করতে লাগ্‌ল যে বাঘ যখন এত ভাল জিনিষ পত্র এনেছে তখন তার মনে কোন দুষ্টু বুদ্ধি নাই, সে তাদের খাবেনা। তখন তারা সাহস করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বাঘ তখন "হায়, হায় ভাগ্‌নি! মামাকে ডেকে শেষে তাড়িয়ে দিচ্ছ!" এই বলে ছট্ ফট্ করতে লাগলো, যেন কতই মনে কষ্ট তার। তখন মেয়েটীর সেই স্নান করতে যাওয়া থেকে সব মনে পড়ে গেল। সে তার মা, বাপকে সব খুলে বল্‌ল।

তার কথা শেষ হতেই বাঘ লাফিয়ে উঠে বল্‌ল "তা হ'লে এখন একবার মামার বাড়ী চল"—শুনে সকলে কাঁদতে লাগ্‌লো। এমন লক্ষীমেয়েকে কি কেউ বাঘের বাড়ী পাঠাতে পারে? ছোট্ট মেয়েটী বল্‌ল "বাঘ মামা, তোমার পায়ে পড়ি! আমাকে যেতে ব'লোনা। ও বাঘ মামা তোমার পায়ে পড়ি"—বাঘ তখন রেগে বল্‌লো "দেখো যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও, তবে আমি বল্‌ছি তোমার খুব ভালই হবে। আর যদি না যাও, তবে এক্ষুনি সকলকে খেয়ে ফেল্‌বো"। মেয়েটী তখন ভয়ে ভয়ে পাল্কীতে উঠ্‌ল! আর দেখতে দেখতে পাল্কীবেহারারা বাঘের হুকুমে মেয়েকে নিয়ে বনে এসে উপস্থিত। মেয়েকে নামিয়ে দিয়েই তারা যে যার প্রাণ নিয়ে দৌড়, মেয়েটি আরও ভয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। বাঘ যতই বলে "আরে, আরে অত কেঁদোনা, চুপ কর" মেয়েটী ততই কাঁদে। শেষে বাঘ বল্‌ল "দেখো আমি গভীর বনে শিকার খুঁজ্‌তে যাচ্ছি, তুমি আমার জন্য পাতা দিয়ে একটা বিছানা করে রেখো। আর ঐ গাছে খুব মিষ্টি মিষ্টি ফল আছে তুমি খেয়ো।" এই বলে বাঘ চলে গেল।

মেয়েটী অনেকক্ষণ খুব কেঁদে, শেষে আস্তে আস্তে উঠে বাঘের জন্য শুক্‌নো পাতা দিয়ে সুন্দর করে বিছানা কর্‌ল। গাছের ডাল ভেঙ্গে, তাই দিয়ে আশে পাশের জঞ্জাল পরিস্কার কর্‌ল। নিজে ফলটল কিছু খেলোনা।

বাঘ এসে বিছানা দেখে মহাখুসী। তার আর দেরী সইল না, গা মোড়ামুড়ি দিয়ে হাই তুলে বল্‌ল "ভাগ্‌নি, আমার পাটা একটু টিপে দাওত"! মেয়েটী তক্ষুণি বাঘের পা টিপে দিতে লাগ্‌ল।

খানিক পরে বাঘ বল্‌ল "আচ্ছা ভাগ্‌নী, আমার লেজটা কেমন?" মেয়েটী বল্‌ল "বাঃ! বড় সুন্দর,—কেমন মখমলের মত নরম, আবার কেমন হলদে কালো ডোরা।" "আচ্ছা আমার কানটা কেমন ভাগ্‌নী?" "বাঃ! ঠিক যেন সোনার

পীদ্দীম খানি!" "আচ্ছা—আমার চোখ দুটো কেমন ভাগ্‌নী?" "চমৎকার! কেমন লাল—আবার রাত্রে জোনাকির মত জ্বলে।" "আচ্ছা—ভাগ্‌নী, আমার দাঁতগুলো কেমন?" "আহাহা! যেমনি ধপ্‌ধপে সাদা, তেম্‌নি ধারাল।" "আচ্ছা—ভাগ্‌নী, বলত কাঁচা মাংসের গন্ধটা কেমন?" এই বলে বাঘ "ঘেউক্" করে এক ঢেকুর তুল্‌ল। মেয়েটীরত গন্ধের চোটে প্রায় বমি হয়ে যাবার যোগাড়, তবু সে সাম্‌লিয়ে নিয়ে বল্‌ল "খুব ভাল মামা, খুব ভাল। ঠিক যেন আতরের গন্ধ।"

বাঘ ত বেজায় খুসী, সে বল্‌ল "আহা, তুমিত বড় লক্ষী মেয়ে। এখন দেখো ঐ গাছের তলায় কত টাকা, কত গহনা, মণি মুক্তা কত কি রয়েছে। যত পারো নিয়ে বাড়ী যাও।" মেয়েটীরত আনন্দ ধরেনা। সে ছুট্টে গিয়ে মস্ত পুটুলী বেঁধে অনেক টাকা, সাড়ী, গহনা নিলো। তারপর বাঘ তাকে গ্রামের পথ পর্য্যন্ত এগিয়ে দিল। তারপর সে বাড়ী যেতেই কি যে আনন্দ হ'ল! পাড়ার সকলে এসে তার জিনিষ পত্র দেখে অবাক্ হয়ে গেল। সকলেই খুসী হয়েছে, কেবল সেই দুষ্টু কালো হিংসুটে মেয়েটা মুখ হাঁড়ী করে বাড়ী ফিরে গেল।

তারপর আর এক দিনও আবার মেয়েরা স্নান করতে নেমেছে। আর সেই হিংসুটে মেয়ে নিজে থেকেই বার বার বলছে "আমার এক বাঘ মামা আছে, আর কিছু নাই; শুধু এক বাঘ মামা আছে আর কিছু নাই"—বাঘটা সে দিনও সব শুনতে পেল। আর ঠিক সেই রকম করে সাড়ী, মিঠাই, খেল্‌না নিয়ে হিংসুক্ মেয়ের বাড়ী গেল।

এদিকে মেয়েত বাড়ী গিয়েই একেবারে দরজায় দাঁড়িয়ে বাঘের জন্য অপেক্ষা করছে। বাঘও পাল্কী টাল্কী নিয়ে এসে হাজির। কিন্তু কেউ কিছু ব্যস্তও হল'না, বরং বাঘকে দেখে খুসীই হ'ল। মেয়েত আগেই পাল্কীতে উঠে বসেছে, আর দেখতে দেখতে বনের কাছে এসে পড়েছে। তারপর সে পাল্কী থেকে নেমেই আগে চারদিকে চেয়ে দেখ্‌ছে, যে সাড়ী, গহনা কোথায় আছে। বাঘ বল্‌ল "দেখো আমি বনে যাচ্ছি শিকার খুঁজতে। তুমি আমার জন্য পাতা দিয়ে বিছানা করে রেখো, আর ঐ গাছে মিষ্টি ফল আছে, খেয়ো।"

মেয়ের বড্ড রাগ হ'ল। বাঘ চলে গেলে পর সে প্রথমে খুব করে ফল পেড়ে খেলো, তারপর কোথাও কিছু টাকা, গহনা পায় কি না খুঁজতে লাগ্‌ল। বিছানাও হল'না কিছুই হল'না।

বাঘ এসে বিছানা করা হয়নি দেখে মাটিতেই শুয়ে মেয়েকে ডাক্‌ল "একটু পাটা টিপে দাওত।" পাছে বাঘ খেয়ে ফেলে সেই ভয়ে মেয়ে পা টিপ্‌তে গেল। বাঘ বল্‌ল "আচ্ছা—বলত আমার লেজটা কেমন?" হিংসুকে মেয়ে বল্‌ল "রামঃ! যেন নারকেলের দড়ি।" "আচ্ছা—আমার কানটা কেমন?" "ছিঃ! যেন জুতোর চামড়ার মত!" "আচ্ছা—আমার দাঁতগুলো বেশ্, না?" "থু—থু—যেন ব্যাঙের ছাতা।" বাঘের ক্রমেই রাগ হচ্ছে, সে আবার বল্‌ল "আচ্ছা—বলত বাপু কাঁচা মাংসের গন্ধটা লাগে কেমন?" এই বলে "ঘেউক্" করে এক ঢেকুর তুল্‌লো। মেয়েটাত বমি করেই ভাসিয়ে দিলো। তখন বাঘ বল্‌ল, "তোকে গহনা, সাড়ী, খেলনা কিচ্ছু দেবোনা। ভাল চাস্‌ত এখনই আমার সাম্‌নে থেকে পালা, না হলে একেবারে গিলে ফেল্‌বো।" মেয়েটাত তখন "বাপ্‌রে, বাপ্‌রে" করে একেবারে ছুট্। একবার ফিরেও তাকায় না, সেই বাড়ীর ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে তবে হাঁপ ছাড়লো। সে আর লক্ষী মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ত না। বাঘের ভয়ে দিঘীতে স্নান করতে যাওয়াও বন্ধ করল।

শ্রীশান্তিলতা চৌধুরী।

রাজার ছেলে।

এক যে ছিলেন রাজপুত্র ধূর্ত্তপানায় মূর্ত্তিমান,
মন বসে না পড়াশুনায় সারাদিনই ফূর্ত্তি চান।
রাণী ভাব্‌তেন ছেলেবেলায় থাকাই ভাল চট্‌পটে;
রাজার কিন্তু মেজাজ হ'ল ধীরে ধীরে খট্ খটে,—
বর্ষাকালের কাদা যথা শুকিয়ে কঠিন আশ্বিনে।
গতিক দেখে রাজার ছেলে ভাবল শেষে ভাস্‌সি নেই।
পাত্র, মিত্র, কোতোয়ালের ছেলেগুলি হাত করে'
একদিন সে হ'ল উধাও একটুখানি রাত করে'।
শোর-গোল খুব পড়ে' গেল ভোরের বেলায় চারদিকে,
খুঁজে কিন্তু পেলে না কেউ রাজা রাণীর কার্ত্তিকে।

পেরিয়ে অনেক রাজার রাজ্য চারটি ছেলে বকাটে,
পেয়ে একটা পড়ো বাড়ী ধাক্কা দিল কপাটে;
দেখে খালি খোলা বাড়ী দিন কাটাল হল্লাতে;
ছিল নাক জনপ্রাণী সেই বাড়ীটির তল্লাটে।
ভয় ঢুক্‌ল সন্ধ্যা বেলা ভারি বোট্‌কা গন্ধ যে।
বন্ধ কর্‌লে ঘরের দুয়ার বিষম রকম সন্দেহে।
ঐ কে যেন ঠেল্‌ছে দুয়ার! কইছে রূঢ় বাক্য সে!
দেখ্‌লে তারা ঘর ঘিরেছে ছোট্ট বড় রাক্ষসে।
বল্লে কোতোয়ালের ছেলে,—"ধর্‌ব তোকে ডাকিস্ ত।
খোক্কসেরা আছি হেথায় জানিস্ নাকি পাপিষ্ঠ?"
"ও বাবারে!" বলে' পালায়, আগে ছোটে বুড়াটা,—
ভাবে বুঝি মড়্‌মড়িয়ে খেলে তাহার মুড়াটা।

পালা ক'রে পাত্র-পুত্র জাগে প্রথম প্রহরে;
নানা যুক্তি করে মনে রাক্ষসেরা সহরে।
পাত্র মশাই তাড়িয়ে মশা করছেন ঘরে পাচারি,
চুপে চুপে এল তখন দুটো রাক্ষস মাঝারি—
ফিস্ ফিসানির নিশ্বাসেতে দুয়ার নড়ে ঝন্‌ঝণাৎ।
জ্ঞানেপটু পাত্র বটু বুদ্ধি এঁটে তৎক্ষণাৎ,
নিজের মনে বলার ছলে কহে মাথা হেঁট করে;
"পেতাম যদি জোড়া রাক্ষস নিতাম খাসা পেট ভরে"।
উর্দ্ধশ্বাসে জোড়ারাক্ষস অমনি পালায় চট্ করে;
গায়ে ঠেকে অশথ্ পাকুড় ভেঙ্গে পড়ে মট্ করে'।

মিত্র-পুত্র তাহার পরে পাহারা করে তিনটিকে,—
মাঝে মাঝে ভয় ঝাড়িতে ঝাড়ে বুলি হিন্দীতে।
কৌতুহলে এল তখন রাক্ষসেদের বাচ্চারা,
চুপে চুপে কোন মতে হয়ে বুড়ীর কাছ ছাড়া;
সবার চাইতে ছোট যেটা, ছিল যাহার জুজুর ভয়,

তালগাছের চাইতে যাহার মাথা বেশী উঁচু নয়,
দরজার এক ছেঁদা দিয়ে আঙ্গুল দিল বিঁধিয়ে ;
দেখেই মিত্রের হাত পা গেল পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে ;
অদ্ভুত সেই মূর্ত্তি দেখে ছেঁদা পথে শঙ্কাতে
ছেলেগুলো লম্ফ দিয়ে চলে গেল লঙ্কাতে।

শেষ রাত্রে রাজার ছেলে দিচ্ছেন যখন পাহারা,
শুন্‌তে পেলেন বাইরে যেন কইছে কথা কাহারা।
অর্থাৎ কিনা কাণ্ডখানা কর্‌তে নিজে চাক্ষুষ-ই,
এসেছিল নাত্‌নী-কোলে পালের গোদা রাক্ষসী ;
বল্‌ছিল সে, "রাক্ষসেরা মরবে নাক কক্‌খন-ও ;
উঠ্‌বো বেঁচে, খোক্কসেরা করে যদি ভক্ষণ-ও ;
আস্‌বে হেথা রাজার পুত্র, নাইক তাহার সম্ভবই,
অন্য হাতে ভাঙ্গবে নাকো স্ফটিক-বাঁধা স্তম্ভটি।"
শুনে বলেন রাজার ছেলে,—"কে আট্‌কাবি আট্‌কা-না!"
ঘরের কোণের স্ফটিক-স্তম্ভ কর্‌লে ভেঙ্গে আট্‌খানা।

রাক্ষসেরা গেল মরে ; ছিল পূরীর মাঝখানে—
বুড়ী রাক্ষসীটির দাসী চারটি মেয়ে সাবধানে ;
তারাই ছিল বেঁচে (হায়রে! মরেছিল অন্যেরা),
যথাক্রমে রাজা হ'তে কোতয়ালের কন্যারা!
রাজার ছেলে আদি সবে বিয়ে ক'রে চারটিকে
ফিরল দেশে ; শূন্যবাসে মন থাকে কি আর টিঁকে ?
রাণী বল্লেন,—"বাছারা সব, ছিলি তোরা কোন্ দেশে ?"
হেসে বল্লেন রাজার ছেলে,—"পড় নাই কি সন্দেশে ?"

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কাপড়ের কথা।

ঐ যে জামাটা তুমি গায়ে দিয়েছ, ওর কাপড়টা তৈরী কর্‌তে কত লোককে কত হাঙ্গাম কর্‌তে হয়েছে, তুমি কি একবার ভেবে দেখেছ ? তূলার ক্ষেতে যখন তূলা হ'লো তখন কত লোকে এসে সেই সব তূলা গাছথেকে তুলে নিয়ে এক জায়গায় জড় কর্‌ল। কলে সেই তূলার বীচি পরিস্কার ক'রে তাকে গাঁটে বেঁধে ফেল্‌ল। তারপর সেই তূলা কত দেশবিদেশে ঘুরে কাপড়ের কলে এসে হাজির হ'ল।

আমি একদিন একটা কাপড়ের কল দেখ্‌তে গিয়েছিলাম, সেটা খুব বড় কল নয়—তার চেয়ে অনেক বড় কল আমাদের দেশে আছে। কিন্তু তারই সব কাণ্ড কারখানা দেখ্‌লে অবাক হয়ে থাক্‌তে হয়। প্রকাণ্ড এক তিনতালা বাড়ী,—তার ছাদে অনায়াসে একটা ফুটবল খেলার জায়গা হ'তে পারে। প্রথমেই গেলাম তিনতালায়। সেখানে একটা প্রকাণ্ড বাষ্পেচালান কপিকল আছে ; তূলার চালান এলে প্রথমেই গাঁটগুলি কপিকলে ক'রে তিনতালায় তোলা হয়। তারপর গাঁট খুলে তূলা কলে পরিস্কার করা হয়। সেই কলে তূলাকে ঝেড়ে আছড়িয়ে দম্‌কা হাওয়ায় উড়িয়ে ধূলা, বালি, বীচি, খড়, কুটো সমস্ত বার ক'রে ফেলে, তারপর সেই পরিস্কার তূলায় চাপ দিয়ে আর একটা কলে মোটা মোটা লেপের মতন তৈরী হয়। সেই 'লেপ' গুলি তারপর দোতালায় চালান করে। সেখানে সেই 'লেপ' থেকে সূতা কাটা হয়। সে এক বিরাট ব্যাপার। প্রথমে অনেকগুলো কলে সেই 'লেপ' থেকে জাহাজ বাঁধা দড়ির মত মোটা দড়ি তৈরী হয়। তারপর আর একটা কলে সেই দড়ি থেকে টেনে মোটা সূতা বার করা হয়। এম্‌নি ক'রে কলের পর কল—তাতে সূতা ক্রমেই খুব সরু হ'য়ে আসে। এ ঘরের

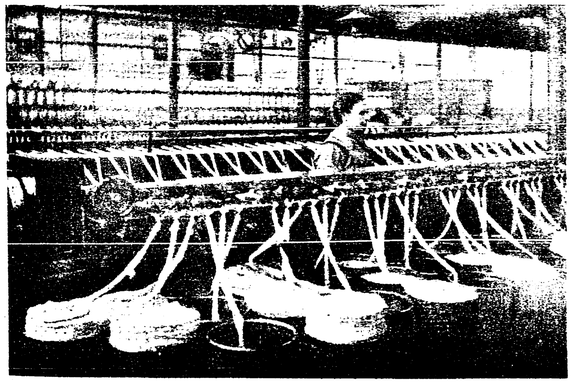

কল কারখানা বড়ই অদ্ভুত। চারদিকে প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা কল সারি সারি সাজান, তার প্রত্যেকটাতে হাজার হাজার লম্বা 'নলী' (সূতা পাকাবার জন্য ছোট ছোট কাঠের 'লাটাই') বন্ বন্ ক'রে ঘুর্‌ছে আর সূতা পাকান হচ্ছে। তা'ছাড়া কল কব্জা যে

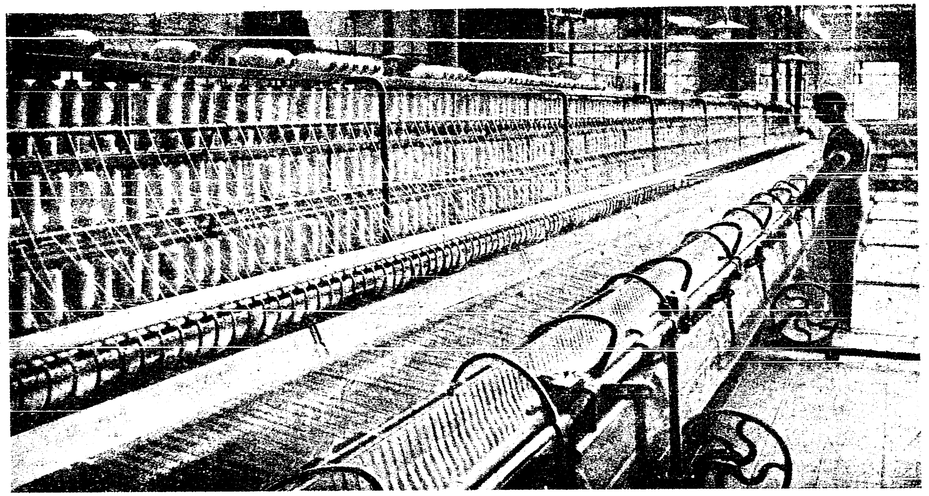

এই কলে ১৩০০ লাটাই। তাতে প্রতিদিন ৪০০০ মাইল সূতা পাকিয়ে জড়ান হচ্ছে।

কতরকম চল্‌ছে তার আর কথাই নাই। দেখ্‌লে চোখে ধাঁধা লেগে যায়, কিন্তু কারখানার কোথাও একটু গোলমাল দেখ্‌তে পাবে না। যে যার কাজ কর্‌ছে আর সব কল ঠিক চল্‌ছে। সূতা কাটা হয়ে গেলে তৈরী সূতার 'নলী' গুলো আর একটা কলের কাছে নিয়ে যায়। এটা হচ্ছে কাপড়ের 'টানা' দেবার কল। 'টানা' কা'কে বলে জান? কাপড়ে লম্বালম্বি ভাবে যে সূতা থাকে তাকে 'টানা' বলে আর চওড়া ভাবে যে সূতা থাকে তাকে 'পড়েন' বলে। এই টানা দেবার কল বড় আশ্চর্য্য। হাজার হাজার নলী থেকে সূতা টেনে একটা চিরুণীর মত জিনিষের ভিতর দিয়ে গলিয়ে নিয়ে একটা রোলারে জড়ায়। কল চল্‌তে চল্‌তে যদি একটাও সূতা ছিঁড়ে যায়, অমনি আপনি আপনি 'ঢং' ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠে আর কল থেমে যায়। সেই সূতাটা জোড়া দিলে তবে কল চল্‌বে। এক সঙ্গে অনেক থান কাপড়ের টানা দেওয়া হয়ে

থাকে। টানার সূতায় রোলার ভর্ত্তি হয়ে গেলে সেই রোলারটাকে একতালায় চালান করা হয়। সেখানে কলে সূতায় মাড় দেওয়া হয়। সূতায় মাড় মাখান, বেশী মাড় চেঁচে ফেলে দেওয়া, বাতাস দিয়ে তাড়াতাড়ি সূতাকে শুখান,—এ সবই কলে হয়। তারপর তাঁতে চড়াবার জন্য সেই সূতাকে গুছিয়ে ঠিক করে। একে বলে 'ব' তোলা। এ কাজটা হয়ে গেলে তারপর কাপড় বোনা হয়। আগের সব কাজ যত সহজে কলে হয় কাপড় বোনা তঁত সহজে হয় না। 'টানা'র সূতার টান যদি একটু বেশী হয়ে যায়, অম্‌নি পট্ করে সূতা ছিঁড়ে যায়। তখনই তাঁত থামিয়ে সূতা জোড়া দিয়ে দিতে হয়। তাঁত যখন চলে তখন বড় মজার দেখায়। টানার সূতা উঠ্‌ছে আর নাম্‌ছে, আর তার ফাঁকের ভিতর দিয়ে 'পড়েন'র সূতার 'মাকু' ঠক্ ঠক্ করে ছুটে যাচ্ছে আর আস্‌ছে,—ঠিক যেন একটা ইঁদুর দৌড়াচ্ছে। কাপড় বোনা হয়ে গেলে তাকে মেজে ঘসে মোলায়েম ক'রে, সুন্দর ক'রে ভাঁজ ক'রে, ছাপ লাগিয়ে, তারপর তাকে বাজারে পাঠান হয়। মোলায়েম করার কলটি বড় মজার। দুটো ফাঁপা রোলার গায়ে গায়ে লাগান রয়েছে, তার মাঝখান দিয়ে কাপড়টা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফাঁপা রোলারের ভিতর ফুটন্ত জলের বাষ্প চালিয়ে দিয়ে রোলার দুটোকে খুব গরম করা হয়, তারপর আস্তে আস্তে সে দুটোকে ঘোরান হয়। তখন কাপড়টাও গরমে আর চাপে খুব মোলায়েম হয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর সেই কাপড় ভাঁজ করার কলে নিয়ে যায়। সেই কলের দুটো হাত আছে, তা'দিয়ে কাপড়টাকে চট্‌পট্ ভাঁজ করে ফেলে। তারপর প্যাক্ করার ঘরে সেই কাপড়ে ছাপ মেরে, তাকে বেঁধে, কাগজ মুড়ে বাজারে পাঠাবার জন্য তৈরী ক'রে রাখে।

এ সবত নিতান্ত সাধারণ কাপড়ের কথা হ'ল। যদি রঙিন্ বা ছিটের কাপড় হয়, তবে তার জন্য ধোলাই করা, সুতায় রং দেওয়া, নক্সা তোলা, ইত্যাদি আরো নানারকম হাঙ্গামের দরকার হয়।

ঊষা ও অনিরুদ্ধ।

দৈত্যরাজ বলির পুত্র বাণরাজা কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। মহাদেব তাহাকে অনেক বর দিয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে বিপদের সময় বাণকে তিনি নিজের পুত্রের মত রক্ষা করিবেন। শিববলে বলী হইয়া বাণ ক্রমে ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিল, দেবতারা পর্য্যন্ত তাহার ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বাণের কন্যার নাম ছিল ঊষা। একদিন রাত্রিকালে ঊষা একটি সুন্দর রাজপুত্রকে স্বপ্নে দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইল। তখন হইতে ঊষা কেবলই সেই স্বপ্নের কথা ভাবে আর "হায় সে কোথা গেল, হায় সে কোথা গেল" এই বলিয়া দুঃখ করে। মন্ত্রীকন্যা চিত্রলেখা ছিল ঊষার সখী; সে জিজ্ঞাসা করিল—"রাজকুমারী! তুমি কাহার জন্য দুঃখ করিতেছ, আমিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" ঊষা তাহার স্বপ্নের ঘটনা সখীকে বলিল। গুণবতী চিত্রলেখা দেব দৈত্য এবং মানুষের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের ছবি আঁকিয়া ঊষাকে দেখাইল। একে একে ছবিগুলি দেখিতে দেখিতে দেব দানবের ছবি ছাড়িয়া ঊষা মানুষের ছবি দেখিতে লাগিল। ক্রমে কৃষ্ণের ছবির নিকটে আসিলে সে কেমন থতমত খাইয়া গেল। তারপর কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের ছবি দেখিয়া তাহার মনে আরও গোল লাগিয়া গেল। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধের ছবি ছিল তারপর, সে ছবি দেখিবা মাত্র "এই সেই, এই সেই" বলিয়া রাজকুমারী চেঁচাইয়া উঠিল।

চিত্রলেখা দ্বারকায় চলিল। সেখানে গিয়া আশ্চর্য্য কৌশলে অনিরুদ্ধকে লইয়া পুনরায় বাণপুরীতে ফিরিয়া আসিল, অনিরুদ্ধ রাজার অন্তঃপুরে ঊষার সহিত দেখা করিতে গেলেন। একজন অপরিচিত পুরুষকে অন্তঃপুরে দেখিয়া প্রহরিগণ দৈত্যরাজ বাণকে গিয়া সংবাদ দিল। এই সংবাদ শুনিয়া বাণের ত রাগ হইবার কথাই—তিনি হুকুম করিলেন "যাও এখনি তাহাকে বন্দী কর।" কৃষ্ণের পুত্রগণের মধ্যে প্রদ্যুম্ন ছিলেন সকলের চাইতে বড় যোদ্ধা, তাঁহারই পুত্র অনিরুদ্ধ—তিনিও যোদ্ধা বড় কম ছিলেন না। বাণের সৈন্যদিগকে তিনি চক্ষের নিমেষে বধ করিলেন। তখন বাণ স্বয়ং যুদ্ধ করিতে গেল। অনিরুদ্ধের সহিত তাহার ঘোরতর যুদ্ধ হইল, তাঁহার তীরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া দৈত্যরাজ অস্থির হইয়া পড়িল। তখন মন্ত্রবলে মায়া যুদ্ধ করিয়া বাণ অনিরুদ্ধকে নাগপাশ অস্ত্র দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল।

এদিকে নারদ মুনি দ্বারকায় গিয়া এই সমস্ত সংবাদ কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি যদুগণকে জানাইলেন। তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ গরুড়ে চড়িয়া বলরাম এবং প্রদ্যুম্নের সহিত বাণপুরীতে রওনা হইলেন। বাণপুরীতে উপস্থিত হইলে পর দৈত্যসৈন্যের সহিত তাঁহাদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাণের পক্ষ হইয়া মহাদেব এবং কার্ত্তিকও যুদ্ধ করিতে আসিলেন। কৃষ্ণের সহিত মহাদেব যে কি ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। কৃষ্ণ জৃম্ভণ অস্ত্র মারিয়া মহাদেবকে অলস করিয়া ফেলিলেন, তিনি রথে বসিয়া শুধু হাই তুলিতে লাগিলেন, তাঁহার যুদ্ধ করিবার শক্তি রহিল না। গরুড় কার্ত্তিকের হাতে ভীষণ কামড়াইয়া দিল, প্রদ্যুম্নের তীক্ষ্ণ বাণগুলি তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল। নিরুপায় হইয়া কার্ত্তিক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

দৈত্যরাজ বাণ দেখিল কৃষ্ণের অস্ত্রে এবং বলরামের লাঙ্গলের আঘাতে অসুর সকল নিঃশেষ হইবার উপক্রম। তখন সে অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয়ে উভয়কে মারিবার জন্য বাছিয়া বাছিয়া সাংঘাতিক অস্ত্র সকল মারিতে লাগিলেন, বাণে বাণে আকাশ ছাইয়া পড়িল। কিন্তু কেহই কাহাকেও হারাইতে পারিলেন না। কৃষ্ণের ভয়ানক রাগ হইল, তিনি তখন দৈত্যরাজকে মারিবার জন্য সুদর্শন চক্র ছাড়িলেন। বাণ রাজার এক হাজার হাত ছিল দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণের চক্র বাণের হাজার হাত কাটিয়া পুনরায় কৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসিল।

বাণের হাত কাটা গিয়াছে এই সংবাদ শুনিয়া মহাদেব কৃষ্ণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক স্তুতি মিনতি করিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! তুমি প্রসন্ন হও। এই দৈত্যকে আমি অভয় দিয়াছি, আমার কথার অন্যথা তোমার করা উচিত নয়। আমার বরে বলবান হইয়াই সে বড় হইয়াছে—আমি তাহার হইয়া তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।" মহাদেবের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ বলিলেন—"শঙ্কর! বাণ তোমার নিকট বর পাইয়াছিল, সুতারং সে বাঁচিয়া থাকুক। আমি তোমার কথা বজায় রাখিবার জন্য এই আমার চক্র সামলাইয়া লইলাম। তুমি তাহাকে অভয় দিয়াছিলে, আমিও অভয় দিলাম।" এই বলিয়া কৃষ্ণ যেখানে অনিরুদ্ধ ছিল সেখানে গেলেন। গরুড়কে দেখিয়াই নাগপাশের সাপ গুলি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, অনিরুদ্ধও বন্ধন মুক্ত হইল। ইহার পর ঊষার সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ দিয়া সকলে দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন।

কৃষ্ণ মহাদেবকে জৃম্ভণ অস্ত্র মারিয়াছেন।

পাস্তর্।

মানুষের যত রকম রোগ হয়, আজকালকার ডাক্তারেরা বলেন, তার সবগুলিই অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর কীর্ত্তি। এই জীবাণু বা "মাইক্রোব" (Microbe) গুলিই সকল রোগের বীজ। পথে ঘাটে বাতাসে, মানুষের শরীরের ভিতরে বাহিরে, ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। আজকালকার চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহাদের খাতির খুব বেশী। এই জীবাণুগুলির ভালরূপ পরিচয় লওয়া, ইহাদের চালচলনের সংবাদ রাখা এবং এগুলিকে জব্দ করিবার নানাপ্রকার ব্যবস্থা করা, এখনকার ডাক্তারি বিদ্যার খুব একটা বড় ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে চিকিৎসাপ্রণালী আশ্চর্য্যরকম উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত উন্নতি এবং এই নূতন প্রণালীর মূলে ফরাসী পণ্ডিত লুই পাস্তর্। পাস্তর একা এ বিষয়ে নূতন আবিষ্কার ও নূতন চিন্তা দ্বারা মানুষের জ্ঞান ও চেষ্টাকে যে কতদূর অগ্রসর করিয়াছেন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

লুই পাস্তর্।

প্রায় ৯৪ বৎসর আগে পাস্তরের জন্ম হয়। অতি অল্প বয়স হইতেই শিক্ষকদের মুখে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা শুনা যাইত। সে সময়কার বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের কাছে তিনি বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতেই রসায়ণ বিদ্যায় তাঁহার খুব নাম শুনা গিয়াছিল। ৪৫ বৎসর বয়সে যখন তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া পারিসে আসেন, তখনও লোকে তাঁহাকে খুব বড় রাসায়নিক পণ্ডিত বলিয়াই জানিত। কিন্তু দেখিতে

দেখিতে তাঁহার চোখ পড়িল আর একটা ব্যাপারের উপরে—"জিনিষ পচে কেন?" এই প্রশ্ন লইয়া তিনি ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন! তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা এবং পুরাতন শিক্ষকেরা ইহাতে ভারি দুঃখিত হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন "পাস্তুরের এমন বুদ্ধি ছিল, চেষ্টা করিলে সে রসায়ণশাস্ত্রে কত কি করিতে পারিত; সে কিনা একটা বাজে বিষয় লইয়া সময় নষ্ট করিতে বসিল"।

কিন্তু পাস্তুর ছাড়িবার লোক নহেন, তিনি ভাবিলেন ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিতে হইবে। আগে লোকের ধারণা ছিল সব জিনিষ বাতাস লাগিয়া "আপনা আপনি" পচিয়া যায়। পাস্তুর দেখাইলেন, দুধে একপ্রকার জীবানু থাকে যাহার জন্য দুধ টকিয়া নষ্ট হইয়া যায়। মাখন যে পচে তাহাও আর এক প্রকার জীবানুর কাণ্ড। ভাত, চিনি বা ফলের রস পচাইয়া যে মদ প্রস্তুত হয় সেখানেও জীবানু। নানাপ্রকার জীবানু বাতাসে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই জন্য অনেক জিনিষ আদুল রাখিলে তাহা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। পাস্তুর আরও দেখাইলেন যে খুব গরম লাগাইলে এই জীবানুগুলি মরিয়া যায়। এইরূপে জীবানু নষ্ট করিয়া একটুকরা মাংস বা খানিকটা দুধ একটা শিশির মধ্যে আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দেখা গেল যে এ অবস্থায় সে গুলি আর পচিতে পারে না! আজকাল লোকে দুধ জমাইয়া টিনে আঁটিয়া বিক্রী করে, নানাপ্রকার ফল চিনির রসে ফুটাইয়া মাসের পর মাস বোতলে পুরিয়া রাখে, কত রকম মাছ মাংস, কত রকম খাবার জিনিষ বাতাসশূন্য পাত্রে করিয়া চালান দেয়। পাস্তুর যদি জীবানু তাড়াইয়া জিনিষ বাঁচাইবার সঙ্কেতটি বলিয়া না দিতেন, তবে এ সকল কিছুই সম্ভব হইত না।

এই সময়ে ফ্রান্সে রেশম-পোকার এক রকম রোগ দেখা দিয়া রেশমের কারবারের ভয়ানক ক্ষতি আরম্ভ করিল। পাস্তুর এই ব্যাপারটার সন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন, এই রোগের মূলে এক প্রকার জীবানু। সেই জীবানুকে নষ্ট করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া তিনি রোগ দূর করিলেন। ইহার পর পশুপাখীর রোগের কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িল। ঘেয়ো জ্বরের উৎপাতে দেশের ছাগল গরু উজাড় হয় দেখিয়া তিনি সেই ঘেয়ো জ্বর দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঘেয়ো জ্বরের জীবানুর সন্ধান করিয়া তাহার উপর নানারূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। ইহার ফলে তিনি যে চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কার করিলেন, ডাক্তার মহলে এখনও তাহার জয়জয়কার চলিতেছে।

তিনি বলিলেন, রোগের বীজকে কাহিল করিয়া সেই বীজের টীকা দাও—তাহাতেই রোগ সারিবে। যাহার রোগ হইয়াছে তাহার দেহ হইতে জীবাণুসংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে সাবধানে রাখিয়া বাড়িতে দাও, তারপর অন্য প্রাণীর দেহে সেই জীবাণুর সাহায্যে রোগ প্রবেশ করাও। এই প্রাণীটি যখন রুগ্ন হইবে এবং তাহার দেহে লক্ষ লক্ষ জীবাণু দেখা দিবে—তাহার শরীর হইতেই টীকার বীজ পাওয়া যাইবে।

পাস্তুর্ বিজ্ঞানমন্দিরে বালক ও নেকড়ের মূর্ত্তি।

পাগলা কুকুরে কামড়াইলে মানুষের "জলাতঙ্ক" রোগ হয়। এই ভয়ানক রোগের জীবাণুগুলি এতই ছোট যে সেগুলি অণুবীক্ষণেও দেখা যায় না। কিন্তু পাস্তুর্ বলিলেন "চোখে দেখা যাউক আর নাই যাউক, জীবাণু আছেই।" সেই অদৃশ্য জীবাণুর দ্বারা তিনি অন্য প্রাণীর মধ্যে রোগ জন্মাইয়া টীকার বীজ প্রস্তুত করিলেন। একটি চাষার ছেলেকে নেকড়ে বাঘে কামড়াইয়াছিল—পাস্তুরের সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষা হইল তাহার উপরে। এই বালক যখন বাঁচিয়া গেল, তাহার পর হইতেই পাস্তুরের চিকিৎসা প্রণালী ডাক্তার মহলে একেবারে পাকা হইয়া পড়িয়াছে। পারিস্‌নগরে পাস্তুরের নামে যে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তাহার সম্মুখে এই কৃষক বালকের একটি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে।

এক সময়ে ডাক্তারেরা মানুষের দেহে সামান্য একটু ছুরী চালাইতে হইলেই কত ব্যস্ত হইতেন কিন্তু এখনকার অস্ত্র চিকিৎসক মানুষের হাত পা কাটিতেও আর

ইতস্তত করেন না, কারণ তিনি জানেন, রোগের বীজ তাড়াইলেই আর ভয় নাই। তাই এত হাত ধোয়াধোয়ি, ফুটন্ত জলে ছুরি কাঁচি ডুবান, এত সাবান আর এত কার্ব্বলিক এসিড্, নির্দ্দোষ তুলা ও ব্যাণ্ডেজের জন্য এত কড়াকড়ি—দুষ্ট জীবাণু যাহাতে কোন ফাঁকে ঢুকিতে না পারে। যুদ্ধের জায়গায় হাজার হাজার লোক আহত হইতেছে; তাহার শতকরা আশি জন বঁচিয়া উঠিতেছে কেবল পাস্তুরের প্রসাদে। আজ বিশ বৎসর হইল পাস্তুর মারা গিয়াছেন; ফরাসিজাতি রাজসম্মানে তাঁহার সমাধি দিয়া সেই সমাধির উপর তাঁহারই নামে বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেখানে এখনও নূতন নূতন আবিষ্কার চলিতেছে। পাস্তুরের শিষ্যেরা এখন পৃথিবীর চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এখনও কত লোক কত কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতেছে।

পাস্তুরকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল "তুমি সারা জীবন ধরিয়া কি দেখিলে এবং কি শিখিলে"? পাস্তুর বলিলেন "দেখিলাম, এ জগৎব্যাপারের সকলই আশ্চর্য্য, সকলই অলৌকিক"।

আশ্চর্য্য কবিতা।

চণ্ডীপুরের ইংরাজী ইস্কুলে আমাদের ক্লাশে একটি নূতন ছাত্র আসিয়াছে। তার বয়স বারো চৌদ্দর বেশী নয়। সে স্কুলে আসিয়া প্রথম দিনই সকলকে জানাইল, "আমি পোইট্রি লিখ্‌তে পারি"! একথা শুনিয়া ক্লাশশুদ্ধ সকলে অবাক্ হইয়া গেল; কেবল দুএকজন হিংসা করিয়া বলিল "আমরাও ছেলেবেলায় ঢেরঢের কবিতা লিখেছি"। নূতন ছাত্রটি বোধ হয় ভাবিয়াছিল, সে কবিতা লিখিতে পারে, শুনিয়া ক্লাশে খুব হলস্থূল পড়িয়া যাইবে, এবং কবিতার নমুনা শুনিবার জন্য সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিবে। যখন সেরূপ কিছুরই লক্ষণ দেখা গেল না, তখন বেচারা, যেন আপন মনে কি কথা বলিতেছে, এরূপ ভাবে, যাত্রার মত সুর করিয়া একটা কবিতা আওড়াইতে লাগিল—

"ওহে বিহঙ্গম তুমি কিসের আশায়
বসিয়াছ উচ্চ ডালে সুন্দর বাসায়?

নীল নভোমণ্ডলেতে উড়িয়া উড়িয়া
কত সুখ পাও, আহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া!
যদ্যপি থাকিত মন পুচ্ছ এবং ডানা
উড়ে যেতাম তব সনে না শুনে মানা"—

কবিতা শেষ হইতে না হইতেই ভবেশ অদ্ভুত সুর করিয়া এবং মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—

"আহা, যাদ থাক্‌ত তোমার ল্যাজ এবং ডানা
উড়ে গেলেই আপদ যেত—কর্‌ত না কেউ মানা"!

শুনিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নূতন ছাত্র তাহাতে রাগিয়া বলিল, "দেখ বাপু, নিজেরা যা পার না, তা ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেওয়া ভারি সহজ। শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের গল্প শোননি বুঝি"? একজন ছেলে অত্যন্ত ভাল মানুষের মত মুখ করিয়া বলিল, "শৃগাল এবং দ্রাক্ষাফল! সে আবার কি গল্প"? অমনি নূতন ছাত্রটি আবার সুর ধরিল—

বৃক্ষ হ'তে দ্রাক্ষাফল ভক্ষণ করিতে
লোভী শৃগাল প্রবেশ করে দ্রাক্ষাক্ষেতে
কিন্তু হায় দ্রাক্ষা যে অত্যন্ত উচ্চে থাকে
শৃগাল লাগাল পাবে কিরূপে তাহাকে?
বারম্বার চেষ্টায় হ'য়ে অকৃতকার্য্য
"দ্রাক্ষা টক" বলিয়া পালাল ছেড়ে (সেই) রাজ্য—

সেই হইতে আমাদের হরেরাম একেবারে তাহার চেলা হইয়া গেল। হরেরামের কাছে আমরা শুনিলাম যে ছোকরার নাম শ্যামলাল। সে নাকি এত কবিতা লিখিয়াছে যে একখানা দুপয়সার খাতা প্রায় ভর্ত্তি হইয়াছে—আর আট দশটি কবিতা হইলেই তাহার একশ'টা পুরা হয়; তখন সে নাকি বই ছাপাইবে। শুনিয়া কেহ কেহ আরও অবাক হইয়া গেল—কাহারও কাহারও হিংসা আরও দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

ইহার মধ্যে একদিন এক কাণ্ড হইল। গোপাল বলিয়া একটি ছেলে স্কুল ছাড়িয়া যাইবে, এই উপলক্ষ্যে শ্যামলাল এক প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল! তাহার মধ্যে "বিদায় বিদায়" বলিয়া অনেক "অশ্রুজল" "দুঃখশোক" ইত্যাদি কথা ছিল। গোপাল কবিতার আধখানা শুনিয়াই একেবারে তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল,

"হতভাগা, ফের আমার নামে পৈট্রি লিখ্‌বি ত এক থাপ্পড় মার্‌ব। কেন রে বাপু দুনিয়ায় কি কবিতা লিখ্‌বার আর কোন জিনিষ পাওনি"? হরেরাম বলিল "আহা, বুঝলে না? তুমি ইস্কুল ছেড়ে যাচ্ছ কিনা, তাই ও লিখেছে"। গোপাল বলিল "ছেড়ে যাচ্ছি ত যাচ্ছি, তোর তাতে কিরে? ফের জ্যাঠামি কর্‌বি ত তোর কবিতার খাতা ছিঁড়ে দেব"। দেখিতে দেখিতে কথাটা স্কুলময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ছেলেরা, বিশেষত নীচের ক্লাশের ছেলেরা, দলে দলে শ্যামলালের কবিতা শুনিবার জন্য আসিতে লাগিল! ক্রমে কবিতা লেখার বাতিকটা ভয়ানক রকম ছোঁয়াচে হইয়া স্কুলের প্রায় অর্দ্ধেক ছেলেকে পাইয়া বসিল। ছোট ছোট ছেলেদের পকেটে ছোট ছোট কবিতার খাতা দেখা দিল—বড়দের মধ্যে কেহ কেহ "শ্যামলালের চেয়ে ভাল কবিতা" লিখিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল! স্কুলের দেয়ালে, পড়ার কেতাবে, পরীক্ষার খাতায়, চারিদিকে কবিতা গজাইয়া উঠিল।

পাঁড়েজির বৃদ্ধ ছাগল যে দিন শিং নাড়িয়া দড়ি ছিঁড়িয়া স্কুলের উঠানে দাপাদাপি করিয়াছিল, আর শ্যামলালকে তাড়া করিয়া খানায় ফেলিয়াছিল, তাহার পর দিন ভারতবর্ষের বড় ম্যাপের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা বাহির হইল—

পাঁড়েজির ছাগলের এক হাত দাড়ি,
অপরূপ রূপ তার যাই বলিহারি!
উঠানে দাপট করি নেচেছিল কাল—
তারপর কি হইল জানে শ্যামলাল।

শ্যামলালের রংটি কাল, কিন্তু কবিতা পড়িয়া সে যথার্থই চটিয়া লাল হইল, এবং তখনি তাহার নীচে একটা কড়া জবাব লিখিতে লাগিল। সে সবেমাত্র লিখিয়াছে, "রে অধম দুরাচার, পাষণ্ড বর্ব্বর" এমন সময় গুরু গম্ভীর গলায় কে যেন ডাকিল "শ্যামলাল"! ফিরিয়া দেখি হেড মাষ্টার মহাশয়! "ম্যাপের উপর কি লেখা হ'চ্ছে"? শ্যামলাল একেবারে থতমত খাইয়া বলিল "আজ্ঞে, আমি আগে লিখিনি, আগে ওরা লিখেছিল"। "ওরা কারা"? শ্যামলাল বোকার মত একবার আমাদের দিকে একবার কড়িকাঠের দিকে তাকাইতে লাগিল, কাহার নাম করিবে বুঝিতে পারিল না। মাষ্টার মহাশয় আবার বলিলেন "ওরা যদি পরের বাড়ী সিঁদ্ কাট্‌তে যায়, তুমিও কাট্‌বে? ওরা যদি নিজের গলায় ছুরি বসায়, দেখাদেখি তুমিও বসাবে"? যাহা হউক, সে দিন অল্পের উপর দিয়াই গেল, শ্যামলাল একটু ধমক ধামক খাইয়াই খালাস পাইল।

ইহার মধ্যে একদিন আমাদের নূতন শিক্ষক মহাশয় গল্প করিলেন যে তাঁহার সঙ্গে যাহারা এক ক্লাশে পড়িত, তাহাদের মধ্যে একজন নাকি অতি সুন্দর কবিতা লিখিত। একবার ইন্‌স্পেক্‌টার স্কুল দেখিতে আসিয়া তাহার কবিতা শুনিয়া তাহাকে সুন্দর ছবিওয়ালা বই উপহার দিয়াছিলেন। এই গল্পটি বোধ হয় অনেকেরই মনে লাগিয়াছিল! বোধ হয় অনেকেই মনে মনে স্থির করিয়াছিল, "ইন্‌স্পেক্‌টার আসিলে তাঁহাকে কবিতা শুনাইতে হইবে।"

ইহার মাসখানেক পরেই ইন্‌স্পেক্টার স্কুল দেখিতে আসিলেন। প্রায় পঁচিশ ত্রিশটি ছেলে সাবধানে পকেটের মধ্যে লুকাইয়া কবিতার কাগজ আনিয়াছে—বড় হলের মধ্যে সমস্ত স্কুলের ছেলেদের দাঁড় করান হইয়াছে—হেড মাষ্টার মহাশয় ইন্‌স্পেক্টারকে লইয়া ঘরে ঢুকিতেছেন,—এমন সময় শ্যামলাল আস্তে আস্তে পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিল। আর কোথা যায়! পাছে শ্যামলাল আগেই তাহার কবিতা পড়িয়া ফেলে, এই ভয়ে ছোট বড় পঁচিশ ত্রিশটি কবিতাওয়ালা একসঙ্গে সাংঘাতিক রকম বিকট চীৎকার করিয়া যে যার কবিতা হাঁকিয়া উঠিল। মনে হইল, সমস্ত বাড়ীটা কর্ত্তালের মত ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল—ইন্‌স্পেক্টার মহাশয় মাথা ঘুরিয়া মাঝ পথেই মেজের উপর বসিয়া পড়িলেন,—ছাদের উপরে একটা বেড়াল ঘুমাইতেছিল সেটা হঠাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া তিন তালা হইতে পড়িয়া গেল—ইস্কুলের দারোয়ান হইতে আফিসের কেশিয়ার বাবু পর্য্যন্ত হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল!

সকলে সুস্থ হইলে পর মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "এত চেঁচাইলে কেন"? সকলে চুপ করিয়া রহিল। আবার জিজ্ঞাসা হইল "কে কে চেঁচাইয়াছিলে"? পাঁচ সাতটি ছেলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল "শ্যামলাল"। শ্যামলাল যে একা অত মারাত্মক রকম চেঁচাইতে পারে একথা কেহই বিশ্বাস করিল না—সুতরাং স্কুলশুদ্ধ ছেলেকে সেদিন স্কুলের পর আট্‌কাইয়া রাখা হইল।

অনেক তম্বীতাম্বার পর একে একে সমস্ত কথা বাহির হইয়া পড়িল। তখন হেড মাষ্টার মহাশয় বলিলেন "কবিতা লেখার রোগ হয়েছে? ও রোগের ওষুধ কি"? বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "বিষস্য বিষমৌষধম্—বিষের ওষুধ বিষ। বসন্তের ওষুধ যেমন বসন্তের টীকা, কবিতার ওষুধ তস্য টীকা। তোমরা যে যা কবিতা লিখেছ তার টীকা ক'রে দিচ্ছি। তোমরা এক মাস প্রতিদিন পঞ্চাশবার ক'রে এটা লিখে এনে রোজ আমায় দেখাবে"। এই ব'লে তিনি টীকা দিলেন—

"পদে পদে মিল খুঁজি, গুণে দেখি চোদ্দ
মনে করি লিখিতেছি ভয়ানক পদ্য!
হয় হব ভবভূতি নয় কালিদাস
কবিতার ঘাস খেয়ে চরি বারো মাস।

এক মাস তিনি আমাদের কাছে এই লেখা প্রতিদিন পঞ্চাশবার আদায় না করিয়া ছাড়িলেন না। এ কবিতার কি আশ্চর্য্য গুণ—তারপর হইতে কবিতা লেখার ফ্যাশান স্কুল হইতে একেবারেই উঠিয়া গেল।

নূতন ধাঁধা।

সূর্য্যের প্রসাদে আমি সবা সাথে ঘুরি
সারাদিন কত রূপে কত লুকোচুরি।
কখন দখিনে বামে কভু আগে পিছে
বিনয়ে লুটাই সদা চরণের নীচে।
তপন পশ্চিমে যায় আমি যাই পূবে
আপনি লুকায়ে মরি সে যখন ডুবে।

ধাঁধার উত্তর।

গত বৎসরের চৈত্র মাসের ধাঁধার উত্তর ভুলে বৈশাখের সংখ্যায় দেওয়া হয় নাই। ধাঁধা দুটির উত্তর ঃ—

(১) পাহাড়। (২) চালাক।

বর্ণপরিচয়

(শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার)।

(ব্যঞ্জনবর্ণ)

ক খ খোকা কেউটে দেখে
পালিয়ে গেল ডরে,
গ ঘ ভয়ে ঘাব্‌ড়ে গিয়ে
ঢুক্‌লো গোয়াল ঘরে
ঙ পেয়াদা কোলা ব্যাঙ
ঠ্যাঙায় লাঠি ধ'রে।
চ ছ দুটি চম্‌রি ছাগল
লাফায় থাকি থাকি
(বর্গীয়) জ জড়িয়ে গলা
ঝ' কে লাগায় ঝাঁকি
ঞ কাঁদে মিঞা মিঞা
সুর করিয়া নাকী!
ট ঠ দুটো টিয়ে পাখী
ঠুক্‌রে বাজায় খোল
ড বসেছে ডুগ্‌ডুগীতে
ঢ নিয়েছে ঢোল
(মূর্দ্ধণ্য)ণ' র কাণে তালা
বলে, থামাও গোল।
ত থ নাচে তাথৈ থৈ
দ দেখ্‌ছে বসে
ধ পড়েছে ধূলোয় ধপাস্
পাগড়ী গেছে খসে
(দন্ত্য) ন কয়, আর নেচো না,
মর্‌বে নিজের দোষে।

প ফ ডুটোঙ্গ পড়া ফেলে
ঘুমিয়ে ডাকায় নাক,
ব ভ তাদের বড় ডুভাই
কাণ ধ'রে দেয় পাক
ম এর মুখে মিহিদানা
পেট্‌টি মোটা ঢাক।
য যাচ্ছেন বিয়ে কর্‌তে
বৌ যুটেছে ভাল
র বাজাবে রোসনচৌকি
ল এর হাতে আলো
ব বসেছেন বরের বাবা
রংটি বেজায় কালো।
(তালব্য) শ ঠিক শকুনি
হাজির হলেন এসে
(মূৰ্দ্ধণ্য) ষ সেজে এল
ষাঁড়ের মত বেশে
(দন্ত্য) স যে সং সেজেছে
হ ম'রলো হেসে।
ড় প'ড়েছে আছাড় খেয়ে
পথের মোড়ে কাদা
ঢ় বলে এই আষাঢ় মাসে
কি জল হলো দাদা
য় বলে হায় যায় যে ওটা
তোল্‌না আগে গাধা।
(খণ্ড) ৎ সে ঈষৎ হাসে পাৎলা চাদরমুখে।
ং অনুস্বারের মাংস খেয়ে
ঃ বিসর্গ রয় দুঃখে।
ঁ চেঁচায় খালি চাঁদের পানে ঝুঁকে।

কয়েকটি ছবি।

একটি ছোট্ট মেয়ের মাথা থেকে একটা উকুন বেরিয়েছিল। আমরা ঠিক কর্‌লাম ওটার ছবি তুলে সন্দেশে দেওয়া যাক্। যেমন-তেমন ছবি তুল্‌লেত হবে না—সন্দেশের পাঠক পাঠিকারা তার ছবি দেখ্‌বেন! তাই একেবারে ক্যামেরার মুখের কাছে বসিয়ে তার প্রকাণ্ড বড় ছবি হ'লো।

কিন্তু শুধু উকুনের ছবি দিলে কি হবে? আরো দু একটা ঐ গোছের ছবি দিলে ভাল হয়; তাই একটা ছারপোকার জন্য ভারি খোঁজ পড়ে গেল। একটি ভদ্রলোকের বিছানায় বরাবর ভয়ানক ছারপোকা থাকে, কিন্তু সেদিন সেখানে ছারপোকা পাওয়াই গেল না। অনেক কষ্টে কোথা থেকে দুটো ছারপোকা পাওয়া গেল, সে গুলোকে সাবধানে মেরে ক্যামেরার সাম্‌নে বসান হ'ল। কিন্তু ছবি তুলবার সময় একটা হঠাৎ হাত পা ছুঁড়ে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। তখন তাড়াতাড়ি তাকে "স্মেলিংসল্‌ট্‌" শুঁকিয়ে ভাল ক'রে মেরে ছবি তোলা হ'ল।

ছারপোকা।

তার পরের ছবিটা দেখ। দেখ্‌লে বোধ হয়, একটা লোহার ডাণ্ডার মধ্যে দড়ি

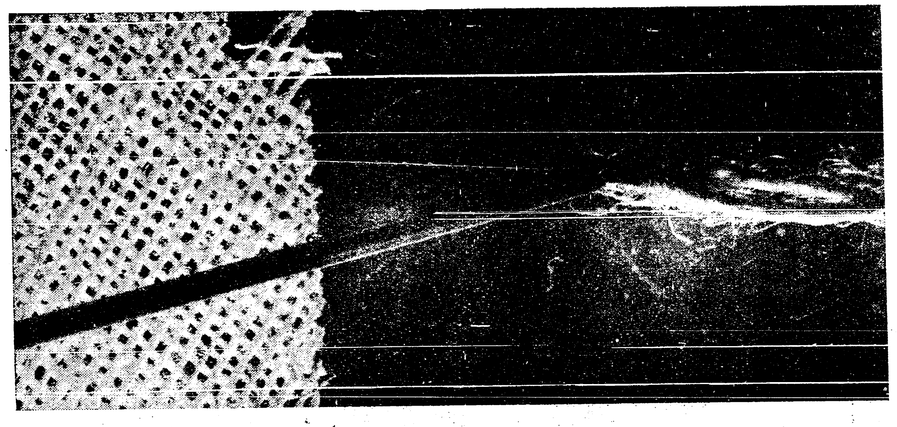

ছুঁচসুতা ও কাপড়ের টুকরা।

পরান রয়েছে আর একটা মোটা ক্যাম্বিসের মত কি একটা জিনিষ। আসলে এগুলো

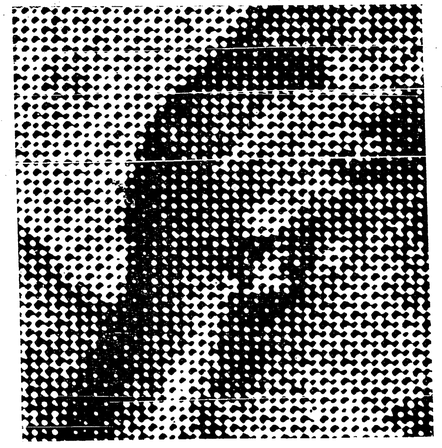

বিশেষ কিছুই নয়—একটা ছুঁচ সুতা আর একটুকরা কাপড় মাত্র।

শেষ ছবিটা এবারকার সন্দেশেরই একটা ছবির টুকরা। ৪১ পৃষ্ঠায় যে বাঘের ছবি আছে, তারই চোখের কাছের খানিকটা অংশ খুব বড় ক'রে দেখান হ'য়েছে। সন্দেশের প্রায় সব ছবিতেই আগাগোড়া এই রকম ছোট বড় বিন্দু দেখ্‌তে পাবে। কেবল এই রকম বিন্দু বিন্দু ফুট্‌কি দিয়ে সাদা কালো ফলিয়ে যে ছবি তৈরী করা হয়, তাকে বলে "হাফ্‌টোন"। সন্দেশের প্রতিষ্ঠাতা ৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় আমাদের দেশে হাফটোন শিল্পের প্রচলন ক'রে তার অনেক রকম উন্নতি ক'রে গিয়েছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কলিকাতা
ক্রমিক
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

চতুর্থ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩২৩ | তৃতীয় সংখ্যা

সঙ্গীহারা

সবাই নাচে ফূর্ত্তি করে সবাই গাহে গান,
একলা বসে হাঁড়িচাঁচার মুখটি কেন ম্লান ?—
দেখ্‌ছ নাকি আমার সাথে সবাই করে আড়ি—
তাইতে আমার মেজাজ খ্র্যাপা মুখটি এমন হাঁড়ি।

তাও কি হয়! ঐযে মাঠে শালিখ পাখী ডাকে
তার কাছে কৈ যাওনিত ভাই শুধাওনিত তাকে!—
শালিখ পাখী বেজায় ঠ্যাঁটা চেঁচায় মিছিমিছি
হল্লা শুনে হাড় জ্বলে যায় কেবল কিচিমিচি।

মিষ্টি স্বরে দোয়েল পাখী জুড়িয়ে দিল প্রাণ
তার কাছে কৈ বস্‌লে নাত শুন্‌লে না তার গান!—
দোয়েল পাখীর ঘ্যান্‌ঘ্যানানি আর কি লাগে ভাল ?
যেমন রূপে তেমন গুণে তেম্নি আবার কালো।

COLOURED DOCUMENT.

রূপ যদি চাও যাও না কেন মাছরাঙ্গার কাছে
অমন খাসা রঙের বাহার আর কি কা'রো আছে ?—
মাছরাঙ্গা ! তারেও কি আর পাখীর মধ্যে ধরি
রকম সকম সঙের মতন, দেমাক দেখে মরি।

পায়রা ঘুঘু কোকিল চড়াই চন্দনা টুন্‌টুনি
কারে তোমার পছন্দ হয়, সেই কথাটি শুনি !—
এইগুলো সব ছ্যাবলা পাখী নেহাৎ ছোট জাত—
দেখ্‌লে আমি তফাৎ হটি অম্নি পঁচিশ হাত !

এতক্ষণে বুঝ্‌তে পারি ব্যাপারখানা কি যে—
সবার তুমি খুঁৎ পেয়েছ নিখুঁৎ কেবল নিজে !
মনের মতন সঙ্গী তোমার কপালে নাই লেখা
তাইতে তোমায় কেউ পোছে না তাইতে থাক একা।

গৌতম ও মণিকুণ্ডল।

(পৌরাণিক গল্প)

গৌতমী গঙ্গার দক্ষিণপারে ভৌবন রাজার রাজ্যে বৃদ্ধকৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার পুত্রের নাম ছিল গৌতম। গৌতম নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও তাঁহার স্বভাব অতিশয় মন্দ ছিল। সেই রাজ্যে মণিকুণ্ডল নামে একজন ধনবান বণিক থাকিত, তাহার সহিত গৌতমের এরূপ বন্ধুতা ছিল, যে সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না।

একদিন গৌতম মণিকুণ্ডলকে বলিল—"বন্ধু ! চল আমরা বিদেশে গিয়া ধন উপার্জ্জন করি।" মণিকুণ্ডল বলিল,—"আমার পিতা বিস্তর ধন রাখিয়া গিয়াছেন, আর ধন দিয়া আমি কি করিব ?" কিন্তু গৌতম কিছুতেই শুনিল না, নানা রকমে বুঝাইয়া মণিকুণ্ডলকে রাজি করিল। মণিকুণ্ডল লোকটি নিতান্ত সরল

এবং সাদাসিধা ; সে তাহার সমস্ত ধন গৌতমের হাতে দিয়া বলিল,—"বন্ধু ! তবে আর দেরি কেন ? চল আমরা এখনই বিদেশ যাত্রা করি।"

পিতামাতাকে কিছু না বলিয়া দুইজনে গোপনে বাহির হইয়া গেল। দুষ্ট ব্রাহ্মণের মনের ইচ্ছা এই যে, বণিককে ঠকাইয়া কোন উপায়ে তাহার ধন কাড়িয়া লইবে। বেচারা মণিকুণ্ডল নিতান্ত ভালমানুষ, সে ব্রাহ্মণের দুষ্ট মৎলব বুঝিতে পারিল না। একদিন গৌতম মণিকুণ্ডলকে বলিল,—"দেখ বন্ধু ! আমি অনেক ভাবিয়া দেখিলাম পৃথিবীতে ধার্ম্মিক লোকেরাই যত কষ্ট ভোগ করে, অধার্ম্মিকেরা বেশ সুখে দিন কাটায়। তাই আমি বলি যে ধর্ম্মের দ্বারা মানুষের কোন লাভ নাই !"

মণিকুণ্ডল লোকটি খুবই ধার্ম্মিক ছিল, গৌতমের কথা শুনিয়া সে ভারি ব্যস্ত হইয়া বলিল—"ছিঃ বন্ধু ! ও কি কথা বলিতেছ ? ধর্ম্ম ছাড়িয়া অধর্ম্ম ! তাহা কখনই হইতে পারে না। যেখানে ধর্ম্ম সেখানে সুখ। যেখানে পাপ সেখানে যত দুঃখ, যত ক্লেশ।" এ তর্কের কিছুতেই মীমাংসা হইল না। তখন তাহারা এই পণ করিল যে লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহার জিত হইবে সে অপরের সমস্ত ধন পাইবে।

পথে চলিতে চলিতে যাহাকে দেখিতে পাইল তাহাকেই তাহারা এই প্রশ্ন করিল—ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম এর মধ্যে কার শক্তি বেশী ? প্রায় সকলেই বলিল—"মহাশয় ! যেরূপ দেখিতে পাই তাহাতে মনে হয় যে অধর্ম্মই বড়। কেন না ধার্ম্মিক লেকেরাই যত কষ্ট ভোগ করে আর দুষ্ট লোকেরা বেশ আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়ায়।" তখন গৌতমই জিতিল এবং পণ অনুসারে বণিকের সমস্ত ধন তাহার হইল। কিন্তু মণিকুণ্ডল তবুও ধর্ম্মের প্রশংসা ছাড়িল না। তাহাতে ব্রাহ্মণ বলিল,—"হে বণিক ! এই মাত্র তোমার সমস্ত ধন জিতিয়া লইয়াছি তবু তুমি সেই ধর্ম্ম ধর্ম্মই করিতেছ ? তোমার মত নির্লজ্জ দেখি নাই।" সাধু মণিকুণ্ডল ব্রাহ্মণের কথায় কর্ণপাত করিল না, ধর্ম্মেরই গুণ গান করিতে লাগিল।

তখন দুষ্ট ব্রাহ্মণ আবার বলিল,—"আচ্ছা ! তাহা হইলে চল এবারে দুটি হাত পণ রাখি। যাহার হার হইবে তাহারই হাত দুটি কাটা যাইবে।" মণিকুণ্ডল তাহাতেই রাজি হইল।

তারপর পূর্ব্বের মত লোকদিগকে প্রশ্ন করিয়া তাহারা ঠিক পূর্ব্বের মতই উত্তর পাইলে পর ব্রাহ্মণ বলিল,—"আমারই জয় হইয়াছে"। এই বলিয়া বেচারি বণিকের

হাত দুখানি কাটিয়া সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ধর্ম্মটাকে কেমন মনে হয়?" সাধু মণিকুণ্ডল বলিল,—"প্রাণ গেলেও ধর্ম্মকেই বড় মনে করিব।"

তারপর দুইজনে ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে এক মন্দিরের নিকটে গিয়া তাহারা উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া আবার তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের তর্ক উঠিল। মণিকুণ্ডল পূর্ব্বের মত ধর্ম্মেরই গুণ গান করিতে লাগিল। পাপিষ্ঠ গৌতম তখন বলিল,—"তোমার ধন গিয়াছে, হাত দুখানি কাটা গিয়াছে, এখন আছে শুধু প্রাণটুকু। এখনও যদি তোমার জেদ্ না ছাড়, তবে তলোয়ার দিয়া তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিব।" মণিকুণ্ডল হাসিয়া বলিল,—"তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পার কিন্তু তবু আমি ধর্ম্মকেই বড় বলিব। যে পাপিষ্ঠ ধর্ম্মের নিন্দা করে তাহাকে স্পর্শ করিলেও পাপ হয়।"

মণিকুণ্ডলের কথায় ব্রাহ্মণ রাগে কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল,—"তবে আইস এবার পণ করি, যে হারিবে তাহার প্রাণ যাইবে।" বণিক তাহাতেই সম্মত হইল। লোকের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা পুনরায় পূর্ব্বমত উত্তরই পাইল। তখন ব্রাহ্মণ মণিকুণ্ডলকে হরিমন্দিরের সম্মুখে মাটিতে ফেলিয়া তাহার চক্ষু দুটি তুলিয়া লইয়া বলিল,—"বণিক! সর্ব্বদা ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া তোমার ধন গিয়াছে হাত গিয়াছে, চক্ষু দুটিও হারাইয়াছ। সুতরাং আর ওরূপ কথা মুখে আনিও না—আমি এখন চলিলাম।" মন্দিরের সম্মুখে মাটিতে পড়িয়া মণিকুণ্ডল চিন্তা করিতে লাগিল,—"হা ভগবান! ধর্ম্মের জন্য কেন আমার এই দুর্দ্দশা হইল!" এরূপ অসহায় ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

সে দিন ছিল শুক্লপক্ষের একাদশী। সেই দিনে রাক্ষস রাজা বিভীষণ পূজা করিবার জন্য সেখানে আসিতেন। রাত্রি হইলে পর বিভীষণ লোকজন সঙ্গে লইয়া সেই মন্দিরে আসিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। পূজার পর বিভীষণের পুত্র পরম ধার্ম্মিক বৈভীষণি সেই বণিককে দেখিতে পাইয়া এবং তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া বিভীষণকে সমস্ত কথা জানাইল। তখন পরম দয়ালু বিভীষণ পুত্রকে বলিলেন,—"বাবা! পূর্ব্বকালে লক্ষণ যখন শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন তাঁহাকে সুস্থ করিবার জন্য হনুমান একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বত তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সেই পর্ব্বতে 'বিশল্যকরণী' ও 'মৃত সঞ্জীবনী' এই দুইটি মহৌষধ ছিল। এই ঔষধের গুণে লক্ষণ জীবিত হইলে পর হনুমান পুনরায় পর্ব্বত লইয়া যাইবার সময় এই মন্দিরের

নিকটে সেই ঔষধের গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। আর ঐ দেখ সেই ডাল হইতে কত বড় গাছ হইয়াছে। এই গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আনিয়া এই বণিকের শরীরে ছোঁয়াইয়া দাও তাহা হইলেই বণিক পুনরায় সুস্থ হইবে।"

বিভীষণের পরামর্শ মত, সেই গাছের ডাল আনিয়া বণিকের শরীরে লাগাইবা মাত্র সে সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার হাত এবং চোখ যেমন ছিল আবার তেমনি হইল। তখন বণিকের আনন্দ দেখে কে! সে ধর্ম্মের গুণ গাহিতে গাহিতে গঙ্গার জলে স্নান করিয়া ভগবানকে প্রণাম করিল। তারপর ঐ আশ্চর্য্য গাছের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল!

অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া বণিক মহাপুর নামে এক রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত। সে দেশের রাজার কোনও পুত্র সন্তান ছিল না, একটি মাত্র কন্যা ছিল সেও আবার অন্ধ।

রাজার মনে বড়ই দুঃখ, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, দেব, দানব, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে কেহ রাজকন্যার চক্ষু ভাল করিয়া দিবে তাহার সহিতই কন্যার বিবাহ দিবেন এবং নিজের সমস্ত রাজ্য দিবেন। লোকের মুখে এই কথা শুনিয়া বণিক বলিল,—"আমি রাজকন্যার চক্ষু ভাল করিব।" রাজার লোকজনেরা বণিককে রাজার নিকট লইয়া গেল। বণিক সেই গাছের ডাল ছোঁয়াইবামাত্র রাজকন্যা চক্ষু ফিরিয়া পাইলেন। তখন রাজার মনে কি যে আনন্দ হইল! তিনি তখনি ঘনঘটা করিয়া বিবাহের আয়োজন করিলেন। দেখিতে দেখিতে বণিকের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইয়া গেল।

রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া বণিক রাজা হইল। এখন আর তাহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। কিন্তু এত সুখ পাইয়াও বণিক তাহার বন্ধু গৌতমের কথা ভুলিতে পারিল না। গৌতমকে অনেক দিন না দেখিয়া ক্রমে সে অস্থির হইয়া পড়িল। এমন সময় একদিন হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। তাহার আর সে চেহারা নাই, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। হাতে একটি পয়সাও নাই, বণিককে ঠকাইয়া সে যে রাশি রাশি ধন পাইয়াছিল তাহা কোন্ দিন জুয়া খেলায় নষ্ট করিয়াছে। মণিকুণ্ডল ব্রাহ্মণকে পরম যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীতে লইয়া গিয়া খুব আদর যত্ন করিল।

মণিকুণ্ডলের নিকট তাহার সমস্ত কথা শুনিয়া গৌতমের মন ফিরিয়া গেল। সে গঙ্গাস্নান করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল, এবং সেই হইতে আত্মীয় স্বজন ও মণিকুণ্ডলের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিল! দুষ্ট গৌতম একজন পরম ধার্ম্মিক হইয়া উঠিল।

সক্রেটিস্।

সে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা—গ্রীসদেশে এথেন্স নগরের একটি গরীবের ঘরে একটি কুশ্রী ছেলের জন্ম হয়। গরীবের ছেলে, পরনে তার ছেঁড়া কাপড়, দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় কি না সন্দেহ—সে আবার লেখাপড়া শিখিবে কিরূপে? সে পাথরের মূর্ত্তি গড়িতে পারিত—তাই বেচিয়া এবং অবসর মত লোকের কাছে দুকথা শিখিয়া মানুষ হইতে লাগিল। এমন সময় ক্রাইটো নামে একটি ধনী

লোক এই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহার মিষ্ট ব্যবহারে এত খুসী হইলেন যে তিনি তখনই নিজের খরচে তাহার পড়াশুনার ভাল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সকলেই ভাবিল গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া এইবার একটা ভাল চাকুরী বা ব্যবসা করিবে।

এথেন্স্ নগরে তখন একদল লোক থাকিত তাহাদের ব্যবসা ছিল পণ্ডিতী করা। তাহারা লোকের কাছে পয়সা লইয়া আড্ডা খুলিত এবং সেইখানে বড় বড় কথা আওড়াইয়া চুলচেরা তর্ক করিয়া নানারকম বিদ্যার ভড়ং দেখাইত। তাহাদের বোল্‌চালে ভুলিয়া লোকে মনে করিত, নাজানি তাহারা কত বড় পণ্ডিত! একটু বয়স হইলেই সেই গরীবের ছেলে এই পণ্ডিত মহলের পরিচয় লইতে আসিলেন। মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা, নিতান্ত ভাল-মানুষটির মত আস্তে আস্তে প্রশ্ন করেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না—কিন্তু তাঁর প্রশ্নের ঠেলায় পণ্ডিতের দল অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিতে গিয়া এক একজন পণ্ডিত এমন নাকাল হইয়া আসিলেন, যে দেখিতে দেখিতে তাঁহার নাম চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। খালি পা মোটা কাপড় পরা, খাঁদা বেঁটে গরীব লোকটিকে রাস্তায় ঘাটে সকলেই চিনিয়া ফেলিল। তিনি পথে বাহির হইলে সকলে দেখাইয়া দিত "ঐ সক্রেটিস্"।

দেখিতে দেখিতে এই সব মুর্খ পণ্ডিতদের উপর সক্রেটিসের ঘোর অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হায়, হায়, এই সব অপদার্থের হাতে পড়িয়া, এথেন্সের ছেলেগুলি একেবারে মাটি হইয়া গেল। ইহারা কেবল কথা কাটাকাটি করিতে শিখিল—কেহ জ্ঞানলাভ করিতে চায় না, মানুষের মত মানুষ হইতে চায় না,—শুধু লোকের কাছে নাম কিনিতে চায়, ছলে বলে ক্ষমতা জাহির করিতে চায়"। সক্রেটিস্ তেজের সহিত চারিদিকে বলিতে লাগিলেন, "এমন করিয়া কোনও মানুষ বড় হইতে পারে না। কেবল টাকাকড়ি ও যশমানের জন্য ছুটাছুটি করিও না; ধর্ম্মপথে থাক এবং জ্ঞান লাভ কর—নহিলে তোমরা অধঃপাতে যাইবে"। লোকে অবাক হইয়া গরীবের মুখে এই সকল কথা শুনিত এবং যে একবার আসিত সেই তাঁহার কথায় ও আশ্চর্য্য ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যাইত। দেখিতে দেখিতে সক্রেটিসের অনেক বন্ধু ও শিষ্য জুটিয়া গেল। সহরের অনেক বড় বড় লোক পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে যাতায়াত আরম্ভ করিল। কোন বিদেশী রাজা অনেক টাকার লোভ দেখাইয়া সক্রেটিস্‌কে তার নিজের সভায় লইতে চাহিলেন। কিন্তু সক্রেটিস্ বলিলেন "আমি এ অনুগ্রহ লইয়া আপনার কাছে ঋণী থাকিতে চাহি না। আমার টাকারই বা প্রয়োজন কি? এই এথেন্স সহরে অতি অল্প খরচেই দুবেলা আহার করিয়া থাকা যায়; আর কাছেই ঝরণার জল, তাহার জন্য পয়সা দিতে হয় না। সুতরাং আমারত কোন অভাব দেখি না"।

সে সময়ে গ্রীসদেশে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ চলিত। একবার কোন এক যুদ্ধে সক্রেটিসকে পাঠান হইল। যাহারা যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই দেশে ফিরিয়া সক্রেটিসের আশ্চর্য্য শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিল। ঘোর শীতের সময়ে যখন বরফে সকল দিক ঢাকিয়া ফেলে, লোকেরা কম্বলের জামা গায়ে দিয়াও শীতে কাঁপিতে থাকে, সক্রেটিস্ তাহার মধ্যে খালি পায়ে সামান্য কাপড় পরিয়া অনায়াসে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ডেলিয়ামের যুদ্ধে যখন শত্রুপক্ষ সক্রেটিসের দলকে হটাইয়া দিল, তখনকার একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বলিয়াছেন, সেই বিপদের সময়েও সক্রেটিসের শান্ত চেহারা ও নিশ্চিন্ত হাসিমুখ দেখিয়া এথেন্সের লোকদের মনে আবার সাহস ফিরিয়া আসিল। শত্রুপক্ষের সৈন্যেরা চারিদিকে মারধর্ করিতেছিল কিন্তু সক্রেটিসের কি আশ্চর্য্য তেজ, তাঁহার কাছে ঘেঁষিতেও কেহ সাহস পায় নাই।

সক্রেটিস্ নিজে গরীবের গরীব কিন্তু সারাজীবন সকলকে বিনাপয়সায় শিক্ষা দিতেন।

এতবড় পণ্ডিত, কিন্তু তাঁর মধ্যে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। কেহ তাঁহাকে রাগ করিয়া কথা বলিতে শুনে নাই, নিজের সামান্য কর্ত্তব্যটুকুও অবহেলা করিতে দেখে নাই। শত্রুমিত্র সকলের জন্য মুখে তাঁহার হাসিটুকু লাগিয়াই থাকিত, কেহ কড়া কথা বলিলে বা মিথ্যা গালাগালি করিলেও তিনি তাহাতে বিরক্ত হইতেন না। কত দুষ্টলোকে তাঁহার উপদেশ শুনিতে গিয়া কাঁদিয়া ফিরিত, তাঁহার মুখের একটি কথায় কত অন্যায় কত অত্যাচার থামিয়া যাইত। দুঃখ বিপদের সময় কতদূর হইতে কত লোকে তাঁহার পরামর্শ শুনিবার জন্য ছুটিয়া আসিত। "যাহা ন্যায় বুঝিব তাহাই করিব" একথা তাঁহার মুখেই শোভা পাইত, কারণ তাঁহার যেমন কথা তেমনি কাজ। এমন সাধু লোককে যে সকলে ভালবাসিবে, ঋষি বলিয়া ভক্তি করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সক্রেটিসেরও শত্রুর অভাব ছিল না। একদল লোক—কেহ হিংসায় কেহ রাগে কেহ নিজের স্বার্থের জন্য—সর্ব্বদা তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিত। সক্রেটিস্‌কে সে কথা জানাইলে তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন।

একবার সে দেশের শাসনকর্ত্তারা তাঁহাকে হুকুম দিলেন "আমরা অমুককে সাজা দিব, তুমি তাহার খোঁজ করিয়া দাও।" সক্রেটিস্ তাহাদের মুখের উপর বলিলেন "আমি অন্যায় কাজে সাহায্য করি না।" শাসনকর্ত্তারা চটিলেন। আর একবার এথেন্সের লোকেরা কয়েকজন সেনাপতির উপর ক্ষেপিয়া জুলুম করিয়া বিনাবিচারে তাহাদের মারিতে চাহিয়াছিল, একমাত্র সক্রেটিস্ ছাড়া সে কার্য্যে বাধা দিতে আর কাহারও সাহস হয় নাই। এই ব্যাপারেও তাহার অনেক শত্রু জুটিল। পণ্ডিতের দলত আগে হইতেই ক্ষেপিয়া ছিল। তারপর যখন চারিদিক হইতে নানাশ্রেণীর লোকে সক্রেটিসের কাছে ঘনঘন যাতায়ত করিতে আরম্ভ করিল, তখন শাসনকর্ত্তারা ভাবিলেন, ইহার মনে নিশ্চয়ই কোন মৎলব আছে—এ হয়ত কোন্‌দিন এই সকল লোককে খ্যাপাইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিবে। তাঁহারা সক্রেটিস্‌কে শাসাইয়া দিলেন, "খবর্দ্দার, তুমি এথেন্সের যুবকদের সঙ্গে আর কথাবার্ত্তা বলিতে পারিবে না।" সক্রেটিস্ তাহাতে ভয় পাইবেন কেন? তিনি পূর্ব্বেরই মত উৎসাহে সকলকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন—"যাহারা জ্ঞানের অহঙ্কার করিয়া বেড়ায় তাহারাই যথার্থ মূর্খ, যাহারা অন্যায় করিয়া দেশের আইনকে ফাঁকি দেয় তাহারা জানে না যে ভগবানের কাছে ফাঁকি চলে না। যে মানুষ খাওয়ায় পরায় অল্পেতেই সন্তুষ্ট, সহজভাবে সরল কথায় সৎচিন্তায় সময় কাটায়, সেই সুখী—আধপেটা খাইয়াও সুখী, মানুষের নিন্দা অত্যাচারের মধ্যেও

সুখী।” এম্নি করিয়া ঋষি সেক্রেটিস্ ৭২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যুবকের মত উৎসাহে নিজের কাজ করিয়া গেলেন।

ইহার মধ্যে সক্রেটিসের শত্রুপক্ষ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা নিন্দা রটাইয়া এথেন্সের বিচার সভায় তাঁহার বিরুদ্ধে অন্যায় নালিশ উপস্থিত করিল। শত্রুর দল যে যেখানে ছিল সকলে হাঁ হাঁ করিয়া সাক্ষ্য দিতে আসিল—“সক্রেটিস্ বড় ভয়ানক লোক, সে এথেন্সের সর্ব্বনাশ করিতেছে।” অন্যায় বিচারে হুকুম হইল “সক্রেটিস্‌কে বিষ খাওয়াইয়া মার!” সক্রেটিসের বন্ধুরা বলিলেন “হায় হায় বিনাদোষে সক্রেটিসের শাস্তি হইল।” সক্রেটিস্ হাসিয়া বলিলেন “তোমরা কি বলিতে চাও যে আমি দোষ করিয়া সাজা পাইলেই ভাল হইত?”

সক্রেটিস্‌কে কয়েদ করিয়া রাখা হইল, কবে তাঁহাকে বিষ খাওয়ান হইবে সে

সক্রেটিসের বিষ পান।

দিনও স্থির হইল। জেলের অধ্যক্ষ সক্রেটিসের ভক্ত ছিলেন, তিনি বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন সক্রেটিস্‌কে রাতারাতি এথেন্স্ হইতে সরাইয়া ফেলিবেন; কিন্তু

সক্রেটিস্ তাহাতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, “আমার দেশের লোকে বিচার করিয়া বলিয়াছেন আমার শাস্তি হউক। আমি সে শাস্তিকে এড়াইয়া দেশের আইনকে অমান্য করিতে চাই না।” ক্রমে দিন ঘনাইয়া আসিল। সক্রেটিসের বন্ধুরা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেলেন, কেহ কেহ রাগে দুঃখে এথেন্স ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—মহাপণ্ডিত প্লেটো প্রভৃতি কয়েকটি শিষ্য শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কাছেই বসিয়া রহিলেন। সক্রেটিসের প্রশান্ত মুখে ভয়ের চিহ্ন মাত্র নাই, তিনি সকলকে আশ্বাস দিতেছেন, উৎসাহের সঙ্গে বলিতেছেন “দেহ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু দেহের মধ্যে যে থাকে সে অমর,—এই দেহে যখন প্রাণ থাকিবে না, আমি তখনও থাকিব”। একজন শিষ্য বলিলেন “মৃত্যুর পর আপনাকে কোথায় কবর দিব”? সক্রেটিস বলিলেন “যেখানে ইচ্ছা; কিন্তু মৃত্যুর পর আমায় পাইবে কোথা”? এমন সময় জেলের প্রধান কর্ম্মচারী কাঁদিতে কাঁদিতে বিষের পাত্র আনিয়া ধরিল এবং সক্রেটিসের কাছে ক্ষমা চাহিল। সক্রেটিস্ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া হাসিমুখে বিষ পান করিলেন। তারপর শিষ্যদের সহিত কথা বলিতে বলিতে ক্রমে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাত পা অবশ হইয়া আসিল। শেষে মৃত্যু আসিয়া মহাপুরুষের জীবন শেষ করিয়া দিল। সক্রেটিস্ মরিয়া অমর হইলেন, তাঁহার নাম চিরকালের জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে থাকিয়া গেল।

রাজার ছেলে পীতাম্বর।

এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল বিশ্বম্ভর। তাঁর ছিল এক রাণী আর তিন ছেলে। বড় ছেলের নাম ছিল নীলাম্বর, মেজর দিগম্বর, ছোটর পীতাম্বর।

একদিন রাণী বেড়াচ্ছিলেন রাজার বাড়ীর বাগানে; হঠাৎ তিনি যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া গেল না। রাজা পাত্র মিত্র সভাসদ্‌দের ডেকে মস্ত এক সভা কর্‌লেন, দেশ বিদেশ থেকে কত জ্যোতিষী, কত গণক, কত পণ্ডিত আনালেন। তিন দিন ধরে কত গণনা, কত মন্ত্রণা চল্ল, তারপর সব চেয়ে বুড়ো যে জ্যোতিষী তিনি উঠে বল্লেন, “মহারাজ, গুণে দেখ্‌লাম যে কচ্ছপাসুর আপনার রাণীকে নিয়ে হিমালয় পর্ব্বতের উঁচু চূড়ায় কোন এক বাড়ীর মধ্যে বন্দী করে রেখেছে। মহারাজ, তার সঙ্গে আপনার মত বীরপুরুষেও যুদ্ধ করে পারবেন না। সে বল্‌তে

গেলে অমর, তার প্রাণ তার দেহে থাকে না, কোথায় থাকে তা সে ছাড়া আর কেউ জানে না। তাই মহারাজ রাণীকে উদ্ধার করবার আশা ছেড়ে দিন।"

রাজা কিন্তু একথা শুন্‌লেন না। তিনি দেশ বিদেশে ভাট পাঠিয়ে দিলেন যে, যে তাঁর রাণীকে উদ্ধার করে আন্‌তে পার্‌বে তাকে তিনি অর্দ্ধেক রাজত্ব দিয়ে দেবেন। তাই শুনে কত বীর এল গেল, কিন্তু রাণীর খোঁজ পাওয়া গেল না।

একদিন রাজা বাগানে বসে রাণীর কথা ভাব্‌ছেন আর চোখের জল ফেল্‌ছেন, এমন সময় শুন্‌তে পেলেন যে তাঁর ছেলেরা কি যেন বলাবলি কর্‌ছে। বড় ছেলে নীলাম্বর বল্ল "এই সব বোকা বোকা লোকদের টাকা দিয়ে মাকে আন্‌তে পাঠালে কি হবে? তার চেয়ে আমায় পাঠালে কাজ দেখ্‌ত"। মেজ ছেলে দিগম্বর বল্ল," লোক গুলো কেবল জাঁক করে, আসলে সব কটাই কাপুরুষ। আমাকে যদি বাবা পাঠাতেন দেখিয়ে দিতাম বীর কাকে বলে।" ছোট ছেলে পীতাম্বর বল্ল, "দাদা, কচ্ছপাসুর ত বড় যে সে লোক নয়, তাই এই সব বীরেরা পারেন নি। তাঁরা যে বীর নন একথা বলা চলে না। তবে বাবা আমাদের পাঠিয়ে দেখ্‌তে পারেন, যদি বা আমরা পারি।"

সে রাত্তিরে রাজা ছেলেদের ডেকে বল্লেন "আমি ঠিক করেছি যে এবার তোমাদের পাঠিয়ে দেখ্‌ব, তোমরা যদি তোমাদের মাকে আন্‌তে পার। বাবা নীলাম্বর, তুমি হলে বড় ছেলে, তুমিই আগে যাও। এর জন্যে তোমার যা দরকার তুমি সঙ্গে নেও।"

নীলাম্বর হাজার হাজার লোকজন, হাতী, ঘোড়া আর প্রকাণ্ড বড় এক থলি মোহর নিয়ে চল্ল। একদিন যায় দুদিন যায়, এম্‌নি করে কতদিন চলে গেল, রাণীর খবরও পায় না, কচ্ছপাসুরের বাড়ীরও সন্ধান পায় না। এম্‌নি করে যেতে যেতে সে একটা জায়গায় এল সেখানে কেবল বালি ধূ ধূ কর্‌ছে; তার লোকজন, হাতী ঘোড়া সব খেতে না পেয়ে, জল তেষ্টায় মারা গেল। শুধু জনকয়েক লোক নিয়ে সে সেই মরুভূমি পার হয়ে এক বনে এল। সে এক ভয়ঙ্কর বন। সেই বনের ধারে একটা শেয়ালকাঁটা গাছের তলায় বসে এক হাত লম্বা ছোট্ট এক বুড়ো, তার শনের মত সাদা দাড়ী মাটীতে লুটিয়ে যাচ্ছে। নীলাম্বর তাকে বল্ল, "ঠাকুর্দ্দা প্রণাম হই"। বুড়ো বল্লে "রাজার ছেলে, তুমি বেঁচে থাক। তুমি যাচ্ছ কোথা? কাজ খুঁজতে না ফাঁকি দিতে"? নীলাম্বর রেগে বল্ল, "কাজ খুঁজতে যাচ্ছি; যে সে কাজ নয়! কচ্ছপাসুরের বাড়ী খুঁজে তাকে মার্‌তে যাচ্ছি—জান?"

বুড়ো মাথা নেড়ে বল্ল, "রাস্তা যে চল্‌ছ তাত ঠিক রাস্তাই বটে, কিন্তু তুমি সেখানে গিয়ে পৌঁছোতে পারবে না।"

নীলাম্বর বল্ল, "কেন পারব না?"

বুড়ো বল্ল, "তিন্‌টে মস্ত মস্ত চওড়া চওড়া নদী পার হতে হবে। মাঝি প্রত্যেক ঘাটে খেয়া পার কর্‌তে যে দাম চাবে তা কি তুমি দিতে পারবে?"

নীলাম্বর মোহরের থলি বাজিয়ে তা থেকে একটা চক্‌চকে মোহর বুড়োর মুখের উপর ছুঁড়ে বল্ল, "তিন্‌টে কেন ত্রিশটা নদী পার হতে পারি"। এই বলে ঘোড়া ছুটিয়ে সে নদীর ধারে গেল। সেই নদীর ধারে কচ্ছপের খোলার মত শক্ত তামার বর্ম্ম পরা এক মাঝি, তার গাটা তাল গাছের মত লম্বা, মাথাটা এক পিপার মত, চোখ দুটো তার

ভাঁটার মত! তাকে দেখে নীলাম্বরের সঙ্গী কজন ভয়ে যে কোথায় পালাল তার ঠিকানাই পাওয়া গেল না। নীলাম্বর সেই মাঝিকে বল্ল "মাঝি, তুমি আমায় পার করে দেবে?" মাঝি বল্ল "হাঁ নিশ্চয়ই, যদি তুমি আমায় আমার পারের দাম দাও।"

নীলাম্বর হেসে বল্ল "কি দাম তুমি নেবে?" মাঝি বল্ল "ফিরবার সময় তোমাকে বিনি পয়সায় পার কর্‌ব, যদি যাবার সময় তোমরা ডানহাতখানা দাও।"

নীলাম্বরের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, কিন্তু সে তবুও ভাব্‌ল "আমি ত রাজা হব, ডান হাত খানা নাই থাক্‌ল বা। না হয় সোনার হাত গড়িয়ে নেব।" সে তাই বল্ল "আচ্ছা তাই দিব। তুমি আমায় পার করে দাও।"

ওপারে গিয়ে রাজপুত্র দেখ্‌ল তার ডান হাতখানা নাই। সে তখন ঘোড়া ছুটিয়ে দ্বিতীয় নদীর ধারে এল। সেখানকার মাঝির চেহারা আরও ভীষণ—রূপার বর্ম্ম খোয়ে-গোখ্‌রো সাপের আঁসের মত চক্‌চক্ করছে। তার চেহারা দেখেই রাজকুমারের মাথা ঘুরে গেল সে দৌড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে দেশে পালিয়ে এল।

রাজামশাই ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে কত আদর কর্‌লেন আর কত যে কাঁদ্‌লেন তা বল্‌বার নয়। তারপর মেজ ছেলেকে ডেকে বল্লেন "বাবা দিগম্বর, এবার তোমার পালা। তোমার যত খুসী টাকা নেও, যত ইচ্ছা লোক নেও।"

দিগম্বর অনেক হাজার লোকজন, অনেক অনেক হাতী ঘোড়া আর থলি থলি মোহর নিয়ে চল্ল। সেও ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে সেই মরুভূমিতে এল। তারও লোকজন, হাতী ঘোড়াও না খেতে পেয়ে জলতেষ্টায় মরে গেল, শুধু জনকুড়ি বেঁচে রৈল। সে তাদের নিয়ে সেই বনের ধারে এসে দেখ্‌ল শিয়ালকাঁটা গাছের তলায় এক হাত লম্বা এক বুড়ী বসে, তার শণের মত সাদা পাকা চুল বাতাসে উড়ে যাচ্ছে।

দিগম্বর তাকে বল্ল "প্রণাম হই, ঠাকুর মা।" বুড়ী বল্ল "বেঁচে থাক রাজ পুত্তুর, এ পথ দিয়ে যাচ্ছ তুমি কোথা? কাজ খুঁজ্‌তে না কাজে ফাঁকী দিতে?"

দিগম্বর বড় গলা করে বল্ল "কাজের মত কাজ খুঁজ্‌তে; কচ্ছপাসুরকে খুঁজে বার করে তাকে মার্‌তে যাচ্ছি।"

বুড়ী বল্ল, "পথ চলেছ ঠিকই বটে, কিন্তু সে যে ভয়ানক রাস্তা। তিনটে যে চওড়া চওড়া মস্ত মস্ত নদী পার হতে হয়—তার খেয়ার দাম কি তুমি দিতে পারবে?"

দিগম্বর হেসে বল্ল, "তাও পার্‌ব না? এই দেখ্ বুড়ী, কেমন না পারি।" এই বলে চক্‌চকে দুটো মোহর বুড়ীর পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে, ঘোড়া হাঁকিয়ে, নদীর ধারে প্রথম মাঝির ঘাটে গেল। সেখানে তাকে দেখে সঙ্গীরা সব কোথায় যে পালাল তাদের আর পাওয়াই গেল না। দিগম্বর ডান হাতখানা মাঝিকে দিয়ে এই ঘাট পার হয়ে দ্বিতীয় মাঝির ঘাটে এল। সেখানে সেই মাঝি বল্ল, "তুমি যদি তোমার বাঁ পাখানা আমায় দাও ত তোমায় আমি বিনি পয়সায় এপার ওপার করে দিব।"

দিগম্বর ভাব্‌ল "একটা হাত ত গিয়েছেই, একটা পাও না হয় গেল, আমি লোকের কাঁধে চড়ে বেড়াব!" তারপর সে ওপারে যেতেই তার বাঁ পাখানা খসে গেল। তারপর সে ঘোড়া ছুটিয়ে তৃতীয় ঘাটে এল। এ মাঝি আরও ভয়ানক দেখ্‌তে—আর এর গায়ে সোণার বর্ম্ম ঝক্‌ঝক্ কর্‌ছে। এর গলার আওয়াজ শুনে দিগম্বর এম্নি ভয় পেল যে ঘোড়া ছুটিয়ে সে একেবারে দেশে পালিয়ে এল।

রাজামশাই তাকে বুকে টেনে নিয়ে অনেক আদর কর্‌লেন, আর ভয়ানক কাঁদ্‌লেন। তারপর ছোট ছেলে পীতাম্বরকে ডেকে বল্লেন, "বাবা, এবার তোমার পালা। লোক জন টাকাকড়ি, যা চাও, সব নেও।"

পীতাম্বর বাবাকে প্রণাম করে বল্ল, "বাবা, আমি লোকজন টাকাকড়ি কিছু চাই না, শুধু আপনার আশীর্ব্বাদ চাই।" এই বলে সে বাবার আশীর্ব্বাদ নিয়ে, রাজবাড়ীর সব চেয়ে ভাল যে ঘোড়া আর রাজার বাড়ীর সব চেয়ে ধারাল যে তলোয়ারখানা সেইটা নিয়ে বার হয়ে পড়্‌ল। (ক্রমশঃ)

পাখীর ছানা।

"তোমরা অনেকেই হয়ত হাঁস কিম্বা মুরগীর ডিম ভাঙ্গিয়া থাকিবে। তাহার ভিতরে খানিকটা শাদা জলের মত তরল জিনিষ আছে, আর সেই জলের ভিতর হল্‌দে রংএর 'কুসুম' ভাসিতেছে। বাস্তবিক কুসুমের ভিতরটাও তরল, কেবল একটা খুব পাতলা পরদার ঢাকনি থাকার দরুণ ছড়াইয়া পড়ে না। কুসুমের গায়ে এক জায়গায় একটি ছোট্ট গোল 'বিন্দু' আছে, সেইটাই ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত ডিমটুকু শেষ করিয়া ছানা হইয়া ওঠে।

তোমরা হয়ত কখনও দেখিয়া থাকিবে, কোন ডিমের কুসুমের গায়ে লাল শিরার মত দাগ হইয়াছে। সেই ডিমটাতে ছানা হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

কিন্তু ডিম শুধু ফেলিয়া রাখিলেই তাহা হইতে ছানা হয় না। পাখী বাসার ভিতর ডিম পাড়িয়া ক্রমাগত কয়দিন পর্য্যন্ত ডিমে তা' দেয়, অর্থাৎ তাহার উপর বসিয়া থাকে।

কেন বসিয়া থাকে জান? তাহারা ডিমের উপর বসিলে তাহাদের শরীরের গরমে ডিমও গরম থাকে। ঠিকমত গরম না পাইলে ডিম ফুটিতে পারে না। আমি মুরগীর ডিম হইতে ছানা ফুটিতে দেখিয়াছি। দেখিতে আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। মুরগী যখন ডিম দেয় তখন প্রায় প্রতিদিন একটি করিয়া, পরপর প্রায় দশ বারটি ডিম দেয়।

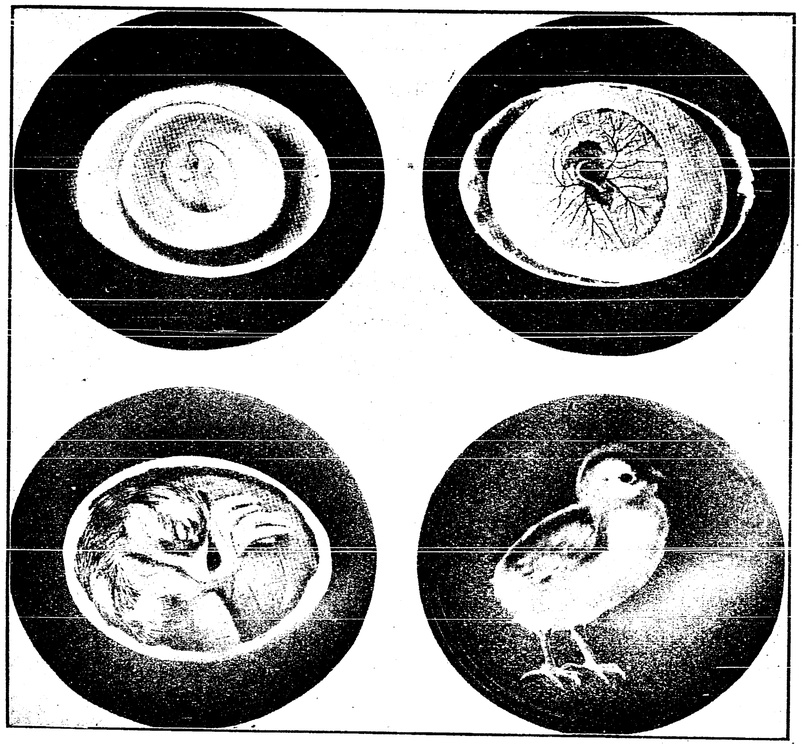

সব ডিম দেওয়া শেষ হইলে সে ডিমের উপর বসে। যদি তাহার ডিমগুলি সরাইয়া লও, তবে সে কয়েক দিন পর্য্যন্ত মাটির উপরেই মিছামিছি বসিয়া থাকে, ইহাই তাহার স্বভাব! সে সময়ে অন্য মুরগীর ডিম সামনে পাইলে সে সেগুলিও টানিয়া লইয়া বসে। এমনও দেখা গিয়াছে যে কাঠ কিম্বা পাথরের ডিম, কিম্বা অন্য পাখীর ডিম দেওয়াতে সে

তাহার উপরেও বসিয়াছে। ডিমে তা' দিবার সময় মুরগী তাহার পালকগুলিকে ছড়াইয়া শরীরটাকে অনেকখানি বড় করিয়া ফেলে; এত বড় করে যে একটা মুরগী দশ বারটা ডিম স্বচ্ছন্দে ঢাকিয়া বসিতে পারে। পালক ছড়াইয়া থাকে বলিয়া মুরগীর লেজটা ঠিক লঙ্কা পায়রার লেজের মত দেখায়। এই সময় তাহারা একটু চুপচাপ নিরিবিলি থাকিতে চায়! হঠাৎ ভয় পাইলে বা চমকাইয়া গেলে তাহারা ভাল করিয়া তা' দিতে পারে না।

একুশ দিন পর্য্যন্ত মুরগী ডিমের উপর বসিয়া থাকে। দুই দিন অন্তর বাহির হইয়া সামান্য খুদ কি কিছু খায়, আবার গিয়া ডিমে বসে। ডিমগুলিকে সে মাঝে মাঝে পা দিয়া উল্টাইয়া দেয়, যাহাতে ডিমের সবদিকে সমান ভাবে তাপ লাগে।

ডিমগুলির প্রতি মুরগীর এত টান যে কাহাকেও ডিমের ত্রিসীমানায় যাইতে দেয় না! কিছু একটু শব্দ পাইলে, সে যেন ভয় পাইয়া অত্যন্ত কাতর ভাবে ডাকিতে থাকে। সে যখন মাঝে মাঝে খাবারের জন্য বাহির হয় তখন, বোধ হয় তাহার অদ্ভুত চেহারা দেখিয়া, অন্য মুরগীরা তাহাকে ঠোক্‌রাইতে থাকে! কিন্তু তাহার তখন এত তেজ হয় যে সে একাই সকলকে ঠোক্‌রাইয়া জব্দ করিয়া দেয়।

লোকে বলে ডিম ফুটিবার দুই চার দিন আগে হইতেই, ডিমের ভিতর যে বাচ্চা গড়ে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। একুশ দিনের দিন একটি একটি করিয়া ডিম ফুটিতে আরম্ভ হয়। বাচ্চা বাহির হইয়াও মুরগীর পালকের নীচেই থাকে, কারণ তা না হইলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। প্রথমে ডিমের এক জায়গায় একটি ছোট্ট ফুটা দেখা যায়, সেই ফুটা ক্রমে বড় হইতে থাকে। বাচ্চা নিজেই ঠোঁট দিয়া খোলা ভাঙ্গে। ক্রমে ক্রমে, অর্দ্ধেকের বেশী খোলা ভাঙ্গিয়া গেলে ছানাটি বাহির হইয়া পড়ে। তখন তাহার চেহারা নিতান্তই বেচারা গোছের থাকে, পায়ে ভাল করিয়া জোর হয় নাই, উঠিতে গেলে পড়িয়া যায়; গায়ের লোমগুলি ভিজা ভিজা, গায়ের সঙ্গে আঁটিয়া আছে। কিন্তু খানিক বাদেই তাহার চেহারা ফেরে। তখন তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন একটি নরম পালকে ঢাকা ডিম, মাথা উঁচু করিয়া পা বাহির করিয়া ছুটিতেছে। তাহার দুই পাশে আবার দুটি ছোট্ট ছোট্ট ডানাও আছে; ডানা দুটিতেও লোমের মত নরম পালক। বাচ্চাগুলি বাহির হইবার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহাদের মা তাহাদের লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তখনও কিন্তু তাহার পালক খাড়া আছে। যতদিন না বাচ্ছাগুলি বেশ বড় হইয়া যায় ততদিন পর্য্যন্ত মার পালক সর্ব্বদাই ছড়ান থাকে, তাহাতে বাচ্ছারা

কেন বসিয়া থাকে জান? তাহারা ডিমের উপর বসিলে তাহাদের শরীরের গরমে ডিমও গরম থাকে। ঠিকমত গরম না পাইলে ডিম ফুটিতে পারে না। আমি মুরগীর ডিম হইতে ছানা ফুটিতে দেখিয়াছি। দেখিতে আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। মুরগী যখন ডিম দেয় তখন প্রায় প্রতিদিন একটি করিয়া, পরপর প্রায় দশ বারটি ডিম দেয়।

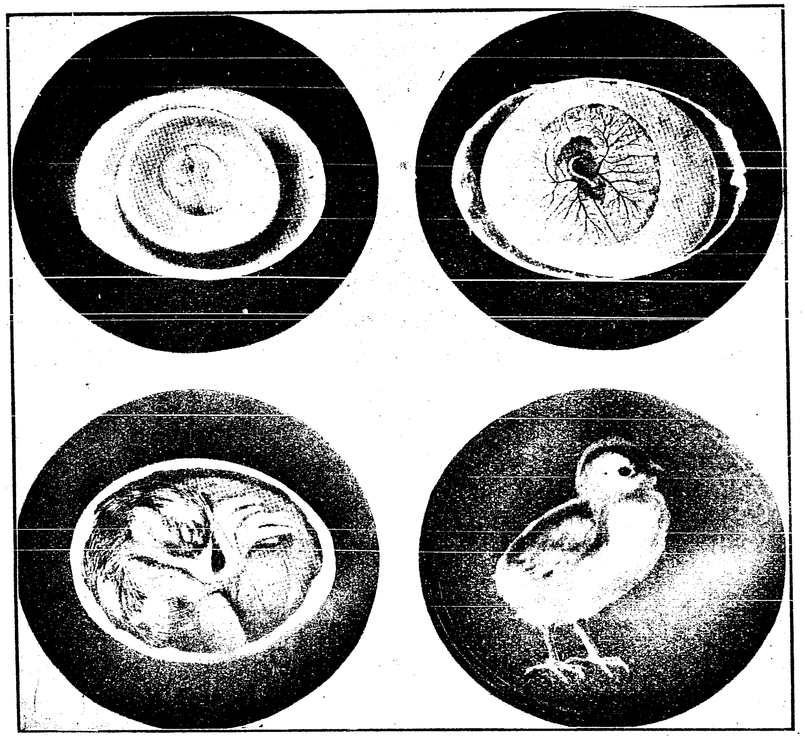

সব ডিম দেওয়া শেষ হইলে সে ডিমের উপর বসে। যদি তাহার ডিমগুলি সরাইয়া লও, তবে সে কয়েক দিন পর্য্যন্ত মাটির উপরেই মিছামিছি বসিয়া থাকে, ইহাই তাহার স্বভাব! সে সময়ে অন্য মুরগীর ডিম সামনে পাইলে সে সেগুলিও টানিয়া লইয়া বসে। এমনও দেখা গিয়াছে যে কাঠ কিম্বা পাথরের ডিম, কিম্বা অন্য পাখীর ডিম দেওয়াতে সে

তাহার উপরেও বসিয়াছে। ডিমে তা' দিবার সময় মুরগী তাহার পালকগুলিকে ছড়াইয়া শরীরটাকে অনেকখানি বড় করিয়া ফেলে; এত বড় করে যে একটা মুরগী দশ বারটা ডিম স্বচ্ছন্দে ঢাকিয়া বসিতে পারে। পালক ছড়াইয়া থাকে বলিয়া মুরগীর লেজটা ঠিক লঙ্কা পায়রার লেজের মত দেখায়। এই সময় তাহারা একটু চুপচাপ নিরিবিলি থাকিতে চায়। হঠাৎ ভয় পাইলে বা চমকাইয়া গেলে তাহারা ভাল করিয়া তা' দিতে পারে না।

একুশ দিন পর্য্যন্ত মুরগী ডিমের উপর বসিয়া থাকে। দুই দিন অন্তর বাহির হইয়া সামান্য খুদ কি কিছু খায়, আবার গিয়া ডিমে বসে। ডিমগুলিকে সে মাঝে মাঝে পা দিয়া উল্টাইয়া দেয়, যাহাতে ডিমের সবদিকে সমান ভাবে তাপ লাগে।

ডিমগুলির প্রতি মুরগীর এত টান যে কাহাকেও ডিমের ত্রিসীমানায় যাইতে দেয় না! কিছু একটু শব্দ পাইলে, সে যেন ভয় পাইয়া অত্যন্ত কাতর ভাবে ডাকিতে থাকে। সে যখন মাঝে মাঝে খাবারের জন্য বাহির হয় তখন, বোধ হয় তাহার অদ্ভুত চেহারা দেখিয়া, অন্য মুরগীরা তাহাকে ঠোক্‌রাইতে থাকে! কিন্তু তাহার তখন এত তেজ হয় যে সে একাই সকলকে ঠোক্‌রাইয়া জব্দ করিয়া দেয়।

লোকে বলে ডিম ফুটিবার দুই চার দিন আগে হইতেই, ডিমের ভিতর যে বাচ্চা নড়ে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। একুশ দিনের দিন একটি একটি করিয়া ডিম ফুটিতে আরম্ভ হয়। বাচ্চা বাহির হইয়াও মুরগীর পালকের নীচেই থাকে, কারণ তা না হইলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। প্রথমে ডিমের এক জায়গায় একটি ছোট্ট ফুটা দেখা যায়, সেই ফুটা ক্রমে বড় হইতে থাকে। বাচ্চা নিজেই ঠোঁট দিয়া খোলা ভাঙ্গে! ক্রমে ক্রমে, অর্দ্ধেকের বেশী খোলা ভাঙ্গিয়া গেলে ছানাটি বাহির হইয়া পড়ে। তখন তাহার চেহারা নিতান্তই বেচারা গোছের থাকে, পায়ে ভাল করিয়া জোর হয় নাই, উঠিতে গেলে পড়িয়া যায়; গায়ের লোমগুলি ভিজা ভিজা, গায়ের সঙ্গে আঁটিয়া আছে। কিন্তু খানিক বাদেই তাহার চেহারা ফেরে। তখন তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন একটি নরম পালকে ঢাকা ডিম, মাথা উঁচু করিয়া পা বাহির করিয়া ছুটিতেছে। তাহার দুই পাশে আবার দুটি ছোট্ট ছোট্ট ডানাও আছে; ডানা দুটিতেও লোমের মত নরম পালক। বাচ্চাগুলি বাহির হইবার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহাদের মা তাহাদের লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তখনও কিন্তু তাহার পালক খাড়া আছে। যতদিন না বাচ্ছাগুলি বেশ বড় হইয়া যায় ততদিন পর্য্যন্ত মার পালক সর্ব্বদাই ছড়ান থাকে, তাহাতে বাচ্ছারা

সেই পালকের মধ্যে লুকাইবার সুবিধা পায়। মা যাহা করে ছানারাও তাহাই করিবার চেষ্টা করে। মা যদি মাটি খোঁটে, ছানাগুলি খাবার থাকুক আর নাই থাকুক অমনি মাটি খোঁটে; মা যদি পা দিয়া মাটি ছড়ায় ছানাগুলিও দুইপায়ে যথাসাধ্য মাটি ছড়াইতে আরম্ভ করে; আর, একটু ভয় পাইলেই মায়ের ডানার নীচে ঢুকিয়া পড়ে। রাত্রে মুরগী ছানাগুলিকে ডানার নীচে ঢাকিয়া নিয়া ঘুমায়।

ক্রমে ছানারা যেমন বড় হইতে থাকে, একটু একটু করিয়া তাহাদের বিদ্যা বাড়ে, তাহারা খুদ ছাড়িয়া কচি পাতা ছোট ছোট পোকা ইত্যাদি খাইতে শেখে। আগে শুধু সমান যায়গায় চলিতে পারিত, ক্রমে উঁচু নীচু ওঠা নামা করিতে শেখে। প্রায়ই হয়ত দেখি যে মুরগীর পিঠের উপর দু একটা ছানা বসিয়া আছে। সেখানে লাফালাফি করিতে গিয়া এক আধটা কখনও গড়াইয়া পড়ে আর মাটিতে চিৎ হইয়া ভারি ব্যস্ত ভাবে ডানা ঝাপ্‌টায় ও শূন্যে হাত পা ছুঁড়িতে থাকে।

একবার কয়েকটা মুরগীর ছানার ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা এত চঞ্চল যে তাহাদের বাগান মুস্কিল। এই বসিয়া আছে ত এই ছুটিতেছে, এই সামনে ফেরে এই পিছন ফেরে; একটা আরেকটার ঘাড়ে উঠিতেছে, আর সামান্য খুটখাট শব্দ হইতেই সবগুলি মায়ের ডানার নীচে! কিন্তু সেখানেও আবার চুপ করিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। মিনিট দুই যাইতে না যাইতেই কোথাও একটা ঠ্যাং বাহির হইয়া পড়ে, কোথাও ঠোঁটের আগা কোথাও কালো কালো চোখ উঁকি মারে; তারপর চুলবুল করিয়া সবগুলি বাহির হইয়া পড়ে; আবার যে হুটোপাটি সেই হুটোপাটি।

শুনিয়াছি একবার একটা মুরগীকে হাঁসের ডিমে তা দিতে দেওয়া হইয়াছিল। মুরগী যত্ন করিয়া সে ডিম হইতে বাচ্ছা ফুটাইল। কিন্তু, যখন ছানাগুলি খোলা হইতে বাহির হইয়া জলের দিকে ছুটিল তখন সে তাহাদের এই রকম অদ্ভুত খেয়াল দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য আর ব্যস্ত হইয়া চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে পিছু পিছু ছুটিল, যেন বারণ করিতেছে "যাস্‌না, যাস্‌না! ডুবে যাবি!"

শ্রীসুখলতা রাও।

দুষ্টু দরজী।

এক দরজী ছিল, তার মতন ভাল সেলাই আর কেউ জানত না। একদিন তাদের রাজপুত্রের বড় সখের পোষাক ছিঁড়ে গেল, তাই তিনি সেটা দরজীর বাড়ি রিফু করতে পাঠিয়ে দিলেন।

দরজী বসে বসে পোষাক সেলাই করছে, আর ভাবছে "আহা এমন একটি পোষাক যদি আমি পরতে পেতাম, তবে না জানি আমাকে কেমন দেখাত!" ভাবতে ভাবতে তার ভারি লোভ হল—আস্তে আস্তে পোষাকটা তুলে গায়ে দিল। তারপরে আয়নাটি সামনে ধরে বল্ল "বাঃ এ যে ঠিক রাজপুত্রের মত দেখাচ্ছে! এখন আমাকে দেখে কে দরজীর ছেলে ব'লে বুঝবে?" এই না বলে, বাক্স থেকে তার পুঁজিপাটা বের করে নিয়ে রাতারাতি চুপচাপ সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সে যেখানে যায় তার সুন্দর চেহারা আর দামী পোষাক দেখে লোকে মনে করে যে নিশ্চয়ই কোন রাজা রাজড়ার ছেলে হবে।

চল্‌তে চল্‌তে একদিন তারই বয়সী একটি লোকের সঙ্গে তার আলাপ হ'ল। সে লোকটি বল্ল "আমি সুলতানের ছেলে, আমার নাম ওমার। আমার জন্মের সময় গণক বলেছিল যে বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিজের রাজ্যে থাকলে আমার ভয়ানক বিপদ হবে। সেই জন্য বাবা আমাকে মামাবাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানেই আমি মানুষ হয়েছি। এখন বিশবছর হয়ে গিয়েছে তাই দেশে ফিরে যাচ্ছি।" দরজী জিজ্ঞাসা করল "আচ্ছা, তুমি তো বড় হয়ে সেখানে কখনও যাওনি;—কি করে সব চিনবে?" ওমার বল্ল "এই রাস্তা ধরে কিছুদূর গেলে একটা মসজিদ দেখা যাবে, সেখানে বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। এই যে তলোয়ার দেখছ, এটা মামা দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে বাবার এই কথা আছে যে এই তলোয়ার দেখিয়ে আমি বলব 'যার আশায় বসে আছেন, আমিই সেই' আর বাবা উত্তর কর্‌বেন 'আল্লা তোমার মঙ্গল করুন'—তা হলেই চেনা যাবে।" এই রকম গল্প করতে করতে দুজনে একটা সরাইখানায় ঢুকল। সেখানে খেয়ে দেয়ে দুজনে শুয়ে রইল। দরজীটার কিন্তু সারারাত ঘুম হ'ল না—সে ভোর না হতেই উঠে ওমারের তলোয়ারটি নিয়ে চুপচাপ সেখান থেকে পালাল।

খানিকদূর গিয়ে দরজী দেখতে পেল যে একটা মস্ত মস্‌জিদের সামনে অনেক লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝখানে একজন বুড়ো লোক বসে আছেন, তাঁর চেহারা

আর পোষাক দেখেই সে বুঝ্‌ল "ইনিই নিশ্চয় সুলতান।" সে সোজা গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে তলোয়ারটি রেখে, সেলাম করে বল্ল "যার আশায় বসে আছেন আমিই সেই" অমনি সুলতান তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন "আল্লা তোমার মঙ্গল করুন।" সঙ্গের লোকেরা তখন আনন্দে কোলাহল করতে করতে বাড়ী যাবার আয়োজন করতে লাগল।

এমন সময় ওমার হাঁপাতে হাঁপাতে সেইখানে এসে হাজির। সে চীৎকার করে বল্ল "ওর কথা শুনোনা—ও একটা জোচ্চোর—আমিই আসল সুলতানের ছেলে।" দরজী তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌ল "আরে, ওটা একটা দরজীর ছেলে—পাগল কিনা

তাই অমন যা তা বলে।" সুলতান বল্লেন "পাকড়াও দেখি—ওটাকে পাগলা গারদে রেখে দেওয়া যাবে।" বল্‌তেই সুলতানের লোকেরা তাকে ধ'রে বন্দী ক'রে ফেল্‌ল।

সকলে বাড়ি পৌঁছাতেই তো সুলতানা ছুটে এলেন, কিন্তু দরজীকে দেখেই তিনি কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লেন "এতো আমার ছেলে নয়! তার তো এ রকম চেহারা ছিলনা!" সুলতান বল্লেন "আরে, কচিছেলের মুখ কি আর তেমনিই থাকে? বড় হয়ে চেহারা বদলিয়ে গিয়েছে।" সুলতানা বল্লেন "না না, আমি কতবার আমার ছেলের মুখ স্বপ্নে দেখেছি, সে মুখ মোটেই এরকম নয়।" এমন সময়ে ওমার হঠাৎ প্রহরীদের হাত ছাড়িয়ে এসে একেবারে সুলতানার পায়ে পড়ে বল্ল "আমিই আপনার ছেলে, ও

লোকটা জোচ্চোর।" তাকে দেখেই সুলতানা চেঁচিয়ে উঠলেন "ওগো, এই তো আমার ছেলে—একেই আমি স্বপ্নে দেখেছি।" তখন সুলতানের ভারি রাগ হল—তিনি ওমারকে ধরে তখনই পাগলা গারদে রাখতে হুকুম দিলেন।

সুলতানা আর কি করেন? তিনি ঘরে বসে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে রাতদিন কাঁদতে লাগলেন। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হঠাৎ তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি জোগাল। তিনি সুলতানকে গিয়ে বল্লেন "আমার একটা সখ হয়েছে যে তোমার ছেলেকে আর ঐ পাগলা দরজীকে দুটো ওড়না বুনতে দিব—যারটা ভাল হবে, সেইটা আমার জন্মদিনে গায়ে দিব।" সুলতান বল্লেন "সে তো বেশ কথা।" তারপর দরজী আর ওমার দুজনকেই ছুঁচ, সুতো, জরী, রেশম এইসব দিয়ে সুলতানা বল্লেন "আমাকে সুন্দর একখানা ওড়না বানিয়ে দিতে হবে।"

দরজীর ছেলে ভাবল "সুলতানা আমার উপর চটে আছেন—এইবার তাঁকে খুসী করে দিতে হবে।" তাই সে খুব যত্ন করে, সোনালী রূপালী ফুল পাতা এঁকে চমৎকার একটি ওড়না বানাল। তাই দেখে সুলতানা বল্লেন "বাছা, তোমার হাতের সেলাই তো বড় চমৎকার! একেবারে ওস্তাদ দরজীর মত! এমন সেলাই কোত্থেকে শিখলে বল দেখি?" তখন দরজী ভারি থতমত খেয়ে গেল।

তারপর দুজনে ওমারের ঘরে গিয়ে দেখলেন যে সে বেচারা চুপ করে বসে আছে। সুলতানা বল্লেন "আমার ওড়না কই?" ওমার মুখ ফুলিয়ে বল্ল "আমি তলোয়ার চালাতেই শিখেছি, ছুঁচ চালাতে ত জানি না।" সুলতানের মনে তখন ভারি খট্‌কা লাগল!

সে দেশে এক আছিকালের বুড়ি ছিল, লোকে বলত যে সে যাদু জানে। সুলতান অনেক ভেবে কিছু ঠিক করতে না পেরে, সেই বুড়ি যাদুকরীকে গিয়ে সব বল্লেন। বুড়ি তাঁকে দুটো কৌটা দিয়ে বল্ল "আপনি বাড়ী গিয়ে ওদের দুজনকে বলুন এর মধ্যে একটা কৌটা পছন্দ করে নিতে। যে যা পছন্দ করবে, তাতেই বোঝা যাবে কে আপনার ছেলে!"

কৌটা দুটি ভারি সুন্দর—দেখ্‌তে দুটোই এক রকম কিন্তু একটার উপর লেখা আছে "টাকার সুখ" আরেকটাতে লেখা আছে "বীরত্বের সম্মান"! সুলতান আর সুলতানা দরজীর ছেলেকে ডেকে বল্লেন "এর মধ্যে তোমার কোনটি পছন্দ হয় বলতো?" দরজী অমনি খপ্ করে "টাকার সুখ" লেখা কৌটাটি ধরল। কিন্তু ওমার এসে "বীরত্বের সম্মান" লেখা কৌটাটি পছন্দ করল। সুলতান বল্লেন "আচ্ছা, নিজের নিজের কৌটা নিয়ে যাও।" যেই কৌটা দুটি হাতে নেওয়া অমনি ফট্ করে তার ঢাকনা খুলে গেল।

ওমারের কৌটার মধ্যে ছোট্ট সুন্দর একটি মুকুট আর রাজদণ্ড, আর দরজীর কৌটায় একটা ছুঁচ আর সুতো!

তখন আর কারো বুঝতে বাকি রইল না যে কে দরজীর ছেলে আর কে সত্যি সুলতানের ছেলে। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। সেই গোলমালের মধ্যে দরজীর ছেলে এক দৌড়ে যে কোথায় পালাল, আর কেউ তাকে খুঁজে পেল না!

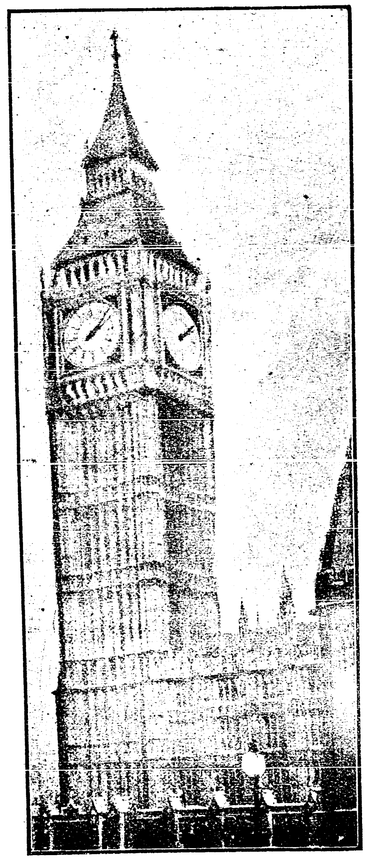

পার্লামেণ্টের ঘড়ি।

বিলাতের যে শাসন সভা, যেখানে সে দেশের খরচপত্র আইন কানুন ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি নানা ব্যাপারের আলোচনা ও ব্যবস্থা করা হয়—তার নাম পার্লামেণ্ট। পার্লামেণ্টের বাড়ীর দুই মাথায় দুই চূড়া—তারই একটার গায়ে, মাটি হইতে প্রায় ১২৫ হাত উঁচুতে পার্লামেণ্টের ঘড়ি বসান। ঘড়িটা এত বড় যে রাস্তার লোকে একমাইল দূর হইতে সেই ঘড়ি দেখিয়া অনায়াসে সময় ঠিক করিতে পারে!

রাস্তা হইতেই প্রকাণ্ড ঘড়িটা চোখে পড়ে কিন্তু বাস্তবিক ঘড়িটা যে কত বড় তাহা বুঝিতে হইলে একটিবার তাহার ভিতরে ঢোকা দরকার! একটি লোহার প্যাঁচান সিঁড়ি ঘুরিয়া ঘড়ির কামরায় ঢুকিতে হয়। ঘড়ির চারিদিকে চারিটি মুখ, এক একটি মুখে একএকটি ঘর, তাতে দোতালা বাড়ীর মত উঁচু ঘষাকাঁচের জানালা। জানালার বাহিরে ঘড়ির কাঁটা—একেকটা সাড়ে সাতহাত লম্বা। রাত্রে সেই ঘর গুলির মধ্যে জানালার পিছনে অনেকগুলি বড় বড় গ্যাসের বাতি জ্বালাইয়া রাখে তাহাতে ঘড়ির সমস্ত মুখটা আলো হইয়া উঠে।

কিন্তু এই ঘরের মধ্যে ঘড়ির কলকব্জা কিছুই দেখা যায় না। ঘড়ির যে ঘণ্টা বাজে তাহাও এখান হইতে দেখিবার যো নাই—সে সমস্ত ভিতরের আর একটা ঘরের মধ্যে। ঘণ্টাটি একটি দেখিবার জিনিষ। গম্বুজের মত প্রকাণ্ড কাঁসার ঘণ্টা তার ওজন সাড়ে তিনশত মনেরও বেশী। প্রথম যখন ঘণ্টাটি তৈয়ারি হইয়াছিল তখন কিছুকাল ব্যবহারের পর সেটা ফাটিয়া যায়; তখন সেটাকে আবার ঢালাই করিয়া নূতন করিয়া গড়া হইল। কিছুদিন পরে নূতন ঘণ্টাতেও ফাটল দেখা দিল। তারপর বছর তিনেক ঘণ্টা বাজান বন্ধ ছিল; পরে হাতুড়িটা বদলাইয়া একটা হাল্কা, অর্থাৎ সাড়ে পাঁচমন ওজনের, হাতুড়ি দেওয়ায় আর ফাটল বাড়িতে পারে নাই। এই বড় ঘণ্টাটি ছাড়া আরও চারিটি ছোট ছোট ঘণ্টা আছে, সে গুলি ১৫ মিনিট অন্তর টুং টাং করিয়া বাজে। 'ছোট' বলিলাম বটে কিন্তু এগুলির একেকটির ওজন ৩০ হইতে ১০০মন। ঘড়ির পেণ্ডুলামটি প্রায় সাড়ে আট হাত লম্বা, দোলকটির ওজন প্রায় ৪ মন।

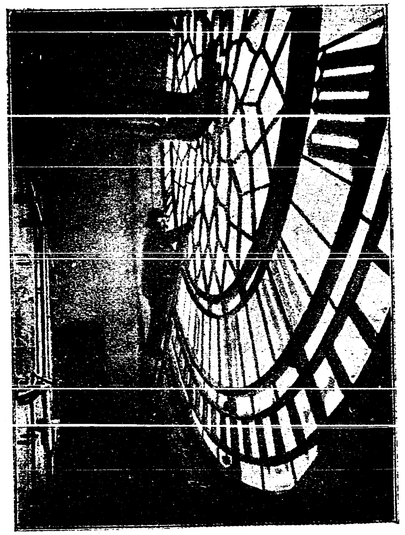

ঘড়ির জানালা পরিষ্কার করা হইতেছে।

ঘড়িতে দম দেওয়া এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। প্রতি সোম বুধ ও শুক্রবার দুই জন লোককে ক্রমাগত কয় ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া এই কাজটি করিতে হয়। ছোট ছোট ঘণ্টা গুলি যতক্ষণ বাজিতে থাকে, সেই ফাঁকে তাহারা একটু বিশ্রাম করিয়া নেয়, আবার

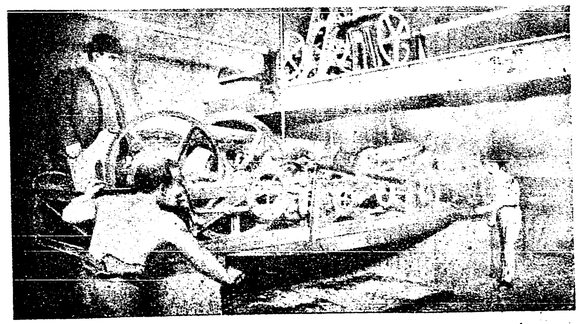

মিনিট পনের চাবি ঘুরায় এই রকম করিয়া সারাটা বিকাল ধরিয়া দম দেওয়া হয়। এই সমস্ত কল কারখানার উপরে, একেবারে চূড়ার আগায় একটা প্রকাণ্ড বাতি। এই বাতি যখন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে তখন লোকে বুঝিতে পারে, পার্লামেণ্টের সভা বসিয়াছে। চূড়ার কাছে উঠিলে আরেকটা আশ্চর্য্য জিনিষ দেখা যায়—ঘড়ির কলকব্জার অনেক নীচে একটা জায়গায় দিনরাত একটা প্রকাণ্ড চুল্লী জ্বলিতেছে! চুল্লীর আঁচে ঘড়ির ভিতরটা সকল সময় সমান ভাবে গরম থাকে; কোথাও এলোমেলো ঠাণ্ডা লাগিয়া কলকব্জা বিগড়াইতে পারে না।

এত বড় ঘড়ি, ইহার জন্য খরচও হইয়াছে কম নয়। ঘড়ির চারটি মুখের জানালায়, লেখা কাঁটা ইত্যাদি শুদ্ধ, প্রায় আশি হাজার টাকা লাগিয়াছে। ঘণ্টাগুলির দাম প্রায় লাখটাকা কলকব্জায় ষাট হাজার টাকা। সমস্ত ঘড়িটার মোট দাম প্রায় সওয়া তিনলক্ষ টাকা।

বনের খবর।

বনে জঙ্গলে ছোট বড় কত রকম জানোয়ার—তাদের অস্ত্রই বা কত রকম। শিং নখ দাঁত খুর এক একজনের এক একটা চলে। কারও হয়ত মুখ আর পা দুই চলে, যেমন শূয়োরের দাঁত আর খুর। বনের মধ্যে কত জানোয়ার দেখি, কিন্তু শূয়োরের মত এমন অদ্ভুত মেজাজের জীব আর দেখলাম না। বাঘ বল, ভাল্লুক বল মহিষ হাতী গণ্ডার যাই বল, সবাই চলে অতি সাবধানে—পাছে কেউ টের পেয়ে ফেলে। দশ বিশ হাত দূরে দিয়ে বাঘ ভাল্লুক নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, কিছু বুঝ্বার যো নাই। হাতীটা পর্য্যন্ত এক এক সময়ে প্রায় ঘাড়ের উপরে এসে না পড়্লে বোঝা যায় না যে হাতী আস্ছে। এই রকম সন্তর্পণে চলাটা বুনো জানেয়োর মাত্রেরই স্বভাব—কেবল শূয়োর বাদে। শূয়োর যখন চলে সে যেন নোটিস্ দিতে দিতে আসে "আমি আস্ছি—সব সাবধান।" এদিক ওদিক তাকান নেই, টিপিটিপি পা ফেলা নেই, কেবল ফঁস্ ফঁস্ ঘঁৎ ঘঁৎ, আর গা দুলিয়ে বুক ফুলিয়ে চলা, আর ঝোপ জঙ্গল ঘেঁটেঘুঁটে তোলপাড় করা। আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারি—ঐ আস্ছেন বরাহ অবতার! এমন একরোখা গোঁয়াড় জন্তু আর বুঝি দ্বিতীয় নাই; তাই লোক বলে "যেন শূয়োরের গোঁ।"

যেমন রাগ, তেম্নি তেজ, তেম্নি তার শক্তি। পালাবার পথ থাক্লে প্রায় সব জন্তুই আগে সেইটা খোঁজে—কিন্তু শূয়োরের সে সব জ্ঞান নাই। তোমায় দেখে যদি দৈবাৎ তার পচ্ছন্দ না হয়, সে খামখা পঞ্চাশ হাত জঙ্গল পার হ'য়ে তোমায় তেড়ে আস্বে। তার উপরে তুমি যদি আগে থেকে খোঁচাখুঁচি কর্তে যাও, তবেত কথাই নেই; খোঁচা খেয়ে হজম করবে এমন জন্তুই সে নয়। তাকে মেরে কেটে রক্তারক্তি করে ফেল তাতে তার ভ্রূক্ষেপও নাই—তুমি একাই হও আর পঁচিশটা লোকই আন, সে তার তোয়াক্কা রাখে না—গায়ে আঁচড়টি পড়্লেই তার মাথায় যেন খুন চাপে। যতক্ষণ তার শরীরে প্রাণ থাকে ও শক্তি থাকে তার সর্ব্বনেশে গোঁ আর ছাড়ে না। রাগ আছে, সাহস আছে, তার উপর ক্ষমতা ও হাতিয়ারেরও অভাব নেই, এমন জন্তুকে কে না ভয় করে? আমাদের দেশে বল্তে শুনি "বাঘ শিকারীর ভাত রেঁধো, শূয়োর শিকারীর রেঁধো না"—সে যে ফিরে আস্বে তার ঠিক কি!

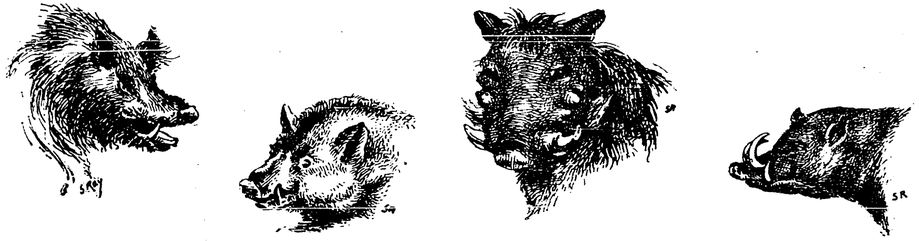

ছোট বড় রংবেরঙের কত রকম শূয়োর—কোনটা সাদা কোনটা কালো কোনটার কাদার মত রং; কারো পিঠে লম্বা লম্বা লোম, রাগ্লে পরে ফুলে উঠে; কারুর ঘাড়ে ছোট ছোট খাড়া খাড়া চুল; কারো সর্ব্বাঙ্গ লোমে ঢাকা। কারো দুটো দাঁত কারো বা চারটে, আবার কারো দাঁত বেরোয় নাকের পাশের চামড়া ফুঁড়ে! একেকটার মুখ ভরা গোল আলুর মত বড় বড় আঁচিল! কেউ থাকে দুচার জন মিলে মিশে আর কোনটা হয়ত বড় বড় দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু মেজাজটি সবারই প্রায় সমান—একটু উনিশ বিশ মাত্র। শূয়োর মারবার কায়দাও নানারকম। কোথাও হয়ত ঘোড়ায় চড়ে বল্লম দিয়ে শিকার করে, কোথাও বা জাল ঘিরে সেই জালের উপর তেড়ে নিয়ে বর্ষা দিয়ে মারে—আর যাদের অত সাহস নেই তারা দূরে থেকে বন্দুক চালায়।

একদিন ভোর বেলা কাজে বেরিয়েছি—সঙ্গে আট দশজন লোক। চারিদিকে লম্বা লম্বা ঘাসের মত নলখাগ্‌ড়ার বন—মাঝে মাঝে দুটো একটা ক্ষেত দেখা যায়। হঠাৎ চেয়ে দেখি একটা সর্‌ষেক্ষেতের মধ্যে দুটো কালো কালো কি দেখা যাচ্ছে। প্রথমটা ভাবলাম হয়ত বাছুর হবে—কিন্তু আরেকটু এগুতেই দেখি প্রকাণ্ড দুই শূয়োর! আমাদের একটা কুকুর প্রথমটা ঘেউ ঘেউ ক'রে তেড়ে গিয়েছিল—কিন্তু বড় শূয়োরটা 'ঘোঁৎ' ক'রে ফিরে দাঁড়াতেই সে একেবারে ল্যাজ গুটিয়ে দে দৌড়। হাতে কোন অস্ত্র ছিল না, ভাবলাম সবাই মিলে চেঁচামেচি ক'রে ওটাকে তাড়ান যাক্। তাতে কিন্তু হিতে বিপরীত হ'লো—শূয়োরটা হঠাৎ এম্নি তাড়া ক'রে এল যে আমরা যে যেদিকে পারি এক দৌড়ে একেবারে জঙ্গলের বাইরে!

আর একদিন কিন্তু আমাদেরই জিৎ হয়েছিল। সে দিন ফির্‌তে সন্ধ্যা হ'য়েছিল তাই তাড়াতাড়ি তাঁবুর দিকে যাচ্ছিলাম। পথের মধ্যে হঠাৎ একেবারে আট দশটা শূয়োরের সামনে গিয়ে পড়েছি। আমরা যেমন চমকে উঠ্‌লাম শূয়োরগুলোও তেমনি থমকে দাঁড়াল। পালের গোদামশাই পিছনে ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি সঙ্গীদের ঠেলেঠুলে, দুচারটাকে উল্টে ফেলে একেবারে সামনে এসে হাজির! তার যা চেহারা! ঘাড়ের লোম খাড়া ক'রে, মূলোর মত দুই দাঁত বের ক'রে সে এম্নি এক বিকট ভেংচি দিল যে আমি বেগতিক দেখে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে বন্দুক উঠালাম। শূয়োরটাও তেড়ে এসেছে আর তারই সঙ্গে সঙ্গে আমার গুলিও ছুটে গিয়েছে। বরাহমশাই তাতেই একেবারে চিৎপটাং! দলের লোকেরা সবাই তখন মহাভোজের আয়োজন কর্‌ল,—আমার লাভ হ'ল খালি দাঁত দুটি।

গল্প স্বল্প।

কুমারী ইন্দুবালা দত্ত সন্দেশের একজন পাঠিকা। তিনি সন্দেশের জন্য একটি মজার গল্প পাঠাইয়াছেন। গল্পের ঘটনাটি সত্য।—

একটি ছোট মেয়ে তার মার সঙ্গে মামাবাড়ী গিয়াছিল। সেখানে গিয়া মেয়েটি তার সইয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। গিয়া দেখে তার সই ঘরের মধ্যে বসিয়া খুব মন দিয়া কি যেন পড়িতেছে। মেয়েটি জানালার কাছে দাঁড়াইল, একটু চুড়ির শব্দ

করিল, তারপর একেবারে ঘরে ঢুকিয়া সইয়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সইয়ের তখন পড়ায় এমনি মন সে ফিরিয়াও তাকায় না। তখন মেয়েটি "সই" বলিয়া জোরে ডাক দিতেই তার গলার আওয়াজ শুনিয়া সইয়ের চমক হইল। মেয়েটি বলিল "এক-মন দিয়ে কি পড়ুছিলে"? সই তাহাকে একখানা "সন্দেশ" দেখাইয়া যে গল্পটি পড়িতেছিল সেইটা আবার পড়িয়া শুনাইল। তারপর মেয়েটি তার দাদামশায়ের কাছে আবদার করিল "আমায় ঐ সন্দেশ কাগজ আনিয়ে দাও"। দাদামশাই তখন সন্দেশ আফিসে লিখিয়া নাত্‌নীর নামে কাগজ আনাইয়া দিলেন। তখন বছরের মাঝামাঝি সময়, কাজেই একসঙ্গে এক তাড়া সন্দেশ আসিয়া হাজির হইল। ইহার পরেই মেয়ের বাবা আসিয়া তাহাদের বাড়ী লইয়া গেলেন।

মেয়ের ঠাকুরমার রাগটা কিছু বেশী, সামান্য কারণে বড় বকেন। সে দিন তাঁর মেজাজটি ভাল ছিল না—তিনি বড় গলা করিয়া মেয়ের মাকে বারবার বকিতেছিলেন। এমন সময় মেয়েটি আসিয়া বলিল "ওমা, আমার সন্দেশগুলো কোথায়? দাও না"। মা বলিলেন "আমার বাক্সে আছে—চাবি দিয়ে খুলে নাও"। ঠাকুর মা কাছেই ছিলেন, এই কথা শুনিয়া তিনি একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন—বলিলেন "বৌমা, তোমার একি ব্যবহার বল দেখি! বাপের বাড়ী থেকে সন্দেশ এনে কাউকে বল নি! পাছে কেউ খেয়ে ফেলে তাই বুঝি বাক্সে লুকিয়ে রেখেছ! ছি ছি ছি!" এই বলিয়া তিনি তাঁর বৌমার মনটি যে কত ছোট তাহার বর্ণনা করিয়া খুব বকিতে লাগিলেন। এমন সময় মেয়ের বাবা হাসিতে হাসিতে এক তাড়া সন্দেশ তাঁহার সাম্‌নে ঝুপ করিয়া ফেলিয়া বলিলেন "এই নাও মা; এই সন্দেশ তোমার বৌ তোমাদের না খাইয়ে লুকিয়ে রেখেছিল।" ঠাকুরমা দেখেন একতাড়া বই, তার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা "সন্দেশ।" সন্দেশ যে বই হয় তাত তিনি জানেন না তিনি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। সন্দেশের মলাটের উপর একটা হাসিমুখো ছবি ছিল, তাঁর মনে হইল সেটা যেন তাঁহাকেই ঠাট্টা করিয়া হাসিতেছে। সে দিন সকলেরই খুব আমোদ হইল, কেবল ঠাকুরমা বেচারা বড় অপ্রস্তুত হইলেন।

নূতন পণ্ডিত।

আগে যিনি আমাদের পণ্ডিত ছিলেন, তিনি লোক বড় ভাল। মাঝে মাঝে আমাদের যে ধমক ধামক না করিতেন, তাহা নয়—কিন্তু কখনও কাহাকেও অন্যায় শাস্তি দেন নাই। এমন কি, ক্লাশে আমরা কত সময় গোল করিতাম; তিনি কেবল মাঝে মাঝে 'আঃ' বলিয়া ধমক দিতেন। তাঁর হাতে একটা ছড়ি থাকিত, খুব বেশী রাগ করিলে সেই ছড়িটাকে টেবিলের উপর আছড়াইতেন—সেটাকে কোন দিন কাহারও পিঠে পড়িতে দেখি নাই। তাই আমরা কেউ তাঁহাকে মানিতাম না।

আমাদের হেডমাষ্টার মশাইটি দেখিতে তার চাইতেও নিরীহ ভালমানুষ। ছোট্ট বেঁটে মানুষটি, গোঁফ-দাড়ি কামান গোলগাল মুখ, তাহাতে সর্ব্বদাই যেন হাসি লাগিয়াই আছে। কিন্তু চেহারায় কি হয়? তিনি যদি "শ্যামাচরণ কার নাম?" বলিয়া ক্লাশে আসিয়া আমায় ডাক দিতেন, তবে তাঁর গলার আওয়াজেই আমার হাত পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইত। তাঁহার হাতে কোনদিন বেত দেখি নাই, কারণ বেতের কোন দরকার হইত না—তাঁর হুঙ্কারটি যার উপর পড়িত সেই চক্ষে অন্ধকার দেখিত।

একদিন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "সোমবার থেকে আমি আর পড়াতে আসব না—কিছুদিনের ছুটি নিয়েছি। আমার জায়গায় আর একজন আস্‌বেন। দেখিস্ তাঁর ক্লাসে তোরা যেন গোল করিস্‌নে।" শুনিয়া আমাদের ভারি উৎসাহ লাগিল; তারপর যে কয়দিন পণ্ডিত মহাশয় স্কুলে ছিলেন, আমরা ক্লাসে এক মিনিটও পড়ি নাই। একদিন বেহারীলাল পড়ার সময় পড়িয়াছিল, সেই জন্য আমরা পরে চাঁদা করিয়া তাহার কাণ মলিয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক পণ্ডিত মহাশয় সোমবার আর আসিলেন না—তাঁহার বদলে যিনি আসিলেন তাঁর গোল কালো চশমা, মুখভরা গোঁফের জঙ্গল আর বাঘের মত আওয়াজ শুনিয়া আমাদের উৎসাহ দমিয়া গেল। তিনি ক্লাসে আসিয়াই বলিলেন "পড়ার সময় কথা বল্‌বে না, হাসবে না, যা বল্‌ব তাই কর্‌বে—রোজকার পড়া রোজ কর্‌বে। আর যদি তা না কর, তাহ'লে তুলে আছাড় দেব!" শুনে আমাদের ত চক্ষু স্থির।

ফকিরচাঁদের, তখন অসুখ ছিল, সে বেচারা কদিন পরে ক্লাসে আসিতেই নূতন পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন। ফকির থতমত খাইয়া ভয়ে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল "আজ্ঞে—আমি ইস্কুলে আসিনি—" পণ্ডিত মহাশয় রাগিয়া বলিলেন, "ইস্কুলে আসনি ত কোথায় এসেছ? তোমার মামার বাড়ী?" ফকির

বেচারা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল "সাত দিন স্কুলে আসিনি—কি ক'রে পড়া বল্‌ব?" পণ্ডিত মহাশয় "চোপরাও বেয়াদব—মুখের উপর মুখ" বলিয়া এমন ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, যে ভয়ে ক্লাশ শুদ্ধ ছেলের মুখের তালু শুকাইয়া গেল।

আমাদের হরিপ্রসন্ন অতি ভাল ছেলে। সে একদিন স্কুলের আফিসে গিয়া খবর পাইল—সে নাকি এবার কি একটা 'প্রাইজ' পাইবে—খবরটা শুনিয়া বেচারা ভারি খুসী হইয়া ক্লাশে আসিতেছিল—এমন সময় নূতন পণ্ডিত মহাশয় "হাস্‌ছ কেন" বলিয়া হঠাৎ এমন ধমক দিয়া উঠিলেন যে মুখের হাসি এক মুহূর্ত্তে আকাশে উড়িয়া গেল। তাহার পরদিন আমাদের ক্লাশের বাইরে রাস্তার ধারে কে যেন হো হো করিয়া হাসিতেছিল; শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় পাশের ঘর হইতে হাঁহাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া আর কথাবার্ত্তা নাই—'কেবল হাসি?' বলিয়া হরিপ্রসন্নর গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া কয়েক চড় লাগাইয়া আবার হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি হরিপ্রসন্নর উপর তিনি বিনা কারণে যখন তখন খাপ্পা হইয়া উঠিতেন।

দেখিতে দেখিতে স্কুলশুদ্ধ ছেলে নূতন পণ্ডিতের উপর হাড়ে চটিয়া গেল। একদিন আমাদের অঙ্কের মাষ্টার আসেন নাই। হেডমাষ্টার রামবাবু বলিয়া গেলেন তোমরা ক্লাশে বসিয়া পুরাতন পড়া পড়িতে থাক। আমরা পড়িতে লাগিলাম, কিন্তু খানিক বাদেই পণ্ডিতমশাই পাশের ঘর হইতে "পড়ছ না কেন?" বলিয়া টেবিলে প্রকাণ্ড এক ঘুঁষি মারিলেন। আমরা বলিলাম "আজ্ঞে হাঁ, পড়ছি ত"। তিনি আবার বলিলেন "তবে শুন্‌তে পাচ্ছি না কেন, চেঁচিয়ে পড়।" যাই বলা অমনি বোকা ফকির চাঁদ

"অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড"—

বলিয়া এমন চেঁচাইয়া উঠিল যে পণ্ডিত মহাশয়ের চোখ হইতে হঠাৎ চশমাটা পড়িয়া গেল। মাষ্টার মহাশয় গম্ভীর ভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন, তারপর কেন জানি না, হরিপ্রসন্নর কানে ধরিয়া তাহাকে সমস্ত স্কুল ঘোরাইয়া আনিলেন, তাহাকে তিন দিন ক্লাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে হুকুম দিলেন, এক টাকা জরিমানা করিলেন, তার কাল কোটের পিঠে খড়ি দিয়া 'বাঁদর' লিখিয়া দিলেন, আর স্কুল হইতে তাড়াইয়া দিবেন বলিয়া শাসাইয়া রাখিলেন।

পরের দিন রামবাবু হরিপ্রসন্নকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহার কাছে সমস্ত কথা শুনিয়া আমাদের ক্লাশে খোঁজ করিতে আসিলেন। তখন ফকিরচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে

হ'রে চেঁচায়নি—আমি চেঁচিয়েছি"। রামবাবু বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়কে 'পাতকী' বলিয়া কি গালাগালি করিয়াছিলে?" ফকির বলিল "পণ্ডিতমশাইকে কিছুই বলি নি; আমি পড়ছিলাম—

অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড, তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড"

এইসময়ে নূতন পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বোধ হয় শেষ কথাটুকু শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন তাঁহাকে লইয়া কিছু ঠাট্টা করা হইতেছে। তিনি রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া হাঁহাঁ করিয়া ক্লাসের মধ্যে আসিয়া রাম বাবুর কাল কোট দেখিয়াই "তবেরে হরিপ্রসন্ন" বলিয়া হেডমাষ্টার মহাশয়কে পিটাইতে লাগিলেন। আমরা ভয়ে কাঠ হইয়া রহিলাম। হেডমাষ্টার মহাশয় অনেক কষ্টে পণ্ডিতের হাত ছাড়াইয়া তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন যদি পণ্ডিতের মুখ দেখিতে! বেচারা ভয়ে একেবারে জুজু—তিন চার বার হাঁ করিয়া আবার মুখ বুজিলেন, তার পর এদিক ওদিক চাহিয়া এক দৌড়ে সেই যে স্কুল হইতে পালাইয়া গেলেন, আর কোনদিন তাঁহাকে স্কুলে আসিতে দেখি নাই।

দুদিন পরে পুরাতন পণ্ডিত মহাশয় আবার ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া আমাদের যেন ধড়ে প্রাণ আসিল—আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সকলে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর পণ্ডিত মহাশয়ের ক্লাসে গোলমাল করিব না, যতই পড়া দিন না কেন, খুব ভাল করিয়া পড়িব।

আবোল তাবোল।

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সাথে কুস্তি ক'রে গাত্রে হ'ল ব্যথা!
ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জান না বুঝি?
রোদের ছায়া চাঁদের ছায়া, হরেক রকম পুঁজি!
শিশির ভেজা সদ্য ছায়া সকাল বেলায় তাজা,
গ্রীষ্মকালের শুক্‌নো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা!
চিল্‌গুলো যায় দুপুর বেলায় আকাশ পথে ঘুরে,
ফাঁদ ফেলে তার ছায়া ধরি খাঁচায় রাখি পুরে।

কাগের ছায়া বগের ছায়া দেখ্‌ছি কত ঘেঁটে—
হাল্কা মেঘের পান্‌সে ছায়া তাও দেখেছি চেটে!
কেউ জানেনা এ সব কথা কেউ বোঝেনা কিছু,
কেউ ঘোরে না আমার মত ছায়ার পিছু পিছু।
তোমরা ভাব গাছের ছায়া অম্নি লুটায় ভুঁয়ে
অম্নি শুধু ঘুমায় বুঝি শান্ত মতন শুয়ে।
তেমনটি নয় নয়রে বাপু আমার কথা শোন,
বল্‌ছি যা তা সত্যি কথা সন্দেহ নাই কোন—
কেউ যবে তার রয়না কাছে দেখ্‌তে নাহি পায়,
গাছের ছায়া ছট্‌ফটিয়ে ইদিক উদিক চায়।

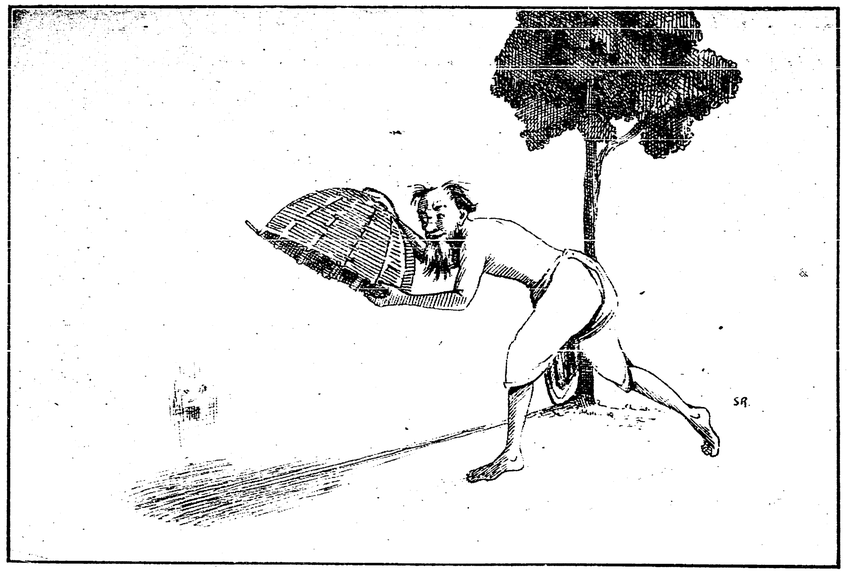

সেই সময়ে গুড়্‌গুড়িয়ে পিছন হ'তে এসে
ধামায় চেপে ধপাস্ ক'রে ধর্‌বে তারে ঠেসে।

পাৎলা ছায়া, ফোক্‌লা ছায়া, ছায়া নিবিড় কালো—
গাছের চেয়ে গাছের ছায়া সব রকমে ভালো।
গাছ গাছালি শেকড় বাকল মিথ্যা সবাই গেলে,
'বাপ্‌রে' ব'লে পালায় ব্যামো ছায়ার ওষুধ খেলে!
নিমের ছায়া ঝিঙের ছায়া তিক্ত ছায়ার পাক,
যেই খাবে ভাই অঘোর ঘুমে ডাক্‌বে তাহার নাক!
চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধর্‌তে যদি পার
শুঁক্‌লে পরে সর্দ্দি কাশি থাক্‌বেনা আর কারো।
আমড়া গাছের নোংরা ছায়া কাম্‌ড়ে যদি খায়
ল্যাংড়া লোকের ঠ্যাং গজাবে সন্দেহ নাই তায়।
আষাঢ় মাসের বাদ্‌লা দিনে বাঁচ্‌তে যদি চাও
তেঁতুল তলার তপ্ত ছায়া হপ্তা তিনেক খাও।
মৌয়া গাছের মিষ্টি ছায়া 'ব্লটিং' দিয়ে শুষে
ধুয়ে মুছে সাবধানেতে রাখ্‌ছি ঘরে পুষে!
পাক্কা নতুন টাট্‌কা ওষুধ এক্কেবারে দিশি—
দাম করেছি শস্তা বড় চৌদ্দ আনা শিশি॥

নূতন ধাঁধা।

এই দালানে লুকিয়ে আছে এইত শুধু জানা—
তার অভাবে জানালা নাই ঘর করেছে কানা।
তায় ফেলে ভাই এক হলেও একলা তবু নই,
গাল দিয়ে তার লাগাল পাব স্পষ্ট কথা কই।
দেখ্‌ছ মিছে ঘরের নীচে, চালার পিছে খোঁজ
চালাক লোকের মধ্যে থাকে—সহজ কথা বোঝ।
তাও যদি না বুঝ্‌তে পার পায়ের দিকে চাও,
'পালা পালা' রবটি তুলে দেখ্‌তে তারে পাও।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর—'ছায়া'।

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

ফড়িং।

১তুর্থ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩২৩ | চতুর্থ সংখ্যা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বাদল গান

ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে,
শ্রাবণ এসেছে ফিরে।
চাতক মিটায় তৃষা,
পাখীরা হারায় বাসা।
নদী টলমল নীরে,
শ্রাবণ এসেছে ফিরে।

২

শ্রাবণ দিয়াছে দেখা,
আকাশে বিজলি রেখা।
গগনে পবনে খেলা,
রবি শশী হেলাফেলা।
লুকাল আলোক লেখা,
শ্রাবণ এসেছে একা।

COLOURED DOCUMENT.

৩

শ্রাবণে জাগাল আশা,
পুলকে ভাসিল চাষা।
ঝুরু ঝুরু ঝরে ধারা,
মাঠে হাসে ভাসে চারা।
গুরু গুরু শুনি ভাষা,
শ্রাবণে জাগাল আশা।

৪

এসেছে শ্রাবণ বালা,
বাদলে ভরিয়া ডালা।
ফুলের ফুরাল হাসি,
মধুকর উপবাসী,
ঘুচিল নিদাঘ জ্বালা,
এসেছে শ্রাবণ বালা।

৫

শ্রাবণ সাগর তীরে,
নেমে এল হেসে ধীরে।
পাগল বাদল গানে,
ধরা ভরা কানে কানে।
মেঘেতে আকাশ ঘিরে,
শ্রাবণ এসেছে ফিরে।

শ্রীশৈলসরসী দেবী।

শ্বেত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান।

সেকালে শ্বেত নামে এক ব্রাহ্মণ গৌতমীনদীর তীরে কুটির নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ শিবের পরম ভক্ত—প্রতিদিন নিষ্ঠার সহিত শিবের স্তুতি বন্দনা করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তখন তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য যমদূতেরা আসিয়া উপস্থিত; কিন্তু শিবভক্ত ব্রাহ্মণের ঘরের ভিতরে তাহারা প্রবেশই করিতে পারিল না।

এদিকে বিলম্ব দেখিয়া যম মৃত্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেই শ্বেত ব্রাহ্মণ এখনও আসিল না কেন? দূতেরাই বা কেন ফিরিয়া আসিতেছে না? বাস্তবিক তুমি মৃত্যু, তোমার কাজে এরূপ অনিয়ম হওয়া কখনই উচিত নয়।" একথায় মৃত্যুর বড়ই রাগ হইল এবং তিনি নিজেই ব্রাহ্মণের কুটিরে চলিলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন যমদূতেরা ভয়ে ভয়ে কুটিরের বাহিরেই দাঁড়াইয়া আছে; তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—"একি! তোমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া কেন?" দূতেরা বলিল,—"স্বয়ং মহাদেব শ্বেত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিতেছেন কাজেই আমরা ব্রাহ্মণের দিকে চাহিতেও ভরসা পাইতেছি না।" মৃত্যু তখন ব্রাহ্মণের নিকটে গেলেন।

কে মৃত্যু, কাহারাই বা তাঁহার দূত, এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ কিছুই জানিতেন না; সুতরাং তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই—তিনি একমনে মহাদেবেরই পূজা করিতে লাগিলেন। এদিকে শিবের অনুচর দণ্ডী মৃত্যুকে পাশ হাতে লইয়া দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি এখানে কি দেখিতেছ?" মৃত্যু বলিল—"আমি শ্বেত দ্বিজকে লইতে আসিয়াছি।" দণ্ডী বলিল—"তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।" একথায় মৃত্যু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শ্বেত ব্রাহ্মণকে পাশ ছুঁড়িয়া মারিল। দণ্ডীও ছাড়িবার পাত্র নহে! তাহার হাতে ছিল মহাদেবের দণ্ড, সেই দণ্ড দিয়া মৃত্যুকে ধরাশায়ী করিল।

তখন যমদূতেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া যমরাজাকে সমস্ত সংবাদ জানাইবা মাত্র তিনিও মহিষে চড়িয়া প্রস্তুত হইলেন। যমরাজার সৈন্যেরাও সাজিয়া গুজিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। শ্বেত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া সকলে উপস্থিত। দলবল সহ মহিষে চড়িয়া যমকে আসিতে দেখিয়া শিবের লোকেরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। তখন সেখানে ভারী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

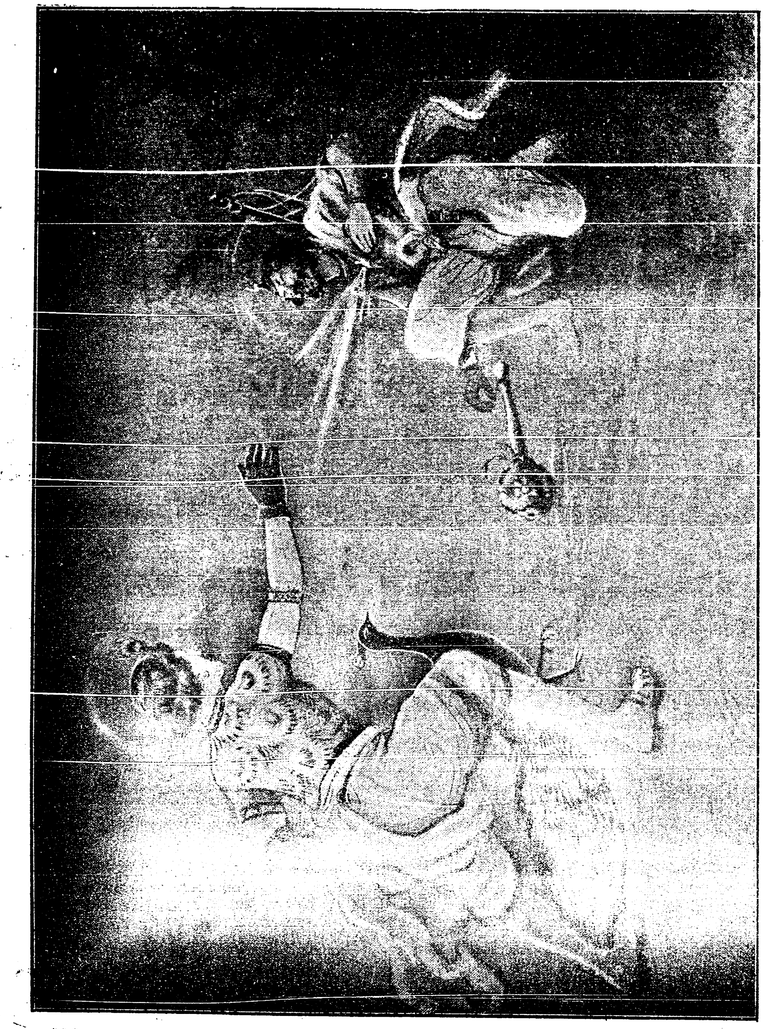

কার্ত্তিক যমকে শক্তি মারিয়াছেন।

কার্ত্তিক তাঁহার শক্তি দিয়া যমের লোকদের কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। অবশেষে যমরাজাকে ও তাঁহার বাহনটিকে গুরুতর রূপে আহত করিলেন। তখন অবশিষ্ট যমসৈন্যেরা গিয়া সূর্য্যকে সমস্ত সংবাদ জানাইল। সূর্য্য ব্রহ্মার নিকটে গেলেন। ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণকে লইয়া যমের নিকটে গিয়া উপস্থিত। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন যম গঙ্গাতীরে মৃতের ন্যায় পড়িয়া আছেন।

যমকে মৃতপ্রায় দেখিয়া দেবতাদের ত ভয় হইবার কথাই! তখন শিবকে সন্তুষ্ট করা ভিন্ন আর উপায় কি? সকল দেবতা মিলিয়া যোড়হস্তে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"তোমাদের পূজায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এখন কি বর চাও বল।" দেবতারা বলিলেন "প্রভু! এই যম ছাড়া সংসারের কাজই চলিতে পারে না। ইনি কোনও অপরাধ করেন নাই, ইঁহাকে বধ করা আপনার উচিত নয়। অতএব আপনি সৈন্যগণ এবং বাহন সহ যমকে জীবিত করুন।"

তখন মহাদেব বলিলেন, "আমার ভক্তের মরণ হইবে না, একথায় যদি তোমরা রাজি হও তাহা হইলে আমি এখনই যমকে বাঁচাইয়া দিব।" দেবগণ বলিলেন,—"তাও কি কখনও হয়? তাহা হইলে সংসারের সমস্ত লোকই যে অমর হইয়া যাইবে।" শিব বলিলেন,—"সে কথা বলিলে চলিবে না। আমার ভক্তের কর্ত্তা আমি, তাহার উপর যম কোন দিন কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবে না। এ কথায় যদি তোমরা সম্মত হও তাহা হইলেই যমকে বাঁচাইব।"

দেবতারা তখন নিরুপায় দেখিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা প্রভু, তাহাই হইবে।" মহাদেবও তখন নন্দীকে বলিলেন,—"নন্দী! গৌতমীর জল দিয়া যমকে বাঁচাইয়া দাও।"

মহাদেবের হুকুমে নন্দী গৌতমীর জল আনিয়া সকলের শরীরে ছিটাইয়া দিবামাত্র যম সৈন্যগণের সহিত জীবিত হইলেন। সে দিন হইতে সংসারে ধার্ম্মিক এবং ভক্ত লোকদিগকে দেখিলেই যম তাঁহার শাসনদণ্ড নামাইয়া ভয়ে দূর হইতে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া সরিয়া পড়েন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

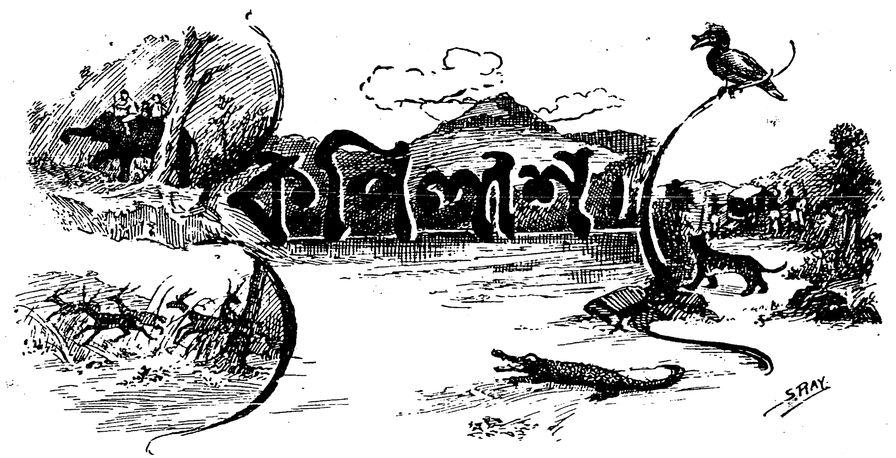

মহানদী আর কাঠজুড়ি, এই দুই নদীর মাঝখানে কটক। মহানদীর মত চওড়া নদী খুব অল্পই আছে। তার উপর যে রেলের পোল সেটা দেড় মাইল লম্বা। কতদিন আমরা মহানদীর পারে দাঁড়িয়ে, অন্য পারে গড়জাতের পাহাড়গুলি দেখেছি। তাদের মধ্যে একটি পাহাড় খুব উঁচু, অনেক সময় তার মাথায় মেঘ লেগে থাক্‌তে দেখা যায়। এই পাহাড়ের নাম কপিলাশ।

এদেশে পাহাড়ে জায়গায় গরমের দিনে চারদিকের পাথর কাঁকড় তেতে উঠে ভয়ানক গরম হয়; তখন বনেতে শুক্‌নো ডালপালায় ঘষাঘষি লেগে অনেক সময় আগুন ধরে যায়। এই আগুনকে 'দাবানল' বলে। ছেলে বেলায় দাবানলের কথা পড়েছিলাম —এখানে এসে চোখে দেখলাম। অন্ধকার রাত্রে দূর থেকে সে আগুন ভারি সুন্দর দেখায়; মনে হয় যেন পাহাড়কে কে আলোর মালা আলোর মুকুট দিয়ে সাজিয়েছে।

গড়জাতের ঢেঙ্কানাল রাজ্যে কপিলাশ পাহাড়। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ কয়দিন ঢেঙ্কানাল রাজবাড়ীতে 'ছৌ' নাচ হয়। যাত্রাগানে যেমন 'রাবণ বধ' 'প্রহ্লাদ চরিত' এই রকম এক একটা 'পালা' হয়, ছৌ নাচেতেও তেমনি হয়; কিন্তু এতে কেউ একটি কথাও বলে না। ছোট বড় ছেলেরা সব নানা রকম সেজে এসে নেচে নেচে সমস্ত গল্পটা দেখায়; তাদের হাত পা নাড়ার ভঙ্গীতেই তাদের মনের ভাব বেশ বোঝা যায়।

এবার চৈত্র মাসে আমরা ঢেঙ্কানাল যাব ঠিক করলাম। ছৌ নাচও দেখব আর কপিলাশ পাহাড়ও দেখব।

এক দিন বিকাল বেলা জিনিষ পত্র বেঁধে আমরা ঢেঙ্কানাল রওনা হলাম। নদীর ওপারে ঢেঙ্কানাল, প্রথমেই নদী পার হতে হবে। তোমরা হয় ত শুনে হাসবে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমার নৌকা চড়তে ভারি ভয় করে। তবে শুনেছি গ্রীষ্মকালে নদীতে জল খুব কম, এ সময়ে নৌকা ডুবতে কখনও শোনা যায় না, তাই মনে অনেকটা সাহস হ'ল। কটকের কাছে নদীর পার অনেক যায়গায় পাথর দিয়ে বাঁধান। এই সব বাঁধ প্রায় হাজার বছরের পুরান। এই রকম একটা বাঁধা ঘাটে আমরা নৌকায় উঠ্‌লাম।

দেখলাম নদীর জল এত কম যে অনেক যায়গায় জলের নীচের বালি শেওলা সব স্পষ্ট দেখা যায়। এক যায়গায় ত বালিতে নৌকা আট্‌কিয়েই গেল, তখন মাঝিরা জলে নেমে তাকে ঠেলে বা'র কর্‌ল। নদীর মাঝে অনেক চরা পড়েছে; কোনটা জল বাড়লে ডুবে যায়, কোন চরা বর্ষা কালেও ডোবে না। এই সব চরাতে কুমড়ো তরমুজ শাক সরিষা ইত্যাদি তরি তরকারী যথেষ্ট জন্মায়। কোথাও কোথাও বড় বড় গাছপালায় জঙ্গল হয়ে গেছে। শীতকালে চরাগুলি যখন শাদা কাশের ফুলে ভরে যায় তখন ভারি চমৎকার দেখায়। আমরা চারদিক দেখতে দেখতে যাচ্ছি। জলের পাখীরা চরার উপর বেড়াচ্ছে, কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে বক উড়ে যাচ্ছে। এক যায়গায় একটা কুমীর বালির উপর হাঁ ক'রে পড়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

আড়াই ঘণ্টা পরে, সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা ওপারে নয়াপাটনার ঘাটে পৌঁছলাম। সেখানে রাজা বাহাদুরের মোটর এসে দাঁড়িয়ে ছিল। নয়াপাটনা থেকে ঢেঙ্কানাল সহর একুশ মাইল। মোটর যাবার জন্য সুন্দর রাস্তা আছে। রাস্তার দুধারে ঝোপ জঙ্গল, কোথাও ঘন বন, কোথাও পাহাড়,—মাঝে মাঝে গ্রাম আছে। কোথাও পাহাড়ের নীচে বিলের মত। আমরা যেতে যেতে সূর্য্য ডুবে গেল, সন্ধ্যা হয়ে এলো। পাহাড়ের পিছনে সূর্য্য ঠিক যেন একটা মস্ত বড় সোনার থালার মত লেগে ছিল। ঝিলের জলে তার আলো পড়েছিল।

এই পথে নাকি ভারি বাঘের ভয়। আমরা যাবার আগে সপ্তাহ দুয়ের মধ্যে জন কুড়ি লোককে ধরে নিয়ে গিয়েছে। মোটরে বসে যদি এক আধটা বাঘ টাঘ দেখতে পেতাম, তবে বেশ হ'ত; কিন্তু মোটরের ভয়ে তারা কেউ কাছেও ঘেঁস্‌ল না। দেখেছিলাম

কেবল এক পাল বুনো হরিণ; তারা রাস্তা পার হচ্ছিল, মোটরের শব্দ শুনে ব্যস্ত হয়ে ছুটে পালাল। আমরা যাবার দশ বার দিন আগে, আমাদেরি কয়েকজন আত্মীয় ঢেঙ্কানাল গিয়াছিলেন। দিনে দুপুরে বাঘ আসবে না মনে ক'রে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ী থেকে নেমে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে একটি নয় দশ বছরের মেয়ে ছিল। কিছু দূর যেতেই সঙ্গের পাহারাওয়ালা তাঁদের চুপ করে দাঁড়াতে ইসারা করল। তাঁরা দেখেন সাম্নে প্রকাণ্ড বাঘ। দেখেই ত ছোট মেয়েটি ভয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল, আর অমনি বাঘও এগিয়ে রাস্তা আটকিয়ে দাঁড়াল। যাহোক, দু একটা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ শুনে আর ঠিক সেই সময় সেখান দিয়ে রাজার একটা হাতী এসে পড়ায় বাঘটা পালিয়ে গেল। ছোট মেয়েটি বাড়ী এসে খুব বাঘের গল্প কর্‌ল, বাঘটা নাকি তাদের দেখে 'ফুলে উঠেছিল'।

ঢেঙ্কানাল পৌঁছতে আমাদের সন্ধ্যা হয়ে এল তাই সে দিন আর সহরের কিছু দেখতে পেলাম না। পরদিন সকালে কপিলাশ যাব। কপিলাশের পথ বড় উঁচু নীচু, মোটর যাবার সুবিধা নাই; হাতী, গরুর গাড়ী বা মানুষে ঠেলা "পুস্‌পুসে" যেতে হয়। আমাদের জন্য পুস্‌পুস্ ঠিক হয়েছিল। সাম্নে দুজন করে লোক টানছিল আর পিছনে চারজন ক'রে ঠেলছিল। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়া যাবে ব'লে সকাল সকাল বেরোন গেল। বারো মাইল পথ যেতে হবে। দুধারে লাল কাঁকরমাটি, শাল হরিতকী কুচিলার (নক্স ভোমিকা) বন। মাঝে মাঝে আম কাঁঠালের গাছও দেখা যায়।

বেলা সাড়ে নয়টায় কপিলাশের নীচে এসে পৌঁছলাম। দু হাজার ফুট উঁচু পাহাড়, তার উপরে উঠ্‌তে হবে। যারা হেঁটে উঠ্‌তে চায় তারা খাড়া পাহাড়ে' রাস্তা দিয়ে গাছপালা ধরে ওঠে। একটু ঘুরে গেলে হাতী কি পাল্কীতেও যাওয়া যায়। দার্জিলিং যেতে পাহাড়ের গা দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেমন রাস্তা গিয়েছে, কপিলাশের গা কেটে, ডিনামাইট দিয়ে পাথর উড়িয়ে তেমনি রাস্তা তয়ের করা হয়েছে। সবাই ঢেঙ্কানালের রাজাবাহাদুর করিয়েছেন। আমরা হাতী চড়ে এই পথে পাহাড়ে উঠলাম। এক এক জায়গায় পাহাড় এত খাড়া যে হাতীর পিঠ থেকে নীচের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে মাথা ঘোরে, মনে হয় যেন এই পড়ে গেলাম। দুধারে বাঁশের বন, গাছপালা লতা পাতা ঝুঁকে পড়েছে। একটু নজর না রাখলে বাঁশের খোঁচায় চোখ কানা হবার যোগাড়। পথের মাঝে কোথাও বড় বড় পাথর বড় বড় গুঁড়ি বাঁশের বোঝা পড়েছে, আমি ভাব্‌ছি 'রাস্তাত বন্ধ,' তারপর দেখি আমরা যেমন ক'রে ঘরের চৌকাঠ ডিঙ্গাই, হাতী তেমনি ক'রে

সেগুলোকে ডিঙ্গিয়ে চল্ল। যদি কোথাও গরু টরু কিছু সাম্নে পড়ে, বেচারীরা হাতীর ভয়ে কোন দিকে যে যাবে ঠিক পায় না, বাঁশের বনের ভিতর দিয়ে গড়ান পাথরের উপর দিয়েই উঠে পড়ে ছুট দেয়।

যা হো'ক এক ঘণ্টা পরে পাহাড়ের উপরে ঢেঙ্কানাল রাজের বাঙ্গলা বাড়ীতে পৌঁছান গেল। সেখানে একটি মহাদেবের মন্দির আছে। তার আশে পাশে আরো ছোট খাটো মন্দির আছে। বাঙ্গলাখানি বেশ বড় আর ঝরঝরে। আমরা সেখানে রেঁধে খাওয়া দাওয়া কর্‌ছি, ইতি মধ্যে একদল লালমুখো বাঁদর ছেলেপুলেসুদ্ধ এসে হাজির। মন্দিরের লোকেদের কাছে আদর পেয়ে পেয়ে তারা আর মানুষকে ভয় করেনা। খাবারের আশায় তারা বারাণ্ডার সাম্নে সারি বেঁধে বসে গেল, যেন ভিখারীর দল। একটা কলা ছুঁড়ে দেবা মাত্র কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ আমাদের হাত থেকে খাবার নিতে আসে।

বিকালে আমরা মন্দির দেখতে গেলাম। মন্দির গুলির গড়ন ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ধরণের, ঘণ্টার মত; তবে এ মন্দির গুলির গায়ে তেমন সুন্দর খোদাই কাজ নেই। পাহাড়ে' যায়গা ব'লে, মন্দিরের উঠান কোথাও উঁচু কোথাও নীচু, মাঝে মাঝে সিঁড়ী; সবই পাথর দিয়ে বাঁধান। পাহাড়ের উপর থেকে একটা ঝরণা তিন ধারায় নেমে এসেছে। মন্দিরের উঠানের পাথরের উপর দিয়ে সে ঝরণার জল বয়ে যাচ্ছে। কোথাও তার মুখে একটুক্‌রো বাঁশের নল কি সুপারি গাছের খোলা লাগান হয়েছে; তা দিয়ে পরিষ্কার তক্‌তকে জল পড়ছে। কপিলাশ পাহাড়ের দৃশ্য বড় সুন্দর। সবুজ পাতায় ঢাকা প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা গাছগুলি দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। আম কাঁঠালের গাছ গুলি পর্য্যন্ত পাহাড়ে এসে পাহাড়েরই মত কেবল আকাশের দিকে মাথা উঁচু করছে।

এই সব বনেতে খয়েরের গাছ আছে, তা থেকে লোকেরা খয়ের তৈরী ক'রে বিক্রী করে। আর এক রকম পাতা আছে শুনেছি, তার ডাল খুব মোটা; সেই ডাল কাটলে নাকি তার ভিতর থেকে জলের মত পরিষ্কার এক রকম রস বেরোয়। পাহাড়ে জঙ্গলে জলের অভাব হ'লে অনেক সময় লোকে এই রস খেয়ে তৃষ্ণা দূর করে। আবার আরেক রকম গাছ আছে, তার গুঁড়ি সিদ্ধ ক'রে তা থেকে সাগু দানার মত এক রকম খাবার তৈরী করা যায়; দুর্ভিক্ষের সময় এ দেশের অনেক লোকে তাই খেয়ে থাকে। এই সব বন জঙ্গলই হ'ল এ দেশের লোকের খাওয়া পরার উপায়। তার জন্য তাদের কম পরিশ্রম কর্‌তে হয় না। সারাদিন খেটে হয়ত বন থেকে বাঁশ কেটে

মাথায় ক'রে বয়ে আন্‌ল—সেটা তারা রাজার দয়াতে বিনা পয়সায়ই পায়। বাড়ী গিয়ে হয় ঝুড়ি চাঙ্গাড়ি কুলো ইত্যাদি বুন্‌ল, নয় ত ভেলার মত করে বাঁশের বোঝা নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে সহরে চল্ল। সেখানে বাঁশ বেচে যে কয়টি পয়সা পাবে তাই দিয়ে নিতান্ত দরকারী চাল নূন কাপড় কিনে আন্‌বে। এরা ঘর বানায় বাঁশ কাঠের উপর বেলে-মাটি লেপে; চালা করে শুকনো পাতা না হয় খড়, 'নই' দিয়ে বেঁধে। এ দেশে নারিকেল গাছ বেশী হয় না, পাট শনের চাষ ও নেই, তাই এরা দড়ির বদলে 'নই' বলে এক রকম মজবুত লতার ছাল ব্যবহার করে।

এখানে পাহাড়ের নীচের যায়গা গুলিতে খুব ধান জন্মায়। কিন্তু হ'লে কি হবে? হয়ত ক্ষেত ভ'রে ধান পেকেছে—হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখা গেল বুনো হাতীর দল এসে ধান খেয়ে আর মাড়িয়ে সব নষ্ট ক'রে রেখে গেছে। তাই ধান পাকবার সময় এলে চাষারা ক্ষেতের মাঝে মাচা বেঁধে সেই মাচায় বসে রাত্রে হাতী তাড়ায়। হাতী তাড়ান হচ্ছে মেয়েদের কাজ। ছেলেরা সারাদিন খেটেখুটে আর রাত জাগতে পারে না, তাই মেয়েরাই হাতী তাড়াবার ভার নেয়। দু একজন ক'রে মাচায় বসে থাকে, হাতীর পাল এলেই খুব ক'রে কেরোসিনের টিন পেটায় আর হৈ হৈ ক'রে চ্যাঁচায়; হাতীরা খুব ভীতু কিনা, তাতেই তারা ভয়ে পালিয়ে যায়।

গড়জাতের বনে বাঘ, ভাল্লুক, নেকড়ে, হাতী, হরিণ, নীলগাই প্রভৃতি জন্তু দেখা যায়। তোমরা আলিপুরের চিড়িয়াখানায় ধনঞ্জয় পাখী দেখে থাক্‌বে, যার ঠোঁটের উপরে ঠোঁট থাকে; সে পাখীও এখানে আছে। এখানের লোকেরা সে পাখীকে 'কুচিলাখাই' (যে কুচিলা খায়) বলে।

কপিলাশ পাহাড়ে একরাত ছিলাম। ভোর বেলা উঠে দেখি পাহাড়ের উপর থেকে গুঁড়িমেরে মেঘ নেমে আসছে! বিকালে আমরা ঢেঙ্কানালে ফিরে এলাম। সেখানে দুইদিন ছৌ নাচ দেখে বাড়ী ফিরলাম। ছৌ নাচ দেখে খুব ভাল লাগ্‌ল—একটা নূতন ধরণের জিনিষ।

ঢেঙ্কানাল সহরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর দেখ্‌তে, মাঝে মাঝে পাহাড় আছে। একটা ছোট ঢিপির উপর রাজবাড়ী। স্কুল, কাচারি, পোষ্টআফিস, থানা সবই আছে। রাস্তার দুধারে গাছের সারি। সহর ছাড়িয়েই প্রকাণ্ড আম বাগান। এ দেশের লোকেরা বেশ হাসীখুসী ও সাদাসিধা ধরনের।

শ্রীসুখলতা রাও।

পাকা রাঁধুনী।

ওগো রাঁধুনী শোন গো শোন, রান্না বলে দি শোন—
(মোর) অতিথি এসেছে দশ বারো জন,
কেহবা আপন মেশো খুড়ো হন,
জানত তোমার কত ভোলা মন— ঘুলিয়ে যেওনা যেন।
ওগো রাঁধুনী, মন দিয়ে আগে রান্না ক'খানি শোন।

মাছঝালে বাটা সরিষা ঢালিবে,
চাল দিয়ে মুড়ীঘণ্ট রাঁধিবে,
ঢেঁড়স্ ক'খানি ভাতেতে ছাড়িবে, দুগ্ধ করিবে ঘন—
বেগুন পোড়ায়ে তৈল মাখাবে, ডাল হবে তাও জেনো।

"বেলা যে বাড়িছে"—গিন্নী শুধায়
"মোদের অতিথি জ্বলিছে ক্ষুধায়,
"ভাত বেড়ে দাও, লইবে বিদায়— বিলম্ব কিসের হেন ?"
রাঁধুনী কহিছে "সবি ত তৈরী, খবর নেওনি কেন ?—
"বেগুন চালেতে ঘণ্ট রেঁধেছি
"মাছঝালে কাঁচা তৈল ঢেলেছি
"আস্ত মুড়োটি ভাতেতে ছেড়েছি, ডালটি করেছি ঘন
"সরিষা বাটিয়া দুগ্ধে ফেলেছি, ঢেঁড়স্ পুড়েছে জেনো।"

গিন্নী কহিল, "কি করি হায় রে
"অতিথি এখন কি দিয়ে খায় রে
"তোরে ল'য়ে দেখি বিষম দায় রে— যমেও ধরে না তোকে ?
"এমন আনাড়ি মুখ্যু রাঁধুনী জন্মে দেখিনি চোখে !"

দাঁত বা'র ক'রে ব্রাহ্মণী হাসে
গালের ভিতরে পান দিয়ে ঠেসে
ঢোক্ গিলি তার কহে তবে শেষে, "মিথ্যে ঘ্যানোর ঘ্যানো
বার বার ক'রে চাটিয়া দেখেছি— মন্দ হয়নি জেনো।"

শ্রীশান্তিলতা চৌধুরী।

রাজার ছেলে পীতাম্বর।

(২)

অনেক দিন ঘুরে ঘুরে পীতাম্বরও সেই মরুভূমি পার হয়ে সেই বনে এসে দেখ্‌ল যে শিয়ালকাঁটা গাছের তলায় সেই এক হাত লম্বা দুই বুড়ো বুড়ী বসে আছে। সে তাদের প্রণাম করে বল্ল, "প্রণাম হই"; বুড়ী তাকে বল্ল, "বেঁচে থাক তুমি"। আর বুড়ো জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তুমি কোথা যাচ্ছ ? কাজ খুঁজ্‌তে না কাজে ফাঁকি দিতে ?"

সে বল্ল, "আমার মাকে কচ্ছপাসুর ধরে নিয়ে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, আমি তাঁকে খুঁজে আন্‌তে যাচ্ছি।"

বুড়ী বল্ল, "ঠিক পথেই যাচ্ছ, কিন্তু সেখানে পৌঁছোতে কি পার্‌বে ?"

পীতাম্বর বল্ল, "কেন, ঠাকুমা ? সে পথে যাওয়া কি ভারী শক্ত ?"

বুড়ো বল্ল, "তিন্‌টে বড় বড়, চওড়া চওড়া নদী পার হতে হয়, সেই পার হওয়ার দাম কি তুমি দিতে পার্‌বে ?"

পীতাম্বর বল্ল, "কি দাম লাগবে তাই বুঝে ত বল্‌ব পারি কি না পারি ?"

বুড়ী বল্ল, "দাদা, ঘাটের মাঝিরা বড় ভয়ানক। প্রথমটা চাইবে তোমার ডান হাত, দ্বিতীয়টা তোমার বাঁ পা, তৃতীয়টা তোমার মাথা।"

পীতাম্বর বল্ল, "চিরকালটা ত আর বেঁচে থাক্‌ব না, চেষ্টা কর্‌তে দোষ কি ?"

বুড়ো বল্ল, "দাদা, তুমি বড্ড ভাল ছেলে, তা ছাড়া তোমার সাহসও আছে। তুমি নিশ্চয়ই নদী পার হ'তে পার্‌বে।"

পীতাম্বর বুড়োবুড়ীকে প্রণাম করে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রথম নদীর ধারে এসে মাঝিকে ডাক দিতেই সে তার খেয়ার দাম চাইল।

পীতাম্বর বল্ল, "দামের কথা পরে হবে, আগে ত পার কর"। এই বলে সে ঘোড়াশুদ্ধ নৌকায় উঠে বস্‌ল। মাঝি পার করে "দাম" চাইতেই, পীতাম্বর "এই নাও তোমার দাম" বলে তার মাথা কেটে ফেল্ল।

এম্‌নি করে সে দ্বিতীয় ও তৃতীয় নদী পার হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে পাহাড়ের তলায় এসে পৌঁছাল। সেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সে একটা মস্ত বড় লাল তামার বাড়ী দেখ্‌তে পেল।

সে সেই বাড়ীর ভিতর ঢুকে প্রত্যেক ঘর খুঁজতে লাগ্‌ল। সব চেয়ে ভিতরকার ঘরে তামার সিংহাসনে বসে তামার রংএর শাড়ী পরা সুন্দরী এক মেয়ে তামার তাঁত বুন্‌ছিল। সে তাম্রলিপ্তির রাজার মেয়ে—তাকেও কচ্ছপাসুর চুরি ক'রে এনেছে। কিন্তু সেখানে পীতাম্বর তার মাকে খুঁজে পেল না।

তারপর সে কিছু দূর যেতেই সাম্‌নে একটা প্রকাণ্ড রূপোর বাড়ী দেখ্‌তে পেল। এ বাড়ীর ভিতরও তন্ন তন্ন করে খুঁজে একটা ঘরে দেখ্‌ল যে রূপোর সিংহাসনে বসে রূপালী জরীর শাড়ী পরা এক সুন্দরী মেয়ে রূপার মাকু হাতে কাপড় বুন্‌ছে। সে রজত-গড়ের রাজার মেয়ে। পীতাম্বর সেখানেও তার মাকে পেল না।

তারপর এক সোণার বাড়ী সেখানে সোণার সিংহাসনে বসে সোণালী জরীর কাপড় পরা পরমাসুন্দরী এক মেয়ে সোণার কাঠি দিয়ে সোণালী সুতার ফুল বুন্‌ছে। পীতাম্বর

তাকে দেখে খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে থেকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জান্‌ল যে সে সুবর্ণপুরের রাজার মেয়ে। কচ্ছপাসুর তাকেও বন্দী করে রেখেছে।

রাজকন্যা বল্ল, "এ বাড়ীর উত্তরে যে মুক্তার প্রাসাদ আছে, বোধ হয় সেখানে আপনার মা আছেন। সে বাড়ী ঘিরে একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ তার লেজ মুখে দিয়ে শুয়ে থাকে, কোনও লোক ভিতরে ঢুক্‌তে গেলে সে তাকে খেয়ে ফেলে। আপনাকে এই শিকড়টা দিলাম; এই শিকড় পোড়ালে তার গন্ধে সাপ ঘুমে অচেতন হয়ে যাবে, তখন আপনি স্বচ্ছন্দে তাকে ডিঙিয়ে যেতে পার্ব্বেন।"

পীতাম্বর তার কাছ থেকে সেই শিকড় নিয়ে সেই মুক্তার বাড়ীর দিকে চল্ল। সেখানে একটা মস্ত অজগর সাপ লেজ মুখে দিয়ে শুয়ে আছে। পীতাম্বর শুক্‌নো ডাল পালা দিয়ে আগুণ জ্বেলে তাতে একটুক্‌রা শিকড় ফেলে দিল। আগুণের ধোঁয়াটা সাপের নাকে ঢুক্‌তেই সাপটা ঘুমে অচেতন হয়ে পড়্‌ল। তখন পীতাম্বর তাকে ডিঙিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌ল।

সেখানে গিয়ে দেখ্‌ল যে তার মা চমৎকার একটা মুক্তোর সিংহাসনে বসে মুক্তার ফুল লতা পাতা কাট্‌ছেন। তাঁর গায়ে মুক্তার গহনা ঝল্‌মল্ কর্‌ছে। পীতাম্বরকে দেখে তিনি সেলাই ফেলে ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে কত যে আদর কর্‌তে লাগ্‌লেন তা বল্‌বার নয়। তারপর কেঁদে বল্লেন, "বাবা, এ যে কচ্ছপাসুরের বাড়ী; তুমি কি করে এলে?"

পীতাম্বর তাঁকে সব কথা খুলে বল্ল। তারপর ছেলেকে খাইয়ে দাইয়ে তিনি তাকে লুকিয়ে রেখে দিলেন। সন্ধ্যার সময় হুহু ক'রে ঝড় বইয়ে কচ্ছপাসুর এল। তার গায়ের রংটা শেওলাধরা কচ্ছপের মত, আর সে দেখ্‌তে ভয়ঙ্কর বিশ্রী আর বিকট। সে ঘঁৎ ঘঁৎ কর্‌তে কর্‌তে একেবারে এসে শুয়ে পড়্‌ল আর রাণীকে বল্ল, "আমার মাথা চুল্‌কিয়ে দাও।"

রাণী মাথা চুল্‌কিয়ে দিতে দিতে কচ্ছপাসুরের মুখের উপর দু ফোঁটা চখের জল ফেল্লেন। কচ্ছপাসুর চীৎকার করে লাফিয়ে উঠে বল্ল, "এ কি! তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?" রাণী বল্লেন, "রোজই ভাবি বলি, আজ আর না বলে থাক্‌তে পার্‌ছি না। আপনি যে রোজ রোজ বার হয়ে যান, যদি কেউ আপনাকে মেরে ফেলে, তখন আমার কি দশা হবে?"

কচ্ছপাসুর তার হল্‌দে হল্‌দে গাজরের মত দাঁত বার করে হেসে বল্ল, "হুঁ, হুঁ; এর জন্য কান্না! আমায় আবার মার্‌বে কে? আমার প্রাণ ত আমার দেহে নাই; অন্য

জায়গায় লুকানো আছে। সে কেউ জানে না, কাজেই আমি অমর!"

রাণী বল্লেন, "তাই নাকি? কোথায় আপনার প্রাণ লুকানো আছে?" কচ্ছপাসুর বল্ল, "এই বাড়ীর রান্নাঘরের কপাটের আড়ালে যে ঝাঁটা আছে, তার মধ্যে।"

পরদিন সকালে সেই ঝাঁটাটা এনে সেটার প্রত্যেক কাঠিতে মণিমুক্তা বসিয়ে রাণী সেটাকে নিজের পাশে খুব যত্ন করে রেখে দিলেন। রাত্রে কচ্ছপাসুর যখন এল, তখন সে মণি মুক্তো দিয়ে সাজান সেই ঝাঁটাটা দেখে ভারি খুসী হ'ল।

সে হেসে বল্ল "হুঁ, হুঁ। তুমি এরকম করে ঝাঁটাটা সাজিয়ে রেখেছ। তা আমার প্রাণ ত ওর মধ্যে নেই। আমি তোমায় মিছে কথা বলেছিলাম। আমার প্রাণ থাকে বাগানের উত্তর দিকে যে ঝোপটা আছে, তার মধ্যে।"

তার পরদিন রাণী আর পীতাম্বর মিলে সেই ঝোপটাকে সোণার পাত দিয়ে মুড়ে দিলেন। রাত্রে কচ্ছপাসুর আস্‌বার সময় চাঁদের আলোতে ঝোপটা চক্‌চক্ কর্‌ছে দেখে, কাছে গিয়ে দেখ্‌ল যে সেটা সোণার পাত দিয়ে মোড়া রয়েছে। বাড়ী এসে সে রাণীকে বল্ল, "রাণী, আমার প্রাণ কি এখানে আছে? মানস সরোবরের কাছে একটা ছোট হ্রদে একটা কাঠ ভাস্‌ছে, সেই কাঠের মধ্যে একটা খরগোস আছে, সেই খরগোসের পেটে একটা হাঁস, সেই হাঁসের পেটে যে ডিম, সেই ডিমটার মধ্যে আমার প্রাণ। আমি তোমাকে পরীক্ষা কর্‌ছিলাম তাই আগে একথা বলি নি। তা দেখ্‌লাম তুমি সত্যিসত্যি আমায় খুব ভালবাস।"

পরদিন কচ্ছপাসুর যখন বার হয়ে গেল, তখন পীতাম্বর আবার খানিকটা শিকড় পুড়িয়ে অজগরটাকে অজ্ঞান করে ফেলে আস্তে আস্তে বাড়ী থেকে বের হ'ল।

কিছু দূর গিয়ে সে এক গভীর বনের মধ্যে গিয়ে পড়্‌ল। সেখানে গিয়ে দেখ্‌ল যে একটা ভালুকের পায়ে কাঁটা ফুটে পা ফুলে উঠেছে। সে সেই কাঁটা বার করে দিল। ভালুকটা তখন তাকে বল্ল, "তুমি আমার যে উপকার কর্‌লে তা আমি কখ্‌খনো ভুল্‌ব না।"

আরও খানিকটা গিয়ে সে দেখ্‌ল যে একটা বাজপাখীর ছানা বাসা থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট কর্‌ছে। সে সেটাকে খুব যত্ন ক'রে বাসায় তুলে দিল। পাখীর মা বল্ল, "তুমি যে আজ আমার ছানার প্রাণ বাঁচালে তা আমি কখ্‌খনো ভুল্‌ব না।"

সে সেখান থেকে খানিকটা যেতেই দেখ্‌ল যে একটা উদ্‌বিড়াল ফাঁদে পড়েছে। সে উদ্‌বিড়ালটাকে খুলে দিল। উদ্‌বিড়ালও বল্ল যে সে এ কথা কখ্‌খনো ভুল্‌বে

না। তারপরে যখন সে সেই হ্রদের কাছে এসে পৌঁছোলো, তখন দেখ্‌ল যে একটা মাছ ডাঙায় পড়ে খাবি খাচ্ছে। সে মাছটাকে জলে ছেড়ে দিতে, মাছটা বল্ল, "তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ, এ কথা আমি কখ্‌খনো ভুল্‌ব না।"

পীতাম্বর দেখ্‌ল যে সেই কাঠখানা হ্রদের মধ্যে ভাস্‌ছে। অতি কষ্টে সে ত কাঠখানা তীরে তুল্‌ল! তারপর কি করবে তাই সে ভাব্‌ছে, এমন সময় কোথাথেকে সেই ভালুকটা এসে নখ দিয়ে চিরে সেই কাঠখানাকে দু টুক্‌রো করে দিল।

কাঠখানা টুক্‌রো হতেই খরগোসটা লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু তাকে পালাতে আর হ'ল না; সেই উদ্‌বিড়ালটা এসে তাকে ধরে ছিঁড়ে ফেল্‌ল।

অমনি তার পেট থেকে একটা হাঁস বার হয়ে আকাশে উড়্‌তে গেল। কিন্তু সেই বাজপাখীটা এসে সেই হাঁসটাকে ধর্‌ল। ধর্‌তেই সেই হাঁসটা হ্রদের জলে তার ডিমটা ফেলে দিল।

তাই দেখে পীতাম্বর ভারি দুঃখ করছে, এমন সময় সেই মাছটা ডিম মুখে করে এসে হাজির। সে তাড়াতাড়ি ডিমটা নিয়ে যত্ন করে লুকিয়ে রেখে, মার কাছে ফিরে গেল।

রাত্রে কচ্ছপাসুর যখন বাড়ী এল তখন পীতাম্বরকে দেখে সে খুব চটে গিয়ে, "তুই কেরে?" বলে তলোয়ার নিয়ে তাকে তেড়ে গেল। পীতাম্বর ডিমটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে ছুঁড়ে ফেল্‌ল। কচ্ছপাসুর ও ঘরের একদিক থেকে আরেক দিকে ছিট্‌কিয়ে পড়্‌ল। পীতাম্বর আবার ডিমটা ডান হাতে নিল। কচ্ছপাসুর আবার ছিট্‌কিয়ে গিয়ে অন্য দেয়ালে মাথা ঠোকা খেল। এরকম বার কতক লোফালুফির পর পীতাম্বর ডিমটাকে হাতে চেপে ধর্‌ল। কচ্ছাপাসুরের চোখ ঘোলা হয়ে জিব বেরিয়ে আস্‌ল। তারপর পীতাম্বর ডিমটা জোরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে ভেঙ্গে ফেল্‌ল। কচ্ছপাসুর মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে মরে গেল। কচ্ছপাসুর মরে যেতেই সেই বাড়ী ঘর সাপ সব কোথায় মিলিয়ে গেল। এ দিকে নীলাম্বর দিগম্বরেরও হাত পা গজিয়ে গেল।

পীতাম্বর মা আর তিন রাজকন্যাকে নিয়ে পাহাড় বেয়ে নেমে এসে সেই বুড়ো বুড়ীর সঙ্গে দেখা কর্‌ল। তারা এদের অনেক টাকাকড়ি দিয়ে রাজ্যে নিরাপদে পৌঁছাবার বন্দোবস্ত করে দিল। চারিদিকে আনন্দোৎসব পড়ে গেল। পীতাম্বর সুবর্ণপুরের রাজার মেয়েকে বিয়ে কর্‌ল। আর অন্য দুই রাজকন্যার সঙ্গে দিগম্বরের আর নীলাম্বরের বিয়ে হয়ে গেল।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

ফড়িং।

ফড়িং পাওয়া যায়না, এমন দেশ খুব কমই আছে। যে দেশে লতা পাতা আছে আর সবুজ মাঠ আছে, সে দেশেই ফড়িং পাওয়া যাবে। নানান্ দেশে নানান্ রকমের ফড়িং, তাদের রং এবং চেহারাও নানান্ রকমের, কিন্তু একটি বিষয়ে সবারই মধ্যে খুব মিল দেখা যায়; সেটি হ'চ্ছে লাফ দিয়ে চলা। এই বিদ্যায় ফড়িঙের একটু বিশেষ রকম বাহাদুরি দেখা যায়, কারণ অন্যান্য অনেক পোকার তুলনায় ফড়িঙের চেহারাটি বেশ বড়ই বল্‌তে হবে। আরও অনেক বড় পোকা আছে, যেমন আরশুলা, যারা একটু আধটু লাফাতে পারে; কিন্তু তাদের লাফানির চাইতে উড়বার ঝঁকিটাই বেশী। ফড়িঙের যদিও ডানা আছে, কিন্তু সেটা সে ঠিক উড়বার জন্য—অর্থাৎ বাতাস ঠেলে উঠ্‌বার জন্য—ব্যবহার করে না। তাতে কেবল লাফ দিবার সময় বাতাসে ভর ক'রে শরীরটাকে কিছু হাল্কা করার সুবিধা হয় মাত্র। ফড়িঙের শরীরটা দেখ্‌লেই বোঝা যায় যে, ঐ রকম লাফ দিবার আয়োজন ক'রেই তাকে গড়া হ'য়েছে। তার শরীরের ভিতরটা বাতাসে পোরা বল্‌লেও হয়—অন্য কোন পোকার মধ্যে এতগুলা ফাঁপা নল প্রায়ই দেখা যায় না। শরীরটা হাল্কা হওয়ায় যে লাফাবার সুবিধা হয়, তা সহজেই বুঝ্‌তে পার। তার উপর ফড়িঙের পা দুটিতেও একটু বিশেষ রকমের কেরামতি আছে। ছবিতে তার পিছনের একটি পা দেখ।

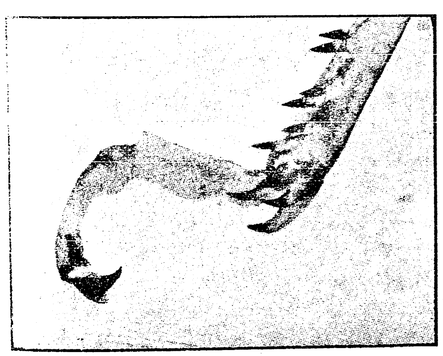

পিছনের পা

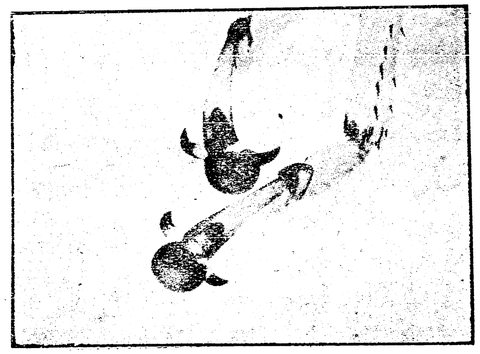

সামনের পা

পায়ের আগাটি যেন বঁড়শির মত বাঁকান। লাফাবার সময় সে ঐ বঁড়শি দিয়ে সুবিধা মত গাছের ডাল পালা কিছু একটা বেশ ক'রে আঁকড়িয়ে ধরে। তারপর পাটাকে জোর ক'রে গুটিয়ে হঠাৎ টান ছেড়ে দেয়, আর সেই সঙ্গে সমস্ত শরীরটা ধনুকের ছিলার মত ছিট্‌কিয়ে যায়। এরকম সাঙ্ঘাতিক ভাবে লাফাতে গিয়ে যাতে হাত পা জখম না হয়, তার জন্যও ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। প্রথম ব্যবস্থা, তার ডানা দুটি। লাফ দিয়ে পড়বার সময় ঐ ডানার উপর ভর দিয়ে সে লাফানির ঝুঁকিটা সামলিয়ে নেয়। তারপর সাম্‌নের পা গুলোর আগায় যে পুঁটুলি দেখ্‌ছ ঐ গুলোতে পড়বার চোট কমিয়ে দেয়। ফড়িঙের ইংরাজি নামটিতেও তার ঐ লাফানির পরিচয় পাওয়া যায়। (Grass hopper অর্থাৎ 'যিনি ঘাসের উপর লাফিয়ে বেড়ান')।

মাঠের মধ্যে ফড়িঙের 'চির্-চির্' শব্দ অনেক সময়ে খুব স্পষ্ট শোনা যায়। এই আওয়াজটি কিন্তু তার গলা থেকে বেরোয় না—তার যন্ত্রটি থাকে ডানার মধ্যে। ডানা দুটির গোড়ার 'উকা'র মত খড়খড়ে দুটি সরু তাঁতের উপর একটি পাৎলা 'চামড়া'র ছাউনি। ঐ তাঁতের ঘষাঘষিতে আওয়াজ হয় আর ওই পাৎলা চামড়াটিতে সেই আওয়াজটাকে বাড়িয়ে তোলে। এই রকম আওয়াজ ক'রে তাদের কি লাভ হয়? একটা লাভ হয় এই যে তারা এম্নি ক'রে পরস্পরকে ডাক্‌তে পারে। ভাল খাবার পেলে বা মনে খুব ফূর্ত্তি হ'লেও তারা এই রকম ক'রে ডাকে; ভয় পেলে চুপ করে থাকে। আশ্চর্য্য এই যে, স্ত্রী ফড়িংদের আওয়াজ নাই; কিন্তু তাদের 'কাণ'খুব ভাল।

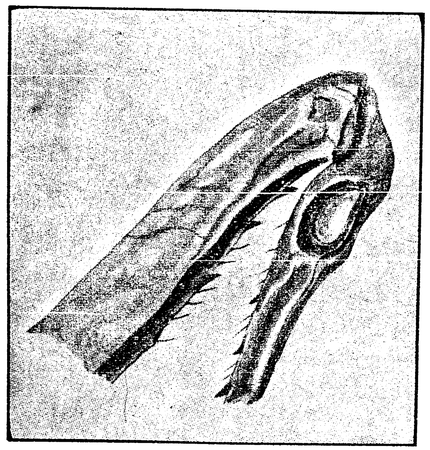

হাঁটুর কাছে ফড়িঙের কাণ

'কাণ' বল্‌লাম বটে, কিন্তু একটা ফড়িং ধরে যদি তার কাণ খুঁজ্‌তে যাও, হয়ত খুঁজেই পাবে না; কারণ, কাণটি থাকে তার হাঁটুর কাছে না হয় পিঠের উপর! কাণেরও আবার নানান্ রকম বেরকম আছে। কোনটা একেবারে খোলা দুটা পাৎলা চামড়ার খোলা, কোনটা গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়ে বসান—কোনটার মুখে রীতিমত ঢাকনি দেওয়া।

এবারের রঙিন ছবিটাতে দেখ কয়েক রকম ফড়িঙের চেহারা দেওয়া হয়েছে। এদের সবগুলি আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। লাল রঙের ঝকঝকে ডানাওয়ালা ফড়িংটির বাসা দক্ষিণ আফ্রিকায়। একেবারে নীচের ঐ শুঁড়ওয়ালা ফড়িংটিও থাকেন আফ্রিকায়। তার উপরেরটির ডানা নাই কিন্তু তিনিও একজন লাফানির ওস্তাদ—বাড়ী ককেশাস্ পাহাড়ে। আর সবগুলিই আমাদের দেশে পাওয়া যায়।

রেলগাড়ীর কথা।

এমন কত জিনিষ আছে যা আমরা সর্ব্বদাই দেখে থাকি এবং তাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বোধ করি না। অথচ, সেই সব জিনিষই যখন প্রথম লোকে দেখেছিল তখন খুব একটা হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। প্রথম যে বেচারা ছাতা মাথায় দিয়ে ইংলণ্ডের রাস্তায় বেরিয়েছিল, তাকে সবাই মিলে ঢিল ছুঁড়ে এম্নি তাড়া হুড়ো ক'রেছিল যে বেচারার প্রাণ নিয়ে টানাটানি!

সার ওয়াল্টার র‍্যালে' যখন বিলাতে আলু আর তামাকের প্রচলন ক'রলেন তখনও তাকে রীতিমত নাকাল হ'তে হ'য়েছিল। শোনা যায়, তিনি একদিন খুব আরাম ক'রে নিজের ঘরে ব'সে 'পাইপ' মুখে দিয়ে তামাক টান্‌ছিলেন, এমন সময় তাঁর চাকর এসে সেই ব্যাপার দেখে, মনিবের মুখে আগুন লেগেছে মনে ক'রে, একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেল। কি কর্‌বে কিছু বুঝ্‌তে না পেরে, সে এক বাল্‌তি জল নিয়ে সার্ ওয়াল্টারের মাথায় ঢেলে দিল! আলু খেতেও প্রথমটা লোকে কম আপত্তি করেনি। "আলু ভয়ানক বিষাক্ত জিনিষ", "আলু খেয়ে লোক ম'রে যাচ্ছে", এই রকম সব অদ্ভুত গুজব চারিদিকে রাষ্ট্র হ'য়ে বহুদিন পর্য্যন্ত লোকের মনে ভয় জন্মিয়ে রেখেছিল।

কলকাতায় হাওড়ার পোল যখন তৈরি হয় নি, তখন একজন সাহেব বলেন যে নৌকার উপর খিলান ভাসিয়ে এই রকম পোল তৈরি হ'তে পারে। এ কথাটা সে সময়ে লোকের কাছে এমনই অদ্ভুত ঠেকেছিল যে খবরের কাগজে পর্য্যন্ত সেই বেচারার নামে নানারকম ঠাট্টা তামাসা বেরিয়েছিল। অথচ এখন হাজার হাজার লোকে প্রতিদিন পোলের উপর যাওয়া আসা কর্‌ছে—সেটা বাস্তবিক একটা অদ্ভুত ব্যাপার কিনা, কেউ সে কথা ভেবে দেখবার অবসর পায় না।

রেলগাড়ীর প্রচলনও এমনি ক'রেই হয়েছিল। প্রায় একশ বৎসর আগে জর্জ্জ

ষ্টিফেনসন বাষ্পের জোরে গাড়ী চালিয়ে তাতে লোকের যাতায়াতের ব্যবস্থা করবার প্রস্তাব করেন। তখন সে প্রস্তাবে এত রকম আপত্তি উঠেছিল যে, ক্রমে তর্কটা পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত গড়ায়। শেষটায় অনেক ঝগড়াঝাটি গণ্ডগোলের পর ষ্টিফেনসনকে নানারকম জেরা ক'রে তারপর অনুমতি দেওয়া হ'ল—"আচ্ছা, তোমার রেলগাড়ীটা না হয় একবার পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক"! ষ্টিফেনসন সহজে জেদ ছাড়বার লোক ছিলেন না—তাই তিনি শেষপর্য্যন্ত লড়াই করতে ছাড়েন নি।

এই জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সনের জীবনের কথা অতি অদ্ভুত। নিতান্ত গরীবের ঘরে যার জন্ম,

যে লেখাপড়ার কোন রকম সুযোগ পায়নি এবং ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কেবল কয়লার খনিতে সামান্য কাজ করেই জীবন কাটিয়েছে, তার মনে এমন আশ্চর্য্য শক্তি আসে কোথা হতে, ভাব্‌লে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। ষ্টিফেনসনেরা ছয় ভাই বোন। বাপ মা অত্যন্ত গরীব, কাজেই ছেলে বেলা থেকেই সব কটি ভাইকে টাকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করতে হ'ত। তারা নানান্ কাজ ক'রে একেকজন দিনে প্রায় দুআনা রোজগার করত। খনিতে নানা-রকম কল কারখানা থাকে, সেই গুলার উপর জর্জ্জের ভারি নজর ছিল। সুযোগ পেলেই সে সেগুলাকে নেড়ে চেড়ে তার ভিতরের কলকব্জা খুলে দেখ্‌ত। বই টই কিছুমাত্র না পড়েও কেবল নিজে দেখেশুনে এ সকল বিষয়ে তার আশ্চর্য্য দখল জন্মেছিল। সে সময়ে কয়লার খনিতে যে সকল এঞ্জিন ব্যবহার হ'ত তাদের "খাড়া এঞ্জিন" বলা যায়—অর্থাৎ সে এঞ্জিন এক জায়গায় খাটান থাকে; তার চাকার সঙ্গে দড়ি, শিকল বা লোহার হাতল জুড়ে গাড়ী টানা, মোট বওয়া, জিনিষপত্র উঠান নামান প্রভৃতি নানারকম কাজ চালান হয়। সেই সময় হ'তেই চাকায়-বসান চলন্ত এঞ্জিন গড়বার খেয়াল ষ্টিফেনসনের মাথায় চেপেছিল।

যাহো'ক ক্রমে ষ্টিফেনসনের অবস্থার উন্নতি হ'তে লাগল। ক্রমে তার সপ্তাহে ১২ শিলিং (নয় টাকা) মাইনে হ'ল—তার উপর জুতা সেলাই ক'রে আর ঘড়ি মেরামত ক'রেও সে কিছু কিছু উপার্জ্জন করতে লাগ্‌ল। সকলে বল্‌ল "জর্জ্জ মস্ত রোজগেরে হ'য়েছে"। এই ভাবে প্রায় ত্রিশ বৎসর কেটে গেল, এর মধ্যেই পাকা এঞ্জিনিয়ার ব'লে ষ্টিফেনসনের বেশ একটু নাম হয়েছে।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ৩৩ বৎসর বয়সে এক খনির মালিককে রাজি করিয়ে ষ্টিফেনসন তাঁর প্রথম চলন্ত এঞ্জিনের পরীক্ষা করেন। এই এঞ্জিনের সঙ্গে কয়লার গাড়ী জুড়ে দেখা গেল যে ৫০০ মণ কয়লা উঁচু রাস্তায় ঘণ্টায় চার মাইল ক'রে নেওয়া যায়। আগে ট্রামের লাইন বসিয়ে তার উপর লোকেরা গাড়ী ঠেলে নিত, সেই লাইনের উপরই এঞ্জিন বসিয়ে কয়লা চালান হ'তে লাগ্‌ল। তারপর বছর খানেকের মধ্যে আরো ভালো দুটি এঞ্জিন তৈয়ারি হ'ল। ক্রমে আশে পাশে আরও কত কয়লার খনিতে ষ্টিফেনসনের এঞ্জিন চল্‌তে লাগ্‌ল। এম্নি ক'রে আট দশ বৎসর কেটে গেল।

তখন ষ্টক্‌টন হ'তে ডার্লিংটন পর্য্যন্ত কয়েক মাইল ট্রামের লাইন বসিয়ে ঘোড়ার ট্রাম করবার কথা হ'চ্ছিল। ষ্টিফেনসন প্রস্তাব করলেন ঐ লাইনের উপর এঞ্জিনের

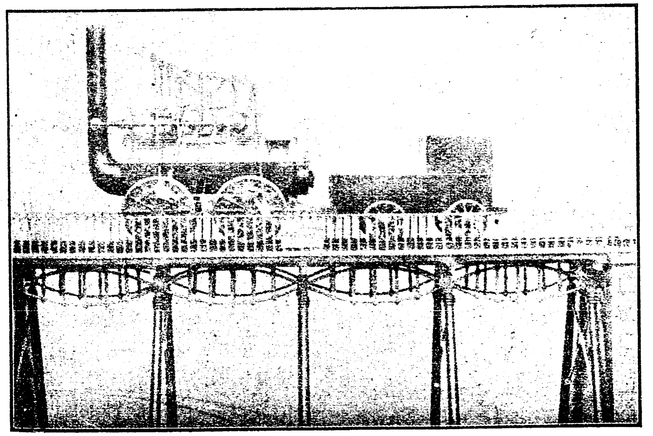

গাড়ী চালান হো'ক। অনেক কথাবার্ত্তা হাঁটা হাঁটির পর ট্রামের কর্ত্তারা রাজি হ'লেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এই লাইন যেদিন খোলা হ'ল তখন "ষ্টিফেনসনের লোহার ঘোড়া" দেখবার জন্য ভিড় জমে গিয়েছিল। কয়লা আর ময়দায় বোঝাই হ'য়ে একগাড়ী যাত্রী নিয়ে ষ্টিফেনসনের এঞ্জিন ষ্টক্‌টন হ'তে রোয়ানা হ'ল; ষ্টিফেনসন নিজে তার ড্রাইভার।

গাড়ীর আগে আগে কোম্পানীর লোক ঘোড়ায় চড়ে নিশান নিয়ে ছুট্‌ল! কিন্তু ষ্টিফেনসন তাঁর ইঞ্জিনে পূরো দম দিয়ে এমন ছুটিয়ে দিলেন, যে সে লোকটির আর সঙ্গে যাওয়া হ'ল না। ডার্লিংটনে সমস্ত মাল পত্র নামিয়ে সমস্ত ট্রেনটিকে পঙ্গপালের মত লোক-বোঝাই ক'রে ষ্টিফেনসন ষ্টক্‌টনে ফিরে এলেন। না জানি সে সময়ে লোকের মনে কি রকম উৎসাহ হ'য়েছিল।

কিন্তু এতেও গোলমাল মিট্‌ল না। এরপর যখন মান্‌চেষ্টার থেকে লিভারপুল পর্য্যন্ত রেল করবার কথা হ'ল, তখন আবার তুমুল ঝগড়া আরম্ভ হ'ল। রেলগাড়ী জিনিষটাতেই অনেকের আপত্তি; কেউ কেউ তাকে "শয়তানের যন্ত্র" বলে গাল দিতেও ছাড়েন নি। এর মধ্যে আবার অন্য কয়েকটি এঞ্জিনওয়ালা এসে বল্লেন "আমরা আরো ভাল এঞ্জিন বানিয়েছি—আমাদের উপর ভার দাও"। কেউ বল্লেন "ষ্টিফেনসন আবার কোথাকার কে? নাম জানি না, ধাম জানি না—এত বড় কাজের ভার কি যার তার উপর দেওয়া যায়"? তখন চারিদিক থেকে পার্লামেণ্টের কাছে দরখাস্ত যেতে লাগ্‌ল। পার্লামেণ্টের হুকুমে সব এঞ্জিন এক জায়গায় আনিয়ে তার পরীক্ষা নেওয়া হ'ল। পরীক্ষায় ষ্টিফেনসনের এঞ্জিন আর সব কটাকে একেবারে পিছনে ফেলে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল ছুটে সকলের মনে এমন তাক্ লাগিয়ে দিল যে যারা ঝগড়া কর্‌তে এসেছিল, তাদের আর কথাটি কইবার মুখ রইলনা। এঞ্জিনওয়ালারা তাদের এঞ্জিনের ঝ্যাঁকঝ্যাঁকানি বন্ধ ক'রে লজ্জায় বাড়ী চলে গেল। এম্নি ক'রে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রীতিমত রেলের চলাচল আরম্ভ হ'ল। তার পর কত এঞ্জিন তৈরী হ'ল, কত দিকে কত রেলের লাইন ব'সে গেল, গরীবের ছেলে ষ্টিফেনসন মস্ত ধনীলোক হ'য়ে গেলেন। কিন্তু জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সাদাসিধা চালচলন আর সহজ সরল ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। ষ্টিফেনসনের একমাত্র ছেলে রবার্টও কালে একজন নামজাদা এঞ্জিনিয়ার হ'য়েছিলেন; রেলের পোল তৈরি বিষয়ে তাঁর বিশেষ রকম সুনাম ছিল।

জগ্যিদাসের মামা।

তার আসল্ নামটি যজ্ঞদাস। সে প্রথম যে দিন আমাদের ক্লাশে এসেছিল পণ্ডিত মশাই তার নাম শুনেই এক ধমক দিলেন "যজ্ঞের আবার দাস কি? যজ্ঞেশ্বর বল্‌লে তবু না হয় বুঝি"। ছেলেটি বল্‌ল, "আজ্ঞে আমিত নাম রাখি নি, নাম রেখেছেন খুড়োমশাই"।

এই শুনে আমরা হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌তেই পণ্ডিত মশাই হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "বানান কর যজ্ঞদাস"। আমি থতমত খেয়ে বল্‌লাম "বর্গীয় জ——", পণ্ডিত মশাই বল্‌লেন "দাঁড়িয়ে থাক"। তারপর একটা ছেলে ঠিক বানান বল্‌লে পর তিনি আরেক জনকে বল্‌লেন, "সমাস কর"। সে বেচারা ভয় খেয়ে বল্‌ল, "যোগ্য ছিল দাস—হ'ল যোগ্যদাস—অর্থাৎ—"; পণ্ডিত মশাই বল্লেন, "থাক্ থাক্ আর বল্‌তে হবে না"।

এম্নি ক'রে জগ্যিদাস আমাদের ক্লাসে ভর্ত্তি হ'ল। দুদিন না যেতেই বোঝা গেল যে জগ্যিদাসের আর কোন বিদ্যে থাকুক আর নাই থাকুক—আজগুবি গল্প বলবার ক্ষমতাটি খুব অসাধারণ। একদিন সে স্কুলে দেরি ক'রে এসেছিল; কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্‌ল, "রাস্তায় আস্‌তে পঁচিশটা কুকুর হাঁ হাঁ ক'রে আমায় তেড়ে এসেছিল। আমি ছুট্‌তে ছুট্‌তে হাঁপাতে হাঁপাতে সেই কুণ্ডুদের বাড়ী পর্য্যন্ত চ'লে গেছিলাম।" পঁচিশটা দূরের কথা, দশটা কুকুরও আমরা একসঙ্গে চোখে দেখেনি—কাজেই কথাটা মাষ্টার মশাইও বিশ্বাস করেন নি। তিনি বল্লেন, "এত মিছে কথা বল্‌তে শিখ্‌লে কার কাছে?" জগ্যিদাস বল্‌ল, "আজ্ঞে, মামার কাছে"। সেদিন হেড মাষ্টারের ঘরে জগ্যিদাসের ডাক পড়েছিল, সেখানে কি হ'য়েছিল আমরা জানি না; কিন্তু জগ্যিদাস যে খুসী হয় নি সেটা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু সত্যি হো'ক আর মিথ্যে হো'ক, তার গল্প বলার বাহাদুরি ছিল। সে যখন বড় বড় চোখ ক'রে গম্ভীর গলায় তার মামাবাড়ীর ডাকাত ধরার গল্প বল্‌ত তখন বিশ্বাস করি আর না করি, শুন্‌তে শুন্‌তে আমাদের মুখ আপনা হতেই হাঁ হ'য়ে আস্‌ত।

জগ্যিদাসের মামার কথা আমাদের ভারি আশ্চর্য্য ঠেক্‌ত! তাঁর গায়ে নাকি যেমন জোর তেম্‌নি অসাধারণ তাঁর বুদ্ধি। তিনি যখন 'রামভজন' বলে চাকরকে ডাক দিতেন—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিশ নিয়ে ছুটে আস্‌ত। কুস্তি বল, লাঠি বল, ক্রিকেট

বল, ফুটবল বল সবটাতেই তাঁর সমান দখল। প্রথমটা আমরা বিশ্বাস করি নি, কিন্তু একদিন সে তার মামার ফটো এনে দেখাল। দেখলাম পালোয়ানের মত চেহারা বটে! এক একবার ছুটী হত, আর জগ্যিদাস মামার বাড়ী যেত, আর এসে যে সব গল্প বল্‌ত তা' সন্দেশে ছাপ্‌বার মত।

একদিন ছুটী থেকে ফিরবার সময় ষ্টেসনে আমার সঙ্গে জগ্যিদাসের দেখা; একটা গাড়ীর মধ্যে, মাথায় পাগড়ী বাধা চমৎকার জাঁদ্‌রেল চেহারার একটি কোন্-দেশী ভদ্রলোক বসে। আমি স্কুলে ফিরতে ফিরতে জগ্যিদাসকে জিজ্ঞেস করলাম,"ঐ লোকটা কে রে?" জগ্যিদাস গম্ভীর ভাবে বল্‌ল, "ঐ ত আমার মামা"। আমি বল্‌লাম, "সে কি! তোমার মামার ফটোতে ত দাড়ী ছিল না—"। জগ্যিদাস বল্ল,"আজ কাল দাড়ী রেখেছেন"। আমি বল্লাম, "ফটোতে ত কালো দেখেছিলাম"। জগ্যিদাস বল্ল, "এবার দার্জ্জিলিং গিয়ে ফর্সা হয়ে এসেছেন"। আমি ইস্কুলে গিয়ে গল্প করলাম, "আজ জগ্যিদাসের মামাকে দেখে এলুম"। জগ্যিদাসও খুব বুক ফুলিয়ে মুখ খানা গম্ভীর ক'রে বল্ল, "তোমরাত ভাই আমার কথা বিশ্বাস কর না। আচ্ছা নাহয় মাঝে মাঝে দুটো একটা গল্প ব'লে থাকি। তা বলে কি আমার সবই গল্প? আমার জল জ্যান্ত মামাকে শুদ্ধ তোমরা উড়িয়ে দিতে চাও?" একথায় অনেকেই মনে মনে লজ্জা পেয়ে ব্যস্ত হয়ে বার বার বল্‌তে লাগ্‌ল, "আমরা কিন্তু গোড়া থেকেই বিশ্বাস ক'রেছিলাম"।

তারপর থেকে মামার প্রতিপত্তি ভয়ানক বেড়ে গেল। রোজই সব ব্যস্ত হ'য়ে থাকতাম মামার খবর শুনবার জন্য। কোন দিন মামা যেতেন হাতী গণ্ডার বাঘ মারতে, কোন দিন একাই তিনি পাঁচটা কাবুলিকে ঠেঙিয়ে ঠিক করতেন—এই রকম প্রায়ই হ'ত।

তারপর একদিন সবাই আমরা টিফিনের সময় গল্প কর্‌ছি, এমন সময় হেডমাষ্টার মশাই ক্লাশে এসে বল্লেন, "যজ্ঞদাস তোমার মামা এসেছেন"। হঠাৎ যজ্ঞদাসের মুখখানা আম্‌সির মত শুকিয়ে গেল—সে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে কি যেন বল্‌তে গিয়ে আর বল্‌তে পার্‌ল না। তারপর লক্ষ্মীছেলেটির মত চুপচাপ মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে চল্‌ল। আমরা বল্লাম, "ভয় হবে না? জানত কি রকম মামা!" সবাই মিলে উৎসাহে আর আগ্রহে 'মামা' দেখবার জন্য একেবারে ঝুঁকে পড়্‌লাম।

গিয়ে দেখি একটি রোগা কালো ছোকরা-গোছের ভদ্রলোক চশমা চোখে গো-বেচারার মত বসে আছে। জগ্যিদাস তাকেই গিয়ে প্রণাম কর্‌ল।

সে দিন আমাদের সত্যিসত্যিই রাগ হ'য়েছিল। এম্নি ক'রে ফাঁকি দেওয়া! মিথ্যে ক'রে মামা তৈরী! সে দিন আমাদের ধমকের চোটে জগ্যিদাস কেঁদেই ফেল্ল। সে

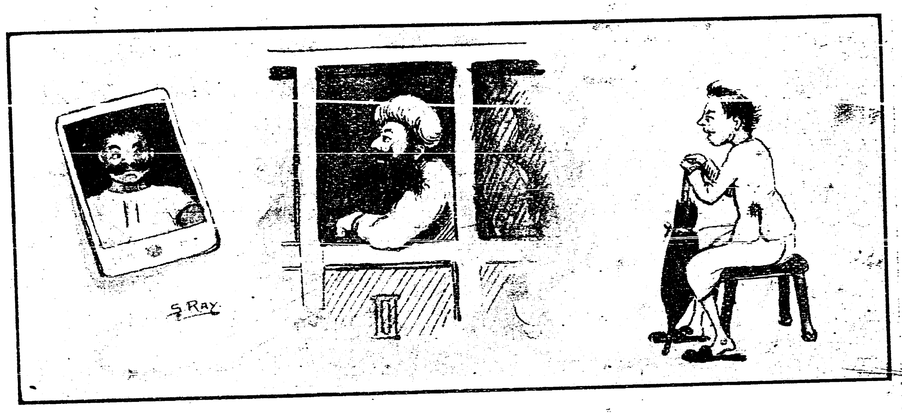

তখন স্বীকার কর্‌ল যে ফটোটা কোন্ এক পশ্চিমা পালোয়ানের। আর সেই ট্রেণের লোকটাকে সে চেনেই না। তারপরে কোন আজগুবি জিনিষের কথা বল্‌তে হ'লেই আমরা বলতাম, "জগ্যিদাসের মামার মত"।

"পেকারি"

"পেকারি" কি জান? দক্ষিণ আমেরিকায় এক রকম শূয়োর আছে তার নাম পেকারি। গতবারের সন্দেশে নানারকম শূয়োরের কথা আর ছবি ছিল, কিন্তু পেকারির নামটি করা হয়নি। আমাদের দেশী এক একটা বড় বড় বরাহের কাছে পেকারি যেন কুকুরের পাশে ইঁদুরটা! বেশ বড় একটি পেকারি হয়ত একটি সাধারণ ছাগলের চাইতে বড় হবে না। কিন্তু পেকারিকে ভয় করে না, এমন জানোয়ার সে দেশে কম আছে। তার কারণ, পেকারিরা সব সময় বড় বড় দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। এক একটা দলে এক এক সময় ৪০।৫০টা পর্য্যন্ত পেকারি থাক্‌তে দেখা যায়।

পেকারির প্রধান শত্রু "জাগুয়ার"। যত রকম চিতে বাঘ আছে তার মধ্যে এই জাগুয়ারই সব চাইতে বড় আর ভয়ানক। কিন্তু পেকারির দল সাম্‌নে পড়্‌লে জাগুয়ার পর্য্যন্ত মানে মানে পথ ছেড়ে পালায়। একবার একদল সাহেব দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঝোপের মধ্যে থেকে এম্নি ভয়ানক ফঁস্ ফঁস্ ঘঁৎ ঘঁৎ শব্দ আস্‌তে লাগ্‌ল যে তাঁরা ব্যস্ত হ'য়ে চট্‌পট্ গাছে উঠে পড়্‌লেন। উঁচুতে উঠে তাঁরা দেখেন একটা ভাঙা গাছের ডালের উপর এক জাগুয়ার চড়ে বসেছে—আর তার চারিদিকে পেকারির দল ভয়ানক গোল বাধিয়ে তুলেছে। জাগুয়ারটা যেখানে বসেছে ততদূর পর্য্যন্ত তাদের লাগাল পৌঁছায়না, তাই তারা কেবল রাগের মাথায় ফঁস্ ফঁস্ কর্‌ছে। আর গাছের গোড়ার ঢুঁ মারছে। মাঝে মাঝে এক একটা লাফ দিয়ে জাগুয়ারটাকে গুঁতো লাগাবার চেষ্টা কর্‌ছে। কয়েকটা গাছে উঠ্‌তে গিয়ে বার বার পড়ে যাচ্ছে, তবু ছাড়ছে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই রকম থেকে জাগুয়ারটার বোধ হয় একটু পরিশ্রম হয়েছিল। সে যাই একটু ন'ড়ে বস্‌তে গেছে, অমনি তার একটা পা হড়কিয়ে ঝুলে পড়েছে। যেমন ঝোলা অমনি একটা পেকারি গিয়ে তার উপর দাঁত দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিয়েছে। জাগুয়ারটাও একেবারে ক্ষেপে

গিয়ে এক লাফে পেকারি গুলোকে ডিঙিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু প'ড়ে আর তাকে উঠ্‌তে হ'ল না, মাটিতে ঠেকার সঙ্গে সঙ্গে পেকারির পাল তার উপর পড়ে তাকে মাড়িয়ে থেঁৎলিয়ে গুঁতিয়ে আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেল্ল। জাগুয়ারটা যতক্ষণ বেঁচেছিল, ততক্ষণ সে ধস্তাধস্তি কর্‌তে ছাড়েনি—কিন্তু তার উপরে এতগুলো শূয়োর চেপেছিল যে মাটিতে পড়বার পর আর তাকে চোখেই দেখা যায়নি। শূয়োরগুলো যদি তাকে আর কিছু নাও কর্‌ত, তবু শুধু চাপের চোটেই মেরে ফেল্‌তে পার্‌ত। জাগুয়ারটা মরে যাবার পরেও পেকারিদের রাগ থামেনি। তারা প্রায় আধঘণ্টা পর্য্যন্ত থেকে থেকে পাগলের মত তার উপর তেড়ে যাচ্ছিল। তারপর যখন পেকারির দল চলে গেল, তখন দেখা গেল এগারটা পেকারি ম'রে পড়ে আছে, আর জাগুয়ারের রক্ত চামড়া মাংস আর হাড় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

পেকারিরা যখন শত্রুর সামনে পড়ে তখন তারা ধনুকের মত গোল হ'য়ে তার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। যদি শত্রু আপনা থেকে সরে পড়ে তবে ভালই; কিন্তু সে যদি একটুও তেজ দেখাতে চেষ্টা করে তবে আর রক্ষা নাই। দলকে দল তার উপর প'ড়ে তাকে আর আস্ত রাখবে না। সেইজন্য জাগুয়ারেরা কখনও ইচ্ছা ক'রে পেকারির দলকে ঘাঁটাতে চায় না; অথচ পেকারির মাংস তার অতি প্রিয় খাদ্য। জাগুয়ার সাধারণত গাছের উপর পাতার আড়ালে চুপচাপ লুকিয়ে থাকে। যদি দৈবাৎ এক আধটা পেকারি দল থেকে একটু এদিকে ওদিকে গিয়ে পড়ে, সে একলাফে তার ঘাড় ভেঙে আবার দৌড়ে গাছের উপর উঠে বসে; সেই সঙ্গে পেকারির দলও একেবারে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে সেই গাছের চারিদিকে এসে জড় হয়। জাগুয়ার ততক্ষণে বেশ একটি উঁচু ডালের উপর হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম কর্‌তে থাকে। পেকারির দল সারাদিন কেবল চীৎকার আর দাপাদাপি করুক তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নাই। যখন তারা চলে যাবে তখন সেও সুযোগ বুঝে সেই আগের মারা পেকারিটিকে খেতে নামবে।

অনেক সময়ে নদীর ধারে কাদার মধ্যে গাছের গুঁড়ির উপর পেকারির দল হুড়াহুড়ি ক'রে খেলে বেড়ায়। সেইখানে কাদা মাখা কাঠের চেলার মত কুমীর হাত পা গুটিয়ে শুয়ে থাকে। সে আবার আমাদের দেশের কুমীরের চাইতেও চট্‌পটে—এই দেখ্‌ছ মড়ার মত, এর পরেই হয়ত দেখ্‌বে পাঁচ হাত লাফ দিয়ে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছে।

পেকারির দল এদিক ওদিক ঘুরে টুরে যখন সেই দিকে আসে কুমীরও ল্যাজটিকে টান ক'রে ভাবে "এইবার সময় এসেছে"। যদি দৈবাৎ এক আধটা পেকারি খেল্‌তে খেল্‌তে সেই ল্যাজের উপর উঠে পড়ে তবে আর রক্ষা নাই। নিশ্চয় দেখ্‌বে তার পরের মুহূর্ত্তেই ল্যাজের এক ঝাপ্টায় পেকারি ভায়া একেবারে ডিগ্‌বাজি খেয়ে শূন্যে উঠেছেন তারপর, শূন্যে থাক্‌তে থাক্‌তেই সেই সাংঘাতিক ল্যাজ চাবুকের মত ছুটে এসে আবার এক বাড়িতে তাকে কাদার মধ্যে আছাড় মেরে ফেলেছে!

ব্যাপারটা কি হ'ল, দলের সবাই সেটা ভাল ক'রে বুঝবার আগেই, কুমীর তার শিকার মুখে নিয়ে আচ্ছা ক'রে ঝাঁকানি দিয়ে জলের মধ্যে নেমেছে। এদিকে পেকারির দল তেড়ে এসে দাঁত উঁচিয়ে তীরের কাছে গোল হ'য়ে দাঁড়িয়ে একটিবার কুমীরের চেহারাটি দেখেই একেবারে চার পা তুলে দে দৌড়! ওই একমাত্র জানোয়ার যার কাছে পেকারির দল ঘেঁষতে সাহস পায় না।

সে দেশের লোকেরা যে পেকারিকে খুব হিসাব ক'রে চলে, তা সহজেই বুঝতে পার। একলা পেলেও কেউ তাকে সহজে ঘাঁটাতে চায় না; কারণ, কাছেই তার দলটি আছে কিনা জানবে কি ক'রে? সুতরাং পেকারির সাম্‌নে

যদি কখন পড়, তবে আর কিছু করবার আগে সুবিধা মত একটি গাছের উপর চ'ড়ে বসাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আবোল তাবোল।

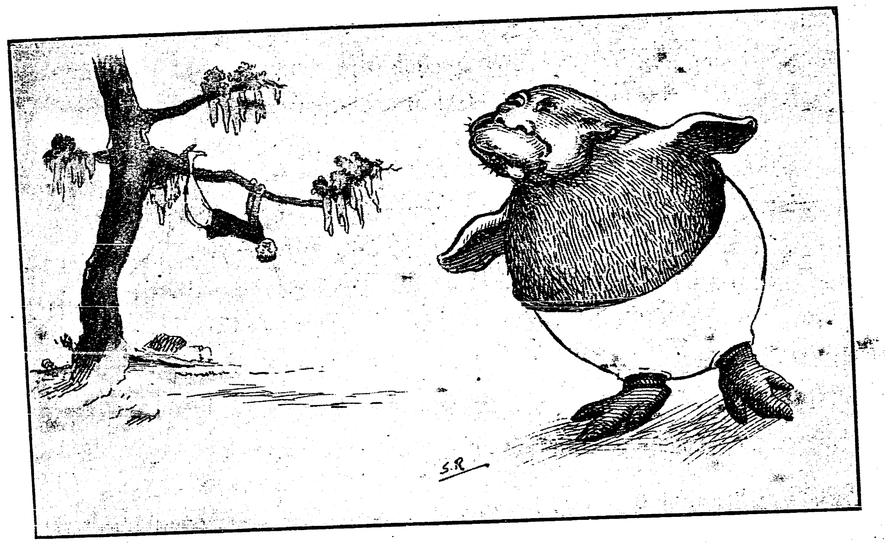

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ নাচে—
খবরদার কেশ'না কেউ আস্তাবলের কাছে!
চাইবেনাকো ডাইনে বাঁয়ে চাইবেনাকো পাছে—
চার পা তুলে থাকবে ঝুলে হট্টমূলার গাছে!

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ কাঁদে—
খবরদার! খবরদার! যেয়ো না কেউ ছাদে!
উপুড় হ'য়ে মাচায় শুয়ে লেপ কম্বল কাঁধে
বেহাগ সুরে গাইবে খালি, "রাধে কৃষ্ণ রাধে"।

(যদি) কুমড়োপটাশ হাসে—
থাক্‌বে খাড়া একটি ঠ্যাঙে রান্না ঘরের পাশে
ঝাপ্‌সা গলায় ফার্সি কবে নিঃশ্বাসে ফিস্‌ফাসে ;
তিন্‌টি বেলা উপোস রবে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে।

(যদি) কুমড়োপটাশ ডাকে—
সবাই যেন শাম্‌লা এঁটে গাম্‌লা চ'ড়ে থাকে
ছেঁচ্‌কিসাগের শেকড় বেটে মাথায় মলম মাখে
শক্ত ইঁটের তপ্ত ঝামা ঘষ্‌তে থাকে নাকে।

তুচ্ছ ভেবে এসব কথা কর্‌ছে যারা হেলা,
কুম্‌ড়োপটাশ জান্‌তে পেলে বুঝবে তখন ঠেলা।
কুম্‌ড়োপটাশ চট্‌লে পরে ঘট্‌বে তখন কি যে,
বল্‌ব কি ছাই বুঝাই কারে বুঝতে না পাই নিজে।
দেখ্‌বে যখন কোন্ কথাটি কেমন ক'রে ফলে,
আমায় তখন দোষ দিওনা আগেই রাখি ব'লে।

গল্প স্বল্প।

কুমারী সরস্বতী দত্ত সন্দেশের একটি ছোট্ট পাঠিকা। তিনি সন্দেশের জন্য গল্প লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ; তাহা পড়িয়া আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। বিশেষ ভাল লাগিয়াছে এই জন্য যে গল্পটী একেবারে তাঁর নিজের লেখা। নিজের হাতে, নিজের ভাষায়, ঠিক নিজের মনের কথাটি বলিয়াছেন। এই নূতন লেখিকাটীর বয়স সবে পাঁচ বৎসর হইল, কিন্তু ইহার মধ্যেই যুক্তাক্ষর পর্য্যন্ত নিজে নিজেই সব শেষ করিয়াছেন ; ইংরাজীও গড়গড় করিয়া পড়িতে পারেন। আমরা আশা করি ইনি বড় হইলে সন্দেশের পৃষ্ঠায় ইঁহার নাম আরও অনেক বার দেখিতে পাইব। ইঁহার লেখা প্রহ্লাদের গল্পটী আমরা এইখানেই ছাপাইয়া দিলাম—

"এক রাজা ছিল তার নাম হিরণ্যকসিপু তাঁর একটি ছেলে ছিল, ছেলেটির নাম প্রহ্লাদ। তার বাবা তাকে ইস্কুলে পড়্‌তে দিল তখন সেখানে গিয়ে কেবল

হরিবল হরিবল করতে লাগল। মাষ্টার তখন এসে তার বাবার কাছে গিয়ে বল্ল দেখ তোমার ছেলে ওখানে গিয়ে কেবল হরিনাম করছে। তখন তার বাবা তাকে ডেকে বল্ল তুই হরিনাম ছাড়বি কি না বল সে বল্ল তুমি আমাকে মার আর কাটো তবুও আমি হরিনাম ছাড়ব না। তখন তাকে একটা মস্তবড় পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দিল তখন হরি তাকে কোলে তুলে নিল। তারপর তাকে জলে ফেলে দিল তখন হরি তাকে বাঁচিয়ে দিল। তারপর তাকে আগুনে ফেলে দিল। ঈশ্বর আগুন নিবিয়ে দিল। তখন একদিন সে ভয়ানক রেগে বল্ল এইবার আমার নিজের হাতে তোকে মার্‌ব দেখি কেমন হরি তোকে বাঁচায়। এই বোলে যেই না মারতে গেল অমনি হরি অসুর সেজে তার বাবাকে মেরে ফেল্ল। ঐ বাবাটা বড় দুষ্টু ছিল।"

সে দিন খবরের কাগজে আফ্রিকার লড়াইয়ের গল্প পড়েছিলাম, সে বড় অদ্ভুত। আফ্রিকায় জার্ম্মাণদের একটা রাজ্য আছে তার নাম "জার্ম্মাণ পূর্ব্ব আফ্রিকা"। ইংরাজ আর বেলজিয়ান সৈন্যেরা সেই জায়গা দখল করবার জন্য লড়াই কর্‌তে গিয়েছে। একজন ইংরাজ সৈনিক লিখ্‌ছেন যে সমস্ত দেশটি একটি আস্ত চিড়িয়াখানা, হাতী গণ্ডার সিংহ মহিষ জিরাফ হরিণ কুমীর বাঁদর সবই দেখা যায়। সে দেশে এর আগে বড় একটা লড়াই টড়াই হয়নি, কাজেই হঠাৎ বন্দুক কামানের আওয়াজ আর মানুষের হট্টগোলে জানোয়ারগুলি যে বিশেষ রকম ব্যস্ত হ'য়েছিল তা বুঝ্‌তেই পার ! একবার একটি লোক সাইকেল্ ক'রে এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে কি একটা খবর নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কথা নেই বার্ত্তা নেই, কোথা থেকে এক হিপোপটেমাস্ বেরিয়ে তাড়কা রাক্ষসীর মত হাঁ ক'রে তাকে তেড়ে এসেছে !

আর একবার একদল বেলজিয়ান সৈন্য একটা ছোট নদী পার হ'তে গিয়ে দেখে নদী ভরা কুমীর। কুমীরের জন্য নদী পার হওয়াই গেল না—লড়াইয়ের সব গোলমাল হ'য়ে গেল। ওদিকে জার্ম্মাণরা ততক্ষণে টের পেয়ে আগে থেকেই প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে। একবার একটা জঙ্গলে লড়াই চলছিল ; সেই জঙ্গলটি বাঁদরে ভর্ত্তি। প্রথম যখন একটু আধটু বন্দুকের শব্দ আরম্ভ হ'ল, বাঁদরগুলোও ভয়ানক চ'টে গিয়ে কিচিমিচি আরম্ভ কর্‌ল। তারপর যখন রীতিমত কামানের লড়াই বেধে গেল, গোলমালে কাণে তালা লেগে যায় আর কি, তখন যত রাজ্যের বাঁদর সেইখানে এসে জড়

হ'য়ে একেবারে আকাশ তোলপাড় ক'রে তুল্‌ল। তারা নাকি এমন চীৎকার ক'রেছিল যে চেঁচানির চোটে মানুষের কথা শোনাত দূরের কথা, কামনের আওয়াজ পর্য্যন্ত প্রায় চাপা পড়্‌বার জোগাড়।

নূতন ধাঁধা।

ল্যাজামুড়া দোঁহে মিলি ডাকে আয় আয়—
মুড়া বাদে চেয়ে দেখি—একি হ'ল দায়!
ল্যাজ ফেলে ঝালে ঝোলে ফিরি পাতে পাতে—
মিলিতে না পারি তবু কাঁচকলা সাথে।
নিতে জানি, দিতে কভু নাহি জানি হায়
পাওনা বুঝিয়া লই কড়ায় কড়ায়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর—'লা'।

[প্রতি মাসে ১৫ই তারিখের মধ্যে যাঁহারা ধাঁধার ঠিক উত্তর পাঠাইবেন, এখন হইতে তাঁহাদের নাম সন্দেশে প্রকাশ করা হইবে। শ্রীমান অজয়চন্দ্র আচার্য্য গত মাসের ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন।]

WATER STAINED.

দশরথের শ্রাদ্ধে সীতার পিণ্ড দান।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চতুর্থ বর্ষ ভাদ্র, ১৩২৩ পঞ্চম সংখ্যা

খোকাখুকীদের বাগান।

আমরা কয়টী ভাই বোনে মিলে'
লাগায়েছি গাছ পালা,
নিজ হাতে করে, বাঁধিয়াছি বেড়া
বেঁধেছি মাচান চালা।
আমি সেঁচি জল দিদি তুলে ঘাস
মাচানের গোড়া হ'তে
কোদাল করিয়া দাদাটি আমার
মাটি খুঁড়ে, চারা পোঁতে।
লতাটি জড়াই পাতাটি কুড়াই
ফুল লয়ে খেলা করি
সবুজ ঠাণ্ডা মাচানের তলে
দুপুরে ঘুমা'য়ে পড়ি।
কুঁড়িটি ধরিলে ফুলটি ফুটিলে
প্রথম ধরিলে ফল
খাওয়া নাওয়া সব ভুলে যাই মোরা
হাসি নাচি অবিরল।

COLOURED DOCUMENT.

পাতাটি ঝরিলে লতাটি পড়িলে
বুকে বড় ব্যথা পাই
প্রজাপতি সাথে ঝোপে বসে রই
দু'টী বোন দু'টী ভাই।
লক লক করে কিবা কচি কচি
পুঁইয়ের ডগলা গুলি
হাজার সাপেতে দুলিতেছে যেন
চক চক ফণা তুলি'।
ঝিঙের ফুলেতে ঢাকিয়াছে পাতা
হলুদের ছড়াছড়ি,
মাচান চাপায়ে লাউ শশা গুলি
ভূমে যায় গড়াগড়ি।
বড় বড় কাঁধি কলাগাছ ভেঙ্গে
ভারেতে পড়েছে ঝুঁকি
কোলেতে চড়িয়া হাতটি বাড়ায়ে
ছুঁতে পারে ছোট খুকী।
শাকের চাকড়া যেন বা বিছানো
ময়ূর কণ্ঠী শাড়ী,
বেগুনী ফুলেতে ভরা সীমলতা
আঁচলা যেন বা তা'রি।
তক তক করা বাগানের পথ
দুই পাশে তা'র দুলে,
লকলক করে' পালঙের শীষ
মটরের ফুলে ফুলে।
মাথার উপর অতসীর গাছ
বাজাতেছে ঝুন ঝুনি
হলুদ রক্ত ফুলে আলো করে
বিকালে সন্ধ্যা মুনি।

পট পট করে' চায় যেন তা'রা
কহিবারে চায় কথা
জীবন্ত তারা বলিতে পারে না
বুকে যে তাদের ব্যথা।
গলা উচুঁ করে' কি যেন বলিছে
রজনী গন্ধা গুলি
কতই আদরে আহ্লাদে তা'রা
গায়ে পড়ে দুলি' দুলি'।
পুঁইমেটুরির আলতা পরিয়া,
চুলে গুঁজি জবা ফুল।
কানে দেয় দাদা পরায়ে আদরে
ঝুমকো ফুলের দুল।
শিউলি বোঁটায় কাপড় রঙ্গাই
গলে পরি বেলি মালা
হাতে পরি মোরা নীল ফুলে ভরা
অপরাজিতার বালা।
দোপাটী ফুলেরে আরতি করিয়া
প্রজাপতি ঘুরে ফিরে,
পাখীগুলি সব করে নাক ভয়
কাছে বসে ধীরে ধীরে।
ফড়িঙের সাথে ভোমরার মাঝে
ঝিঁঝিঁদের দলে থাকি
মটর ছড়া'য়ে পায়রা গুলোরে
ছাদ হ'তে আনি ডাকি'।
চীনে করবীর ডালে ঝুল খেয়ে
কেটে যায় সারা বেলা
ভাই বোনে মিলি' শুধু 'গাছ-গাছ'
'ফুল-ফুল' করি খেলা।

শ্রীকালিদাস রায়।

সীতার অভিশাপ।

পূর্ব্বকালে রাম বনবাসের সময় সীতা ও লক্ষণের সহিত কিছুকাল ফল্গু নদীর তীরে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধের কাল উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার বড়ই ভাবনা হইল। শ্রাদ্ধের উপযুক্ত জিনিষ পত্র সংগ্রহ করিবার জন্য লক্ষণকে তখনি নিকটস্থ গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রাদ্ধের সময় প্রায় উপস্থিত তবুও লক্ষণ ফিরিয়া আসিলেন না দেখিয়া রাম নিজেই গ্রামের দিকে রওয়ানা হইলেন।

রাম লক্ষণ চলিয়া গেলে সীতা একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"বেলা দুই প্রহর পার হইতে চলিল, লক্ষণ তবুও ফিরিলেন না। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া রামচন্দ্র গেলেন, তিনিও এখন পর্য্যন্ত আসিলেন না। এদিকে শ্রাদ্ধের সময় শেষ হইতে চলিল —এখন আমি করি কি? যাক্ আমিই আজ ফল্গু তীরে পতির পিতৃপুরুষগণকে পিণ্ড দিব।" এইরূপ স্থির করিয়া সীতা ইঙ্গুদী তেলের বাতি জ্বালিলেন এবং উপস্থিত ফুল, ফল যাহা পাইলেন তাহাই সংগ্রহ করিয়া পিণ্ড দিবামাত্র শূন্যে কয়েকখানি সুসজ্জিত হাত বাহির হইয়া সেই পিণ্ড গ্রহণ করিল। এবং সেই সঙ্গে আকাশবাণী হইল—"হে জনকনন্দিনী! আজ আমরা পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম এবং তুমিও ধন্য হইলে।"

সীতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কে আসিয়া আমার পিণ্ড লইলেন?" ইহার উত্তরে আকাশবাণী হইল—"জানকি! আমি তোমার শ্বশুর দশরথ; তোমার পিণ্ড পাইয়া আমাদের তৃপ্তি হইয়াছে।" দশরথকে দেখিতে না পাইয়া জানকী তাঁহার উদ্দেশে বলিলেন—"পিতঃ! আমার পতি রামচন্দ্র এবং দেবর লক্ষণ ফিরিয়া আসিয়া এ সকল কথা যদি বিশ্বাস না করেন তখন আমি কি করিব?" পুনরায় দৈববানী হইল—"এ বিষয়ে তুমি কয়েকজন সাক্ষী রাখিয়া দাও।" সীতা তখন ফল্গুনদীকে, অগ্নিকে, একটি গরুকে এবং যে কেতকী ফুল দিয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন সেই ফুলকে বলিলেন—"তোমরা এই ব্যাপারের সাক্ষী থাকিও।"

কিছুকাল পরে রাম লক্ষণের সহিত ফিরিয়া আসিয়া সীতাকে বলিলেন—"শ্রাদ্ধের সময় শেষ হইয়া আসিল, মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই অন্তরালে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রাদ্ধ করিয়াই আমরা আহার করিব, আমাদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছে—তুমি শীঘ্র স্নান করিয়া আহারের আয়োজন কর।" কথার কোন উত্তর না দিয়া জানকী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন—"এমন অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলে কেন?"

সীতা তখন সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলেন। তখন রাম বলিলেন—"লক্ষণ! জানকী যাহা যাহা বলিলেন শুনিলেত? আমরা শাস্ত্র মতে ডাকিয়াও যাঁহার দর্শন পাইনা তিনি কিনা জানকীর ডাক শুনিয়াই আসিয়া উপস্থিত হইলেন! এ বড় আশ্চর্য্য কথা—বোধ করি জানকী যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক নয়।"

রামের কথায় সীতা অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিলেন—"এ বিষয়ে ফল্গুনদী প্রভৃতি আমার সাক্ষী আছে। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তবে উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন।" রাম বলিলেন—"আচ্ছা! উহারা যদি তোমার কথা সত্য বলিয়া বলে তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিব।"

চারিজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলে পর দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তাহারা সকলেই অস্বীকার করিয়া বলিল—"কই! আমরাত শ্রাদ্ধের বিষয় কিছুই জানি না।" শুনিয়া রাম লক্ষণ হাসিতে লাগিলেন। জানকী বেচারী লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রান্না করিতে লাগিলেন।

এ দিকে শ্রাদ্ধে বসিয়া রাম যখন পিতৃগণকে আহ্বান করিলেন তখন আকাশবাণী হইল—"বৎস! আবার কি জন্য ডাকিতেছ? জানকী আমাদিগকে পিণ্ডদান করিয়াছেন, আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাম বলিলেন—"আমি এই কথা মানিনা।" পুনরায় দৈববাণী হইল—"হে রাম! জানকী শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, আর শ্রাদ্ধের প্রয়োজন নাই।" তবুও যখন রাম সন্তুষ্ট হইলেন না তখন স্বয়ং সূর্য্য সাক্ষী হইয়া বলিলেন—"রাম! কেন তুমি আবার শ্রাদ্ধ করিতে বসিলে? জানকী ইতিপূর্ব্বেই শ্রাদ্ধ করিয়াছেন" তখন আর কথা কি, রামের সন্দেহ দূর হইল। তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"জানকী! তোমার জয় হউক, তুমি চিরজীবি হও। আমাদের কুলে তোমার মত পুণ্যবতী বধূ! আমরা ধন্য হইলাম।"

তখন সেই চারিজন দুষ্ট সাক্ষীর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া জানকী তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন। ফল্গুকে বলিলেন—"সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তুমি মিথ্যা বলিলে সে জন্য এখন হইতে তোমার জল মাটির নীচ দিয়া বহিবে।" কেতকী ফুলকে বলিলেন—"হে কেতকি! তুমি যে মিথ্যা বলিয়াছ সে জন্য তোমার দ্বারা এখন হইতে শিবের পূজা হইবে না।" গরুকে বলিলেন—"এখন হইতে তোমার মুখের দিক সব অপবিত্র হইবে।" আগুনকে বলিলেন—"দেবতা হইয়াও তুমি যে মিথ্যা কথা বলিয়াছ সে জন্য তুমি আজ হইতে সর্ব্বভক্ষক হও।"

তখন হইতে নাকি ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা, অগ্নি সর্ব্বভুক্, কেতকী শিব পূজার অযোগ্য এবং গরুর মুখ অপবিত্র ও পুচ্ছদেশ পবিত্র হইয়াছে।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

নিরেট গুরুর কাহিনী।

১। দুরন্ত নদীর কথা।

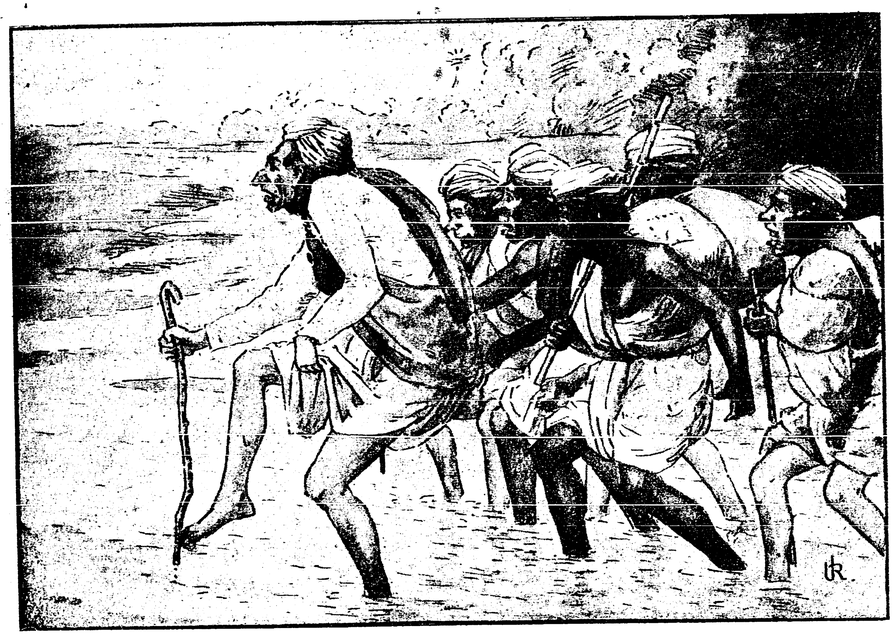

কোনও এক গ্রামে একজন গুরু বাস করিতেন; তাঁহার নাম ছিল নিরেট। ইঁহার পাঁচজন শিষ্য ছিল, তাঁহাদের নাম, আকাট, হাবা, হাঁদা, বোকা এবং আহাম্মক।

কাছাকাছি গ্রামে গুরুর যে সকল শিষ্য বাস করিত, তাহাদিগকে দর্শন দিবার জন্য ইঁহারা ছজন বাহির হইয়াছিলেন। কাজ শেষ করিয়া আপনাদের মঠে ফিরিয়া আসিবার পথে, একদিন রাত্রি তৃতীয় প্রহরে তাঁহারা এক নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গুরুর ধারণা ছিল নদীটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, সে যতক্ষণ জাগিয়া থাকিবে ততক্ষণ পার হইবার মোটেই সুবিধা হইবে না। নদী ঘুমাইয়াছে কি জাগিয়া আছে, জানিয়া আসিবার জন্য তিনি বোকাকে আদেশ করিলেন। বোকা তখন বিড়ী টানিতেছিল, তাহারই আগুনে সে একটা মশাল জ্বালিল, এবং সেইটি হাতে লইয়া চলিল। নদীর নিকটে আসিয়া, জল হইতে, বেশ খানিক দূরে থাকিয়াই, হাত বাড়াইয়া মশালটাকে জলে ডুবাইয়া দিল।

জলে দিবামাত্রই জলটা হুস্ হুস্ শব্দ করিয়া উঠিল, এবং ধোঁয়া উঠিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বোকা সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। কতবার যে সে আছাড় খাইল ও গড়াইয়া পড়িল, তাহার সংখ্যাই নাই, কিন্তু সে দিকে মোটেই তাহার খেয়াল ছিল না। সে দৌড়িতে দৌড়িতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "গুরু মশায়, গুরু মশায়, এখন নদী পার হবার সময় মোটেই নয়, ও জেগে রয়েছে। আমি তাকে যেই না ছোঁয়া, সে অমনি রেগে ফোঁস্ ফোঁস্ করে উঠল! আর ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে আমার দিকে লাফিয়ে এল। আমি যে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি এই আশ্চর্য্য।" তাহার কথা শুনিয়া গুরু বলিলেন "আমরা দেবতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারিনা। আমরা এখানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করি।" ইহা বলিয়া গুরু তাঁহার শিষ্যদের লইয়া, নিকটেই একটি বাগানে ছায়ায় গিয়া বসিলেন। সময় কাটাইবার জন্য প্রত্যেকে এই নদী সম্বন্ধে একটী ঘটনা বলিতে লাগিল। আকাট বলিল—

"আমি আমার ঠাকুরদাদার কাছে এই নদীটার চালাকি আর অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। আমার ঠাকুরদাদা একজন মস্ত সওদাগর ছিলেন। একদিন তিনি আর তাঁর একজন বন্ধু দুটো গাধার পিঠে নূন বোঝাই করে আস্‌ছিলেন। এই নদীটাতে নেমে মাঝামাঝি এসে তাঁরা একবার স্নান করে নিলেন, জলটা মোটে তাঁদের কোমর অবধি ছিল, গ্রীষ্মকাল বলে তাঁরা একটু ক্লান্তও হয়েছিলেন। তারপর গাধা গুলোকে থামিয়ে, তাঁরা সেগুলোকেও বেশ করে স্নান করিয়ে নিলেন।

"নদীপার হয়ে এসে তাঁরা দেখলেন কি যে নদীটা সব নুন চুরি করে নিয়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, নুনটা জাদু করে বের করেছে; কারণ বস্তাগুলোর মুখ আচ্ছা করে সেলাই করা ছিল, তা একটুও খোলেনি। ব্যাপার দেখে তাঁরা খুব ফূর্ত্তি করে বল্‌তে লাগলেন, বাপ্‌রে বাপ্, এতখানি নুন খেয়ে ফেলেছে। আমাদের যে ছেড়ে দিয়েছে এটা কিন্তু বেজায় ভাগ্যি বলতে হবে।"

হাঁদা তখন আর এক গল্প আরম্ভ করিল—

"এই নদীটার ফন্দি ফিকির আর চুরি আমার বয়সেই আমি ঢের দেখেছি। একবারের কাণ্ড শোন। একটা কুকুর এক টুকরো মাংস মুখে নিয়ে এই নদীতে সাঁতার দিচ্ছিল, এমন সময় নদীটা ফন্দি করে নিজের জলের ভিতর আর এক টুকরো মাংস দেখাল। কুকুর বেচারা দেখল যে জলের ভিতর যে টুকরোটা রয়েছে, সেইটাই বড়। কাজেই সে নিজের মুখের মাংসটা ফেলে যেই সেটা নিতে গেল, অমনি দু টুকরোই উড়ে গেল। কুকুর বেচারা খালি পেটেই বাড়ী ফিরল।"

এইরূপে গল্প করিতে করিতে তাহারা দেখিল যে নদীর ওপার হইতে একজন ঘোড়সওয়ার আসিতেছে। নদীতে তখন মাত্র এক বিঘৎ খানিক গভীর জল, কাজেই সে লোকটী নির্ভয়ে ঘোড়ার পিঠে থাকিয়াই, ঝপ্ ঝপ্ করিয়া জল পার হইয়া এ পারে আসিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া শিষ্যেরা সকলে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "হায় হায়, আমাদের গুরুর যদি একটি ঘোড়া থাকত, তাহলে আমরা সবাই নির্ভয়ে জলে নামতে পারতাম।" গুরু নিরেট বলিলেন," "এ বিষয়ে আমাদের পরে কথা হবে।"

দিন শেষ হইয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, কাজেই গুরু এই সময় আর একবার নদী জাগিয়া আছে কিনা পরীক্ষা করিতে পাঠাইলেন। এবারে হাবা আগেকার সেই মশালের কাঠখানা লইয়া চলিল, এবং জলের কাছে গিয়াই কাঠখানা ডুবাইয়া দিল। কাঠখানার আগুন আগেই নিবিয়া গিয়াছিল, কাজেই এবারে জল একটুও শব্দ করিল না, বা লাফাইয়া উঠিল না। ইহা দেখিয়া হাবা পরম আনন্দে ছুটিয়া চলিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "এইবার সময় হয়েছে; শিগ্গির এসো, দেখো যেন টুঁ শব্দটিও কোরোনা; নদীটা এখন খুব ঘুমচ্ছে, এখন আর ভয় ডরের কোনও দরকার নেই।"

হাবা চীৎকার করিয়া এই সুখবর দিবামাত্রই তাহারা সকলে লাফাইয়া উঠিল এবং একটি কথাও না বলিয়া ছজনে আসিয়া অতি সাবধানে জলে নামিল। তাহারা এত আস্তে আস্তে পা ফেলিতেছিল যে জলে কোনও রকম শব্দ হইল না। ভয়ে তখনও তাহাদের বুক কাঁপিতে ছিল; এইরূপে তাহারা নদীর ওপারে আসিয়া পৌঁছিল।

তীরে উঠিয়াই তাহাদের ফূর্ত্তি আর দেখে কে? আগে যে অত ভয় পাইয়াছিল তাহার আর চিহ্নই দেখা গেল না, মহা আনন্দে সকলে মিলিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিল। নদী ত পার হওয়া হইল, এখন সবাই আসিয়া পৌঁছিয়াছে কিনা, তাহা ত দেখা চাই? আহাম্মক সকলের পিছনে ছিল, সেই গুণিতে আরম্ভ করিল। সে নিজেকে বাদ দিয়া

আর সকলকেই গুণিল! গুণিয়া যখন দেখিল যে মোটে পাঁচজন হইল, তখন ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, "হায়, হায়, আমাদের মধ্যে একজন জলে ডুবে মারা গিয়েছে। গুরুমশায়, দেখুন, আমরা মোটে পাঁচটি এখানে রয়েছি।" গুরু তাড়াতাড়ি তাহাদের সকলকে সার দিয়া দাঁড় করাইয়া, তিন চার বার গুণিয়া দেখিলেন, কিন্তু তিনিও নিজেকে বাদ দিয়া গোণাতে ফল সেই পাঁচই দাঁড়াইল। তখন প্রত্যেকেই এক একবার গুণিয়া দেখিল, কিন্তু কেহই নিজেকে গুণিবার কথা ভাবিল না; কাজেই শেষে তাহারা পরিষ্কার বুঝিতে পারিল যে, নদী তাহাদের একটীকে খাইয়া ফেলিয়াছে।

তখন তাহারা সকলে খুব চেঁচাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, এবং একজন আর একজনকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে পাষণ্ড নদী, তুই পাষাণের চেয়েও কঠিন, বাঘের থেকেও নিষ্ঠুর। আমাদের গুরু নিরেটকে সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধা করে, পৃথিবীর এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত তাঁর প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর শিষ্যকে গিলে খেতে কি তোর একটুও ভয় হলনা রে? তোর কি এতই সাহস? তোর পরকালে কি গতি হবে রে? তুই কি এমন কাজ করার পরেও বেঁচে থাকবি? তুই যেন একেবারে শুকিয়ে যাস্, ঢেউ গুলো যেন পুড়ে যায়, তোর যেখানে জল ছিল, সেখানটা যেন কাঁটায় ভরে যায়।"

এই রকম করিয়া তাহারা খানিকক্ষণ হাত বাড়াইয়া, আঙ্গুল মটকাইয়া নদীটাকে খুব অভিশাপ দিল। কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে বুদ্ধিমানেরা, তাহাদের মধ্যে যে কে ডুবিয়া মরিয়াছে, তাহার খোঁজ একবারও লইলনা, চেঁচানর দিকেই তাহাদের মন ছিল। একটি লোক সেই খান দিয়া যাইতেছিল, সে তাহাদের কান্নাকাটি শুনিয়া, দয়া করিয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে বাপু ব্যাপার কি? সবাই মিলে অত গণ্ডগোল বাধিয়েছ কেন?" ব্যাপার খানা যে কি, তাহা তখন সকলে খুলিয়া বলিল। লোকটী তাহাদের বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বলিল, "যা হয়ে গিয়েছে, তার আর কি করা যাবে? কিন্তু তোমরা যদি আমাকে ভাল রকম বক্‌শিস দাও তাহলে আমি, যে নদীতে ডুবে গিয়েছে, তাকে ফিরিয়ে আনতে পারি, কারণ আমার জাদুবিদ্যাটা খুব ভাল রকম জানা আছে।" গুরু খুব খুসী হইয়া বলিলেন, "তুমি যদি তা করতে পার, তাহলে আমরা আমাদের পথ খরচের জন্য যত টাকা এনেছি সব তোমাকে দেব।" লোকটী তখন একখানা লাঠি উঁচু করিয়া দেখাইয়া বলিল, "আমার বিদ্যাটা এরি মধ্যে আছে। তোমরা সকলে সার দিয়ে দাঁড়াও, আর তোমাদের পিঠে যেই লাঠি পড়বে, অমনি যদি

প্রত্যেকে নিজের নাম বলে চেঁচিয়ে ওঠ, তাহলেই দেখবে যে তোমরা ছজনেই এখানে রয়েছ।” এই বলিয়া সে সকলকে সার দিয়া দাঁড় করাইল, এবং প্রথমেই গুরুর পিঠে ধাঁই করিয়া এক ঘা লাঠি কসাইয়া দিল। গুরু চীৎকার করিয়া বলিলেন, “ওহে, আমি হচ্ছি গুরু।” লোকটি বলিল “এক”। এই প্রকারে সে প্রত্যেককেই এক এক ঘা লাঠি লাগাইল, এবং তাহারা যেই আপন আপন নাম বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, অমনি গুণিয়া যাইতে লাগিল। শেষে তাহারা সকলে অবাক হইয়া দেখিল যে ছজনই রহিয়াছে, একজনও বাদ পড়ে নাই। তখন তাহারা লোকটীর যথেষ্ট প্রশংসাত করিলই, তার উপর, থলি ঝাড়িয়া সব টাকা কড়ি তাহাকে দিয়া, বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল।

এক চাষার এক কুকুর ছিল, তার নাম ক্যাপ্। একদিন এক দুষ্ট লোকে পাথর ছুঁড়িয়া ক্যাপের একটি পা খোঁড়া করিয়া দিল। চাষা ভাবিল, “এই খোঁড়া কুকুর লইয়া আমি কি করিব? এ আর আমার কোন কাজে লাগিবে না।” শেষটায় কুকুর বেচারাকে মারিয়া ফেলাই ঠিক হইল। একটি ছোট মেয়ে, তার নাম ফ্লরেন্স্, সে এই কথা শুনিতে পাইয়া বলিল,“আহা মারবে কেন? আমায় দেও, আমি ওকে সারিয়ে দেব।” তারপর সে ক্যাপ্‌কে বাড়ীতে লইয়া তার পায়ে পট্টি বাঁধিয়া, তাহাতে ঔষধ দিয়া, সেঁক দিয়া, রীতিমত শুশ্রূষা করিয়া, কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার খোঁড়া পা সারাইয়া দিল। তখন সেই চাষা বলিল, “ভাগ্যিস্ আপনি ছিলেন, তা নৈলে আমার এমন কুকুরকে আমি মিছামিছি মেরে ফেলতাম।”

কেবল এই একটি ঘটনা নয়, প্রায়ই এমন দেখা যাইত যে, মেয়েটি হয়ত বাগানে বেড়াইতেছে আর কাঠবিড়ালীগুলা তাঁহার কাছ হইতে খাবার লইবার জন্য চারিদিকে হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। বাড়ীর ঘোড়াটা পর্য্যন্ত তাঁর গলার আওয়াজ শুনিলে বেড়ার উপর দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিত! ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল বড় লোকের মেয়ে, তাঁর পয়সা কড়ির ভাবনা ছিল না, কোন অভাব ছিল না; তার বাবারও বড় ইচ্ছা ছেলে মেয়েরা সকলে খুব ভাল লেখাপড়া শেখে। সুতরাং অল্প বয়স হইতেই যে ফ্লরেন্সের মনে লেখা পড়ার ঝোঁক ছিল সেটা কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু লোকে যে ঐ বয়স হইতেই তাঁহাকে ভালবাসিত এবং শ্রদ্ধা করিত, সেটা তাঁহার লেখা পড়ার বাহাদুরির জন্য নয়—তার কারণ এই যে তিনি যেমন মন প্রাণ দিয়া সকলকে ভালবাসিতেন, লোকের সেবা করিতে পারিতেন এবং লোকের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইতে পারিতেন, এমন আর কেহ পারিতনা। আশে পাশে যেখানে যত গরীবের স্কুল আর হাঁসপাতাল ছিল ফ্লরেন্স্ তাহার সবগুলির মধ্যেই থাকিতেন। সেই সময়ে ইংলণ্ডে কয়েদীদের অবস্থা বড় ভয়ানক ছিল। জেলখানাগুলি অত্যন্ত নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর এবং তাহাদের বন্দোবস্ত এমন বিশ্রী যে একবার যে জেলে ঢুকিয়াছে তাহার পক্ষে ভবিষ্যতে আবার ভাল হওয়া একরূপ অসম্ভব। মিসেস্ ফ্রাই নামে একজন ইংরাজমহিলা এই কয়েদীদের উন্নতির জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতেছিলেন—কিসে তাহারা আবার চাকরি পায়, কিসে তাহারা সমাজের কাছে ভাল ব্যবহার পায়, কিসে তাহাদের মধ্যে আবার সাধুভাব ফিরিয়া আসে, তিনি এই চিন্তাতেই সমস্ত সময় কাটাইতেন। ইঁহার সঙ্গে ফ্লরেন্সের আলাপ হওয়ায় দুজনেরই উৎসাহ খুব বাড়িয়া গেল।

ফ্লরেন্স বুঝিলেন যে ইংলণ্ডের হাঁসপাতালগুলির উন্নতি করিতে হইলে, রোগীর সেবার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত লোক চাই। সেবার কাজ মেয়েদের দ্বারাই খুব ভাল রকমে হইবার কথা, সুতরাং তাঁহার মনে এই চিন্তা আসিল যে, একদল মেয়েকে রোগীর শুশ্রূষা বিষয়ে ভাল রকম শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

সে সময়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে এ বিষয়ে কিছু কিছু বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে এমন সব শুশ্রূষাকারিণীর দল ছিল যাঁহারা আবশ্যক মত রোগীর শুশ্রূষা ও যুদ্ধক্ষেত্রে আহতের সেবার জন্য সকল সময়ে প্রস্তুত থাকিতেন। ফ্রান্স দেশে Sisters of Mercy নামে একদল সন্ন্যাসিনী বহুকাল হইতে অতি আশ্চর্য্যরূপে এই কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। জার্ম্মাণীতেও শুশ্রূষাশিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত ছিল। মিসেস্ ফ্রাইয়ের সঙ্গে ফ্লরেন্স্ পরামর্শ

যুদ্ধক্ষেত্রে আহতের সেবা করিতে গিয়া ফরাসী শুশ্রূষাকারিণীর মৃত্যু।

করিলেন, "একবার ঐ সকল দেশ ঘুরিয়া এই বিষয়ে কিছু শিক্ষা করিয়া আসি"। যেমন কথা তেমনি কাজ; ফ্লরেন্স পরম উৎসাহে বিদেশে গিয়া এই শিক্ষায় লাগিয়া রহিলেন। সেখানে তাঁহার বুদ্ধি উৎসাহ ও সেবার আগ্রহ দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল! তিনি ছয় মাসের মধ্যে রীতিমত পরীক্ষা পাস করিয়া এবং সকল বিষয়ে আশ্চর্য্য সফলতা দেখাইয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু এত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শরীর এমন ভাঙ্গিয়া পড়িল যে তাঁহার কাজ আরম্ভ করিতে আরও বছরখানেক দেরী হইয়া গেল। সুস্থ হইয়াই তিনি চারিদিকে হাঁসপাতাল আতুরাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের মধ্যে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর।

ইহার কিছুদিন পরেই ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের লড়াই বাধিয়া গেল! ইংরাজেরা সে সময়ে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাড়াতাড়ি কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হইল। তাহাদের চিকিৎসার জন্য বা আহতের সেবার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করিবার সময় হইল না। ইহার ফল এই হইল যে, চারিদিকে অসম্ভব রকম বেবন্দোবস্ত দেখা দিল; এমন কি রুগ্ন ও আহত সৈন্যগণ হাঁসপাতালে গিয়া ঔষধ পথ্য ও চিকিৎসার অভাবে দলে দলে মরিতে লাগিল। সে সময়ের অবস্থা এমন ভয়ানক হইয়াছিল যে যুদ্ধে যত লোক মারা পড়ে তাহার সাত গুণ লোকে হাঁসপাতালে প্রাণ হারায়!

এই সকল কথা ইংলণ্ডে পৌঁছিলে পর লোকে শিহরিয়া উঠিল। "কি করা যায়, কিরূপে এ অবস্থা দূর হয়" এই ভাবনায় সকলে অস্থির হইয়া পড়িল। তখন ইংলণ্ডের যুদ্ধমন্ত্রী নিজে ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলকে লিখিলেন, "আপনি এই কাজের ভার লইতে পারেন কি?" এমন ডাক শুনিয়াও কি ফ্লরেন্স্ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া ৩৪ জন শুশ্রূষাকারিণী (nurse) সঙ্গে যুদ্ধস্থানে চলিলেন। শুনিয়া দেশশুদ্ধ লোকে আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আর ভয় নাই।"

"মিস্ নাইটিঙ্গেলের দল" যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌঁছিয়া দেখিলেন কাজ বড় সহজ নয়। ছোট্ট একটি হাঁসপাতাল, তাহার মধ্যে চার হাজার লোক ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া শুইয়া আছে! অধিকাংশই জ্বর ও আমাশায়ে ভুগিতেছে—আহতের সংখ্যা খুবই কম। ঔষধের কোন ব্যবস্থা নাই—পথ্যাপথ্যের বিচার নাই—যাহার ভাগ্যে যাহা জুটিতেছে সে তাহাই খাইতেছে! তার উপর হাঁসপাতালের বিছানাপত্র সমস্ত এমন ময়লা ও দুর্গন্ধ যে সুস্থ

লোকেও সেখানে অসুস্থ হইয়া পড়ে। শুশ্রূষাকারিণীর দল প্রথমে নিজেরা হাঁস-পাতাল ধুইয়া সাফ করিলেন; তারপর প্রত্যেকটি বিছানা মাদুর চাদর পরিষ্কার করিয়া কাচিলেন। কে কি খাইবে, কাহার কি ঔষধ চাই, এ সমস্তের ব্যবস্থা করিলেন। মিস্ নাইটিঙ্গেল নিজে রান্নাঘরের সমস্ত গুছাইয়া পথ্যের বন্দোবস্ত করিলেন। দেখিতে দেখিতে হাঁসপাতালের চেহারা ফিরিয়া গেল। চারিদিক ঝরঝরে পরিষ্কার। ক্রমে হতাশ রোগীদের মুখে প্রফুল্লতা দেখা দিল—চারিদিকে সকলের উৎসাহ জাগিয়া উঠিল—সকলে বলিল, "মিস্ নাইটিঙ্গেল নিজে সব ভার লইয়াছেন, আর ভয় নাই।" যেখানে অর্দ্ধেকের বেশী লোক বিনা চিকিৎসায় মরিতেছিল, সেখানে এখন শতকরা ৯৮ জন প্রাণে বাঁচিয়া মিস্ নাইটিঙ্গেলের জয়জয়-কার করিতে লাগিল। তাঁহার আর বিশ্রাম নাই সকলের

খবর লইতেছেন, সকলের কাছে কত কথা বলিতেছেন—কতজনকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য কত গল্প করিতেছেন—কতজন লিখিতে পারে না, তিনি তাহাদের চিঠি লিখিয়া দিতেছেন! সাধে কি তাহারা বলিত, "ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল স্বর্গের দেবী, তাঁর ছায়া লাগিলে মানুষ পবিত্র হয়!"

তারপর যখন যুদ্ধ শেষ হইল, সকলে দেশে ফিরিল—তখন ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের সম্মানের জন্য বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল। তিনি সে সমস্ত এড়াইয়া ভগ্ন শরীরে চুপচাপ লুকাইয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু লোকে তাহা শুনিবে কেন? তাহারা তাঁহার

জন্য মনুমেণ্ট তুলিয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠাইয়া, তাঁহার নামে শুশ্রূষা শিক্ষার আয়োজন করিয়া, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাইয়াছে; রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া তাঁহার কাছে মাথা নত করিয়াছে; দেশ বিদেশ হইতে কত রকমের সম্মান তাঁহার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া বার বার তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যে কাজ করিলে তাহার আর তুলনা হয় না।" ইহার পরেও মিস্ নাইটিঙ্গেল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই অসংখ্য প্রকার সেবার কাজে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। এখন এই যে ইউরোপের যুদ্ধে এত "রেড্ ক্রস্", "এম্বুলেন্স্" প্রভৃতির নাম শোন, আহতের সেবার জন্য এত চেষ্টা, এত আয়োজন দেখ, বলিতে গেলে এ সমস্তেরই মূলে ফ্লরেন্স্ নাইটিঙ্গেল।

সির্বালা।

(৯ বৎসরের বালকের লিখিত)

আমাদের একজন ধরম ভাই আছেন, তাঁকে ভাইজি বলি। তাঁর বিয়েতে আমি মজা করে সির্বালা (নীতবর) হয়ে গেলুম।

অমৃতসরের এক বড় দোকানদারের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে। বিয়ের দুদিন আগে এক পণ্ডিত আর একটি স্ত্রীলোক এলেন, 'গান্না' (গ্রন্থিবন্ধন) হবে। মা বাঁয়ের দিকে বসলেন, আর পিতাজি ডান দিকে বসলেন। একধারে বড়দাদা, ছোটদাদা ও আমি, আর একধারে আমার ক্রিকেট টিমের (Dipak's Own Team) বন্ধুরা বসে পড়ল, তাদের নাম প্রতাপ, হরবংশ বল্লি আর কর্ত্তার।

বড়দাদা ছোটদাদা ও আমাকে সবাই দেখ্‌তে লাগ্‌ল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট কে। দেখতে দেখতে আমিই ছোট বের হলুম। পিতাজি বল্লেন আমি ছোট, আমাকেই সির্ব্বালা করা ঠিক হবে। সবাই বলে উঠ্‌ল—"এ-ই ঠিক হবে, এ-ই ঠিক হবে।" আমি আর আহ্লাদ রাখতে পারছিলুম না। প্রতাপ আর কর্ত্তারের দিকে চেয়ে হাসি আসছিল।

আমাকে আর ভাইজিকে একসঙ্গে আসনে বসান হল। আর মা বাবা আমাদের মুখে মিষ্টি দিলেন। ভাইজি ও মায়ের হাতে হল্‌দে সুতো বাঁধা হলে, আমি উঠে

থালায় যে মিষ্টি বেঁচেছিল আমার বন্ধুদের খাওয়ালুম। মাকে জিজ্ঞেস করলুম, "এরা আমাদের সঙ্গে জঞ্জে (বরবাত্রীতে) যাবে না মা? এদের নেমন্তন্ন করি?"

মা বল্লেন, "ইস্কুল কামাই করে কি রকম করে যাবে?" আমি বল্লুম, "টাইড্‌ম্যান সাহেবকে আর্জ্জি দিও।" মা বল্লেন, "তোমার ছুটীর জন্য আর্জ্জি আমি দিতে পারি, পরের ছেলের জন্য ত দিতে পারি নে।"

"আচ্ছা ওরা আপনিই ছুটী করে নেবে।"

মা বল্লেন, "তা যদি হয়, শুধু বল্লি যাক্। বেচারা নিতান্ত গরিবের ছেলে, দিন কতক বিয়ে বাড়ীতে ভাল করে খেয়ে দেয়ে আসুক।" কিন্তু পিতাজি নামঞ্জুর করলেন। বল্লেন, "বরযাত্রীর খুব ভাল সাজগুজ, বিছানা পত্র চাই, বল্লির পোষাবে না।" বল্লির ভাই লড়াইয়ে গেছে, বাপ টঙ্গা চালায়।

২

আমার সির্ব্বালার পোষাক নেই। তার পরদিনই ভাইজি আমায় বাজারে নিয়ে গেলেন। লোহারী দরজার ভিতর একজন দর্জ্জি আমার মাপ নিলে। দুঘণ্টার মধ্যে আমার সিল্‌ওয়ার (ঘেরদার পায়জামা) তৈরি হয়ে গেল। মলমল কিনে দাদা রলারীর দোকানে রঙাতে দিলেন, আমার পাগড়ীও কোমর বন্ধ হল। ডব্বিবাজারে গিয়ে নূতন জড়ির জুতো কেনা হয়ে গেল। বাড়ী ফির্‌তে দুটো বাজল। মা ভাইজির উপর একটু বিরক্ত হলেন। বল্লেন, "রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে আর ক্ষিদেতে বেচারার মুখ শুকিয়ে গেছে।"

আমি বল্লুম, "না মা, তুমি জান না! আমি বেশী ত ঘুরিনি, পা ত ব্যথা কর্‌ছেনা। আর ক্ষিদে মোটেই পায় নি।"

মা বল্লেন, "বাজারে যা তা খেয়েছিস বুঝি?"

"যা-তা নয় মা, খুব ভাল ভাল জিনিষ খেয়েছি। প্রথমে আনারকলিতে কেশরীর দোকানে দুবোতল লেমনেড, তারপর সহরের ভিতরে গিয়ে চার পাঁচটা পুরী, হালুয়া, নূতন আমের আচার, খাট্টা, আলু কচালু, দুটো পেড়া আর একটা মস্ত বড় আম।"

মা বল্লেন, "সর্ব্বনাশ! এখন একটু শুয়ে থাক্‌বে চল"। "না মা সোনা! আজ আমার শোবার ফুরসুৎ নেই। অনেক কাজ আছে। বন্ধুরা আমায় সাবধান করে দিয়েছে সঙ্গে যেন ছুঁচ আর ঢের জিনিষ রাখি। সির্ব্বালাকে কনের বাড়ীর মেয়েরা

মারতে আসে, তখন আমায় ছুঁচ ভোঁকাতে হবে। ভাইজি আমায় ছুঁচ টুঁচ কিনে দেন নি, সে সব এখন যোগাড় করে রাখতে হবে।"

মা কেন হাস্‌তে লাগলেন জানিনে।

৩

তার পরদিন ভোরে প্রতাপ আর হরিবংশ এসে মাকে বল্লে, "শুনেছি জঞ্জে যেতে হবে আমাদের?" তারা হাতে রেশমি কোট এনেছিল।

মা বল্লেন, "এবার থাক আর কোন বার যেও।"

১০টার মধ্যে মেলাই বিছানা ও ট্রঙ্ক নিয়ে আমরা ছাপাখানায় গেলুম। ভাইজি রাত্রে ছাপাখানায় শোন। সেখানে জঞ্জীরা (বরযাত্রী) সব অপেক্ষা করছে। সেখান থেকে সবাই একসঙ্গে ষ্টেশনে গিয়ে রেলে চড়্‌ল।

আমি একটা খাকী সুট পরেছিলুম, ভাইজিও সাদাসিদে পাজামা কোট আর পাগড়ী পরেছিলেন। আমাদের দেখলে কেউ চিনতে পারবে না আমি সির্বালা আর ভাইজি বর।

দুঘণ্টায় আমরা অমৃতসরে পৌঁছলুম। ষ্টেশনে দেখলুম ২০।২৫ খানা জুড়ি গাড়ী আমাদের জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি ও ভাইজি এক গাড়ীতে উঠলুম, সেখানা সব চেয়ে ভাল। আর দেখলুম কি রেলওয়ে পুলের ওপারে ব্যাণ্ডের বাজনা দাঁড়িয়ে আছে। যখন ওপারে পৌঁছলুম গাড়ীগুলো একটু থেমে গেল, আর থেমে যাবার পর বাজনা আরম্ভ হল। ব্যাণ্ড বাজতে বাজতে গাড়ী আস্তে আস্তে চলতে লাগল। অমৃতসরের বাজারে ঘুরে ঘুরে আমরা লালকুঠিতে পৌঁছলুম। ভাইজি বল্লেন যারা জাঁকজমক করে বিয়ে করতে আসে তারা এই বাড়ীতে ওঠে। বাড়ীটা খুব ভাল, আর এক বিয়ের দল ঐ বাড়ীতে ছিল।

দুঘণ্টা বিশ্রাম করে আমরা কাপড় ছাড়লুম। তখন আমাকে সির্বালা ও ভাইজিকে বর বোধ হতে লাগল। আমার কমলানেবু রঙের লাল পাগড়ী, লাল কোমরবন্দ, লাল কিংখাবের আচকান, সাদা সিল্‌ওয়ার আর সোণালী জড়ির জুতো; ভাইজির সাদা কোট, সাদা সিল্‌ওয়ার, কেসরী রঙের পাগড়ী, কেসরী রঙের কোমরবন্দ ও রূপলী জড়ির জুতো। আমাদের দুজনের মাথায় পাগড়ীর উপর ফুলের মুকুট, তার ফুলের ঝালড়ে চোখ ঢেকে পড়ছে।

এবার 'ঘোড়িচড়া' হল। আমি ও ভাইজি এক ঘোড়ায় বসলুম, ভাইজি সামনে, আমি পিছনে। খুব জোরে জোরে বাজনা বাজতে লাগল। আমরা বাজারে ঘুরে ঘুরে কনের বাড়ী পৌঁছলুম।

সেখানে পৌঁছতেই এক পাল ছোট ছোট মেয়ে ফুলের ছড়ি হাতে নিয়ে আমায় মারতে এল। ভাইজি এক হাতে ছড়ি আটকে ফেল্লেন, আমায় কেউ মারতে পারলে না। নয়ত মুস্কিল হত, আমি ছুঁচ আনতে ভুলে গিয়েছিলুম, তাদের ভোঁকাতে পারতাম না, হেরে যেতুম।

ভাইজিকে ছেড়ে আমরা বাড়ী চলে এলুম। আমাদের জন্যে লালকুঠিতে খাবার এল।

৪

তার পরদিন সকালে আমরা দরবার সাহেবে স্নান করে কনের বাড়ী মিঠাই খেতে গেলুম। গিয়ে শুনি ভাইজির বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে কেমন করে হয় দেখলুম না। ভাইজি আমাদের সঙ্গে লালকুটিতে ফিরে এলেন। দুপুর বেলা আমরা সবাই সেখানে খেতে গেলুম। ভাইজি রইলেন, আমরা খেয়ে ফিরে এলুম। বিকালে ছোটরা আবার মিষ্টি খেতে গেল। সন্ধ্যেবেলা বড় ছোট সবাই খেতে গেলেন। কনের বাড়ীর লোকেরা সবাইকে যেমন বসাল তেমনি বসলুম। পিতাজি একদিকে বসলেন আর আমরা একদিকে। পিতাজির পিছনে একটা দরজা ছিল। একবার অনেক মেয়েরা ছুটে এল। পিতাজি তখনি দেখে ফেল্লেন, আর ওরা পালিয়ে গেল। আর একবার তারা চুরি চুরি এসে পিতাজির কোট তাঁর পিছনে দেওয়ালে ঝোলা ফুলকারির সঙ্গে সেলাই করে দিয়ে গেল। কেউ দেখতে পায়নি। যখন পিতাজি উঠতে গেলেন, উঠতে পারলেন না। তখন সব লোকেরা হাসতে লাগল।

তৃতীয় দিন সকালে কাকা বল্লেন, "চল, আমরা কজন আগে যাই, বৌকে নিয়ে বর আর জনকতক লোক সন্ধ্যের গাড়ীতে আস্‌বে।"

ছোটদাদার ইস্কুল কামাই হচ্ছে বলে ছোটদাদাকে কাকা সঙ্গে আনতে চাইলেন। কিন্তু সেই সময় ছোটদাদা কোথায় সরে পড়্‌ল, তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। রাত্রিবেলা বৌদিদিদের সঙ্গে সে এল। আমি কাকার সঙ্গে ফিরলাম।

ছোটদাদা এসে মাকে গল্প করলে আমার উপর খুব গাল পড়েছিল। কিন্তু মোটেই না। আমরা যখন খেতে বস্‌তুম জঞ্জীদের সবায়ের নাম ধরে ধরে মেয়েরা গালির ছড়া গাইত। সির্বালার উপর ছড়া গেয়েছিল, কিন্তু আমার নামটি কেউ টের পায়নি।

দীপক।

রামের শঙ্খ।

গরীব চাষা বেচারার বড় দুরবস্থা। সেবার তার ক্ষেতের শস্য এতই কম হয়েছে যে তার দু'বেলা পেট ভ'রে খাওয়াই জোটে না। তার ভাঙা কুঁড়ের পাশেই এক দুষ্টু লোকের বাড়ী; সে অনেক গরীব লোককে ফাঁকি দিয়ে দেদার টাকা আর মস্ত দালান করেছে।

চাষা সেই লোকটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কি ক'রে টাকা জমায় বল্‌তে পার কি?" দুষ্টু লোকটা ভালমানুষের মত মুখ ক'রে বল্‌ল, "রামনাম জপ কর টাকা তিনিই দেবেন।"

চাষা বেচারা ভাল মানুষ, সে তো তখন থেকে কেবলই দিন রাত "রাম-রাম-রাম-রাম" বলে। কিন্তু টাকা আর আসে না। শেষটায় ঘরে আর এক মুঠোও চাল রইল না। তখন বেচারা বড়ই মুস্কিলে পড়্‌ল। না খেয়ে খেয়ে তার গলার জোর চলে গেছে—রাম নাম কর্‌তে পারে না। অথচ টাকা না হ'লেও চলে না—রাম-নাম ছাড়্‌বারও জো নাই। বেচারা চিঁ চিঁ ক'রে নাম জপ করছে এমন সময় একজন রোগা টিংটিঙে লোক এসে একটা শঙ্খ দিয়ে চাষাকে বল্‌ল, "এই শঙ্খটা নাও। দশবার রাম-নাম ক'রে পূব মুখো হয়ে এই শঙ্খে তিনবার ফুঁ দিয়ে যা' চাইবে তাই পাবে।" এই ব'লেই সে চ'লে গেল।

চাষা তো তখনই দশবার রাম নাম ক'রে, পূবমুখো হয়ে শঙ্খে তিনবার ফুঁ দিয়েই বল্‌ল, "পোলাও, মাংস, তরকারী, পায়েস, মিঠাই এই সব চাই।"—অমনি থালা ভরা সুন্দর সুন্দর খাবার এসে হাজির!—বেচারা তখন পেট ভ'রে খেয়ে বাঁচ্‌ল। তার পরের দিন যখন সেই দুষ্টু লোকটার সঙ্গে চাষার দেখা হ'ল, তখন সে চাষাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কি ভাই, তোমার আজ এত ফূর্ত্তি কেন? রাম-নাম করে বুঝি মেলাই টাকা পেয়েছ?"

চাষা বেচারা ভাল মানুষ সে সব কথা তাকে খুলে বল্‌ল; কেবল শঙ্খটা কি ক'রে বাজাতে হয় তা' বল্ল না। দুষ্টু লোকটার বড় হিংসা হ'ল। সে রোজই শঙ্খটার লোভে চাষার বাড়ী যাওয়া আসা কর্‌তে লাগ্‌ল, আর একদিন সুবিধা বুঝে সেটাকে চুরি কর্‌ল। কিন্তু সেটা চুরি করেও তার কোন লাভ হল না। বাড়ী গিয়ে সেটাকে সে কত রকম করে বাজাতে লাগ্‌ল আর নানান জিনিষ চাইতে লাগ্‌ল, কিন্তু কিছুই পেল না। শেষটায় খুব জব্দ হয়ে সে চাষার কাছে ছুটে গেল, আর বল্ল

"তোমার শঙ্খটা আমি চুরি করেছি। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর যে ভবিষ্যতে তুমি শঙ্খের কাছ থেকে যা কিছু জিনিষ নেবে তার দ্বিগুণ জিনিষ আমাকে দেবে, তবে তোমাকে সেটা ফিরিয়ে দেবো।" চাষা বেচারা আর কি করে? নাই মামার চেয়েও তো কানা মামা ভাল; তাই সে দুষ্টু লোকটার কথায়ই রাজি হ'লো। তখন থেকে শঙ্খের কাছে সে যা কিছু জিনিষ পায়, দুষ্টু লোকটা তার দ্বিগুণ জিনিষ পায়।

শেষটায় একবার সে দেশে ভয়ানক গরম পড়ল; বৃষ্টি বন্ধ হ'ল, আর নদী, পুকুর কূয়ো সব শুকিয়ে গেল। তখন চাষা শঙ্খের কাছে একটা জলভরা কূয়ো চাইল। অমনি তার বাড়ীতে একটা সুন্দর ঠাণ্ডা জলের কূয়ো হ'ল, আর সেই দুষ্টু লোকটার বাড়ীতে দুটো সুন্দর কূয়ো হ'ল।

চাষার এত হিংসা হ'ল যে তার আর রাত্রে ঘুমই হ'ল না। সে কেবল ভাব্‌তে লাগ্‌ল কি ক'রে দুষ্টু লোকটাকে জব্দ কর্‌বে। ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার মাথায় একটা বুদ্ধি জোগা'ল। সে শঙ্খের কাছে চাইল, "আমার একটা চোক কানা ক'রে দাও!"

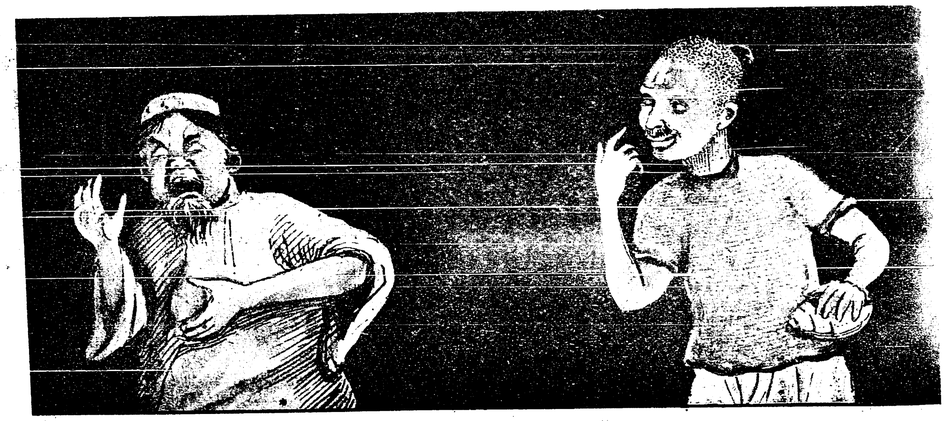

অমনি তার একটা চোখ কানা হয়ে গেল, আর সেই দুষ্টু লোকটা একেবারে অন্ধ হয়ে গেল। অন্ধ হয়ে যাই সে ঘর থেকে বেরুবে, অমনি সেই দুটো কূয়োর একটার মধ্যে পড়ে গেল, আর হাবুডুবু খেয়ে ডুবে মর্‌ল।

এক হল দুই।

এক ছিলেন রাজা—মস্ত বড় রাজা! যেমন ছিল লম্বা চওড়া তাঁর দেহ, তেম্‌নি ছিল লম্বা চওড়া তাঁর রাজ্য, আর তেম্‌নি প্রচণ্ড ছিল তাঁর রাগ।

তাঁর ছিল একটী পরমাসুন্দরী মেয়ে আর ছিল চমৎকার মীনাকরা সোণার তারের বাটী। বাটীটা লক্ষ্মী ঠাকরুণের পায়ের তলার দলমেলা পদ্মফুলের মত দেখ্‌তে। রাজা সেটাকে একটা পুরু মখ্‌মলের গদির উপর বসিয়ে রাজসভার যে প্রকাণ্ড ঘর তার মাঝখানে রেখে দিয়েছিলেন। যে আস্‌ত সেই সে বাটীটা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত।

একদিন অনেক দূরের এক দেশের রাজার কাছে থেকে এই রাগী রাজার কাছে এক দূত এল। দূত বাটীটা দেখে মুগ্ধ ত হ'লই না বরং উল্‌টিয়ে বল্ল, "ওমা! সবেমাত্র একটা বাটী! তাও আবার এমনি করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে! আরে ছিঃ! আমাদের রাজার ত ঐ রকম দুটো বাটী আছে। দুটো পাশা পাশি না রাখ্‌লে কি মানায়।"

রাজামশাই ত শুনে ভয়ানক চটে গেলেন। তিনি চীৎকার করে বলে উঠ্‌লেন, "কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা! দুটো বাটী? তা কিছুতেই হ'তে পারে না। দূত, তুমি মিথ্যে কথা বল্‌ছ!"

দূত হাত যোড় করে বল্ল, "আজ্ঞে না; আমি সত্যি কথাই বল্‌ছি; আমাদের রাজা মশায়ের এরকম দুটো বাটী আছে।"

রাজা কিন্তু তবুও জেদ করে বল্লেন, "তবে সে বাটী কখ্‌খনো এ বাটীর মত দেখ্‌তে নয়।"

দূত বল্ল, "আজ্ঞে হাঁ, ঠিক এই বাটীর মতই দেখ্‌তে।" তখন রাজা ভয়ঙ্কর রেগে মন্ত্রীকে বল্লেন, "মন্ত্রি, এখ্‌খুনি এই লোকটার রাজার বাড়ী লোক পাঠিয়ে খবর নাও যে সত্যি সত্যি সেখানে এরকম দুটো বাটী আছে কি না।"

লোকেরা গিয়ে ফিরে এসে বল্ল, "হাঁ, মহারাজ এরকম দুটো বাটীই আছে।"

তখন রাজামশাই বল্লেন, "যেমন করে হোক আমাকে আর একটা বাটী এনে দিতেই হবে। যে আমাকে এরকম বাটী আরেকটা দিতে পার্ব্বে, তাকে আমি রাজকন্যার সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজত্ব দেব।"

কেউ কিন্তু আরেকটা বাটী এনে দিতে পার্‌ল না। সেক্‌রারা ওরকম বাটী আর গড়্‌তেও পার্‌ল না। রাজা খুব চট্‌তেই লাগ্‌লেন, কিন্তু কিছু ফল হ'ল না।

শেষে একদিন এক রাজপুত্র রাজার কাছে এসে বল্লেন, "মশাই, আমি যদি আপনাকে দেখাতে পারি যে আপনার দুটো বাটী আছে, তা হ'লে আপনার মেয়েকে আমায় দেবেন ত ?"

রাজা বল্লেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই।"

রাজপুত্র তখন বল্লেন, "তা হলে আপনার লোকজন ডাকুন, আমি সকলের সাম্‌নে প্রমাণ করে দিচ্ছি যে একটা বাটী থাক্‌লেই দুটো বাটী থাকা হ'ল।"

রাজা রাজ্যের সমস্ত বড় বড় লোকদের ডেকে পাঠালেন। যত আমীর, ওম্‌রাহ উজীর, নাজীর এসে উপস্থিত হ'ল। রাজপুত্র বল্লেন, "একটা বোর্ড চাই, আমি অঙ্ক কষে প্রমাণ করে দেবো।"

অম্‌নি "হাঁই" "হুঁই" কর্‌তে কর্‌তে চারজন লোক প্রকাণ্ড এক বোর্ড নিয়ে উপস্থিত।

রাজপুত্র খড়ি দিয়ে লিখ্‌লেন "ক = গ"। তারপর বল্লেন, "মনে করুন 'ক' 'গ' এর সমান। অঙ্ক-শাস্ত্রে ত এ রকম লেখে ?"

রাজামশাই আর সভাপণ্ডিতেরা ঘাড় নেড়ে বল্লেন "হুঁ"। রাজপুত্র অঙ্ক কষ্‌তে লাগ্‌লেন আর বল্‌তে লাগ্‌লেন, "যদি ক, গ এর সমান হয়, তা হ'লে কগ নিশ্চয়ই গগ ($গ^২$) এর সমান হবে।"

'কগ = গগ'

লোকেরা বল্লে "হুঁ"।

রাজপুত্র বল্লেন, "এখন কগ আর গগ দুই থেকে কক বাদ দেওয়া যাক্‌। তা হ'লে হ'ল

'কগ − কক = গগ − কক' অর্থাৎ $গ^২ - ক^২$'

কেমন হ'ল ত ?"

পণ্ডিতেরা বল্লেন, "হাঁ, হয় বৈ কি।" আর সবাই অবাক হয়ে চেয়ে রৈল।

রাজপুত্র বল্লেন, "তারি মানে হ'ল

'ক (গ − ক) = (গ + ক) (গ − ক)'

তাই ত ?"

সকলে হাঁ করে বসে রৈল, শুধু পণ্ডিতেরা বল্লেন "হাঁ"।

রাজপুত্র বল্লেন, "তারই মানে—

'ক = গ + ক'

কেমন নয় কি ? আবার তার থেকেই হ'ল,

'ক = ক + ক'

অর্থাৎ কি না

'১ক = ২ক'

অর্থাৎ কি না এক হ'ল দুই এর সমান। এই দেখুন আমার অঙ্ক—

ক = গ

∴ কগ = গগ

∴ কগ − কক = গগ − কক

∴ ক (গ − ক) = (গ + ক) (গ − ক)

∴ ক = গ + ক = ক + ক

অর্থাৎ ক = ২ক

অর্থাৎ ১ = ২"

পণ্ডিতেরা খুব খুসী হয়ে বলে উঠ্‌লেন, "হাঁ হাঁ, তা'ত ঠিকই, তা'ত ঠিকই। আরে এত জলের মত সোজা।"

সভাশুদ্ধ লোকেরাও চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল, "হাঁ, এত জলের মতই সোজা।"

রাজামশাই ত মহা আনন্দে ঘাড় নাড়্‌তে লাগ্‌লেন। রাজপুত্র তখন বল্লেন, "তা হ'লে একটা বাটী থাকাও যা দুটো বাটী থাকাও ত তাই।"

সকলে বল্লেন "হাঁ, তাই।"

তখন রাজপুত্র, রাগী রাজার অর্দ্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা পুরস্কার চাইলেন—আর পেলেনও।*

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

---

* সন্দেশের পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা বীজগণিত (Algebra) পড়েছেন, তাঁদের কাছে রাজপুত্রের অঙ্কটা বোঝা শক্ত হবে না। ইংরাজিতে লিখতে গেলে অঙ্কটা লিখতে হবে—

$a=b$; $\therefore ab=b^2$; $\therefore ab-a^2=b^2-a^2$; or, $a(b-a)=(b+a)(b-a)$

$\therefore a=b+a=2a.$

সূর্য্যের কথা।

সূর্য্যটা একটা গোল আগুনের পিণ্ড, এ কথা আমরা সকলেই জানি। গোল, সেটা চোখেই দেখতে পারি—আর 'আগুন' কিনা তা একটিবার দুপুর রোদে দাঁড়ালেই আর বুঝতে দেরী লাগে না। পণ্ডিতেরা বলেন এই পৃথিবীটার মত তের লক্ষ পিণ্ডের তাল পাকালে তবে ওই সূর্য্যটার সমান বড় হয়। তাঁরা কেমন ক'রে জানলেন? যাঁরা জরীপ করেন তাঁরা জানেন খুব দূরের জিনিষকে নানারকমে পরখ্ ক'রে এমন হিসাব পাওয়া যায় যা থেকে, চট্ ক'রে বলা যায় যে জিনিষটা কতখানি দূরে! এই কৌশলটি পণ্ডিতেরা সূর্য্যের উপর খাটিয়েছেন। পৃথিবীর দুই জায়গায় দুই জন লোক ব'সে সূর্য্যটাকে খুব সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, কোন্ সময়ে সেটাকে আকাশের ঠিক কোন্ জায়গায় দেখা যায়—এবং দুজনের হিসাব মিলিয়ে অঙ্ক কষে বলেছেন যে সূর্য্যটা এখান থেকে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে! সে যে কতদূর তা আমাদের কল্পনাতেই আসে না। একটা এঞ্জিন যদি ঘণ্টায় ৬০ মাইল ক'রে ক্রমাগত ছুটে আজ সূর্য্যের দিকে রোয়ানা হয় সে ১৭৭ বছর পরে (২০৯৩ খৃষ্টাব্দে) সূর্য্যে গিয়ে পৌঁছাবে। পণ্ডিতেরা এই সকল মাপ নিয়ে বল্‌ছেন যে ঐ সূর্য্যের পাশে পৃথিবীটাকে বসালে সেটা দেখাবে যেন একটি তরমুজের পাশে একটি মুসুরির ডাল।

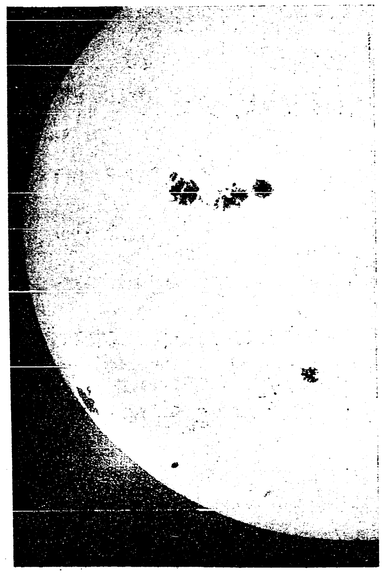

সূর্য্যের গায়ে ফোস্কা

সূর্য্যটা কিসের তৈরী? সূর্য্যের আলোক পরীক্ষা ক'রে পণ্ডিতেরা বলেন যে পৃথিবীটা যা দিয়ে তৈরী সূর্য্যটাও ঠিক তাই দিয়েই তৈরী। তবে সেই সব মাল মসলা জমে এখানে যেমন জল মাটি পাথর হ'য়েছে সেখানে তা হবার যো নেই—কারণ সেখানকার সর্ব্বনেশে গরমে সব জিনিষ সত্যসত্যই আগুন হ'য়ে ওঠে। লোহা শুধু গ'লে যায় তা

নয়, ফুটন্ত জলের মত টগবগ ক'রে বাষ্প হ'য়ে উড়ে যায়। এই ফুটন্ত আগুন আর জ্বলন্ত বাষ্প সূর্য্যের চারিদিক ঘিরে লক্‌লক্ করতে থাকে। শুধুচোখে মনে হয় সূর্য্যটা বেশ একটি মোলায়েম গোল জিনিষ, তার গায়ে কোথাও আঁচড়ের দাগটি পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু আসলে তা নয়। ভাল দূরবীণ দিয়ে দেখ্‌লে বোঝা যায় যে তার সমস্ত গা ভ'রে আগুনের চিক্‌মিকি খেল্‌ছে—আগুনের সমুদ্রে আগুনের ঢেউ, তার মধ্যে বড় বড় আগুনের ডেলা পাগলের মত ডুবছে আর ভাসছে।

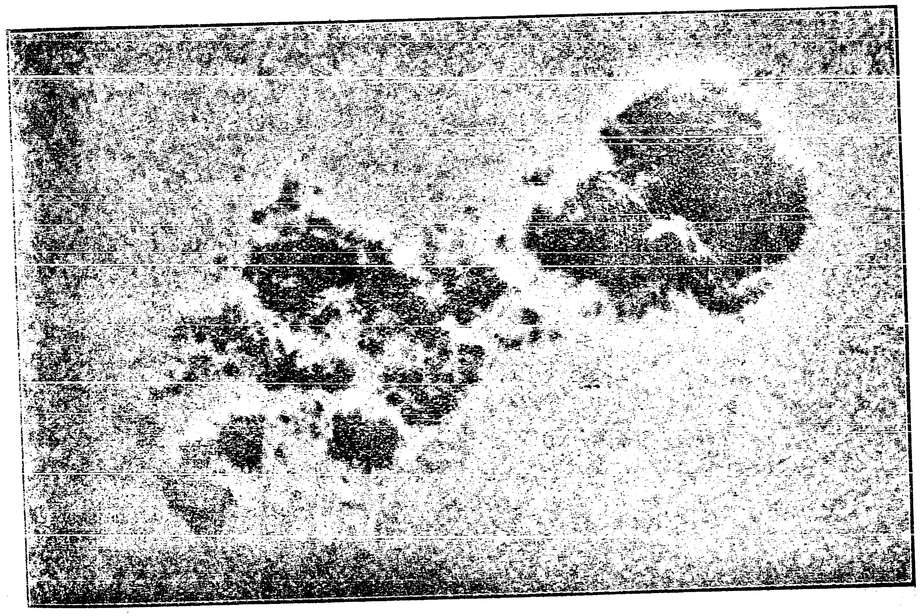

তা' ছাড়া, সূর্য্যের গায়ে প্রায়ই ছোট বড় ফোস্কা দেখা যায়—ফোস্কাগুলি তত উজ্জ্বল নয়, তাই দেখ্‌তে হঠাৎ কালো দেখায়। জলের মধ্যে যেমন বুদ্‌বুদ ওঠে, সূর্য্যের গায়ে তেমনি আগুনের ফোস্কা ওঠে আর ফেটে পড়ে। এক একটি বুদ্‌বুদ মাঝে মাঝে এত বড় হয়, যে কালো কাঁচ দিয়ে দেখ্‌লে সেগুলোকে শুধু চোখেই দেখ্‌তে পার। ঐ রকম এক একটা বুদ্‌বুদের মধ্যে ইচ্ছা কর্‌লে দু দশটা পৃথিবীকে

স্বচ্ছন্দে পুরে রাখা যায়। ঐ ফোস্কাগুলি এক একটি আগুনের ঘূর্ণীচক্র, তার চারিদিকে দমকা আগুন ঠেলে উঠছে।

সূর্য্যের তেজ এত বেশী যে তার চারিদিকে যে আগুনের শিখা ঝড়ের মত উঠ্‌ছে আর পড়্‌ছে, সেগুলি আমরা দেখতেই পাই না। সূর্য্যের যখন পূর্ণ গ্রহণ হয়, চাঁদটা মাঝে প'ড়ে তার চক্‌চকে শরীরটিকে আড়াল ক'রে ফেলে, তখন তাদের চেহারা দেখা যায়, আগুনের লকলকে জিভের মত। শিখাগুলি হাজার হাজার মাইল জুড়ে দপ্ দপ্ করে জ্বলতে থাকে, কখন আগুনের ঝাপটা দিয়ে মিনিটে ছয় হাজার মাইল ছুটে যায়, কখন শান্ত মেঘের মত সূর্য্যের গায়ে গায়ে ভেসে বেড়ায়। এক একটাকে দেখে মনে হয় যেন আগুনের ফোয়ারা উঠছে! তার মধ্যে যদি আমাদের এই পৃথিবীটিকে ছেড়ে দেও, এটি চক্ষের নিমিষে গলে বাষ্প হয়ে কোথায় যে মিলিয়ে যাবে, সে আর খুঁজেই পাবে না। সূর্য্যের চারিদিকের এই অগ্নিমেঘের স্তরটিকে দিনের আলোতে দেখবার জন্য পণ্ডিতেরা আশ্চর্য্য রকম উপায় বা'র ক'রেছেন, তার জন্য তাঁদের এখন আর গ্রহণের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না।

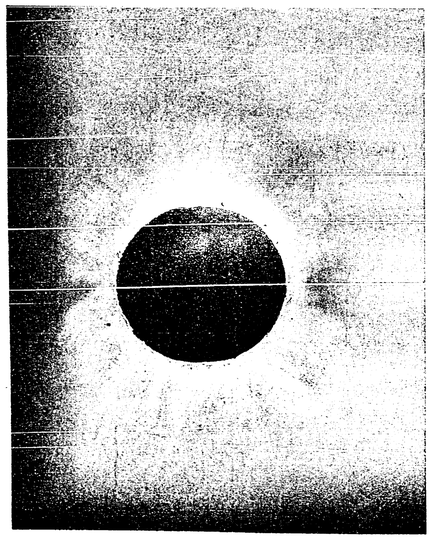

কিন্তু সূর্য্যের চারিদিকে আরেকটি জিনিষ আছে যেটিকে গ্রহণ ছাড়া দেখবার যো নেই—সেটিকে সূর্য্যের কিরীট (Corona) বলা যায়। পৃথিবীর চারিদিকে যেমন বাতাসের আবরণ, সূর্য্যের চারিদিকেও তেমনি বহুদূর পর্য্যন্ত এই কিরীটের ঢাকনি। যাঁরা সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণ দেখেছেন, তাঁরা বলেন এমন আশ্চর্য্য অদ্ভুত দৃশ্য আর কিছু নেই। যখন গ্রহণ সম্পূর্ণ হ'য়ে আস্‌তে থাকে, চাঁদের কালো ছায়া যখন চোখের সামনে পাহাড় সমুদ্র সব গ্রাস ক'রে ফেল্‌তে থাকে, আকাশের অদ্ভুত ফ্যাকাশে রং আর পৃথিবীর অন্ধকার দেখে পশু পাখী পর্য্যন্ত ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়; সেই সময়ে সূর্য্যের তেজ চাপা প'ড়ে তার আশ্চর্য্য কিরীটের শোভা দেখা যায়। শুধু এই কিরীটের সুন্দর স্নিগ্ধ আলো দেখবার জন্যই কত লোকে পয়সা কড়ি

খরচ ক'রে হাজার মাইল পার হ'য়ে গ্রহণ দেখতে যায়। এই কিরীটের চেহারা সব সময়ে এক রকম থাকে না—কখন সেটা চারিদিকে বেশ সমান ভাবে গোল হয়ে থাকে, কখন তার মধ্যে ভয়ানক ঝড় ঝাপটার লক্ষণ দেখা যায়—কখন তা থেকে লম্বা লম্বা ছটা বেরিয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মোটের উপর বলা যায়, যে সময়ে সূর্য্যের গায়ে ফোস্কা বেশী দেখা যায়, সেই সময়ে তার আগুনের শিখাগুলিরও অত্যাচার বাড়ে, আর সেই অত্যাচারে তার কিরীটটিকেও ঘাঁটিয়ে তোলপাড় ক'রে তোলে। আমরা জানি যে পৃথিবীটা ২৪ ঘণ্টায় একবার পাক খায়, তাতেই আমাদের দিনরাত হয়। সূর্য্যটাকে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে সেও ভয়ঙ্কর বেগে লাট্টুর মত ক্রমাগত পাক খাচ্ছে—কিন্তু একটি পাক খেতে তার ছাব্বিশ দিন সময় লাগে।

অনেকের বিশ্বাস এই যে, সূর্য্যটা এক জায়গায় স্থির হ'য়ে বসে আছে—আর পৃথিবী গ্রহ চন্দ্র সবাই মিলে ঘুরতে ঘুরতে তার চারিদিক প্রদক্ষিণ কর্‌ছে। কিন্তু আসলে তা নয়—বিশ্বজগতে কারও স্থির হ'য়ে ব'সে থাকবার হুকুম নাই। আমাদের এই পৃথিবী এবং আর সমস্ত গ্রহকে নিয়ে সূর্য্য ভয়ানক বেগে শূন্যে ছুটে চলেছে। সে কোন্ দিকে কি রকম বেগে চল্‌ছে, তাও পণ্ডিতেরা হিসাব ক'রে ঠিক করেছেন। এই হিসাবে সূর্য্য ঘণ্টায় প্রায় কুড়ি হাজার মাইল পথ ছুটে চলেছে!

শুন্‌লে হঠাৎ হয়ত মনে হ'তে পারে, এমন সাংঘাতিকভাবে চল্‌তে গিয়ে হয়ত কোন্‌দিন কোন্ তারার সঙ্গে তার ঢুঁ লেগে যাবে—কিন্তু সে রকম ভয়ের কোন কারণ নেই। এই সব তারাগুলি এক একটি এত দূরে যে সূর্য্যটা দশলক্ষ বৎসর এই ভাবে ছুটলেও কোন তারার কাছে পৌঁছবার সম্ভাবনা নাই। তোমরা হিসাব ক'রে দেখ—এক ঘণ্টায় যদি ২০০০০ মাইল যাওয়া যায়, তাহ'লে দশ লক্ষ বৎসরে কত মাইল? ২০০০০ × ২৪ × ৩৬৫ × ১০০০০০০! তা হ'লে এক একটি তারা কত খানি দূরে একবার ভাবতে চেষ্টা কর।

সেকালের বাঘ।

সেকালে এমন সব জন্তু ছিল, যা আজকাল আর দেখা যায় না—এ কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। সেকালের চারদাঁতওয়ালা হাতী, ত্রিশ হাত লম্বা কুমীর, বা হাঁসুলি-পরা তিন শিঙা গণ্ডার, এর কোনটাই আজকাল পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে গুহা গহ্বরে পাহাড়ের গায়ে বা বরফের নীচে তাদের কঙ্কালের কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়—তা থেকেই পণ্ডিত লোকে বুঝতে পারেন, যে এক সময়ে এই এই রকম জানোয়ার পৃথিবীতে ছিল। যাঁরা এই সকল জিনিষের চর্চ্চা করেন, তাঁরা সামান্য একটুকরা দাঁত দেখে বল্‌তে পারেন—এটা কি রকম জন্তুর দাঁত, সে আমিষ খায় কি নিরামিষ খায়, ইত্যাদি।

এবার যে জানোয়ারের ছবি দিলাম, ইংরাজিতে তাকে বলে Sabre-toothed Tiger (অর্থাৎ খড়্গদন্ত বাঘ)। নামটি যে খুব ঠিক হয়েছে, তা ছবি দেখেই বুঝতে পারছ। এর কঙ্কাল ইউরোপে আমেরিকায় আমাদের দেশে এবং আরও নানা জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। ওই খড়্গের মত দাঁত দুটিতে তার কি কাজ হ'ত সে কথা বলা বড় শক্ত। অত লম্বা দাঁত দিয়ে কামড়াবার সুবিধা হয় না; তা ছাড়া এই বাঘের চোয়ালের হাড় আজকালকার বাঘের মত মজবুত নয়, সুতরাং তার কামড়ের জোরও কম ছিল। দাঁত দুটি প্রায় ছয় ইঞ্চি ক'রে লম্বা, তার গায়ে ছুরির মত ধার—হয়ত তা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শিকারের

মাংস ছাড়াবার সুবিধা হ'ত। যে জন্তু যে রকম স্থানে যে রকম অবস্থায় বাস করে, সেই অনুসারে তার চেহারা ও গায়ের রং কিছু না কিছু বদলিয়ে আসে। বাঘের গায়ে যে কালো কালো দাগ দেখতে পাও, তাতেই বুঝতে পারা যায় যে ঝোপ জঙ্গলে চলাফিরা তার অভ্যাস আছে—সেখানে বড় বড় ঘাসের ঝোপে যখন বাঘ মশাই লুকিয়ে থাকেন, তখন সেই খাড়া ঘাসের আলো ছায়ার সঙ্গে বাঘের হল্‌দে-কালোর ডোরা গুলি এমনি ভাবে মিশিয়ে যায় যে হঠাৎ দেখ্‌লে বুঝবার যো নেই যে ওখানে ঝোপ ছাড়া আর কিছু আছে। কিন্তু যতদূর বোঝা যায়, তাতে মনে হয় আমাদের খড়্গদন্ত মহাশয় সিংহের মত খোলা জায়গাতেই সাধারণত বাস করতেন—সুতরাং তাঁর গায়ে একালের বাঘের মত দাগ না থাকাই সম্ভব বোধ হয়।

একালের বাঘের চাইতে খড়্গদন্তের মুখখানা অনেকটা লম্বাটে গোছের ছিল। তার লেজটিও সাধারণত একটু বেঁটে হ'ত। শরীরের গড়নটা মোটের উপর আজকাল-কার বাঘেরই মত, কিন্তু একটু ভারি গোছের—বিশেষত সামনের পায়ের দিকটা। সুতরাং তার পক্ষে খুব দৌড়ান বা লাফান, বা চট্‌পট্ হাত পা নাড়া, বড় সহজ ছিল না। নানান্ যুগের নানান্ রকম পাথরে এই বাঘের কঙ্কাল পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় যে এরা বহুকাল ধ'রে পৃথিবীতে নানাদেশে দৌরাত্ম্য করে, তারপর কেন জানিনা একেবার লোপ পেয়েছে।

আবোল তাবোল।

শেখ্‌বার আছে কত, আছে কত দেখ্‌বার
ডাক্তারি কারে কয় দেখে যাও একবার।
কয়েছেন গুরু মোর "শোন শোন বৎস,
কাগজের রোগী কেটে আগে কর মক্‌স!"
উৎসাহে কি না হয়? কি না হয় চেষ্টায়?
অভ্যাসে চট্‌পট্ হাত পাকে শেষটায়।
খেটেখুটে জল হ'ল শরীরের রক্ত—
শিখে দেখি বিদ্যাটা নহে কিছু শক্ত।
কাটাছেঁড়া ঠুক্‌ঠাক্, কত দেখ যন্ত্র,
ভেঙে চুরে জুড়ে দেই তারও জানি মন্ত্র।

চোখ বুজে চট্‌পট্‌ বড় বড় মূর্ত্তি
যত কাটি ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস তত বাড়ে ফূর্ত্তি।
ঠ্যাং-কাটা গলা-কাটা কত কাটা হস্ত
শিরীষের আঠা দিয়ে জুড়ে দেই চোস্ত!

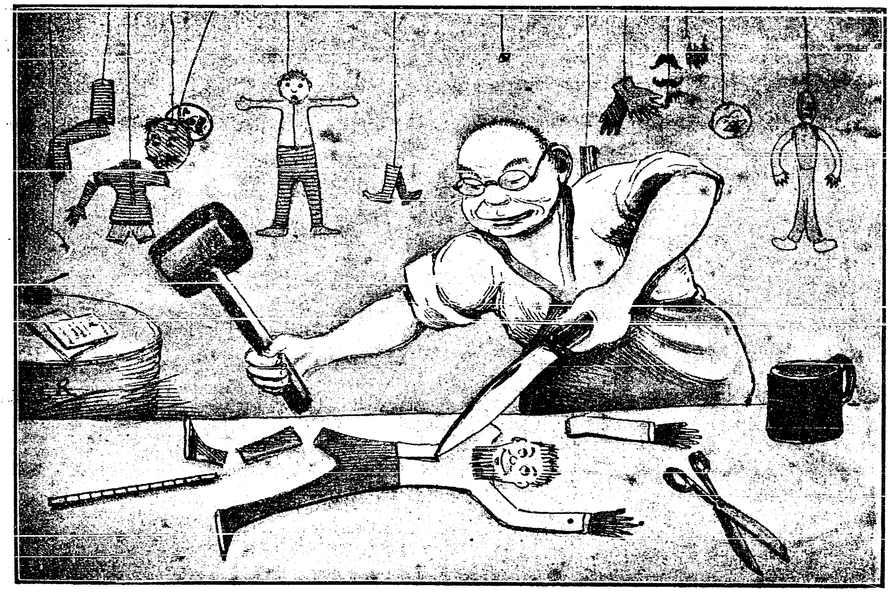

এইবারে বলি তাই রোগী চাই জ্যান্ত—
ওরে ভোলা গোটা ছয় রোগী ধরে আন্ত!
গেঁটেবাতে ভুগে মরে ও পাড়ার নন্দী,
কিছুতেই সারাবেনা এই তার ফন্দি!
এক দিন এনে তারে এইখানে ভুলিয়ে
গেঁটে বাত ঘেঁটে ঘুঁটে সব দেব ঘুলিয়ে—
কার কাণে কট্‌কট্‌, কার নাকে সর্দ্দি?
এসো এসো, ভয় কিসে? আমি আছি বদ্যি!

গালফোলা কাঁদ কেন? দাঁতে বুঝি বেদনা?
এসো এসো ঠুকে দেই, আর মিছে কেঁদনা—
এই পাশে গোটা দুই, ওই পাশে তিনটে—
দাঁত গুলো টেনে দেখি—কোথা গেল চিমটে?
ছেলে হও বুড়ো হও অন্ধ কি পঙ্গু,
মোর কাছে ভেদ নাই কলেরা কি ডেঙ্গু!
কালাজ্বর পালাজ্বর, পুরানো কি টাট্‌কা,
হাতুড়ির একঘায়ে একেবারে আট্‌কা!

নূতন ধাঁধা।

১। যত কর মারপিট ডাক ছাড়ে তেড়ে,
মাথা কাট, কথা কওয়া তবু যায় বেড়ে!
তল মিলে সহজেই, বাদ দিলে পেটে—
বুঝে দেখ তোমারি সে, ল্যাজ খানি কেটে।

২। এই ঘরগুলির কোন্ একটিতে আরম্ভ করিয়া ঠিকমত পরপর সব ঘরে যাইতে পারিলে কতগুলি রঙের নাম পাওয়া যাইবে। কোন ঘর না ডিঙাইয়া, এবং কোনটিকে বাদ না দিয়া, পাশাপাশি ডাইনে-বাঁয়ে বা উপর নীচে যাওয়া চাই—কোনাকুনি গেলে চলিবে না।

ল	লা	ল	নী	ল
ম	লো	বে	য়ে	কা
ক	নি	গু	ছে	পী
বু	স	দে	শা	লো
জ	হ	ল	দা	গো

গত মাসের ধাঁধার উত্তর—"আদায়"।

নিম্নলিখিত গ্রাহকগ্রাহিকাগণ শ্রাবণের ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন ঃ—

অরুণচন্দ্র দত্ত, প্রেমতোষ রুদ্র, লীলাময়ী দাসগুপ্ত, অন্নদাচরণ চৌধুরী, শচীন্দ্রনাথ মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র দাস, সামস উদ্দিন আহমাদ, বিনয়ভূষণ মৌলিক, সুধাংশুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মৃণালিনী দেবী, সূর্য্যকান্ত খাসনবিশ, স্বদেশরঞ্জন সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ মিত্র, পঞ্চানন সরকার, সুধীরকুমার সিংহ, নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, সুধীরকুমার পাল, আদিত্যসাধন মুখোপাধ্যায়, বিরাজমোহন জোয়ারদার, কনকলতা রায়, অমিয়াসুন্দরী মিত্র, ভবেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শান্তিময়ী দেবী, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, উষাবালা দেবী, পরিমলকুমারী দেবী, মামুদল হক্, আবদুল আজিম,আবদুল এজাজ হোসেন মণ্ডল, নরেন্দ্রকুমার বসু, সুষমাময়ী সাণ্ডেল, রামধন মুখোপাধ্যায়, রাধাসুন্দর পৈতণ্ডী, লীলাময়ী বসু, বিপিনবিহারী পাল, দ্বিজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলি, মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শিববিলাস মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার ভট্টাচার্য্য, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, দুলালকৃষ্ণ পাল, সত্যপ্রসন্ন দাস, সান্ত্বনা বসাক, শক্তিপদ বটব্যাল, এস, এন, রায়, ভূপালচন্দ্র রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ তরফদার, অহীন্দ্রকুমার বসু, সুধাংশুনলিনী দেবী, শৈলেনচন্দ্র চন্দ, মৃণালিনী দেবী, ক্ষণপ্রভা চক্রবর্ত্তী, ব্রহ্মরঞ্জন সেন,মহম্মদ-মোশারফ হোসেন, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, সুরেশচন্দ্র রায়, প্রভাবতী ঘোষ, জগদীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত, হরিসাধন পাইন, ভূপেন্দ্রকুমার দাস, ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুহৃদকুমার রায়চৌধুরী, জীতেন্দ্রমোহন সেন, মণিভূষণ বসু, নির্ম্মলকুমার সেনগুপ্ত, সুধাংশুভূষণ সেন, রাধারাম চন্দ্র, প্রমথেশ রায়, ফণিন্দ্রভূষণ গুপ্ত, হরেন্দ্রনাথ শীল, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়,সুবোধ কুমার ঘোষ, যতিকুমার রায়চৌধুরী, কুমারী মায়া দেবী, প্রিয়নাথ ঘোষ, সুবর্ণলতা দেবী, অরুণ, হরমোহন নাথ, বিজয়েন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রমদারঞ্জণ, মণীন্দ্রকুমার সিংহ, সুধীনাথ ঘোষ, কমলাপ্রসন্ন রায়, ইন্দুভূষণ দাসগুপ্ত, রমেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, সুনির্ম্মলচন্দ্র বসু, জ্যোতিরঞ্জণ সেন; হিমাংশুনিভা সেনগুপ্ত, ভবেশচন্দ্র চৌধুরী, ননীগোপাল ঘোষ, ইন্দুভূষণ চৌধুরী, আনিরুদ্দিন আমোদ, শকুন্তলা দেবী, কমলা দে, নিরুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশচন্দ্র ঘোষ, খলিলর রহমান, সুবালা সেন, এন, চৌধুরী, অমূল্যচন্দ্র মিত্র, স্নেহশীলা রায়, তরুবালা দেবী, নন্দরাণী সিংহ, বাসন্তী দেবী, বীণাপানি দেবী, ননীগোপাল বসু, পঙ্কজিনী রায়, বিজয়কৃষ্ণ সেনগুপ্ত, ইন্দিরা দেবী, বিমলেন্দ্র রায়, তারাদাস সান্যাল, প্রভাতচন্দ্র বসু, হরেন্দ্রনাথ দত্ত, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, কমলিনী, মন্মথনাথ রায়, কালীপ্রসন্ন সরকার, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ননীবালা দেবী, প্রফুল্লনাথ চৌধুরী, কুমারীকুমার দাস, সতীশচন্দ্র নাগ, সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দপ্রসাদ সেন, কেশবচন্দ্র সেন, নানকদাস বল, নিমাইদাস পাল, তরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কল্যাণকুমার বসু, মন্মথনাথ ঘোষ,শচীন্দ্রনাথ বসু মল্লিক, সুধীরকুমার ঘোষ, শরদিন্দু বসু, হীরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, তুহিনকুমারী দত্ত, সুধীরকুমার মল্লিক, গগনচাঁদ মল্লিক, হীতেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

ভবিষ্যতে, ধাঁধার উত্তর পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর দিতে হইবে। গ্রাহক নম্বর না লিখিলে নাম প্রকাশ করা হইবে না। ১৫ই তারিখের মধ্যে উত্তর পাঠাইতে হইবে।

রাক্ষুসে কাঁকড়া

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকা

চতুর্থ বর্ষ আশ্বিন, ১৩২৩ ষষ্ঠ সংখ্যা

ঘুমটি দিয়ে যা।

সোহাগ লুটে আয়রে মিঠে
হিম-সাগরের বা'
সাগর সেঁচা মণির চোখে
ঘুমটি দিয়ে যা'!
যে ঘুম ঘুমায় স্বপন সুখে
ঢেউয়ের গানে সাগর-বুকে
জাগিয়ে চুপে আনরে তাকে
বুলিয়ে খোকার গা'
কোমল চোখের পাপড়ি মুদে
ঘুমটি দিয়ে যা'!
আয়রে ধীরে ও ফুর-ফুরে
হিম-সাগরের বা'
খোকন মণির চোখটি ভরে
আবেশ দিয়ে যা'!
আঁচল ছাঁকা রাশি রাশি
ডুবন্ত ঐ চাঁদের হাসি

COLOURED DOCUMENT.

আকাশ-জলে আসবে ভাসি'
ভরিয়ে মেঘের না'
চাঁদের সেরা খোকার চোখে
ঘুমটি দিয়ে যা'!
আয়রে লুটে আয়রে ছুটে
হিম-সাগরের বা'
তন্দ্রা ভরা সুরের লহর
কাঁপিয়ে তারার গা'!
পরীর দেশের তরল বাঁশি
আনরে তাদের মোহের রাশি
ডুবিয়ে দে রে কান্না হাসি
হিম-সাগরের বা'
সাগর ছেঁচা মণির চোখে
ঘুমটি দিয়ে যা'!

শ্রীসুধাংশুশেখর মজুমদার।

নিরেট গুরুর কাহিনী।

ঘোড়ার ডিম কেনার গল্প।

গুরু নিরেট এবং তাঁর পাঁচ শিষ্য মঠে ফিরিয়া আসিয়া, নদী পার হইবার সময় তাঁহারা যে বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহার খবর সকলকেই দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

মঠের ঘর দুয়ার ঝাঁট দিবার জন্য একজন কানা বুড়ী ঝি ছিল, সে তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিল, "আমার মনে হচ্ছে যে আপনাদের গুণবার রকমটা একটু বেঠিক হয়েছিল। গুণবার সময় নিজেকে কিম্বা আর কাউকে বাদ দিয়ে ফেল্লেই ত সব মাটী। যা হোক্, যদি আপনারা আবার কখনও ঐ রকম বিপদে পড়েন, এই জন্য আপনাদের আমি ঠিকমত গুণবার একটা উপায় বলে দিচ্ছি। মাঠে যত গোবর পড়ে থাকবে, সব কুড়িয়ে এনে এক জায়গায় জড় করবেন; তারপর সেটাকে থাবড়ে থুবড়ে বেশ

গোল করবেন। সবাই মিলে তখন সেইটার চারধারে জুটে, একে একে তাতে নিজের নাক ডুবাবেন। এমনি করলেই প্রত্যেকের নাকের তাতে চমৎকার ছাপ পড়ে যাবে, আর সেই ছাপ কটা গুণে নিলেই কাজ চুকে যাবে। পঞ্চাশ ষাট বচ্ছর আগে আমরা এমনি করে একদল মেয়েকে গুণেছিলাম।"

বুড়ীর পরামর্শ শুনিয়া তাহারা সকলেই খুসী হইয়া বলিল, "উপায়টা খুব চমৎকার বটে! এতে কোনো টাকা খরচও নেই; এটা কিন্তু আমাদের কারুর মাথায় ঢোকেনি। যা হোক, সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের একটা ঘোড়া কেনাই সব থেকে সুবিধের। গুরুমশায়, আপনাকে একটা ঘোড়া কিন্‌তেই হচ্ছে।" গুরু শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে একটি ঘোড়ার দাম কত। তাহারা অনেক জিজ্ঞাসবাদের পর জানিল যে দুই তিন শ টাকার কমে একটা ঘোড়া কেনা চলিবে না। গুরু তাহাদের বুঝাইয়া দিলেন যে অত টাকা দিবার ক্ষমতা তাঁহার হইবে না। যা হোক, কথাটা ঐখানেই থামিয়া গেল না, কিছু দিন ধরিয়া তাহার আলোচনা চলিল।

গুরুর একটি গরু ছিল, একদিন সেটা মাঠে চরিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসিল না। চেলার দল তাহাকে সারা গ্রামময় খুঁজিয়া বেড়াইয়াও পাইল না, কাজে কাজেই তার পরদিন আকাট আশে পাশের গাঁয়ে তাহার খোঁজ করিতে গেল।

তিন দিন পরে সে ফিরিয়া আসিল, গরুর কোনও খোঁজ সে পায় নাই, কিন্তু তাহার জন্য তাহার ফূর্ত্তির কোনও কমতি দেখা গেল না। সে মঠে পা দিয়াই পরম আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিল, "গুরুমশায়, আমি গরুটাকে কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। যাক্, তার জন্যে কোনও চিন্তা নেই, আমি আপনার জন্য খুব কম দামে একটা ঘোড়ার সন্ধান করে এসেছি"। গুরু উৎসাহে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম?" আকাট বলিল, "আমি যখন রাজ্যের মাঠ ঘাট বন বাদাড় খুঁজে, ফিরে আসছি, তখন দেখলাম যে একটা পুকুরের ধারে গোটা পাঁচ ছয় ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে। আর একটু দূরে গিয়ে দেখলাম যে এক জায়গায় অনেকগুলো ঘোড়ার ডিম ঝুলছে। এক একটা ডিম এত বড় যে দু হাত দিয়ে ধরা যায় না। একজন লোককে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে সেগুলো সত্যিই ঘোড়ার ডিম, আর এক একটার দাম কুড়ি পঁচিশ টাকার বেশিও নয়। গুরুমশায়, এমন সুবিধা আর পাবেন না, অল্প দামে একটা খুব ভাল ঘোড়ার ডিম পাওয়া যাবে, আর বাচ্চাটাকে খুব ভাল করে সব শিখিয়ে নিলে, সেটা শান্ত শিষ্টও বেশ হবে।" এ কথা শুনিয়া সকলেই ঘোড়া কিনিতে রাজী হইল, ও আকাটের হাতে

পঁচিশটি টাকা দিয়া এবং হাবাকে তাহার সঙ্গে দিয়া, ঘোড়ার ডিম কিনিতে পাঠাইয়া দিল।

তাহারা দুইজনে চলিয়া যাইবার পর, হঠাৎ আহাম্মকের মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে বলিল, "আচ্ছা, একটা খুব ভাল ঘোড়ার ডিম না হয় পাওয়া গেল, কিন্তু তাতে 'তা' না দিলে ত ডিম ফুটবে না! কিন্তু 'তা' যে কে দেবে, তা ত আমি ভেবেই পাচ্ছি না। আকাট ত বল্‌ল যে এক একটা ডিম দু হাতে ধরা যায় না, তা হলে আমরা সেটার উপর দশটা মুরগী রাখলেও, তারা ডিমটার উপর দাঁড়িয়েও থাকতে পারবে না, সেটাকে ঢেকে রাখা ত দূরে থাক্। এখন বল দেখি, কি করে কাজ হাসিল করা যায়?" আহাম্মকের কথা শুনিয়া সকলে হাঁ করিয়া এ উহার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল, এত বড় কঠিন প্রশ্নের উত্তর আর কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গুরু শেষে তাঁহার তিন শিষ্যকে বলিলেন, "আমাদের একজনকেই ওটার উপর বসে 'তা' দিতে হবে, এছাড়া ত আর কোনও উপায় দেখছি না।" গুরুর কথা শুনিয়াই প্রত্যেকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি প্রমাণ করিতে বসিয়া গেল যে, তাহাদের একেবারেই ও রকম কাজ করিবার অবসর নাই, তাহারা সারাক্ষণই কাজে ব্যস্ত থাকে। একজন বলিল, "দিনে যত জল লাগে, সমস্তই আমাকে নদীর থেকে আনতে হয়, তাছাড়া জ্বালানী কাঠও সব আমাকে আনতে হয়, আমার সময় কোথায়?" আর একজন বলিল, "আমি ত সারাদিন রান্না ঘরেই আছি, ভাত তরকারী রাঁধতে, নানা রকম পিঠে তৈরী করতে আর সকলের জল গরম করতে করতেই আমার প্রাণ যায়। আমি আবার ডিমে 'তা' দেব কি করে?" বাকী যে জন ছিল সে বলিল, "ভোর হবার আগেই আমি উঠে নদীতে গিয়ে দাঁত মেজে মুখ হাত ধুই, আর যা কিছু করবার সব ঠিক শাস্তর মেনে করি। তারপর বাগানে গিয়ে ফুল তুলে এনে, মালা গেঁথে, এখানে যতগুলি ঠাকুর আছে সব কজনের পূজো করি আর তাদের উপর ফুল ছড়াই। আমার ত এত কাজ, তার উপর আবার ডিম ফুটাতে বসবো কখন?"

তাহাদের সকলের কথা শেষ হইলে গুরু বলিলেন, "এ সবই সত্যি কথা, তোমরা ডিমের ভার নিতে পারবেনা, আর যে দুজন সেটা কিনতে গেছে, তাদের দিয়েও ওকাজ করান চলবেনা, কারণ তাদের মধ্যে একজন সারাদিন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যত লোক জন আসে সকলের খবর নেয় আর তারা যা কিছু কথা বলে সব কথার উত্তর দেয়। আবার তাদের মধ্যে যদি ঝগড়া বিবাদ হয়, তাহলে তাকে সেটাও মিটিয়ে দিতে হয়।

এইত গেল হাবার কাজ, আর আকাটকে দিয়ে ত আমাদের যা কিছু জিনিষ দরকার সবই কেনান হয়, সে বেচারা সারাদিনই মঠের থেকে গাঁয়ে আর গাঁয়ের থেকে মঠে ছুটাছুটী করে। তোমাদের কারুই নিজের কাজ কর্ম্ম ছেড়ে বসে থাকা চলবে না। তা আমার ত কোনও কাজ কর্ম্ম নেই, আমিই না হয় ও কাজটা করব। আমি ডিমটাকে কোলে নিয়ে, সেটাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দুহাতে জাপ্‌টে ধরে থাকব, যথাসাধ্য যত্ন করব। ডিম ফুটে যখন ছানা বেরবে তখন আমাদের সকল কষ্ট সফল হবে।"

মঠে ত এই সব বন্দোবস্ত হইতেছিল, এদিকে আকাট আর হাবা তখনও পথ চলিতেছে; অনেক পথ হাঁটিয়া তাহার শেষে সেই পুকুরের ধারে আসিয়া পৌঁছিল। পুকুরটার পাড়ে খুব কুমড়া ফলিয়া ছিল, এক একটা তাহার মধ্যে খুব প্রকাণ্ড।

একটা লোক সেইখানে বসিয়া পাহারা দিতেছিল। দুই বন্ধু তাহার কাছে গিয়া খুব মিনতি করিয়া বলিল, "মশায়, দয়া করে আমাদের একটা ডিম দিন।" লোকটা খরিদ্দারদের বুদ্ধির দৌড় বুঝিয়া দাঁত খিঁচাইয়া বলিল, "আহা হা, যা বল্লে আর কি! তোমাদের এমন ডিম কিনবার ক্ষমতা থাকলে ত? এর দাম কত তা জান?" আকাট আর হাবা ভাবিল লোকটা বুঝি তাহাদের ঠকাইতে চেষ্টা করিতেছে; তাহারা বলিল "আরে যান্ যান্ মশায়, আমরা যেন আর জানিনা যে একটা ডিমের দাম পঁচিশ টাকা! টাকা কটা নিয়ে, একটা ভাল দেখে ডিম দিয়ে দাও বাপু, কেন মিছে গোলমাল কর।" লোকটা দেখিল আচ্ছা দাঁও মারা গিয়াছে। কাজেই সে একটু নরম হইয়া বলিল, "তোমরা ত দেখছি খাসা লোক হে! আচ্ছা তোমাদের গুণ দেখে আমি অত কম দামেই ডিম দিতে রাজি হলাম। ন্যাও, একটা ভাল দেখে বেছে ন্যাও, কিন্তু দেখ, সবাইকে যেন বলে বেড়িও না যে ডিমটা অত কমে পেয়েছ, তাহলে আমার ব্যবসার ক্ষতি হবে।" দুই বন্ধুতে খুসী হইয়া বাছিয়া বাছিয়া সবার বড় কুমড়টাকে বাহির করিল, এবং তারপরদিন ভোরে উঠিয়া বাড়ীর পথে ফিরিয়া চলিল।

হাবা আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল এবং আকাট ডিমটি মাথায় লইয়া তাহার পিছনে চলিল। যাইতে যাইতে আকাট বলিল, "আমাদের বাপ পিতামহরা বলতেন যে যারা তপস্যা করে, তারা নিজেদেরই কাজ এগিয়ে রাখে। আমরা তা এখন নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। আমাদের গুরু যে অত তপস্যা করেছিলেন, তার কেমন ফল পেলেন দেখ! এমন চমৎকার ঘোড়ার দাম কম করে তিন চারশ টাকা হবে, আমরা কিনা তাকে পঁচিশ টাকায় কিনলাম!" হাবা বলিল, "তা আর বলতে? কথায় বলে

"যা কিছু সুখ তা ধর্ম্ম কর্ম্ম থেকেই পাওয়া যায়, আর যা কিছু, সে সব কোনও কর্ম্মের জিনিষই নয়। ধর্ম্ম কর্ম্মে লাভও যেমন আনন্দও তেমনই; যেখানেই ধর্ম্ম নেই সেখানেই দুঃখ। আমার বাবা অনেক তপস্যা করেছিলেন, তাই না শেষে এত সুখ পেলেন, তা না হলে কি আর আমার মত ছেলে হয়?" আকাট বলিল, "এ কথায় কি আর কোনও সন্দেহ আছে? যেমন রুইবে, তেমনি ফলবে। ভাল কাজের ফল ভাল হবে, মন্দ কাজের ফল মন্দ হবে।"

এইরূপ গল্প করিতে করিতে তাহারা অনেক দূর পথ চলিয়া আসিল। তাহারা যে পথে আসিতেছিল তাহার মাঝখানে একটা গাছ ছিল, উহার গাছ পালাগুলা রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। আকাট কুমড়া মাথায় করিয়া গাছটার তলায় আসিবামাত্র,

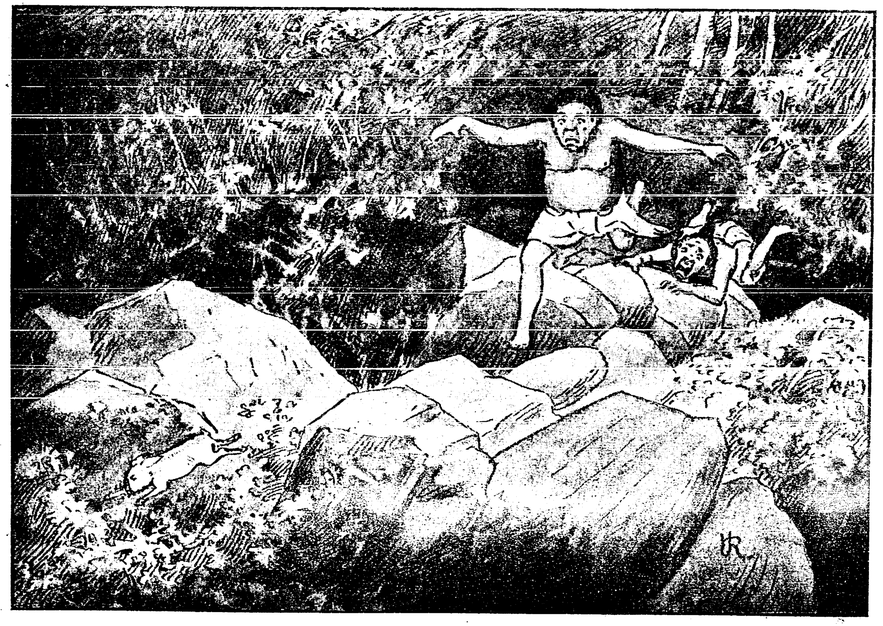

একটা ডালে ধাক্কা খাইল এবং কুমড়াটা তাহার মাথা হইতে ছিট্‌কাইয়া রাস্তায় পড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। পথের ধারে, ঝোপের মধ্যে একটা খরগোস বসিয়া ছিল, সে

কুমড়া ফাটার শব্দে লাফাইয়া উঠিয়া এক দৌড় দিল। "ঐ রে ঘোড়ার বাচ্চাটা পালাল" বলিয়া তাহারা দুজনেই খরগোসটার পিছনে তাড়া করিয়া ছুটিল। দৌড়িতে দৌড়িতে কাঁটা গাছে লাগিয়া তাহাদের কাপড় চোপড় ছিঁড়িয়া গেল, খোঁচা লাগিয়া গা হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল, তবুও তাহারা দৌড়িতে ছাড়িল না। শেষে ঘোড়ার বাচ্চা যখন আর চোখেও দেখা গেল না তখন তাহারা হতাশ হইয়া রাস্তায় শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া যে দিকে খরগোসটাকে শেষ দেখা গিয়াছিল সেইদিকে খানিকক্ষণ খুঁজিয়া বেড়াইল, কিন্তু বাচ্চাটার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তখন তাহাদের প্রাণ বাহির হইয়া আসিতেছে, কাজেই শেষে তাহারা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মঠে ফিরিয়া আসিল।

মঠের দরজায় ঢুকিয়াই, তাহারা কপাল চাপড়াইয়া কাঁদিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল, "হায় হায়, আমাদের কি হল গো!" তাহাদের চীৎকার শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের টানিয়া তুলিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ব্যাপার কি? তোমাদের কি হয়েছে?" দুইজন তখন আপনাদের কীর্ত্তিকাহিনী সব খুলিয়া বলিল। আকাট বলিল, "গুরুমশায়, বলব কি, জন্মে এমন তেজিয়ান ঘোড়া দেখিনি, রংটা তার পাঁশুটে, মাঝে মাঝে একটু কালোর ছিট আছে, লম্বা চওড়ায় প্রায় একটা খরগোসের সমান। সবেমাত্র ডিম ফুটে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু কান খাড়া করে আর লেজ গুটিয়ে যা ছুটটা দিল, সে আর কি বলব!"

ঘোড়ার বর্ণনা শুনিয়া সবাই হা হুতাশ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু গুরু বলিলেন, "টাকাগুলো গেল বটে, কিন্তু ঘোড়ার বাচ্চাটাও গিয়ে ভালই হয়েছে। বাচ্চাতেই এত তেজ, যখন বড় হবে তখন তার উপর চড়বে কে? আমি বাপু বুড় মানুষ, আমার কি ও সব পোষায়? অমন ঘোড়া আমাকে কেউ দিলেও আমি নিই না।"

পারিজাত হরণ।

সেকালে দেবতারা যখন অমৃতের জন্য সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন তখন সমুদ্রের ভিতর হইতে পারিজাত ফুলের গাছ উঠিয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্র সেটিকে আনিয়া স্বর্গে তাঁহার নন্দনকাননে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। পারিজাত ফুলের মত সুন্দর এবং সুগন্ধ ফুল জগতে আর নাই, ফুলের গন্ধ ছড়াইয়া দেবপুরী মাতাইয়া তুলিত। ইন্দ্রের স্ত্রী, শচী দেবী পারিজাতের মঞ্জরী খোপায় পরিয়া প্রতিদিন সাজ সজ্জা করিতেন, সে জন্য গাছটি তাঁহার বড়ই আদরের ছিল।

এক সময়ে কৃষ্ণ তাঁহার রাণী সত্যভামাকে লইয়া স্বর্গে ইন্দ্রের পুরীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া অতি সম্মানের সহিত পূজা করিলেন। কৃষ্ণ সত্যভামার সহিত নন্দনকাননে বেড়াইতে গিয়া পারিজাত ফুলের গাছটি দেখিতে পাইলেন। গাছটি দেখিয়া সত্যভামার বড়ই লোভ হইল; তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন—"কৃষ্ণ! তুমি না বলিয়া থাক যে জাম্ববতীর চাইতেও আমাকে বেশী ভালবাস? সে কথা যদি সত্যি হয় তবে আমার জন্য এই পারিজাত দ্বারকায় লইয়া চল। গাছটি আমাদের বাগানে পুঁতিয়া রাখিব এবং প্রতিদিন ইহার মঞ্জরী লইয়া খোপায় পরিব।" সত্যভামার কথায় কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে পারিজাত বৃক্ষটি তুলিয়া গরুড়ের উপর রাখিলেন।

এই ব্যাপার দেখিয়া নন্দনকাননের প্রহরিগণ বলিল—"ওহে কৃষ্ণ! এটি শচীদেবীর অতি আদরের গাছ, তুমি কেন ইহা চুরি করিতেছ? এই সংবাদ পাইলে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন। তিনি যদি বজ্র হাতে লইয়া দেবসৈন্যগণের সহিত এখানে আসিয়া উপস্থিত হন তাহা হইলে তোমার আর রক্ষা নাই। অতএব পারিজাত হরণ করিয়া দেবতাদের সহিত বিবাদ করিও না।"

প্রহরিদিগের কথায় সত্যভামার অত্যন্ত রাগ হইল, তিনি বলিলেন—"বটে! পারিজাতের শচীই বা কে আর ইন্দ্রই বা কে? সমুদ্র মন্থনেই যদি উঠিয়া থাকে তবে ত এটা সকলেরই সাধারণ ধন—একা ইন্দ্রই বা কেন ইহা ভোগ করিবেন? শচী যদি মনে করেন যে মহা ক্ষমতাশালী দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার স্বামী সুতরাং পারিজাত তাঁহারই প্রাপ্য, তবে তাঁহাকে গিয়া বল যে "কৃষ্ণ তাঁহার পত্নী সত্যভামার অনুরোধে পারিজাত বৃক্ষ লইয়া যাইতেছেন, যদি ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে বাধা দিন।"

প্রহরিগণ শচীকে গিয়া সমস্ত কথা জানাইল। পৃথিবীর মানুষ কৃষ্ণ আসিয়া ইন্দ্রের নন্দনকানন হইতে পারিজাত হরণ করিয়া লইবে—এত বড় আস্পর্দ্ধা? এত অপমান শচী সহ্য করিবেন কেন? শচীর উৎসাহ বাক্যে ইন্দ্র তখনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন—কৃষ্ণকে সাজা দিয়া পারিজাত ফুলের গাছটি কাড়িয়া লইতেই হইবে! বজ্র হাতে লইয়া ইন্দ্র ঐরাবতে চড়িলেন, সমস্ত দেব সৈন্য অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া 'মার, মার' শব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত। তখন সেখানে ভারী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

তেত্রিশ কোটী দেবতা ইন্দ্রের সহায় আর কৃষ্ণ একা। কিন্তু একা হইলে কি হয়! তিনি ত বড় সহজ যোদ্ধা নন—দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাণে চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। দেবতাদের বাণগুলি তিনি অনায়াসে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বাহন গরুড়টিও বড় কম নয়! এক ঠোকর মারিয়া বরুণের ভয়ঙ্কর পাশ অস্ত্রটি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিল। যম তাঁহার দণ্ড ছাড়িলেন কিন্তু কৃষ্ণের গদার বাড়ি খাইয়া সেটা ভাঙ্গিয়া গেল। কৃষ্ণ তাঁহার সুদর্শন চক্র দিয়া কুবেরের রথটিকে তিল তিল করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। চন্দ্র আর সূর্য্য কৃষ্ণের ভ্রুকুটি দেখিয়াই একেবারে নিস্তেজ। অগ্নি আসিলেন যুদ্ধ করিতে কিন্তু কৃষ্ণের বাণে তিনি শত ভাগ হইয়া গেলেন। অপর দেবতাদের ত কথাই নাই—কেহ চক্রের আঘাতে, কেহ গদার আঘাতে আবার কেহ বা কৃষ্ণের বাণ খাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। এদিকে আবার গরুড়ও সুবিধা পাইলেই আঁচড়াইয়া, কামড়াইয়া, আবার মাঝে মাঝে পাখার ঝাপ্‌টা মারিয়া দেবতাদিগকে ক্ষত বিক্ষত করিল।

এইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমে যখন সকলেরই অস্ত্র ফুরাইয়া আসিল তখন ইন্দ্র লইলেন বজ্র—এবং কৃষ্ণ লইলেন সুদর্শন চক্র। দধিচি মুনির হাড়ের তৈরি বজ্র—সে বড় সহজ অস্ত্র নয়! আবার কৃষ্ণের সুদর্শন তাহার চাইতেও ভীষণ! ইন্দ্র ও কৃষ্ণ এই দুই অব্যর্থ মহা অস্ত্র ছাড়িলে ভয়ঙ্কর প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইবে এই ভয়ে ত্রৈলোক্যের লোক হাহাকার করিয়া উঠিল। ইন্দ্র কৃষ্ণকে বজ্র ছুঁড়িয়া মারিলেন।

ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে বজ্র কৃষ্ণের দিকে ছুটিল। বজ্র নিকটে আসিলে পর নিতান্ত অবহেলার সহিত কৃষ্ণ হাত দিয়া সেটাকে ধরিয়া ফেলিলেন, বজ্র বিফল হইয়া গেল। কৃষ্ণ বজ্র বিফল করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, তাঁহার চক্র তাঁহার হাতেই রহিল। এদিকে ইন্দ্রের বাহন গরুড়ের তাড়নায় ক্ষত বিক্ষত, তাঁহার বজ্রটিও হইল বিফল—তখন নিরুপায় হইয়া তিনি পলায়নের চেষ্টা করিলেন।

ইন্দ্রের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ।

ইন্দ্রকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সত্যভামা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"ওহে ইন্দ্র! তুমি হইলে দেবতাদিগের রাজা! তোমার কি যুদ্ধ ছাড়িয়া পলায়ন করাটা উচিত! শচী তোমার অতি আদরের রাণী, তাঁহার খোপায় পারিজাতের মঞ্জরী না দেখিতে পাইলে যে তোমার ইন্দ্রত্বই বজায় থাকিবে না। যাহা হউক, আর লজ্জিত হইয়া পলায়নের আবশ্যক নাই—এই নাও, তোমার পারিজাত লইয়া যাও। তোমার বাড়ীতে আসিয়াছিলাম কিন্তু শচীর এতই অহঙ্কার যে আমাকে একটুও সম্মান করিলেন না। সেই জন্য আমি ইচ্ছা করিয়াই এই বিবাদ বাধাইয়াছিলাম। অতএব এখন পারিজাত হরণে আর কোনও প্রয়োজন নাই।"

সত্যভামার কথায় ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"দেবী! আপনার মনের সাধ মিটিয়াছে তবে এখন আর রাগ কেন? আর আমার পরাজয়ের কথা যদি বলেন, স্বয়ং কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়াছি তাহাতে আমার লজ্জার কোন কারণ নাই।"

ইন্দ্রের এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, আর আমরা পৃথিবীর লোক! সুতরাং আমারই অপরাধ হইয়াছে এবং সে অপরাধ আপনার ক্ষমা করা উচিত। পারিজাত আপনার নন্দনকাননে থাকারই উপযুক্ত। সত্যভামার অনুরোধে আমি উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম, এখন আপনি ইহা ফিরাইয়া লউন। আর আপনি যে আমাকে বজ্র মারিয়াছিলেন তাহাও এই নিন।" এই বলিয়া কৃষ্ণ বজ্রটি ফিরাইয়া দিলেন।

বজ্র গ্রহণ করিয়া ইন্দ্র বলিলেন—"কৃষ্ণ! 'আমি পৃথিবীর লোক' এ কথা বলিয়া আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছ কেন? তুমি যে কত বড় দেবতা ও মহাপুরুষ তাহা কি আর আমি জানি না? যাহা হউক এই পারিজাত তুমি দ্বারকায় লইয়া যাও। তুমি যখন পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া আসিবে তখন পারিজাতও তোমার সঙ্গে সঙ্গে আসিবে।"

কৃষ্ণ তখন "আচ্ছা তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া পারিজাত লইয়া সত্যভামার সহিত গরুড়ের পিঠে চড়িলেন। গরুড় তাঁহাদিগকে লইয়া দ্বারকায় ফিরিয়া আসিল।

কাজের মানুষ।

মাগো তুমি ডাক্‌ছ আমায়,
বল্‌ছ 'বেলা হ'ল
থাকুক্ এখন পুতুল খেলা
নাইতে খেতে চল।'

সবুর কর, এই যে এলাম
একটু খানি পরে;
কাজ কর্ম্ম হয়নি সারা,
যাই মা কেমন ক'রে?

কাচের পুতুল মোমের পুতুল
খোকা খুকী যত,
তাদের নিয়ে সকাল থেকে
ব্যস্ত আছি কত।

বড়রা যায় ইস্‌কুলেতে
তাইতে তাড়াতাড়ি
বাট্‌না বাটা কুট্‌নো কোটা
রান্না বাড়াবাড়ি।

তার উপরে ছোট্টরা সব
করছে উৎপাত,
কেউ ফেলেছে কাপড় খুলে,
কেউ ভেঙ্গেছে হাত।

মাটি দিয়ে ভাঙ্গা হাত এই
আট্‌কে দিয়েছি,
কাটা ঘায়ে কেমন দেখ
ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছি।

দুধ খাবে না খুকুন আমার,
দুষ্টু এমন তর,
এস ত মা, একটু খানি
পা দুটো ওর ধর!

খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে,
যাব তোমার কাছে।
ওদের ফেলে আমায় কি মা
নাইতে খেতে আছে?

শ্রীসুখলতা রাও।

অজানা দেশে।

সে দিন একটা বইয়ে মাঙ্গো পার্কের কথা পড়ছিলাম। প্রায় সওয়া শ' বৎসর আগে—অর্থাৎ লিভিংষ্টোনের অনেক পূর্ব্বে—মাঙ্গো পার্ক আফ্রিকার অজানা দেশ দেখতে গিয়েছিলেন। এক এক জন মানুষের মনে কেমন নেশা থাকে, নূতন দেশ নূতন জয়গার কথা শুনলে তারা সেখানে ছুটে যেতে চায়। তারা অসুবিধার কথা ভাবে না, বিপদ আপদের হিসাব করে না—একবার সুযোগ পেলেই হয়। মাঙ্গো পার্ক এই রকমের লোক ছিলেন। তাঁর বয়স যখন ২৪ বৎসর মাত্র তখন তিনি নাইগার নদীর সন্ধান কর্‌তে গিয়েছিলেন। তার কিছুদিন আগে একজন ইংরাজ সেই অজানা দেশে ডাকাতের হাতে মারা যান—অথচ পার্ক তা জেনেও মাত্র দুজন সে-দেশী চাকর সঙ্গে সেই পথেই বেরিয়ে পড়্‌লেন। তাঁর উদ্দেশ্য সেই নদী ধ'রে ধ'রে তিনি আফ্রিকার ওই অঞ্চলটা বেশ ক'রে ঘুরে আসবেন। তখনও আফ্রিকার ম্যাপে সেই সব জায়গায় বড় বড় ফাঁক দেখা যেত আর সেগুলোকে 'অজানা দেশ' বলে লেখা হ'ত।

সে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সে সময়ে অনেকটা আরব ও মূরজাতীয় মুসলমানদের হাতে ছিল। ইউরোপীয় লোক সেখানে গিয়ে পাছে তাদের ব্যবসা কেড়ে নেয় এই ভয়ে সাহেব দেখ্‌লেই তারা নানারকম উৎপাত লাগিয়ে দিত। পার্ক্‌কেও তারা কম জ্বালাতন করেনি; কতবার তাঁকে ধ'রে বন্দী ক'রে রেখেছে—তাঁর সঙ্গের জিনিষ পত্র কেড়ে নিয়েছে—তাঁর লোকজনকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, এমন কি তাঁকে মেরে

ফেলবার জন্যও অনেকবার চেষ্টা ক'রেছে। তার উপর সে দেশের অসহ্য গরম আর নানারকম রোগের উৎপাতেও তাঁকে কম ভুগতে হয়নি। একবার জলের অভাবে তাঁর এত কষ্ট হয়েছিল যে তিনি গাছের পাতা শিকড় ডাঁটা চিবিয়ে তৃষ্ণা দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু তাতে কি তৃষ্ণা যায়? সারাদিন পাগলের মত জল খুঁজে খুঁজে সন্ধ্যার কিছু আগে ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তারপর যখন তাঁর জ্ঞান হ'ল তখন তিনি চেয়ে দেখেন ঘোড়াটা তখনও তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে সূর্য্য অস্ত গেছে, চারিদিক ক্রমেই অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ছে, কাজেই আবার তাঁকে ঘোড়ায় চ'ড়ে জলের সন্ধানে বেরুতে হ'ল। তারপর যখন তাঁর দেহে আর শক্তি নাই, মনে হ'ল প্রাণ বুঝি যায় যায়, তখন হঠাৎ উত্তর দিকে বিদ্যুৎ চমকিয়ে উঠ্‌ল। তা দেখে তাঁর আবার উৎসাহ ফিরে এল, তিনি বৃষ্টির আশায় সেই দিকে চল্‌তে লাগলেন। চল্‌তে চল্‌তে ক্রমে ঠাণ্ডা বোধ হ'তে লাগল, বাদ্‌লা হাওয়া দেখা দিল, তারপর কড়্

মাঙ্গো পার্ক হতাশ হয়ে গাছের তলায় ব'সে পড়লেন।

কড়্ ক'রে বাজ পড়ে ঝমাঝম বৃষ্টি নামল। পার্ক তখন তাঁর সমস্ত কাপড় বৃষ্টিতে ধ'রে

দিয়ে, সেই ভিজা কাপড় নিংড়িয়ে তার জল খেয়ে তৃষ্ণা দূর করলেন। তখন ঘুট্‌ ঘুটে অন্ধকার রাত্রি, বিদ্যুতের আলোতে কম্পাস দেখে দিক স্থির ক'রে আবার তাঁকে সারারাত চল্‌তে হ'ল।

একবার তিনি সারাদিন না খেয়ে পরিশ্রান্ত হ'য়ে এক সহরে গিয়ে হাজির হ'তেই সেখানকার রাজা হুকুম দিলেন, "তুমি গ্রামে ঢুকতে পারবে না"। তিনি সেখান থেকে এক গ্রামে গেলেন, সেখানেও লোকেরা তাঁকে দেখে ভয়ে পালাতে লাগ্‌ল—তিনি যে বাড়ীতেই যান লোকে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়। শেষটায় হতাশ হ'য়ে তিনি একটা গাছের তলায় ব'সে পড়লেন। এই রকম অনেকক্ষণ ব'সে থাকবার পর একটি নিগ্রো স্ত্রীলোক আর তার মেয়ে এসে তাঁকে ডেকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে খেতে আর বিশ্রাম করতে দিল। সে দেশীয় মেয়েরা সন্ধ্যার পর ঘরে বসে চরকায় সূতো কাটে আর গান গায়। মাঙ্গো পার্কের নামে তারা গান বানিয়ে গেয়েছিল—সেই গানটার অর্থ এই—"ঝড় বইছে আর বৃষ্টি পড়ছে আর বেচারা সাদা লোকটি শ্রান্ত অবশ হ'য়ে আমাদের গাছ তলায় এসে বসেছে। ওর মা নেই, ওকে দুধ এনে দেবে কে? ওর স্ত্রী নেই ওকে ময়দা পিসে দেবে কে? আহা, ওই সাদা লোকটিকে দয়া কর। ওর যে মা নেই ওর যে কেউ নেই।"

তিনি অনেকবার 'মূর'দের হাতে পড়েছিলেন। এক একটা গ্রামে তিনি যান আর সেখানকার সর্দ্দার তাঁকে ডেকে পাঠায়, না হয় লোক দিয়ে ধরপাকড় ক'রে নিয়ে যায়। এই রকম অবস্থায় তারা তাঁর কাছ থেকে প্রায়ই কিছু না কিছু বক্‌শিস্‌ আদায় না ক'রে ছাড়্‌ত না। এম্নি ক'রে তাঁর সঙ্গের জিনিষ পত্র প্রায় সবই বিলিয়ে দিতে হ'য়েছিল। একবার এক সর্দ্দার তাঁর ছাতাটি তাঁর কাছ থেকে আদায় ক'রে মহা খুসী! ছাতাটাকে সে ফট্‌ ফট্‌ ক'রে খোলে আর বন্ধ করে আর হো হো ক'রে হাসে। কিন্তু ওটা দিয়ে কি কাজ হয় সে কথাটা বুঝতে তার নাকি অনেকখানি সময় লেগেছিল। আসবার সময় মাঙ্গো পার্কের নীল কোট আর তাতে সোনালী বোতাম দেখে সর্দ্দার মশাই কোটটাও চেয়ে বস্‌লেন। তখন সেটা তাকে না দিয়ে আর উপায় কি? যা হো'ক, সর্দ্দারের মেজাজ ভাল বল্‌তে হবে, সে ছাতা আর কোটের বদলে তাঁকে অনেক জিনিষপত্র সঙ্গে দিয়ে তাঁর চলা ফিরার সুবিধা ক'রে দিল। কিন্তু সকল সময়ে তিনি এত সহজে পার পান নি। আলী নামে এক মূর রাজার দল তাঁকে বন্দী ক'রে মাস খানেক খুব অত্যাচার ক'রেছিল। প্রথমটা তারা

ঠিক করল যে এই বিধর্ম্মী খৃষ্টানটাকে মেরে ফেলাই ভাল। তারপর কি যেন ভেবে তারা আবার বল্‌ল, "ওর ওই বেড়ালের মত চোখ দুটো গেলে দেও।" যাহো'ক শেষটায় সেখানকার রাণীর অনুগ্রহে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন।

মূর সর্দ্দার মাঙ্গো পার্কের ছাতাটি চেয়ে নিল।

এম্নি করে অত্যাচার অপমান চুরি ডাকাতি সব সহ্য ক'রে মাঙ্গো পার্ক শেষটায় একেবারে ফকির হ'য়ে পড়েছিলেন, তাঁর লোকজন কাপড় চোপড় জিনিষপত্র এমন কি ঘোড়াটি পর্য্যন্ত সঙ্গে রইল না। কিন্তু এত কষ্ট স'য়েও শেষটায় যখন তিনি নাইগার নদীর সন্ধান পেলেন, তখন তাঁর মনে হ'ল এত কষ্ট এত পরিশ্রম সব সার্থক হ'য়েছে। এম্নি ক'রে তিনি দুই বৎসর সে দেশে ঘুরে তারপর দেশে ফিরে আসেন। এই দুই বৎসরের সব ঘটনা তিনি প্রতিদিন লিখে রাখতেন আমরা এখানে যা লিখছি তার প্রায় সবই তাঁর সেই ডায়ারি থেকে নেওয়া।

আফ্রিকার নিগ্রো জাতীয় লোকদের আমরা সাধারণত "অসভ্য-জাতি" বলে থাকি —কিন্তু মাঙ্গো পার্ক বলেন যে মূর বা আরব জাতীয় লোকদের মধ্যে যারা কতকটা 'সভ্য' হ'য়েছে, তাদের চাইতে এই অসভ্যেরা অনেক ভাল। আমাদের দেশে যেমন সাঁওতালরা প্রায়ই খুব সরল আর সত্যবাদী হয়, মোটের উপর এরাও তেমনি। তাদের দেশে তারা বিদেশী লোক দেখেনি, কাজেই হঠাৎ অদ্ভুত পোষাক পরা হল্‌দে চুল, নীল চোখ সাদা রঙের মানুষ দেখ্‌লে তাদের ভয় হবারই কথা।

কিন্তু তবু বিপদে আপদে পার্ক তাদের কাছেই সাহায্য পেতেন—মূর বা আরবদের কাছে নয়।

দেশের নানান্ স্থানে নানান্ জাতীয় লোক, তাদের মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ চলে। একবার মাঙ্গো পার্ক মালাকোণ্ডা ব'লে একটা সহরে এসে শুনলেন আরও উত্তরে খুব বড় একটা লড়াই চল্‌ছে—'ফুতা-তরা'র রাজা আবুল কাদের অসভ্য জালফদের রাজা দামেলকে আক্রমণ ক'রেছেন। এই আবুল কাদের আর দামেলের যুদ্ধ বড় চমৎকার। আবুল কাদের একজন দূতকে দিয়ে দামেলের কাছে দুখানা ছুরি পাঠিয়ে দিলেন, আর ব'লে দিলেন—"দামেল যদি মুসলমান হ'তে রাজি হ'ন, তবে এই ছুরি দিয়ে আবুল কাদুর নিজের হাতে তাঁর মাথা কামিয়ে দিবেন, আর যদি রাজি না হ'ন তবে ঐ ছুরিটি দিয়ে তাঁর গলা কাটা হবে। এর মধ্যে কোন্‌টি তার পছন্দ?" দামেল এ কথা শুনে বল্‌লেন, কোনটাই পছন্দ হচ্ছে না। "আমি মাথাও কামাতে চাই না, গলায় ছুরিও বসাতে চাই না।" আবুল কাদের তখন প্রকাণ্ড দলবল সঙ্গে নিয়ে জালফদের দেশে লড়াই কর্‌তে এলেন। জালফদের অত সৈন্য সামন্ত নেই, তারা নিজেদের ঘর বাড়ী পুড়িয়ে, পথের পাতকুয়া সব বন্ধ ক'রে সহর গ্রাম সব ছেড়ে পালাতে লাগল। এম্নি ক'রে তিনদিন পর্য্যন্ত আবুল কাদের ক্রমাগত এগিয়েও লড়াইয়ের কোন সুযোগ পেলেন না। তিনি যতই এগিয়ে চলেন, কেবল নষ্ট গ্রাম আর পোড়া সহরই দেখেন, কোথাও জল নাই খাবার কিছু নাই, লুটপাট করবার মত কোন জিনিষপত্র নাই। চতুর্থ দিনে তিনি পথ বদলিয়ে সারা দিন হেঁটে একটা জলা জায়গার কাছে এলেন। সেখানে কোন রকমে তৃষ্ণা দূর ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে এমন সময় ভোর রাত্রে দামেল তাঁরদল বল নিয়ে মারমার ক'রে তাদের উপরে এসে পড়লেন। আবুল কাদেরের দল সে চোট আর সামলাতে পারল না—তাদের কেউ কেউ পালিয়ে গেল, অনেকে মারা পড়ল, কিন্তু অধিকাংশই জালফদের হাতে বন্দী হ'ল—সেই বন্দীদের একজন হ'চ্ছেন আবুল কাদের নিজে। জালফরা মহা ফূর্ত্তিতে আবুলকাদেরকে বেঁধে দামেলের কাছে নিয়ে গেল। সকলে ভাবল এইবার দামেল বুঝি তার বুকে ছুরি মেরে তার শত্রুতার প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু দামেল সে রকম কিছুই না ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "আবুলকাদের, তুমি যথার্থ বলত—আজ তুমি বন্দী না হ'য়ে যদি আমি বন্দী হতাম, আর তোমার কাছে আমায় নিয়ে যেত, তা'হলে তুমি কি কর্‌তে"? আবুল কাদের বল্লেন "তোমার বুকে আমার বল্লম বসিয়ে দিতাম। তুমি তার বেশী আর

কি কর্‌বে"? দামেল বল্লেন, "তা নয়। তোমায় মেরে আমার লাভ কি? আমার এই সব নষ্ট ঘর-বাড়ী কি তাতে ভাল হ'য়ে যাবে, আমার প্রজারা কত জনে মারা পড়েছে—তারা কি আবার বেঁচে উঠবে। তোমায় আমি মারব না। তুমি রাজা, কিন্তু রাজার ধর্ম্ম থেকে তুমি পতিত হ'য়েছ। যতদিন তোমার সে দুর্ম্মতি দূর না হয়, ততদিন তুমি রাজত্ব করবার যোগ্য হবে না—ততদিন তুমি আমার দাসত্ব কর্‌বে"। এইভাবে তিনমাস নিজের বাড়ীতে বন্দী ক'রে রেখে তারপর তিনি আবুল কাদেরকে ছেড়ে দিলেন। এখনও নাকি সে দেশের লোকেরা দামেলের এই আশ্চয্য মহত্ত্বের কথা ব'লে গান করে।

নাইগার নদীর আশেপাশে যে সব নিগ্রোরা থাকে তাদের 'মাণ্ডিঙ্গো' বলে। তাদের সম্বন্ধে পার্ক অনেক খবর সংগ্রহ ক'রেছেন। তারা মনে করে এই পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড সমতল মাঠের মত; তার শেষ কোথায় কেউ জানতে পারে না, কারণ তার চারি দিক মেঘে ঘেরা। তারা বছরের হিসাব দেয় বড় বড় ঘটনার নাম ক'রে; যেমন "ফুরবানা যুদ্ধের বছর", "দামেলের বীরত্বের বছর"। পার্ক যে সকল গ্রামে গিয়েছিলেন, তার কোন কোনটিতে সেই বছরকে বলা হ'ত "সাদা লোক আসবার বছর"।

এর পরেও পার্ক আরেকবার দল বল নিয়ে আফ্রিকায় যান এবং সেইখানেই প্রাণ হারান। এবার গোড়াতেই জ্বর জারি হ'য়ে তাঁর লোকজন সব মারা যেতে লাগ্‌ল। ৪৭ জন সাহেবের মধ্যে তিন মাসে কুড়ি জন মারা গেল, বাকী অনেকগুলি অসুখে একেবারে কাহিল হয়ে পড়ল। চার মাসে তিনি আবার নাইগার নদীর ধারে উপস্থিত হ'লেন তখন তিনি আর সঙ্গের দু একটি নিগ্রো ছাড়া আর সকলেই প্রায় অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়েছে। তারপর তিনি নৌকায় চ'ড়ে জলের পথে কয়েক দিন গেলেন, কিন্তু চারিদিক থেকে মূরেরা ক্রমাগত আক্রমণ ক'রে তাঁদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্‌ল। শেষটায় যখন তাঁর সঙ্গের সাতটি মাত্র সাহেব বেঁচে আছে এমন সময় অনেক কষ্টে নিগ্রোদের দেশে এসে তিনি মনে কর্‌লেন, এতক্ষণে নিরাপদ হওয়া গেল। কিন্তু এইখানেই নদী পার হবার সময় তিনি দল বল শুদ্ধ নিগ্রোদের হাতে মারা গেলেন। তাঁর একটি মাত্র বিশ্বস্ত নিগ্রো চাকর তাঁর চিঠি পত্র নিয়ে ফিরে এসে এই খবর দিল যে নদীর স্রোতের মধ্যে নৌকাকে বেকায়দায় পেয়ে নিগ্রোরা তাঁদের মেরে কেটে সব লুটে নিয়েছে। তখন পার্কের বয়স ৩৪ বৎসর মাত্র।

পুণ্যের হিসাব।

রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন সভায় বসে সকলকে এই প্রশ্ন করলেন—"আমি কোন্ পুণ্যবলে পৃথিবীর রাজা হয়েছি?" রাজমন্ত্রী, উজির, নাজির কেহই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। এমন কি রাজার নবরত্ন পণ্ডিতেরাও চুপ করে রইলেন। তখন বিক্রমাদিত্য দেশ বিদেশে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন যে "কোন্ পুণ্যের বলে আমি পৃথিবীর রাজা হয়েছি যে এই কথার উত্তর দিতে পারবে তাকে আমি পঞ্চাশ হাজার সুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দিব।" কিন্তু সপ্তাহ গেল, মাস গেল, বছর ও পার হয়ে গেল তবুও রাজা প্রশ্নের উত্তর পেলেন না।

রাজার রাজ্যে এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিল, ভিক্ষা করে অতি কষ্টে কোনও রকমে সে দিন কাটাত। ব্রাহ্মণ আর তার স্ত্রী, পরিবারে এই দুটি মাত্র প্রাণী—তারা ভারী দুঃখী। রাজার ঢেঁড়ার কথা ব্রাহ্মণীও শুনেছিল। সে একদিন বল্ল—"ওগো! আর ত আধ-পেটা খেয়ে খেয়ে দিন চলে না, যাওনা একবার রাজবাড়ীতে? গিয়ে বল যে তুমি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।" ব্রাহ্মণ বল্ল—"ব্রাহ্মণি! তুমি কি ক্ষেপেছ? কত মহা মহা পণ্ডিত যে কথার উত্তর দিতে পারলেন না, আমি মূর্খ ব্রাহ্মণ কি করে তার উত্তর দিব?"

ব্রাহ্মণী—"আচ্ছা, একবার গিয়ে বলই না যে তুমি পারবে, তারপর সাত দিনের সময় চেয়ে নিও। বলো যে মহারাজ! সাত দিন পরে নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব; তবে কিনা, আমি নিতান্ত গরীব, খেতে পাই না, অনুগ্রহ করে যদি আমাকে পাঁচ শ টাকা দেন তা হলে এ সপ্তাহটা বেঁচে থাকতে পারি। রাজা নিশ্চয়ই তোমাকে বিশ্বাস করে টাকা দেবেন, আমরা ও কিছুকাল সুখে কাটাতে পারব—তারপর যা হয় দেখা যাবে এখন।"

ব্রাহ্মণীর উপদেশ মত ব্রাহ্মণ বিক্রমাদিত্যের সভায় গিয়ে সব কথা বল্ল। রাজা তার কথা বিশ্বাস করে সাত দিনের সময় দিলেন, পাঁচ শ টাকাও দিলেন। টাকা নিয়ে ব্রাহ্মণ যখন বাড়ী ফিরে এল তখন ব্রাহ্মণী ত মহা খুসী। ব্রাহ্মণের কিন্তু বড়ই ভাবনা হলো—সাত দিনের সময় নিয়ে পাঁচ শ টাকা এনেছে এখন ত আর ফাঁকি দিলে চলবে না! ভেবে ভেবে ব্রাহ্মণ বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। এখানে সেখানে ঘুরে ফিরে একদিন দুপুর রোদে এক মাঠে গিয়ে উপস্থিত। বেজায় গরম, বাতাসের লেশ মাত্র নাই—গাছের একটি পাতাও নড়ে না। শ্রান্ত, ক্লান্ত ব্রাহ্মণ মাঠের মাঝখানে একটা

বটগাছ দেখ্‌তে পেয়ে তার ছায়ায় গিয়ে বসল। সেখানে বসেও তার ভাবনা গেল না, উপরের দিকে চেয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখ্‌তে পেল যে গাছের উঁচু ডালের তিনটে পাতা খুব নড়ছে। কোন ডালের পাতা নড়ে না আর ঐ ডালটার শুধু তিনটে পাতা নড়ছে—এটা কেমনতর কথা? ব্রাহ্মণের হলো সন্দেহ। তখন খুব মন দিয়ে পাতা তিনটার দিকে অনেক্ষণ তাকিয়ে থেকে দেখ্‌ল যে তিনটা বিকটাকৃতি মানুষ পাতার উপর বসে রয়েছে।

গরীব হলেও ব্রাহ্মণের সাহস ছিল খুবই, সে তখনি জিজ্ঞাসা করল—"কে হে বাপু তোমরা পাতার উপর বসে রয়েছ?" তখন একজন বল্ল—"আমরা যমদূত।" ব্রাহ্মণ—"তোমরা ওখানে বসে কি করছ?" বটগাছের কাছেই একটা লোক ক্ষেতে লাঙ্গল দিচ্ছিল তাকে দেখিয়ে একজন যমদূত বল্ল—"ঐ লোকটাকে নিতে এসেছি।"

ব্রাহ্মণ—"সুস্থ সবল লোকটা ক্ষেতে হাল দিচ্ছে—তাকে নিতে এসেছ কি রকম? সে ত মরেনি।" যমদূত—"আরে ঠাকুর! ব্যস্ত হও কেন? দেখবে এখন, লোকটা যখন হাল চালিয়ে ক্ষেতের এ পাশে আসবে তখনি ধাঁ করে আমাদের একজন তার সামনে বেণাবন হয়ে পড়বে এবং আর একজন কেউটে সাপ হয়ে বেণাবন থেকে বেরিয়েই তাকে কামড়াবে। তখন আমিও তার আত্মাটা নিয়ে যমরাজার কাছে চলে যাব।" যমদূতের কথায় ব্রাহ্মণের ত চক্ষুস্থির!

তারপর চাষা যখন হাল চালিয়ে ক্রমে ক্ষেতের এপাশে এসে উপস্থিত তখন সত্যি সত্যি তার সামনে হঠাৎ বেণাবন হয়ে পড়ল আর তার ভিতর থেকে কেউটে সাপ বেরিয়ে দিল তাকে কামড়িয়ে—বাস্, তখনি তার মৃত্যু! তারপর তৃতীয় যমদূত চাষার আত্মা নিয়ে যমরাজার কাছে চল্ল দেখে ব্রাহ্মণ হাত জোড় করে, অনেক কাকুতি মিনতি করে তাকে বল্ল—"ভাই! আমার একটি অনুরোধ—দোহাই তোমার! যমরাজাকে জিজ্ঞাসা করো, আমি তাঁকে শুধু একটি মাত্র প্রশ্ন করে চলে আসব—তিনি যদি দয়া করে আমাকে একবার যমপুরীতে যাবার অনুমতি দেন।" ব্রাহ্মণের কথায় রাজি হয়ে দূত চাষার আত্মা নিয়ে চলে গেল।

দূত যমপুরীতে গিয়ে ব্রাহ্মণের অনুরোধের কথা বল্‌লে পর যমরাজা মহাব্যস্ত হয়ে বল্লেন—"রক্ষা কর বাবা! আর জেয়ন্ত মানুষ যমপুরীতে এনে কাজ নেই। এখানে জেয়ন্ত মানুষ এনে একবার যা নাকালটা হয়েছিলাম—সে কথা জন্মেও আমি ভুলব না—অমন আহাম্মুকি কাজ কি আর করি!"

দূত—"কেন মহারাজ! ব্যাপারটা কি হয়েছিল? কৈ, আমি ত তার কিছু শুনিনি।"

যমরাজা—"আরে বাপু! সে অনেক আগেকার কথা। তখন তুমি আমার কাজে বহাল হওনি। ব্যাপারটা কি হয়েছিল জান? অনেক দিন আগে একবার আমার মা পৃথিবীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে দেখ্‌লেন রাস্তা দিয়ে একটা হাতী যাচ্ছে। হাতিটা চল্‌তে চল্‌তে ভারী দুষ্টুমি করছিল আবার তখনি মাহুতের অঙ্কুশের ঘা খেয়েই যেন নেহাৎ ভাল মানুষটি। এই দেখে মা হাতীটাকে বলেছিলেন—"আরে বোকা হাতি! পাহাড়ের মত তোমার দেহটা, আর তোমার গায়ে এত জোর, তবু কিনা তুমি সামান্য একটা মানুষের ভয়ে কাতর হও!' মায়ের কথা শুনে হাতী বল্ল—'আরে যমের মা বুড়ি! মানুষকে তুমি সামান্য বলবে বৈ কি! তোমার ছেলে কিনা মরা মানুষ নিয়ে কারবার করে—একবার সে জেয়ন্ত মানুষের পাল্লায় পড়লে মজাটা বুঝতে পারত।"

হাতির উত্তর শুনে মা ভারী অপমান বোধ করে আমার কাছে এসে নালিশ করলেন। আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে বল্লাম—"আচ্ছা মা! একটা জেয়ন্ত মানুষ যমপুরীতে এনে একবার দেখ্‌ব তাকে জব্দ করতে পারি কিনা।" তখনি দূতেদের হুকুম করলাম—"যাও ত হে! একটা জেয়ন্ত মানুষ ধরে নিয়ে এস।"

যমরাজার হুকুমে দূতেরা পৃথিবীতে এসে মহা বিপ্রদে পড়ে গেল। হাটে, বাজারে, লোকের বাড়ীতে যেখানে হোক্, কাউকে গিয়ে যদি বলে—"চলত হে! যমরাজার হুকুম, তোমাকে একবার যমপুরীতে যেতে হবে," অমনি সকলে মিলে দূতদের বেদম প্রহার দেয় আর বলে—"হতভাগা বেটারা! মরিনি তবু যমপুরীতে যেতে বল্‌ছ?" মার খেয়ে খেয়ে দূত বেচারিদের হাড্ডি নড়ে গেল, গায়ে ব্যথা ধরল। তখন সর্দ্দার দূতটি বল্ল—"চুলোয় যাক্‌গে জেয়ন্ত মানুষ! যমরাজার যত সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড! মরা নিয়ে যাদের কারবার তাদের কেন জেয়ন্ত মানুষ নেওয়া পোষাবে? চল ভাই, আর কাজ নেই—ঢের গুঁতো খেয়েছি, এখন ফিরে চল।"

ফিরবার পথে খানিক দূর গিয়েই তারা দেখল কি একজন কৃষক তার বাড়ীর সাম্‌নে গাছের ছায়ায় খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে। সর্দ্দার দূতের মাথায় তখন হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেল্‌ল—"আচ্ছা ভাই সকল! এ লোকটা ত নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে, চল না কেন খাটিয়া শুদ্ধ একে তুলে নিয়ে যাই?" সকলে দেখল এটা অতি উত্তম পরামর্শ—বাস্, আর কথাটি নাই তখনি ধরাধরি করে খাটিয়া শুদ্ধ নিয়ে রওয়ানা।

খানিক দূর গিয়ে ঝাঁকানির চোটে লোকটার গেল ঘুম ভেঙ্গে। ঘুম ভাঙ্গবা মাত্র তড়াক্ করে খাটিয়ার উপর বসে কৃষক জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"কেরে তোরা? আমাকে কোথা নিয়ে যাচ্ছিস্?" সর্দ্দার দূত বল্ল—"আরে ভাই! চট কেন? যমরাজা বলেছেন

একটা জেয়ন্ত মানুষ নিয়ে যেতে, তাই তোমাকে আমরা যমপুরীতে নিয়ে যাচ্ছি। তা, তোমার যদি যেতে আপত্তি থাকে তা হলে বল—এখনি আবার তোমাকে রেখে আসব।"

কৃষক—"যেতে আমার বিশেষ আপত্তি কিছু নেই, তবে কিনা যমরাজা যখন সিংহাসন ছেড়ে বাড়ীর ভিতর যাবেন ঠিক সেই সময় তোমরা আমাকে পুরীর ভেতর নিয়ে যাবে—এইটে যদি তোমরা প্রতিজ্ঞা করে বল তা'হলেই আমি যেতে রাজি আছি।" এতটা সহজে যে কৃষক যেতে সম্মত হবে দূতেরা তা স্বপ্নেও ভাবেনি—সুতরাং তখনি তারা প্রতিজ্ঞা করে কৃষককে নিয়ে চল্ল।

যমদূতেরা বিলক্ষণ জানে রাজা কখন সিংহাসন থেকে নেবে অন্তঃপুরে যান, ঠিক সেই সময়ে কৃষককে নিয়ে তারা পুরীর ভিতর গেল। ভিতরে গিয়ে কৃষক যাই দেখল

সিংহাসন শূন্য অমনি চক্ষের নিমেষে খাট থেকে লাফিয়ে পড়েই একদম সিংহাসনের উপরে। সিংহাসনে যে চড়ে সেই রাজা, কৃষকও রাজা হয়ে হুকুম করল—"কে আছিস্! নিয়ে আয় পাপ পুণ্যের হিসাবের খাতা।" হুকুম মাত্র দূতেরা খাতা নিয়ে হাজির। খাতার মধ্যে কৃষক নিজের হাতে তার নাম লিখে সেই নামের পাশে বড় বড় অক্ষরে পৃথিবীর সমস্ত পুণ্য কাজের লিষ্টি লিখে রাখল। তারপর হুকুম হলো—"নিয়ে এস যমকে হাত পা বেঁধে।"

যমদূতেরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ীর ভিতর গিয়ে যমকে বল্ল—"মহারাজ! সর্ব্বনাশ হয়েছে। একটা জেয়ন্ত মানুষ ধরে এনেছিলাম, সে ত এসে শূন্য সিংহাসন দেখেই তার উপর চড়ে বসে রাজা হয়ে হুকুম চালাতে আরম্ভ করেছে। পাপ পুণ্যের খাতা আনিয়ে তাতে নিজের নাম লিখে তার পাশে এত বড় পুণ্যের ফর্দ্দ! শুধু তাও নয়, এখানে আবার হুকুম করেছে—ধরে নিয়ে আয় যমকে বেঁধে। মহারাজ! কি উপায় হবে?"

উপায় হবে মাথা আর মুণ্ডু! সংবাদ শুনে ভয়ে যমের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। তখন তিনি জানালা দিয়ে গলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে একদম পিতামহ ব্রহ্মার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত। হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর বিপদের কথা সমস্ত জানিয়ে ব্রহ্মার পা জড়িয়ে ধরে বল্লেন—"দোহাই পিতামহ ঠাকুর! যমপুরীতে জেয়ন্ত মানুষ এনে মাটি খেয়েছি এখন এ বিপদ থেকে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।"

যমরাজার কথা শুনে ব্রহ্মার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি বল্লেন—"তাই ত! এখন উপায়। আমাদ্বারা ত এর কোন প্রতিকার হবে না—শীগ্‌গির চল বিষ্ণুর কাছে যাই।" ব্রহ্মা যমকে নিয়ে বিষ্ণুর নিকটে গেলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে বিষ্ণু বল্লেন—"বিপদ ত নেহাৎ সহজ নয় দেখ্‌ছি। এখন উপায়! লোকটা শিবের ভক্ত, একি সহজে আমার কথা শুন্‌বে। চল তাহলে একবার শিবের কাছে যাই।"

ব্রহ্মা বিষ্ণু যমকে নিয়ে শিবের নিকটে গেলেন। শিব তাঁদের কথা শুনে যমকে খুব গালাগালি করে বল্লেন—"কেন হে বাপু! তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হলো? মরা মানুষের সঙ্গে তোমার কারবার, তুমি কেন আবার জেয়ন্ত মানুষের সঙ্গে ঘাঁটা ঘাঁটি কর্‌তে গিয়েছিলে? তোমার যেমন কাজ এখন তার ফল ভোগ কর।"

ক্রমশঃ

অদ্ভুত কাঁকড়া।

এবারের রঙিন ছবিতে Giant Crab বা রাক্ষুসে কাঁকড়ার ছবি দেওয়া হ'য়েছে। ছবিটা দেখলে হঠাৎ মনে হয়, এর চেহারাটি তেমন কিছু ভীষণ নয়, গায়ের রংটিও বেশ সুন্দরই বল্‌তে হবে—তবে একে রাক্ষুসে বলা হ'চ্ছে কেন? 'রাক্ষুসে' বলার একমাত্র কারণ হ'চ্ছে তার দেহের আয়তনটি। খুব বড় একটি রাক্ষুসে কাঁকড়ার বড় দুটি দাঁড়া ফাঁক করিয়ে তার আগা থেকে আগা পর্য্যন্ত মাপ নিয়ে দেখা গেছে—দশ বার হাত লম্বা! এটা হ'ল কর্ত্তা-কাঁকড়ার কথা—তাঁর গিন্নী যে কাঁকড়ি, তাঁকে ত আর যখন তখন লড়াই কর্‌তে হয় না, কাজেই তাঁর অত বড় দাঁড়াও নেই।

গেছো কাঁকড়া।

এই কাঁকড়া থাকে জাপান দেশে সমুদ্রের জলে। সেইখানে কূলের কাছে সমুদ্রের শেওলা-ধরা পাথরের মধ্যে রাক্ষুসে কাঁকড়া গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে। নামটি রাক্ষুসে হ'লেও এদের স্বভাবটি মোটেও রাক্ষসের মত নয়—সেই জন্য নানা জাতীয় মাছ, আর অক্টোপাস্ প্রভৃতি জলজন্তু, এদের দেখ্‌তে পেলেই তেড়ে খেতে আসে। ছবিতে যে রকম চেহারা দেখ্‌ছ—ও রকম চেহারা তার অনেক সময়েই দেখা যায় না। কারণ, নানারকম শেওলা প্রবাল আর 'স্পঞ্জ' তার গায়ের উপর বাসা ক'রে তার আসল চেহারাটিকে

এমন বেমালুম ঢেকে রাখে যে খুব কাছে গেলেও অনেক সময় তাকে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হয়।

এখানে কতগুলা কাঁকড়ার ছবি দেওয়া হ'য়েছে এগুলাকে 'গেছো কাঁকড়া' বলা যায়। এরা সত্যি সত্যি গাছে চড়ে কিনা তা নিয়ে আগে নানারকম তর্ক শোনা যেত, কিন্তু এখন এটা একেবারে সত্য বলে প্রমাণ হ'য়েছে। তবে এরা যে নারকেল গাছের আগায় চ'ড়ে ডাব পেড়ে আনে, এ কথাটা অনেক সময় শোনা গেলেও এর কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। যা হো'ক অল্পই উঠুক আর বেশীই উঠুক, ডাব পাড়ুক আর নাই পাড়ুক, গাছে চড়া আর নারকেল খাওয়া এই দুই বিদ্যাতেই এর বেশ বাহাদুরী আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের কতগুলি ছোট ছোট দ্বীপে এই কাঁকড়ার বাড়ী। সেখানে নারকেল গাছের অভাব নাই, নারকেল মাটিতে পড়লেই গেছো কাঁকড়া তাকে আক্রমণ করে। প্রথমতঃ সে নারকেলটার ছোবড়া ছাড়িয়ে নেয়—এই ছোবড়া তাদের গর্ত্তে বিছাবার জন্য দরকার হয়। তারপর যে দিকে নারকেলের 'চোখ' থাকে, সেই দিকে দাঁড়া দিয়ে ঠুকে গর্ত্ত ক'রে সেই গর্ত্তের মধ্যে দাঁড়া ঢুকিয়ে খুব মজা ক'রে খায়। আস্ত নারকেলটিকে যে দাঁড়া দিয়ে ভাঙ্‌তে পারে—তার দাঁড়ার একটি চাপটে যে মানুষের হাড় পর্য্যন্ত ভেঙে দেয় সেটা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তবু মানুষে তাকে ধরতে ছাড়ে না—কারণ এ কাঁকড়া খেতে নাকি অতি চমৎকার। তার গায়ে এত চর্ব্বি যে সেই চর্ব্বি গলিয়ে সে দেশের লোকেরা তেল বার ক'রে রাখে। তার উপর সে দেশের বুনো শূয়োরগুলারও কেমন বদভ্যাস—তারা গর্ত্ত খুঁড়ে এই কাঁকড়াদের বা'র ক'রে খেয়ে ফেলে!

রাক্ষুসে কাঁকড়ার মত বড় না হ'লেও, এগুলিও যে নেহাৎ ছোট নয় তা এই ছবিতে ঐ নারকেলের খোলাগুলোর সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখলেই বুঝতে পারবে। একবার এই রকম একটা কাঁকড়াকে একটা মজবুত টিনের বাক্সে বন্ধ ক'রে বাক্সটাকে তার দিয়ে বেঁধে রাখা হ'য়েছিল। কিন্তু পরের দিন দেখা গেল যে কাঁকড়াটা বাক্সের ধার মুচড়িয়ে ফাঁক ক'রে তা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে!

হিতে বিপরীত।

ওরে ছাগল, বল্‌ত আগে
সুড়সুড়িটা কেমন লাগে ?
কই গেল তোর জারিজুরি
লম্ফঝম্প বাহাদুরি।

নিত্যি যে তুই আসতি তেড়ে
শিং নেড়ে আর দাড়ি নেড়ে
ওরে ছাগল করবি রে কি ?
গুঁতোবি ত আয়না দেখি।

হাঁ হাঁ হাঁ, এ কেমন কথা ?
এমন ধারা অভদ্রতা !
শান্ত যারা ইতর প্রাণী
তাদের পরে চোখরাঙানি !

ঠাণ্ডা মেজাজ কয় না কিছু
লাগতে গেছ তারই পিছু ?
শিক্ষা তোদের এম্নিতর
ছি—ছি—ছি ! লজ্জা বড়।

সব চেয়ে উঁচু।

ছাগল ভাবে সামনে একি !
একটুখানি গুঁতিয়ে দেখি।

গুঁতোর চোটে ধড়াধ্বড়
হুড়মুড়িয়ে ধূলোয় পড়।

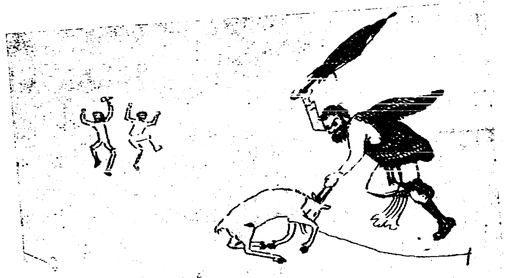

তবে রে পাজি লক্ষ্মীছাড়া
আমার 'পরেই বিদ্যেঝাড়া,

পাত্রাপাত্র নাই কিরে হুঁশ্
দেদমাদম্ ধুপুস ধাপুস্।

সব চেয়ে উঁচু।

তোমাদের মধ্যে কে কত উঁচু বাড়ী কিম্বা স্তম্ভ দেখেছ বল তো ? যারা কলকাতায় থাক কিম্বা কলকাতায় বেড়াতে এসেছ তারা নিশ্চয়ই গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের নাম করবে। আবার তোমাদের মধ্যে যারা দিল্লী গিয়েছ তারা হয়তো কুতব মিনারের নাম করবে। কিন্তু মনুমেণ্ট কিম্বা কুতব মিনার কেউ না দেখে থাকলেও বিশেষ দুঃখ করবার কারণ

নেই ; কেন না যাঁরা কেবল মনুমেণ্টের উপর উঠেছেন কিম্বা কুতবে চড়েছেন তাঁরা কেউই পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে উঁচু স্তম্ভের কাছ দিয়েও যান নি। যদি কেউ কুতব কিম্বামনুমেণ্টের গল্প করে তোমাদের তাক লাগিয়ে দিতে চান তা হলে তোমরা নির্ভয়ে তাঁদের এ কথাটা জানিয়ে দিতে পার।

মানুষের তৈরী সকলের চাইতে উঁচু জিনিষ হচ্ছে "ইফেল টাওয়ার"। কত উঁচু জান? প্রায় ১০০০ হাজার ফিট। কিছু আন্দাজ করতে পারলে কি কতটা উঁচু? আচ্ছা মনে কর, কলকাতার তিনতলা বাড়ীগুলো সাধারণতঃ ৩০।৩৫ ফুট উঁচু হয়। তাহ'লে ইফেল টাওয়ার ত্রিশটা তিন তলা বাড়ীর সমান।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী সহরে একটা প্রকাণ্ড মেলা হয়। ফরাসী দেশের সব লোকেরা মিলে মেলাটাকে যতদূর সম্ভব জাঁকালো ও আশ্চর্য্য রকমের করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। ইফেল বলে সেই সময়ে একজন মস্ত ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি মেলার কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে জানালেন যে তিনি অনুমতি পেলে ঐ মেলাতে পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে উঁচু একটা স্তম্ভ তৈয়ার করে দেবেন। মেলার কর্ত্তারা খুব খুসী হয়েই অনুমতি দিলেন। ইফেল তখন তাঁর প্ল্যানমত স্তম্ভটি গড়ে দিলেন এবং তাঁর নাম থেকেই ঐ স্তম্ভের নাম হল ইফেল টাওয়ার।

ইফেল টাওয়ার আগা গোড়া লোহার তৈরী। ছবিতে দেখতে পাবে, চারটি বাঁকা বাঁকা লোহার পায়ার উপর স্তম্ভটি দাঁড়িয়ে আছে। পায়াগুলো যদি বাঁকা না হয়ে একেবারে খাড়া হতো তা হলে ঝড়ের সময় বাতাসের ধাক্কা লেগে ইফেল টাওয়ার কবে যে মাটিতে পড়ে যেত তার ঠিকানা নাই। ঝড় বাতাসের ঝাপটা ঐ বাঁকা পায়ের গায়ে লেগে চারধারে ছড়িয়ে যায়, টাওয়ারের কোন ক্ষতি করতে পারে না! এ সম্বন্ধে একটা গল্প বলি শোন। ফ্রান্সে ইফেল টাওয়ারের দেখাদেখি জার্ম্মাণেরাও একটা খুব উঁচু লোহার স্তম্ভ বানিয়েছিল। স্তম্ভটি উঁচু হল সাড়ে ছ'শ ফুট কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারেরা তার পায়াগুলো করেছিলেন সোজা। তার ফলে স্তম্ভটি তৈরী হবার পাঁচ মাস পরেই এক দিন খুব ঝড় হয়ে, অত সাধের টাওয়ারটি হুড়মুড় করে ঘাড়মুড় শুদ্ধ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো!

কিন্তু ইফেল টাওয়ারটি কেবল দেখবারই জিনিষ তা নয়। ফরাসীরা সেটাকে অনেক কাজে লাগিয়েছে। মেলার সময় রাত্রিতে ইফেলের চূড়ার উপর একটা মস্ত ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বালা হতো। সেই আলোকে শুধু যে সমস্ত জেলাটা আলোময় হয়ে উঠতো তা নয় বহু দূরের সহর হতেও সেই আলোর ছটা লোকে দেখতে পেত। এখন ইফেলের চূড়ার উপরে তারহীন টেলিগ্রামের যন্ত্র বসানো আছে। সেখান থেকে প্রতিদিন বেলা ঠিক বারেটার সময় আকাশে বিদ্যুতের ঢেউ তুলে বহুদূর পর্য্যন্ত সঙ্কেত (signal) করা হয়। সমুদ্রে যে সব জাহাজ থাকে সেই সব জাহাজ ঐ সঙ্কেত পেয়ে নিজেদের ঘড়ি ঠিক করে নয়। ঠিক আমাদের তোপ পড়ার মত আর কি।

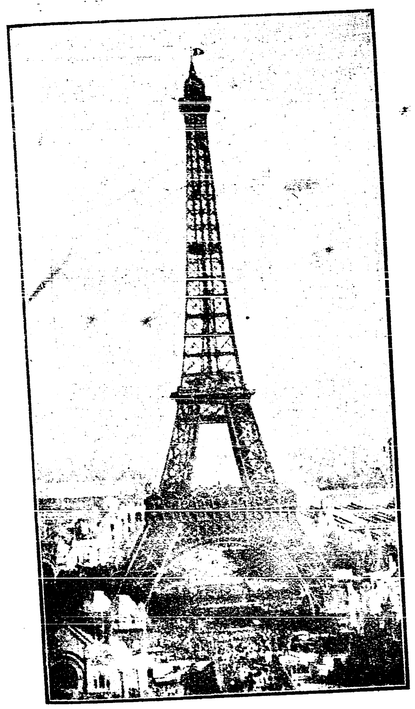

এখন যুদ্ধের সময় ইফেলের চূড়া থেকে জার্ম্মানদের জেপেলিন আসছে কি না লক্ষ্য রাখা হয়! আর তা ছাড়া চূড়ার উপরে একটা খুব জোরালো "সার্চ্চ-লাইট" বসানো আছে। জেপেলিন কাছাকাছি এলেই ঐ আলো তার উপর ফেলে তাকে আক্রমন করবার সুবিধা করে দেয়।

চল্‌তি ঘরে (lift) করে ইফেল টাওয়ারে উঠা নামা যায়। টাওয়ারের ভিতরে হোটেল থেকে ডাকঘর পর্য্যন্ত সবই বন্দবস্ত আছে; উঠ খাও চিঠি লেখ যা ইচ্ছা কর। ইফেলের চূড়ার উপর থেকে প্যারী সহর ও তার আশ পাশ অনেক দূর পর্য্যন্ত ঠিক ম্যাপে আঁকা বাড়ী ঘরের মত দেখায়।

উঁচু স্তম্ভের কথা বলেছি, এখন সব চাইতে উঁচু মূর্ত্তির কথা বলা যাক। এ মূর্ত্তিটি হচ্ছে নিউ-ইয়র্কের "স্বাধীনতার মূর্ত্তি।" জাহাজে করে নিউ-ইয়র্ক বন্দরে ঢুকতে গেলেই এই মূর্ত্তিটি সকলের আগে চোখে পড়ে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা আমেরিকাকে এই স্বাধীনতার মূর্ত্তি উপহার দেন। মূর্ত্তিটি দেড়শো ফুট উঁচু। যে গাঁথনির উপর সেটি দাঁড়িয়ে আছে সেটা শুদ্ধ ধর্‌লে তিন শো ফুট। মূর্ত্তিটি তৈয়ারী করতে দশ বৎসর সময় লেগেছিল এবং আঠারো লাখ টাকা খরচ পড়েছিল। মূর্ত্তির হাতে একটা মস্ত আলো আছে, রাত্রিতে সেই আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং রাত্রে এই মূর্ত্তিটি সমুদ্রের আলোকস্তম্ভের কাজ করে। মূর্ত্তির ভিতরে পা থেকে হাতের আগা পর্য্যন্ত আগা গোড়া একটা সুড়ঙ্গ। তার ভিতর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা যায়।

ছোট গল্প।

[ফরাসী শিশুপাঠ হইতে]

(১)

প্রসিদ্ধ গল্প লেখক ঈশপ্ একদিন রাস্তায় বেড়াচ্ছিলেন—এমন সময় একজন পথিক তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—দূরের পাহাড়টা যে দেখা যাচ্ছে ওখানে পৌঁছতে কত সময় লাগবে।

ঈশপ্ বল্লেন "হেঁটে গেলেই পৌঁছতে পারবে।" লোকটা বল্লো—"সে তো আমিও জানি—কিন্তু কতক্ষণ লাগবে—তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলুম।"

ঈশপ্ একটু রাগলেন—যা আগে বলেছিলেন এবারেও তাই বল্লেন।

পথিক বল্লো "লোকটা বোকা। এর কাছ থেকে কিছু জানবার আশা নেই—যাই হাঁটি।"

কিছুদূর যেতেই ঈশপ্ তাকে ডাকলেন—পথিক ফিরে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"কেন, ডাকছ যে?" ঈশপ বল্লেন—"তোমার পাহাড়ে যেতে দেড় ঘণ্টা লাগবে—তাই বলতে ডাকলুম।"

"তা আগে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলুম তখন বলতে পার নি কেন?" ঈশপ বল্লেন "কারণ আগে তোমার হাঁটার দৌড় দেখে—পরে বল্লুম।"

(২)

একজন মস্ত ধনী লোক—কিন্তু বেজায় কৃপণ সে—তার নিজের একখানি তৈলচিত্র করবার জন্য চিত্রকরের কাছে গেলেন,। দর দস্তুর ঠিক হলো। কিছু দিন পরে চিত্রও শেষ হলো—ভারী সুন্দর চিত্র হয়েছিল—একেবারে অবিকল কৃপণ ধনীর মতন। টাকা দিবার সময় কৃপণের যত কষাকষি আরম্ভ হলো, সে দর কমাবার জন্য বলতে আরম্ভ কর্‌ল—চিত্র মোটে ভাল হয় নাই!

চিত্রকর যে দাম ঠিক করেছিল তার কমে চিত্র ছাড়লো না—কৃপণও বল্লো—"রেখে দাও, ও চিত্র চাই না আমি।"

চিত্রকর চিত্রটি বেশ ভাল করে বেঁধে—তার দোরের সম্মুখে ঝুলিয়ে বড় অক্ষরে লিখে দিল—"আমি ঋণ শোধ করতে না পেরে এখানে আছি।"

সহর শুদ্ধ লোক চিত্র দেখে হাসা হাসি আরম্ভ কর্‌ল, ধনী সকলের ঠাট্টার বিষয় হয়ে পড়লেন। অবশেষে ধনী উচিত মূল্য দিয়ে নিজের ছবি সরিয়ে নিলেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

?

তার মনিবটি এক পাগল।

এক যে ছিল ছাগল

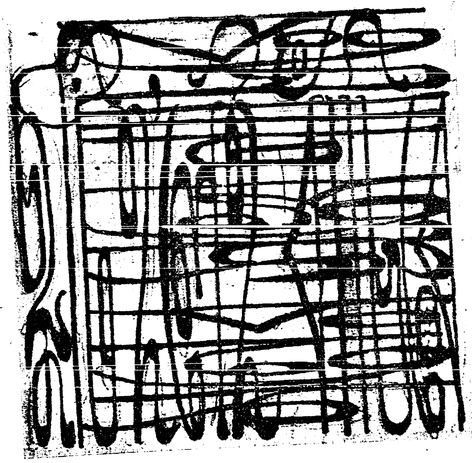

এটা পড় দেখি!

গত মাসের ধাঁধার উত্তর—

১। তবলা।

২। কমলা-বেগুনি-সবুজ-হলদে-শাদা-গোলাপী-কাল-নীল-লাল।

নিম্নলিখিত গ্রাহকগ্রাহিকাগণ দুইটি ধাঁধার উত্তর ঠিক দিয়াছেন :—

রামকিঙ্কর সেন, সুরেশ্বরী দেবী, প্রেমতোষ রুদ্র, জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখার্জ্জী, গোহালা ছাত্রহিতৈষিণী সভা, ফণিন্দ্রনাথ বসু, অমূল্যচন্দ্র মিত্র, সুধীরকুমার পাল, রহম তলবারী, অমিয়াসুন্দরী মিত্র, শান্তিময়ী দেবী, লালা পৃথ্বীনাথ মোহর, প্রেমতোষ রায়, ভূপালচন্দ্র রায়চৌধুরী, ইন্দুভূষণ চৌধুরী, প্রফুল্লনাথ চৌধুরী, রিখবদাস সিংহি, তারাদাস সান্যাল, কমলাপ্রসন্ন রায়, দেবেন্দ্রনাথ মুস্তোফী, অমিয়কুমার ঘোষ, গুণবন্ত সিংবোথরা, বিমলেন্দু রায়, রঙ্গপুর বণিক লাইব্রেরী, আউটসাহী বাবুবাড়ীর ছেলেরা, অনিলকুমার গুহ, লাবণ্যপ্রভা চৌধুরী, কল্যাণকুমার বসু, মদনগোপাল মহোতা, কমলা দে, মণীন্দ্র কুমার সিংহ, বিকাশচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ দে, স্নেহলতা দত্ত, সুধাংশুকুমার গাঙ্গুলী, কমলাবালা দেবী, হেমাঙ্গিনী ঘোষ, সুবোধকুমার ঘোষ, শৈলেন্দ্রকুমার বসু, শম্ভুনাথ রায়, যতীন্দ্রনাথ মিত্র, জীতেন্দ্রমোহন সেন, কামাখ্যারঞ্জন সেন, রমেশচন্দ্র মল্লিক, যতীরঞ্জন সেন, সুজাতা দত্ত, তারাপ্রসন্ন মুখার্জ্জী, মণিকা রায়, বিজয়কৃষ্ণ সেনগুপ্ত, পরিমল রায়, কমলিনী দেবী, ননীগোপাল ঘোষ, কনকলতা রায়, হেমন্তকুমার ইন্দ্র, বীণাপাণী দেবী, শরদিন্দু বসু, নিহারচন্দ্র মিত্র, হরেন্দ্রনাথ শীল, কিরণচন্দ্র নিয়োগী,, হীরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী, আদিত্যসাধন মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মলকুমার সেনগুপ্ত, কেশবচন্দ্র সেন, সুবর্ণলতা দেবী, নন্দরাণী সিংহ, সুলতিকা সান্যাল, নির্ম্মলকুমার ঘোষ, নিরুবালা সেন, ননীবালা দেবী, ভবেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ রায়, সুবোধচন্দ্র সেন, সুরেশচন্দ্র রায়, সুধীরকুমার সিংহ, সুনির্ম্মলচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রনাথ বসু, লতিকা দেবী, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, দেবজ্যোতি বর্ম্মণ, ননীগোপাল বসু, নিরুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণপদ বসু, সুবালা সেন, সুধাংশুভূষণ সেন, রবীন্দ্রমোহন মুখার্জ্জী, তুহিনকুমারী দত্ত, মহিতচন্দ্র চৌধুরী, ঋণপ্রভা দেবী, নৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, তারাপ্রসন্ন মুখার্জ্জী, প্রভাতচন্দ্র বসু, রাধাপ্রসাদ প্রামাণিক, সুধীরা দেবী, হিমাংশুনিভা সেনগুপ্ত, নিমাইদাস পাল, শ্বেতকেতু বসু, দেবীপ্রসাদ ঘোষ, হরিদাস চৌধুরী, হরিসাধন পাইন, মনোরঞ্জনবালা দাসী, বাসন্তী দেবী, মাধুরীলতা দাসগুপ্তা, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অমলচন্দ্র চৌধুরী, কুমারীকুমার দাস, জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সুবোধকৃষ্ণ পাল, জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, শচীন্দ্রকুমার বসুমল্লিক, ভূপেন্দ্রকিশোর আচার্য্যচৌধুরী, সুধীরকুমার মল্লিক, চক্রধর চৌধুরী, অনুকূলচন্দ্র ঘোষ, বর্ষারাণী, মণিভূষণ মুস্তাফী, সুষমা সেনগুপ্তা, হিমাংশুবিকাশ বসু, প্রকাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, গগনচাঁদ মল্লিক, তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ ঘোষ, সত্যেন্দ্রকেশরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

লোভী ছেলে।

গ্রন্থাগার
ক সং
ণী সং
কলিকাতা।

সন্দেশ

চতুর্থ বর্ষ কার্ত্তিক, ১৩২৩ সপ্তম সংখ্যা।

লোভী ছেলে।

কি ভেবে যে আপন মনে
হাসি আসে ঠোঁটের কোণে,—
আধ' আধ' ঝাপ্‌সা বুলি
কোন কথা কয়না খুলি।
ব'সে ব'সে একলা নিজে
লোভী ছেলে ভাবেন কি যে—
শুধু শুধু চামচ চেটে
মনে মনে সাধ কি মেটে ?
একটু খানি মিষ্টি দিয়ে
রাখ আমায় চুপ করিয়ে,
নৈলে পরে চেঁচিয়ে জোরে,
তুলব বাড়ী মাথায় ক'রে।

TORN PAGE(S).
COLOURED DOCUMENT.

বিশ্বামিত্র।

মহামুনি তেজস্বী বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বপুরুষ পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল গাধি। পিতার মৃত্যুর পর বিশ্বামিত্র বহুকাল পৃথিবী পালন করিয়া সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে একবার তিনি প্রায় এক অক্ষৌহিনী সৈন্য লইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে বাহির হন। নানা দেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া রাজা বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠ মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত। মহামুনি বসিষ্ঠ তাঁহাকে অতি আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আপনি পৃথিবীর রাজা হইয়া দরিদ্রের কুটিরে আসিয়াছেন—আমি ধন্য হইলাম। আপনি সম্মত হইলে আপনার ও আপনার সৈন্য-গণের অতিথিসৎকার করিতে ইচ্ছা করি। আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ করুন।"

রাজা বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠের চরণ বন্দনা করিয়া অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন—"পূজনীয় বসিষ্ঠদেব! আপনার কথায় আমি ধন্য হইলাম, আপনার ইচ্ছা প্রকাশেই আমার সৎকার করা হইয়াছে। এখন আপনার পায়ের ধূলা এবং আশীর্ব্বাদ দিন আমি বিদায় হই।" বসিষ্ঠ কিছুতেই ছাড়িলেন না, তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার জন্য বারবার বিশ্বামিত্রকে অনুরোধ করিলে পর রাজা বিশ্বামিত্রও তখন রাজি হইলেন।

মুনির আশ্রমে ফল মূলই খাদ্য, কিন্তু পৃথিবীর রাজা বিশ্বমিত্রকে এবং তাঁহার এতগুলি সৈন্যকে শুধু ফল মূল খাওয়াইলে ত চলিবে না—রাজার উপযুক্ত আয়োজন করা চাই! ব্রহ্মাপুত্র মহামুনি বসিষ্ঠ তখন কি করিলেন? তাঁহার একটি কামধেনু গাই ছিল তাহার নাম শবলা। তিনি শবলার নিকট গিয়া বলিলেন—"মা শবলা! রাজা বিশ্বামিত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি তুমি তাঁহার উপযুক্ত সৎকারের আয়োজন কর—দেখিও যেন আমার ইজ্জৎ বজায় থাকে।"

শবলা আহারের বিরাট আয়োজন করিলেন। লুচি, মণ্ডা, পায়স, পিঠা, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর প্রভৃতি চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সকল রকমের রাশি রাশি পর্ব্বত প্রমাণ সুমিষ্ট খাদ্যের বন্দোবস্ত হইল। সে যে কি আয়োজন তাহার কথা আর কি বলিব! রাজা বিশ্বামিত্র তাঁহার নিজের বাড়ীতেও সেরূপ নানা প্রকারের উত্তম উত্তম খাবার কখন চক্ষে দেখেন নাই। আহারের পর বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠকে বলিলেন—"প্রভু! আপনার অতিথিসৎকারে আমরা পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এখন আমার একটি অনুরোধ

আপনাকে রাখিতে হইবে। আপনার শবলা একটি রত্ন, তাহার প্রতি আমার ভারী লোভ হইয়াছে। আমি পৃথিবীর রাজা আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি—অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শবলা দান করুন।"

মহাত্মা বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন—"মহারাজ! শবলা আমার অতি আদরের এবং তাহার অনুগ্রহে আমি যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি সকলই করিয়া থাকি। শত কোটি গাভী কিম্বা লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা পাইলেও আমি শবলাকে ছাড়িতে পারি না। শবলাই আমার সর্ব্বস্ব ও সকল সুখের কারণ, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই অনুরোধ আমাকে করিবেন না।"

বসিষ্ঠ যখন কিছুতেই শবলাকে দিতে রাজি হইলেন না তখন তেজস্বী বিশ্বামিত্রের রাগ হইল, তিনি জবরদস্তি করিয়া শবলাকে লইয়া চলিলেন। মনের দুঃখে শবলার চক্ষে জল আসিল এবং তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—"হায়! বিশ্বামিত্রের লোকেরা আমাকে লইয়া যাইতেছে, তবু প্রভু বসিষ্ঠ কিছুই বলিলেন না! আমি তাঁহার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন?" এইরূপ চিন্তার পর শবলা হঠাৎ রাজভৃত্যদের এড়াইয়া হম্বারবে চীৎকার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে বসিষ্ঠের নিকটে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"প্রভু ব্রহ্মানন্দন! আমাকে রাজা বিশ্বামিত্র লইয়া যাইতেছেন; তবে কি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন?"

বসিষ্ঠ বলিলেন—"না মা! আমি কেন তোমাকে পরিত্যাগ করিব? রাজা বলপূর্ব্বক তোমাকে লইয়া যাইতেছেন। আমি দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ, বিশ্বামিত্র পৃথিবী-পতি বলশালী ক্ষত্রিয় রাজা, অক্ষৌহিনী সৈন্য তাঁহার সহায়—আমি কিরূপে তাঁহাকে বাধা দিব?"

শবলা বলিলেন—"প্রভু! পণ্ডিতদের নিকট শুনিয়াছি ব্রাহ্মণের তপস্যার বলের নিকট প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়ের বল অতি তুচ্ছ, সুতরাং আপনি দুর্ব্বল একথা ঠিক নহে। আমারও ব্রহ্মবল আছে, আপনি হুকুম করুন আমি এখনি গর্ব্বিত ক্ষত্রিয় রাজার সৈন্যগণকে বিনাশ করিতেছি।"

বসিষ্ঠ বলিলেন—"তথাস্তু। তুমি সৈন্য সৃষ্টি করিয়া শত্রু বিনাশ কর।" ইহার পর আর কথা কি? শবলা সৈন্য সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার 'হম্বা' রবে লক্ষ লক্ষ সৈন্য বাহির হইয়া বিশ্বামিত্রের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। শত চেষ্টা করিয়াও রাজা তাঁহার সৈন্যদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন বিশ্বামিত্রের এক শত পুত্র

ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বসিষ্ঠকে আক্রমণ করিল। মহামুনি বসিষ্ঠ একবার মাত্র হুঙ্কার করিলেন আর বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ ভস্ম হইয়া গেল। সৈন্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে, চক্ষের সম্মুখে পুত্রগণ বসিষ্ঠের গর্জ্জন শুনিয়াই ভস্ম হইয়া গেল—বিশ্বামিত্রের লজ্জার সীমা পরিসীমা রহিল না, তিনি ভারী চিন্তিত হইলেন। তখন তিনি তাঁহার এক পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা! তুমি দেশে গিয়া রাজ্য শাসন কর—আমি কোন্ লজ্জায় লোককে মুখ দেখাইব? এখন হইতে বনে গিয়া মহাদেবের তপস্যাই জীবনের সম্বল করিলাম।"

হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে দর্শন না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি আসিয়া রাজাকে বলিলেন—"তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।" রাজা মহাদেবকে বিনয়ের সহিত প্রণাম করিয়া বলিলেন—"প্রভু! আপনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে সমস্ত ধনুর্ব্বিদ্যা আমাকে প্রদান করুন। আপনার প্রসাদে দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস প্রভৃতির সমুদায় অস্ত্র আমার আয়ত্ত হউক।" মহাদেব রাজাকে 'তথাস্তু' বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মহাদেবের নিকট বর পাইয়া বিশ্বামিত্রের অহঙ্কারের সীমাই রহিল না। তিনি ভাবিলেন 'আর কি, বসিষ্ঠের প্রাণ ত এখন আমার হাতের মুঠার মধ্যে—এইবারে ভাল করিয়াই আমার অপমানের প্রতিশোধটা লইতে হইবে।"

তখন বসিষ্ঠের আশ্রমে গিয়া বিশ্বামিত্র বাছিয়া বাছিয়া ভয়ঙ্কর বাণ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার আগুনে তপোবন দগ্ধপ্রায় হইল; তপোবনবাসী শত শত মুনি ঋষি, পশু পক্ষী এবং বসিষ্ঠের শিষ্যেরা ভয়ে আশ্রম ছাড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। মহামুনি বসিষ্ঠ 'ভয় নাই, ভয় নাই' বলিয়া কত আশ্বাস দিলেন কিন্তু কেহই তাহা শুনিল না—দেখিতে দেখিতে আশ্রম শূন্য হইয়া গেল। বসিষ্ঠ মুনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কালদণ্ডের ন্যায় ভীষণ ব্রহ্মদণ্ড হাতে লইয়া বিশ্বামিত্রের সম্মুখে গিয়া বলিলেন—"রে দুরাচার বিশ্বামিত্র! তুই আমার পবিত্র আশ্রম নষ্ট করিলি, আজ তোর মরণ নিশ্চয়।"

গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র ধনুতে আগ্নেয় অস্ত্র সন্ধান করিয়া বলিলেন—"ক্ষান্ত হও! কার হাতে কার মৃত্যু হয় এখনি তাহা দেখা যাইবে।" ক্রুদ্ধ বসিষ্ঠ ব্রহ্মদণ্ড হস্তে নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"রে ক্ষত্রিয়াধম! আমি তোর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি, তোর যতদূর

শক্তি থাকে দেখা। আমার এই ব্রহ্মদণ্ড দিয়া তোর সকল অস্ত্রের দর্প নাশ করিব।" বিশ্বামিত্র আগ্নেয় অস্ত্র ছাড়িলেন, বসিষ্ঠের চারিদিকে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। জল ছিটাইয়া দিলে আগুন যেমন নিভিয়া যায় বসিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডের প্রভাবে

চারিদিকের আগুন তেমনি ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র ক্রোধে বারুণ, ঐন্দ্র, পাশুপত, ঐশিক, জৃম্ভণ, ব্রহ্মপাশ, বিষ্ণুচক্র, বায়ব্য, ত্রিশূল প্রভৃতি কত কি ভীষণ অস্ত্র ছাড়িলেন! বসিষ্ঠ তাঁহার দণ্ড দিয়া অনায়াসে সেই সকল অস্ত্র নিবারণ করিলেন।

মহাদেবের ভয়ঙ্কর অস্ত্র সকল বিনষ্ট হইল দেখিয়া বিশ্বামিত্র লইলেন ব্রহ্মাস্ত্র। বিশ্বামিত্রের হাতে ব্রহ্মাস্ত্র দেখিয়া দেবতারা ভয় পাইলেন, সমস্ত পৃথিবীর লোক হাহাকার করিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন কিন্তু এই অতি ভীষণ অস্ত্রটিকেও বসিষ্ঠ

তাঁহার দণ্ড দিয়া বিফল করিয়া দিলেন। সেই সময়ে নাকি বসিষ্ঠের চেহারা বড়ই ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। তাঁহার দণ্ডের মুখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, শরীরের লোমকূপ হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল। তখন সকলে অতি বিনয়ের সহিত তাঁহার বন্দনা করিয়া বলিলেন—"প্রভু! আপনার তপস্যালব্ধ ব্রহ্মবলের নিকট গর্ব্বিত বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয় বল পরাস্ত হইয়াছে, এখন দয়া করিয়া আপনার এই মহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি শান্ত করুন।" সকলের অনুরোধে বসিষ্ঠ শান্ত ভাব ধারণ করিলেন।

মহাদেবের নিকট বর পাইয়াও বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠের নিকট হারিয়া গেলেন! তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বিশ্বামিত্র মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"ক্ষত্রিয়ের বলে ধিক্! ব্রহ্ম বলই পরম বল—আজ ব্রহ্মবল দ্বারাই আমার শিবদত্ত ধনুর্ব্বিদ্যা এবং অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত বিফল হইল। সুতরাং যেরূপ তপস্যা করিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় এখন হইতে আমি সেইরূপ তপস্যা করিব।"

ইহার পর বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করিয়া দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিলে পর দেবতারা তাঁহাকে 'রাজর্ষি' করিয়া দিলেন। বিশ্বামিত্র তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় বহুকাল ধরিয়া তপস্যা করিলেন। তখন দেবতারা আসিয়া তাঁহাকে 'মুনি' বলিলেন। বিশ্বামিত্র তাহাতেই বা কেন তুষ্ট হইবেন? তিনি যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মর্ষি হইতে চান! পুনরায় তিনি তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সে অতি ভয়ঙ্কর তপস্যা—শীতে, গ্রীষ্মে, অনাহারে, অনিদ্রায় মাথা নীচের দিকে ঝুলাইয়া বহু শত বৎসর এমনি কঠোর তপস্যা করিলেন যে তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া দেবতাদিগকে মানিয়া লইতে হইল। দেবতারা সকলে মিলিয়া মহামুনি বসিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের বন্ধুতা করিয়া দিলে পর বসিষ্ঠও তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করিলেন। স্বয়ং মহামুনি বসিষ্ঠ যখন তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করিলেন তখন আর কথা কি! অন্য সকলেও বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া মানিল—ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র তখন হইতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া 'ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র' হইলেন।

নিরেট গুরুর কাহিনী।

ষাঁড়ে চড়িয়া বেড়ানর গল্প।

কিছুকাল পরে গুরুর অনেক দূর দেশে যাইবার দরকার হইল। পায়ে হাঁটিয়া ও আর গুরু অতদূর যাইতে পারেন না, কাজেই শিষ্যদের মহা ভাবনা উপস্থিত হইল। শেষে ঠিক হইল যে একটা ষাঁড় ভাড়া করিয়া, তাহার উপর চড়িয়া যাওয়া হইবে। কাছাকাছিই একটি ষাঁড় পাওয়া গেল, জন্তুটির গুণ আবার অনেক! শিং দুটী খট্‌খট্ করিয়া নড়ে। ষাঁড়ের মালিককে রোজ তিন আনা ভাড়া দেওয়া স্থির হইল এবং কাজ কর্ম্ম সারিয়া বিকাল বেলা সকলে মহা আনন্দে বাহির হইয়া পড়িল।

তখন গ্রীষ্মকাল, কাজেই হাঁটিতে হাঁটিতে যখন তাহারা একটা খোলা মাঠে আসিয়া হাজির হইল, তখন গরমে তাহাদের ভারী কষ্ট হইতে লাগিল। মাঠটী এমন যে

তাহাতে একটী ও গাছ নাই, যাহার ছায়ায় বসিয়া বেচারারা একটু বিশ্রাম করে। গুরুর যা অবস্থা হইল, সে আর বলিবার কথা নয়। বুড়া মানুষ রোদের ঝাঁঝে একেবারে মুষ্‌ড়াইয়া গেলেন, ষাঁড়ের পিঠ হইতে পড়িয়া যান আর কি! শিষ্যেরা দেখিল যে গুরু মারা যান, কাজেই তাহারা তাড়াতাড়ি ধরাধরি করিয়া ষাঁড় হইতে গুরুকে নামাইয়া দিল। আর কোথাও ছায়া নাই, অতএব ষাঁড়টাকে থামাইয়া, তাহারই ছায়ায় তাঁহাকে বসাইয়া নিজেদের কাপড় দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে গুরু একটু সুস্থ হইলেন, একটু একটু বাতাসও বহিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি আবার ষাঁড়ে চড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং সন্ধ্যার আগেই একটা গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন।

কাছাকাছি একটা ছোটখাট সরাই দেখিয়া তাঁহারা সকলে সেখানে গিয়া উঠিলেন। ষাঁড়ের মালিককে চুক্তিমত তিন আনা পয়সা দেওয়া হইল। সে তাহা না লইয়া এই বলিয়া মহা গোলমাল আরম্ভ করিল যে, তাহাকে যত দেওয়া উচিত তাহা দেওয়া হয় নাই। শিষ্যেরা বলিল, "সে কি হে বাপু, তোমার সঙ্গে ত এই রকমই কথা বার্ত্তা হয়েছিল?" লোকটী চীৎকার করিয়া বলিল "ষাঁড়ের ভাড়া তিন আনাই ঠিক হয়েছিল বটে, কিন্তু ঐ দামে যে আমি তার ছায়াটাও দেব এমন কথা ত হয়নি? তোমরা ছায়া নিলে কেন? আমি তার জন্য আলাদা পয়সা নেব।" চেলারা বলিল, "এ বাপু তোমার জুয়াচুরি"। তখন দুই পক্ষে মহা ঝগড়া বাধিয়া গেল। গ্রামের যত লোক আসিয়া জুটিল, সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বিচারপতিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই পক্ষের নালিশ শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি যাহা মীমাংসা করিয়া দিবেন তাহারা তাহাই মানিয়া লইতে রাজি আছে কিনা। দুই দলই তাঁহার কথায় রাজি হইল। তখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"আমি একবার দূরদেশ থেকে বাড়ী ফিরে আস্‌ছিলাম। একদিন রাত্রে আমি একটা মস্ত বড় সরাইয়ে গিয়ে উঠলাম। সেখানে থাকবার জায়গা ত পাওয়া যেতই, তার উপর খাবার টাবার যা কিছু দরকার সবই সরাইয়ের লোকেরাই জোগাত। আমার হাতে তখন টাকাকড়ি বেশী ছিল না, পথ খরচ নিয়েই টানাটানি, কাজেই আমি বল্‌লাম যে, আমার কিছুই দরকার নেই। আমি যে ঘরে বসেছিলাম সেটা হচ্ছে রান্না ঘর, সেখানে সব লোকজনের জন্য রান্না হচ্ছিল। একটা লোহার শলাতে বিঁধিয়ে একটা ভেড়ার ঠ্যাং আগুনে সিদ্ধ করা হচ্ছিল, একজন লোক মাঝে মাঝে শলাটা ঘুরিয়ে

দিচ্ছিল, যাতে মাংসটা পুড়ে না যায়। মাংসর থেকে অল্প অল্প ধুঁয়ো বেরচ্ছিল, আর যা চমৎকার গন্ধ উঠেছিল তা আর কি বলব! আমার মাথায় তখন এক ফন্দী এল, ভাবলাম আমার সঙ্গে ত কোনও রকম তরকারি নেই, শুধু চারটি ভাত আছে, এই গন্ধের মধ্যে বসে যদি সেটা খাওয়া যায় তা হলে ত দিব্যি হয়! ঠিক মনে হবে যেন মাংস দিয়েই ভাত খাচ্ছি। আমি তখন গিয়ে সরাইওয়ালাকে বল্লাম যে, আমি খানিক-ক্ষণ শলাটা ঘুরাতে চাই। বিনা পয়সায় কাজ পাবার নামে সে ত খুসী হয়েই রাজি হল। আমি তখন ভাতের থালা নিয়ে গিয়ে সেইখানে বসলাম, একহাত দিয়ে ভাত খেতে লাগলাম, আর অন্য হাত দিয়ে মাংস ঘুরতে লাগলাম। খেয়ে দেয়ে চলে যাব, এমন সময় সরাইয়ের কর্ত্তা এসে বল্‌ল, "কি হে, দিব্যি ত চলে যাচ্ছ, আমার যে অতখানি মাংসের গন্ধ শুঁকে গেলে তার দাম দেবে না?" আমি ত তার কথা শুনে মহা খাপ্পা হয়ে উঠলাম, খুব ঝগড়া বেধে গেল; শেষে ঝগড়া করতে করতে দুজনে গাঁয়ের মোড়লের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। মোড়ল খুব বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, আইন কানুন তাঁর খুব ভাল রকমই জানা ছিল। তিনি বিচার করে বল্লেন, "আমার মত হচ্ছে এই, যে মাংস খেয়েছে, সে টাকা দেবে, আর যে মাংসের গন্ধ শুঁকেছে, তাকে টাকার গন্ধ দিতে হবে।" এই বলে তিনি এক থলি টাকা নিয়ে সরাইওয়ালার নাকের উপর ভয়ানক জোরে ঘস্‌তে লাগলেন। সে ত প্রাণপণে চেঁচাতে আরম্ভ করল, "ওরে বাবারে! আমার যথেষ্ট টাকা লাভ হয়েছে, আর চাই না, আমার নাকটা যে খসে গেল।" দেখত বাপু, কেমন চমৎকার বিচার! তোমাদের গোলমালটাও ঠিক এই আইন অনুসারে মিটমাট করা যায়। ষাঁড়ে চড়ে এখানে আসবার জন্য টাকা ভাড়া দিতে হবে, কিন্তু তার ছায়াটা যে কাজে লাগিয়েছ, তার জন্য বাপু তোমাদের টাকার ছায়া দিতে হচ্ছে।"

গোলমাল ত চুকিয়া গেল, কিন্তু তখন সন্ধ্যা হওয়াতে সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, কাজেই টাকার ছায়া পাওয়ার আর কোনও উপায় দেখা গেলনা। বিচারক মহাশয় তখন ঠিক করিলেন যে ছায়ার অভাবে টাকার শব্দ দ্বারাই কাজ সারিতে হইবে এবং টাকার থলিটা লইয়া ষাঁড়ের মালিকের কাণের উপর খুব জোরে পিটাইতে আরম্ভ করিলেন আর বলিতে লাগিলেন, "শুন্‌তে পাচ্ছিস্ ত? দেখিস্ ভাল করে শুনিস্।" লোকটা চীৎকার করিয়া বলিল, "হ্যাঁ মশায়, চমৎকার শুনতে পাচ্ছি, আর বেশী ষাঁড়ের ছায়ার ভাড়া পেলে কান কালা হয়ে যাবে। এইবার ছেড়ে দিন।" গুরু ও বলিলেন, "আমি যা

ভোগ ভুগেছি তাতেই আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমি আর ও ষাঁড়ে চড়ছিনা, ওটাকে দূর করে দাও। পথ আর অল্পই বাকী আছে, সেটুকু আমি আস্তে আস্তে পায়ে হেঁটেই যাব।" ষাঁড় ওয়ালা কাণে হাত বুলাইতে বুলাইতে ষাঁড় লইয়া প্রস্থান করিল। গুরু এবং তাঁহার শিষ্যগণ গ্রামের বিচারপতির যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আবার আপনাদের পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পুণ্যের হিসাব।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু দুজনে মিলে তখন শিবকে অনেক স্তুতি মিনতি করে সন্তুষ্ট করলে পর শিব বল্লেন—"আচ্ছা, তবে চল যাই, দেখি গিয়ে এর কোন উপায় করতে পারি কিনা।"

পথে যেতে যেতে মহাদেবের হঠাৎ একটা খেয়াল হলো, তিনি বল্লেন—"দেখ যম! তুমি এক কাজ করো। আমরা যমপুরীতে গেলেই কৃষক আমাদের দেখে সিংহাসন ছেড়ে এসে মাটিতে লম্বা হয়ে পড়ে প্রণাম করবে। সেই মুহূর্ত্তে তুমিও চট্ করে গিয়ে সিংহাসনে বসে পড়ো। সাবধান! ভুলে যদি যাও তাহলে কিন্তু আর উপায় নাই।"

যমপুরীতে তাঁরা যখন গেলেন তখন তাঁহাদের দেখে কৃষক তাড়াতাড়ি সিংহাসন থেকে উঠে এসে ঢিপ করে এক প্রণাম। সেই সময়ে যমও গিয়ে সিংহাসনটি অধিকার করে বস্‌লেন। কৃষক বেচারি সব বুঝ্‌তে পেরে মহা অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সিংহাসনে বসেই যমরাজা বল্লেন—"এলোকটা পাপ পুণ্যের খাতায় তার নাম লিখে সেই নামের পাশে মস্ত বড় পুণ্যের লিষ্টি লিখে রেখেছে—এর কি উপায় হবে?"

মহাদেব বল্লেন—"উপায় আর কি! সে যখন তার নামের পাশে পুণ্যের লিষ্টি লিখেছে তখন সে লিষ্টি পূরণ করে দিতেই হবে। এক কাজ করা যাক্—আমার কিছু পুণ্য আমি দিব, ব্রহ্মা বিষ্ণুও তাঁদের পুণ্যের ভাগ কিছু দিন। আর যমরাজা, তুমিও তোমার কিছু পুণ্য দাও। এইরূপে কৃষকের লিষ্টি পূরণ কর—তাছাড়া আর উপায় নাই।" শিবের কথা অমান্য করে কার সাধ্য! তখন সেইরূপেই কৃষকের পুণ্যের লিষ্টি পূরণ করে দেওয়া হলো।

গল্প শেষ করে যমরাজা দূতকে বল্লেন—"এখন বুঝ্‌তে পারলে ত কেন আমি জেয়ন্ত মানুষ যমপুরীতে আনার নামে এতটা আপত্তি করছি?"

দূত বল্‌ল—"মহারাজ! এ ক্ষেত্রে আপনার ভয় পাবার কোনই কারণ নাই। আমি ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসব, সে তার প্রশ্নের উত্তর পেলেই আমি নিয়ে তাকে আবার রেখে আসব—এতে আর গোলমাল হবার কারণ কি? দোহাই মহারাজ! ব্রাহ্মণের অনুরোধ শুনুন, আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন—আমি এর জন্য দায়ী রইলাম।"

যমরাজা দেখলেন দূত নাছোড় বন্দা কিছুতেই সে মানেনা। তখন তিনি রাজি হয়ে বল্লেন—"আচ্ছা! ব্রাহ্মণকে নিয়ে এস, কিন্তু খবরদার! আমি যখন সিংহাসনে বসে থাক্‌ব ঠিক তখনি কিন্তু তাকে আনতে হবে!" দূত "যে আজ্ঞে মহারাজ!" বলে ব্রাহ্মণকে আনতে চলে গেল।

খানিক পরেই দূত ব্রাহ্মণকে নিয়ে এসে উপস্থিত। যমরাজাকে প্রণাম করে ব্রাহ্মণ বল্‌ল—"প্রভু! রাজা বিক্রমাদিত্য কোন পুণ্য ফলে পৃথিবীর রাজা হয়েছেন, অনুগ্রহ করে আপনি ইহার উত্তর বলে দিন।"

যমরাজা বল্লেন—"আমিত বাপু এ প্রশ্নের উত্তর তোমায় বলতে পারি না। তবে কিনা যে এর উত্তর জানে আমি তোমাকে তার সন্ধান বলে দিচ্ছি—রাজবাড়ীর নিকটেই একজন কলু থাকে, তার ঘানিতে একটা কাণা এঁড়ে গরু আছে। বিক্রমাদিত্য যদি রাত দুপুরের সময় সেই কাণা গরুকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তাহলেই তার উত্তর পাবেন।"

এরপর দূত ব্রাহ্মণকে নিয়ে গিয়ে সেই বটগাছের নীচে রেখে এল।

ব্রাহ্মণ তখনি চল্ল বিক্রমাদিত্যের সভায়। এ দিকে সাতদিন পার হয়ে গিয়েছে তবু ব্রাহ্মণের উদ্দেশ নাই দেখে বিক্রমাদিত্য ভাবছিলেন—"তাইত! ব্রাহ্মণ কি তাহলে ফাঁকি দিল!" এমন সময় হঠাৎ ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত। তাহাকে দেখে রাজা ভারী খুসী হয়ে বল্লেন—"কি ঠাকুর! আমার প্রশ্নের উত্তর কৈ!" ব্রাহ্মণ বল্ল—"মহারাজ! সাত দিন পার হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু আমি প্রশ্নের উত্তর ঠিক করে এনেছি। আজ রাত দুপুরের সময় রাজবাড়ীর পাশেই যে কলু থাকে তার বাড়ীতে গিয়ে আপনি তার ঘানির কাণা এঁড়ে গরুটাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন এবং তাহলেই তার উত্তর পাবেন।"

দুপুর রাত্রে বিক্রমাদিত্য কলুর বাড়ী গিয়ে কাণা এঁড়ে গরুটাকে প্রশ্ন করবা মাত্র সেটা ভেউ ভেউ করে কাঁদ্‌তে লাগল। খুব খানিকক্ষণ কেঁদে গরুটা বল্‌ল—"মহারাজ! আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। রাজবাড়ীর সাম্‌নে প্রায় এক মাইল

দূরে একটা বড় বটগাছ আছে, সেই গাছের ডালে দেখ্‌তে পাবেন মাথা নীচের দিকে দিয়ে একটা পেত্নী ঝুলে রয়েছে। সন্ধ্যার পর আপনি নিজে গিয়ে যদি পেত্নীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তাহলে সে তার উত্তর দিবে।"

পরের দিন সন্ধ্যার পর বিক্রমাদিত্য সেই বটগাছের তলায় গিয়ে দেখলেন বাস্তবিকই মাথা নীচের দিকে দিয়ে একটা পেত্নী ঝুলে রয়েছে। রাজা তাকে সেই প্রশ্ন করলে

পর সে বল্‌ল—মহারাজ! আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি জানি বটে কিন্তু বল্‌তে পার্‌ব না। আপনার নবরত্নের পণ্ডিত যে বররুচি আছেন তাঁর ছোট মেয়েকে গিয়ে প্রশ্ন করুন, সেই তার উত্তর দিবে।"

পরের দিন রাজা বররুচিকে ডেকে সব কথা বল্লেন। রাজার কথা শুনে তাঁর বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হলো। তাঁর মেয়ে এই প্রশ্নের উত্তর জানে সেটা তাঁর বিশ্বাসই হলো না। যা হোক্ বাড়ীতে গিয়ে মেয়েকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে পর মেয়ে বল্‌ল—"হাঁ বাবা! রাজা ঠিক কথাই বলেছেন—আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর জানি। আচ্ছা, চলুন তাহলে রাজার কাছে গিয়েই সব কথা খুলে বল্‌ছি।"

বররুচি তাঁর মেয়েকে রাজার নিকটে নিয়ে গেলে পর রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হাঁ মা! তুমি নাকি আমার প্রশ্নের উত্তর জান?" মেয়ে বল্ল—"জানি মহারাজ! আমি তার উত্তর বল্‌ছি শুনুন—

"বহুকাল পূর্ব্বে অতিশয় দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁর স্ত্রী, তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ পরিবারে এই চারটি প্রাণী। প্রতিদিন প্রায় অনাহারেই তাঁদের দিন কেটে যেত। ভিক্ষা করে প্রায়ই কিছু পেতেন না, যদিবা কখনও কিছু পেতেন তাও এত সামান্য হতো যে তাতে ভাল করে তাঁদের ক্ষুধাই দূর হতো না। এক সময়ে তাঁদের এমনি দুরবস্থা হলো যে ক্রমাগত পাঁচ দিন উপবাস করে রইলেন এক মুঠা চালও সংগ্রহ করতে পারলেন না। ষষ্ঠ দিনে ভগবানের কৃপায় কিছু খাদ্যের জোগাড় হলো। ব্রাহ্মণী রান্না করে ভাত চার ভাগ করলেন; সকলে খেতে বসবেন এমন সময় হঠাৎ এক অতিথি এসে উপস্থিত। অতিথি সাত দিন অনাহারে, গা তার ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌ছে, মুখ দিয়ে তার কথা বেরুচ্ছে না। অতি কষ্টে অনেক মিনতি করে সে বল্ল—'দোহাই বাবা! আমি সাত দিন কিছু খেতে পাই নি, দয়া করে আমাকে দুটি খেতে দাও।'

"অতিথির দুর্দ্দশা দেখে ব্রাহ্মণের বড়ই দয়া হলো, তিনি ব্রাহ্মণীকে বল্লেন—'আমরা পাঁচ দিন খাইনি আর এই বেচারি সাত দিন ধরে উপোষ। শুধু আমার ভাগ দিলে ওর কিছুই হবে না, ব্রাহ্মণী! তোমার ভাগটাও দাও। দুজনের ভাগ খেলে তবু তার প্রাণ রক্ষা হবে।'

"ব্রাহ্মণী গেলেন চটে। 'পাঁচ দিন পর এক মুঠো খেতে বসেছি তাও বল্‌ছ কিনা অতিথিকে দাও! তোমার ভাগ দিতে হয় তুমি দাও গিয়ে—আমি আমার ভাগ দিচ্ছি

না বাপু। অতিথি মরে মরুক, আমার তাতে বয়ে গেল—নিজের প্রাণটাত আগে বাঁচাই।' এই বলে ব্রাহ্মণী খেতে আরম্ভ করে দিল। ব্রাহ্মণ পুত্রের ভাগ চাইলেন কিন্তু সেও অস্বীকার করল। তখন নিরুপায় হয়ে পুত্রবধূকে বল্লেন—'মা! তা হলে তোমার ভাগটা দিয়েই অতিথিকে বাঁচাও।'

"পুত্রবধূটি নিতান্ত ভালমানুষ ছিল। অতিথিসৎকার না করলে শ্বশুরের পাপ হবে এটা তার বিলক্ষণ জানা ছিল। সে খুসী হয়ে তার ভাগটা দিল—ব্রাহ্মণও তাঁর নিজের ভাগ এবং পুত্রবধূর ভাগ দিয়ে অতিথিকে খাওয়ালেন।"

এই গল্প বলে বররুচির মেয়ে বল্ল—"মহারাজ! সেই ব্রাহ্মণ হচ্ছেন আপনি—নিজে উপবাসী থেকে অতিথি সৎকার করে যে পুণ্য করেছিলেন সেই পুণ্যের বলে এখন পৃথিবীর রাজা বিক্রমাদিত্য হয়েছেন। বটগাছের পেত্নী হচ্ছে আপনার স্ত্রী সেই ব্রাহ্মণী, কলুর একচক্ষু এঁড়ে গরু হচ্ছে আপনার পুত্র—আর আমি হচ্ছি আপনার সেই পুত্রবধূ।"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

উচিত বিচার।

একজন মিস্ত্রি গির্জ্জার চূড়া মেরামত করতে উঠে পা পিছলে নীচে পড়ে যায়। রাস্তা দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিল তারই ঘাড়ে সে পড়ে। মিস্ত্রি সামান্য একটু জখম হল কিন্তু যার উপরে পড়ল সে বেচারী মারা গেল।

মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনেরা মিস্ত্রিকে ধরে বিচারকের কাছে নিয়ে গেল, আর মিস্ত্রিটাকে শূলে দেবার জন্য বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জজ সাহেবকে অনুরোধ করতে লাগলো। জজ সাহেব উচিত বিচার করবেন অথচ দুপক্ষকেই সন্তুষ্ট করা চাই; তাই মিস্ত্রিকে বল্লেন—

"লোকটা যে জায়গায় মারা যায় তুমি ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে থাক—আর তোমরা কেহ একজন ওইখান থেকে লাফিয়ে পড়। তা হলেই ওর উচিত শাস্তি হবে।"

এই ব্যবস্থায় আত্মীয়েরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারল—মিস্ত্রিও বেঁচে গেল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

"জ্বালাতন আরকি!"

চারটি ভায়ে করছি খেলা শোন্‌রে ওরে গাধা,
মিথ্যে মোদের জ্বালাস্‌নে আর দিস্‌নে এখন বাধা।

জানোয়ার-ওয়ালা।

এক সার্কাসওয়ালার ছেলে—বয়স তার ষোল বৎসর—সে স্কুলের ছুটিতে বাড়ী এসেছিল। সেখানে সে রোজ সিংহের খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত, আর দেখত সিংহকে কেমন ক'রে খেলা শেখায়। যে লোকটা সিংহের খেলা দেখাত, সে একটা সিংহের উপরে ভারি অত্যাচার করত—সিংহটাকে না খাইয়ে, মার ধ'র ক'রে, গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে সে নানা রকমে কষ্ট দিত। দেখে ছেলেটির ভয়ানক রাগ হ'ল; সে তার বাবার কাছে গিয়ে সেই লোকটার নামে নালিশ করলে। কিন্তু তার বাবা সে কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন; বল্লেন, "ও রকম না করলে সিংহ কি পোষ মানে?" তারপর, অনেক দিন এই অত্যাচার স'য়ে স'য়ে একদিন সিংহটা সত্যি সত্যিই খেপে গিয়ে সেই দুষ্টু খেলোয়াড়কে সাংঘাতিক রকম জখম ক'রে দিল!

তখন সেই ছেলে তার বাবাকে বল্ল, "কাল থেকে আমি সিংহের খেলা দেখাব"। তার বাবা একথা শুনে তাকে দুই ধমক দিয়ে দিলেন। কিন্তু ছেলেরও জেদ কম নয়, পর দিন সকালে দেখা গেল সে বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে সিংহের খাঁচায় ঢুকে বসে আছে!

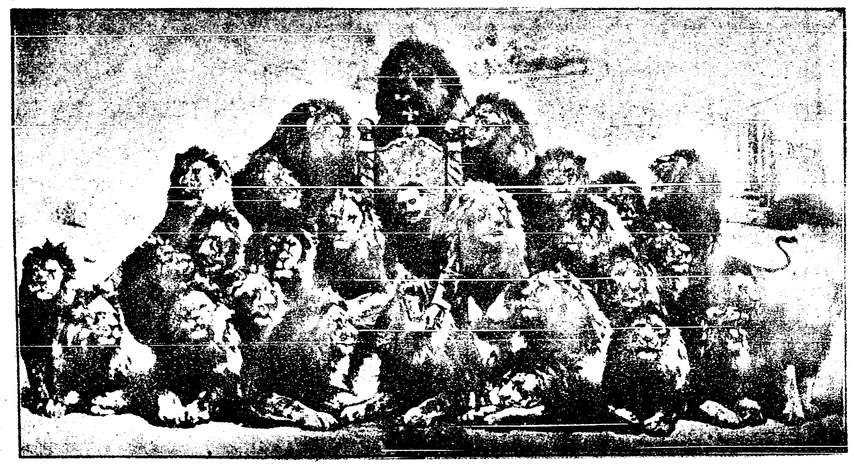

প্রথমটা সকলে খুবই ভয় পেয়েছিল, কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে সিংহের সঙ্গে তার

এমন ভাব হ'য়ে গেছে যে ভয়ের কোন কারণ নাই। এই ছেলে এখন পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় "জানোয়ার-ওয়ালা"। এঁর নাম ফ্র্যাঙ্ক বোস্টক্।

একটি সিংহ নিয়ে আরম্ভ ক'রে এখন প্রায় চল্লিশটিতে দাঁড়িয়েছে। এক এক সময়ে পঁচিশ ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশটা সিংহকে একসঙ্গে জড় ক'রে তামাসা দেখান হয়। অবশ্য সিংহগুলি সবই পোষা, কিন্তু তা হলে কি হবে—তবুত সিংহ। সিংহ কি বাঘ হাজার পোষ মানলেও, তাকে ভয় ক'রে চল্‌তে হয়। সামান্য একটু কারণে হঠাৎ একটু ভয় পেলে বা চমকে উঠ্‌লে তারা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সাংঘাতিক কাণ্ড ক'রে ফেল্‌তে পারে। একবার একজন খেলোয়াড় একটা নতুন রকমের পোষাক প'রে খাঁচায় ঢুকেছিল ব'লে তার সিংহটা তাকে তেড়ে কামড়াতে গিয়েছিল—খেলোয়াড় তখন পোষাক বদ্‌লিয়ে পুরান পোষাক প'রে এসে তারপর খাঁচায় ঢুক্‌তে পেল। আর একবার এক মেম সাহেব একসঙ্গে পাঁচ সাতটা সিংহের খেলা দেখাতে গিয়ে এই রকম বিপদে পড়েছিলেন। সেদিন তাঁর হাতে একটা ফুলের তোড়া ছিল, একটা সিংহ তাই দেখে, বোধ হয় মাংস না কি মনে ক'রে, হঠাৎ তার উপর এক থাবা মেরে ব'সেছে! ঐ একটি থাবায় মেম সাহেবের গালের আর হাতের মাংস শুদ্ধ উঠিয়ে নিয়েছে, আর অমনি চক্ষের নিমেষে সব কটা সিংহ একেবারে হাঁ হাঁ ক'রে ফুলের তোড়াটার দিকে তেড়ে এসেছে! মেম সাহেবটি তখন বুদ্ধি ক'রে তোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তাই রক্ষা, তা নইলে অতগুলা সিংহের হুড়াহুড়ির মধ্যে পড়ে তাঁকে আর বাঁচতে হ'ত না। যাহো'ক, ফুলটা মাটিতে পড়তেই সিংহগুলো তাকে নেড়ে শুঁকে নাক সিঁট্‌কিয়ে আবার যে যার জায়গায় ফিরে গেল!

একবার বার্মিংহাম সহরে বোস্টক্ সাহেবের একটা সিংহ খাঁচা থেকে পালিয়ে সহরের রাস্তায় এসে হাজির হ'য়েছিল। সহরের মধ্যে হুলস্থূল পড়ে গেল রাস্তায় লোক জনের চলা ফেরা বন্ধ হ'য়ে এল—দোকানীরাও তাদের দোকানপাট খুল্‌তে চায় না। সিংহটা এদিক ওদিক ঘুরে শেষটায় একটা প্রকাণ্ড ড্রেনের নর্দ্দামায় গিয়ে ঢুকে বস্‌ল, আর সেখান থেকে সে বেরোতে চায় না। সেই নর্দ্দমার ভিতর দিয়ে সে রাস্তার নীচে চলাফিরা করে, আর মাঝে মাঝে ডাক ছাড়ে! রাত দুপুরে মাটীর নীচ থেকে ঐ রকম গুরু গম্ভীর আওয়াজ—অবস্থা খানা কি রকম বুঝতেই পার! শেষটায় নর্দ্দমার একটা মুখে খাঁচা বসিয়ে সিংহটাকে তাড়িয়ে তার মধ্যে নেবার কথা হ'ল। কিন্তু অনেক তাড়া ক'রেও সিংহটাকে নড়ান গেল না। সকলের চীৎকার, বড়

বড় পাথরের আঘাত, আর লম্বা লম্বা বাঁশের খোঁচা, সে সব সহ্য করে সে চুপচাপ বসে রইল। তার পর কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হ'ল, বোষ্টক সাহেব নিজে তার নাকের আগায় এক ঘা জুতো মেরে আসলেন, কিন্তু সিংহ সেখান থেকে নড়ে না। সকলে যখন হয়রান হ'য়ে পড়েছে, এমন সময় একজন লোকের হাত থেকে একটা বালতি কেমন ক'রে ফস্কে গিয়ে গড়গড় শব্দ ক'রে নর্দ্দামার মধ্যে গড়িয়ে গিয়েছে। সেই আওয়াজ শুনে সিংহমশাই এক দৌড়ে ল্যাজ গুটিয়ে একেবারে খাঁচার মধ্যে!

আর একবার একটা পলাতক সিংহকে পটকা ছুঁড়ে ভয় দেখিয়ে খাঁচার মধ্যে ঢোকান হয়েছিল। সুতরাং সিংহের যেমন একদিকে খুব সাহস, আর একদিকে তেমনি ভয়ও আছে, বলতে হবে। বোষ্টক সাহেব বলেন, মানুষের যেমন নানারকমের মেজাজ থাকে—কেউ ঠাণ্ডা কেউ চটা, কেউ হাবাগোছের কেউ চট্‌পটে—এই সব জানোয়ারদেরও তেমনি। এক একটা সিংহের চালচলন, বুদ্ধি শুদ্ধি এক এক রকমের। কোনটা পোষমানে একেবারে কুকুরের মত—কোনটা হয়ত কোন কালেই ঠিকমত পোষ মানেনা—তাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখতে হয়। সিংহ পশুরাজ, তাই তার কথাই বেশী ক'রে বল্‌লাম, কিন্তু জানোয়ারের মধ্যে হাতীর সম্মানও বড় কম নয়। বিশেষত বিলাতে ও আমেরিকায়—যেখানে হাতী সর্ব্বদা দেখা যায় না—সেখানে হাতীকে লোকে খুবই খাতির করে। বোষ্টক সাহেবের কতগুলো হাতী আছে তাদের তোয়াজ করবার জন্য অনেকগুলা চাকর সর্ব্বদা লেগে আছে। আমাদের দেশে হাতীগুলো রোজ স্নান করবার সময় অনেকক্ষণ জলে কাদায় মাটিতে গড়াগড়ি কর্‌তে ভালবাসে—তাতে নাকি তাদের গায়ের চামড়া খুব ভাল থাকে। কিন্তু ঠাণ্ডা দেশে সব সময় সে রকম স্নানের সুবিধা না থাকায় তাদের চামড়া শুকিয়ে কড়া হ'য়ে ফেটে যায়। সেই জন্য মাঝে মাঝে তাদের রীতিমত ভাল রকম স্নানের বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হয়। হাতীর পক্ষে "রীতিমত স্নান" কাকে বলে তার একটু নমুনা শোন। প্রথমত কোন পুকুর বা বড় চৌবাচ্চার জলে হাতিটাকে নামিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে কয়েক ঘণ্টা থাকলে পর তাকে ডাঙায় এনে কড়া বুরুষ দিয়ে তার গায়ে কয়েক ঘণ্টা খুব ক'রে সাবান ঘষে, তাকে আবার জলে নামান হয়। তারপর আবার সাবান ঘষা আবার জলে নামান। এই রকম তিন চারবার করা হয়—তাতে প্রায়ই দু চার দিন সময় লাগে আর সাবান খরচ হয় প্রায় ২৫ সের!

তারপর চামড়াটাকে আগাগোড়া একরকম ঝামা দিয়ে ঘষে কয়েকদিন ধ'রে তাতে বেশ ক'রে তেল লাগান হয়—এক পিপে জলপাইয়ের তেল! এতেও তার সখ মেটে না—এর পরে তার নখগুলি একটি একটি ক'রে উকা দিয়ে ঘষে পালিশ ক'রে তাকে ফিট ফাট ক'রে দিতে হয়। এই রকমে একটি হাতীর পিছনে এক সপ্তাহ ধরে পাঁচ সাতটি লোককে রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এরকম সাংঘাতিক স্নান সব সময় দরকার হয় না—বছরে দুচার বার করলেই যথেষ্ট। এ রকম স্নানের ঘটা হাতী যে বেশ পছন্দ করে তা এই ছবিতেই বেশ বুঝতে পারছ।

বোষ্টক সাহেবের লোকে পৃথিবীর চারি দিকে জানোয়ারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। একবার একটা গরিলার ছানা বিলাতে আনা হ'য়েছিল—বোষ্টক সাহেব অনেক দর দস্তুরির পর প্রায় ষোল হাজার টাকায় সেটাকে কিনে নিয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাকে বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি। তার চাইতে শিম্পাঞ্জির খেলা দেখিয়ে তিনি অনেক বেশী নাম ক'রেছেন। তাঁরই পোষা শিম্পাঞ্জি "কন্সাল" বিলাতের বড় বড় থিয়েটারে তামাসা দেখিয়ে লোকের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। "কন্সাল"কে বোষ্টকের লোকেরা ঠিক মানুষের মত খাতির করত। তার নিজের চাকর, নিজের থাকবার ঘর, টেবিল চেয়ার কাপড় চোপড় আসবাব পত্র সব ছিল। তাকে যখন তামাসা দেখাবার

জন্য বড় সহরে নেওয়া হ'ত, তখন তার জন্য রীতিমত হোটেলের ঘর ভাড়া করা হ'ত —আলাদা শোবার ঘর, বসবার ঘর, স্নানের ঘর ইত্যাদি। কন্সালের ফটোগ্রাফটি

দেখ, ঠিক মনে হয় যেন সে বক্তৃতা করছে—না? তার আদব কায়দা খুব দুরস্ত। তার বাড়ীতে যদি তার সঙ্গে দেখা করতে যাও, সে রীতিমত চেয়ার থেকে উঠে তোমার সঙ্গে "হ্যাণ্ড শেক্" করবে, তোমাকে টুপি রাখবার জায়গা দেখিয়ে দেবে—তারপর হয়ত পেয়ালা এনে তোমার জন্য গম্ভীর ভাবে চা ঢাল্‌তে বসবে! প্রথম যে শিম্পাঞ্জিকে বোস্টক সাহেব এইসব শিখিয়ে ছিলেন, তারই নাম ছিল কন্সাল সে অনেক দিন হ'ল মারা গিয়েছে—কিন্তু তার জায়গায় অন্য শিম্পাঞ্জিকে শিখিয়ে নেওয়া হ'য়েছে—তারও নাম দেওয়া হ'য়েছে কন্সাল।

দ্রিঘাংচু।

এক ছিল রাজা।

রাজা একদিন সভায় বসেছেন—চারিদিকে তাঁর পাত্রমিত্র আমির ওম্‌রা, সিপাই শান্ত্রী গিজ্ গিজ্ করছে—এমন সময় কোথা হ'তে একটা দাঁড় কাক উড়ে এসে সিংহাসনের ডান দিকে উঁচু থামের উপর ব'সে ঘাড় নীচু ক'রে চারদিক তাকিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বল্ল "কঃ"।

কথা নেই বার্ত্তা নেই হঠাৎ এ রকম গম্ভীর শব্দ,—সভাশুদ্ধ সকলের চোখ এক সঙ্গে গোল হ'য়ে উঠ্‌ল—সকলে একেবারে এক সঙ্গে হাঁ ক'রে রইল। মন্ত্রী একতাড়া কাগজ নিয়ে কি যেন বোঝাতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ বক্তৃতার খেই হারিয়ে তিনি বোকার

মত তাকিয়ে রইলেন। দরজার কাছে একটা ছেলে বসে ছিল সে হঠাৎ ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল, যে লোকটা চামর দোলাচ্ছিল, চামরটা তার হাত থেকে ঠাঁই ক'রে রাজার মাথার উপর প'ড়ে গেল। রাজা মশাইয়ের চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছিল, তিনি হঠাৎ জেগে উঠেই বল্লেন, "জল্লাদ ডাক"।

বল্‌তেই জল্লাদ এসে হাজির। রাজা মশাই বল্লেন "মাথা কেটে ফেল"। সর্ব্বনাশ! কার মাথা কাট্‌তে বলে? সকলে ভয়ে ভয়ে নিজের নিজের মাথায় হাত বুলাতে লাগ্‌ল। রাজা মশাই খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে আবার তাকিয়ে বল্লেন, "কই মাথা কই?" জল্লাদ বেচারা হাত জোড় ক'রে বল্ল, "আজ্ঞে মহারাজ, কার মাথা?" রাজা বল্লেন, "ব্যাটা গোমুখ্যু কোথাকার, কার মাথা কিরে? যে ঐ রকম বিট্‌কেল শব্দ ক'রেছিল, তার মাথা।" শুনে সভাশুদ্ধ সকলে হাঁফছেড়ে এমন ভয়ানক নিঃশ্বাস ফেল্ল যে কাকটা হঠাৎ ধড়ফড় ক'রে সেখান থেকে উড়ে পালাল।

তখন মন্ত্রীমশাই রাজাকে বুঝিয়ে বল্লেন যে, ওই কাকটাই ওরকম আওয়াজ ক'রেছিল। তখন রাজা মশাই বল্লেন, "ডাক, পণ্ডিতসভার যত পণ্ডিত সবাইকে"। হুকুম হওয়া মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাজ্যের যত পণ্ডিত সব সভায় এসে হাজির।

তখন রাজা মশাই পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন "এই যে একটা কাক এসে আমার সভার মধ্যে আওয়াজ ক'রে এমন গোল বাধিয়ে গেল, এর কারণ কিছু বল্‌তে পার?"

কাকে আওয়াজ করল তার আবার কারণ কি? পণ্ডিতেরা সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। একজন ছোকরা মত পণ্ডিত খানিকক্ষণ কাঁচুমাচু ক'রে জবাব দিল —"আজ্ঞে বোধ হয় তার খিদে পেয়েছিল"।

রাজা মশাই বল্লেন, "তোমার যেমন বুদ্ধি! খিদে পেয়েছিল, তা সভার মধ্যে আস্‌তে যাবে কেন? এখানে কি মুড়ি মুড়কি বিক্রী হয়! মন্ত্রী ওঁকে বিদেয় ক'রে দাও"—সকলে মহা তম্বী ক'রে বল্ল "হাঁহাঁ ঠিক ঠিক, ও'কে বিদেয় করুন"।

আর একজন পণ্ডিত বল্লেন, "মহারাজ কার্য্য থাকলেই তার কারণ আছে—বৃষ্টি হ'লেই বুঝবে মেঘ আছে, আলো দেখ্‌লেই বুঝবে প্রদীপ আছে, সুতরাং বায়স পক্ষীর কণ্ঠনির্গত এই অপরূপ ধ্বনিরূপ কার্য্যের নিশ্চয়ই কোন কারণ থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি"?

রাজা বল্লেন, "আশ্চর্য্য এই যে, তোমার মত মোটা-বুদ্ধি লোকেও এই রকম আবোল-তাবোল বকে মোটা মোটা মাইনে পাও। মন্ত্রী, আজ থেকে এঁর মাইনে বন্ধ কর"। অমনি সকলে হাঁহাঁ ক'রে উঠ্‌লেন "মাইনে বন্ধ কর"।

দুই পণ্ডিতের এ রকম দুর্দ্দশা দেখে সবাই কেমন ঘাবড়ে গেল। মিনিটের পর মিনিট যায়, কেউ আর কথা কয় না। তখন রাজা মশাই দস্তুর মত খেপে গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, এর জবাব না পাওয়া পর্য্যন্ত কেউ যেন সভা ছেড়ে না ওঠে। রাজার হুকুম, সকলে আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে রইল। ভাবতে ভাবতে কেউ কেউ ঘেমে ঝোল হ'য়ে উঠ্‌ল, চুলকিয়ে চুলকিয়ে কারো কারো মাথায় প্রকাণ্ড টাক প'ড়ে গেল। ব'সে ব'সে সকলের খিদে বাড়তে লাগল—রাজামশায়ের খিদেও নাই বিশ্রামও নাই—তিনি বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

সকলে যখন হতাশ হ'য়ে এসেছে, আর মনে মনে পণ্ডিতদের "মূর্খ অপদার্থ নিষ্কর্ম্মা" ব'লে গাল দিচ্ছে এমন সময় রোগা সুঁট্‌কো মত একজন লোক হঠাৎ বিকট চীৎকার ক'রে সভার মাঝখানে প'ড়ে গেল। রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্র উজির নাজির সবাই ব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন "কি হ'ল, কি হ'ল"?

তখন অনেক জলের ছিটা পাখার বাতাস আর বলা কওয়ার পর লোকটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বল্ল, "মহারাজ, সেটা কি দাঁড়কাক ছিল" সকলে বল্ল, "হাঁ হাঁ হাঁ—কেন বল দেখি"? লোকটা আবার বল্ল, "মহারাজ সে কি ঐ মাথার উপর দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে বসেছিল—আর মাথা নীচু ক'রে ছিল, আর চোখ পাকিয়ে ছিল আর "কঃ" ক'রে শব্দ ক'রেছিল"? সকলে ভয়ানক ব্যস্ত হ'য়ে বল্ল, "হাঁ হাঁ—ঠিক ঐ রকম হ'য়েছিল"। তাই শুনে লোকটা আবার ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল—আর বল্‌তে লাগল, "হায় হায় সেই সময়ে কেউ আমায় খবর দিলে না কেন"?

রাজা বল্লেন, "তাই ত, একে তখন তোমরা খবর দেওনি কেন"? লোকটাকে কেউই চেনে না তবু কেউ সে কথা বল্‌তে সাহস পেল না, সবাই বল্ল "হ্যাঁ, ওকে খবরটা দেওয়া উচিত ছিল"—যদিও কেন তাকে খবর দেবে, আর কি খবর দেবে, একথা কেউ বুঝতে পারল না। লোকটা তখন খুব খানিকটা কেঁদে তারপর মুখ বিকৃত ক'রে বল্ল, "দ্রিঘাংচু"। সে আবার কি! সবাই ভাবল, লোকটা খেপে গেছে।

মন্ত্রী বল্লেন, "দিঘাঞ্চু কি হে"? লোকটা বল্‌ল "দিঘাঞ্চু নয়, দ্রিঘ্রাংচু।" কেউ কিছু বুঝতে পারল না—তবু সবাই মাথা নেড়ে বল্‌ল "ও!" তখন রাজা মশাই জিজ্ঞাসা

করলেন "সে কি রকম হে?" লোকটা বল্‌ল "আজ্ঞে আমি মূর্খমানুষ, আমি কি অত খবর রাখি, ছেলে বেলা থেকে দ্রিঘাংচু শুনে আস্‌ছি—তাই জানি দ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে, তখন তাকে দেখতে দেখায় দাঁড়কাকের মত। সে যখন সভায় ঢোকে তখন সিংহাসনের ডান দিকে থামের উপর বসে, মাথা নীচু ক'রে দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে চোখ পাকিয়ে 'কঃ' ব'লে শব্দ করে। আমিত আর কিছু জানিনা—তবে পণ্ডিতেরা যদি জানেন—"পণ্ডিতেরা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন "না, না, ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নি।"

রাজা বল্‌লেন "তোমায় খবর দেয়নি ব'লে কাঁদছিলে, তুমি থাক্‌লে কর্‌তে কি?" লোকটা বল্‌ল "মহারাজ, সে কথা বল্‌লে যদি লোকে বিশ্বাস না করে তাই বল্‌তে সাহস হয় না"।

রাজা বল্লেন, "যে বিশ্বাস করবে না তার মাথা কাটা যাবে"—তুমি নির্ভয়ে ব'লে ফেল"। সভাশুদ্ধ লোক তাতে হাঁহাঁ ক'রে সায় দিয়ে উঠল।

লোকটা তখন বল্ল, "মহারাজ, আমি একটা মন্ত্র জানি, আমি যুগজন্ম ধ'রে বসে আছি দ্রিঘাংচুর দেখা পেলে সেই মন্ত্র তাকে যদি বল্‌তে পারতাম তা হ'লে কি যে আশ্চর্য্য কাণ্ড হ'ত তা কেউ জানে না। কারণ, তার কথা কোন বইয়ে লেখেনি। হায় রে হায়, এমন সুযোগ আর কি পাব"? রাজা বল্লেন, "মন্ত্রটা আমায় বলত"। লোকটা বল্ল, "সর্ব্বনাশ! সে মন্ত্র দ্রিঘাংচুর সামনে ছাড়া কারুর কাছে উচ্চারণ করতে নেই"। আমি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি—আপনি দুদিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালে উঠে সেটা পড়ে দেখবেন। আপনার সাম্‌নে দাঁড় কাক দেখলে তাকে আপনি মন্ত্র শোনাতে পারেন, কিন্তু খবরদার আর কেউ যেন তা না শোনে—কারণ দাঁড়কাক যদি দ্রিঘাংচু না হয়, আর তাকে মন্ত্র বলতে গিয়ে অন্য লোকে শুনে ফেলে, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ"!

তখন সভা ভঙ্গ হ'ল সভার সকলে এতক্ষণ হাঁ ক'রে শুনছিল, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, সকলে দ্রিঘাংচুর কথা, মন্ত্রের কথা আর আশ্চর্য্য ফল পাওয়ার কথা, বলাবলি করতে করতে বাড়ী চ'লে গেল।

তারপর রাজামশাই দুদিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকাল বেলা—সেই লোকটার লেখা কাগজখানা খুলে-পড়্‌লেন। তাতে লেখা আছে—

"হল্‌দে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎ পটাং
মুস্কিল আসান উড়ে মালী
ধর্ম্মতলা কর্ম্মখালি।"

রাজামশাই গম্ভীর ভাবে এটা মুখস্থ করে নিলেন। তারপর থেকে তিনি দাঁড়কাক দেখলেই লোকজন সব তাড়িয়ে তাকে মন্ত্র শোনাতেন, আর চেয়ে দেখতেন কোন রকম আশ্চর্য্য কিছু হয় কিনা! কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তিনি দ্রিঘাংচুর কোন সন্ধান পা'ন নি।

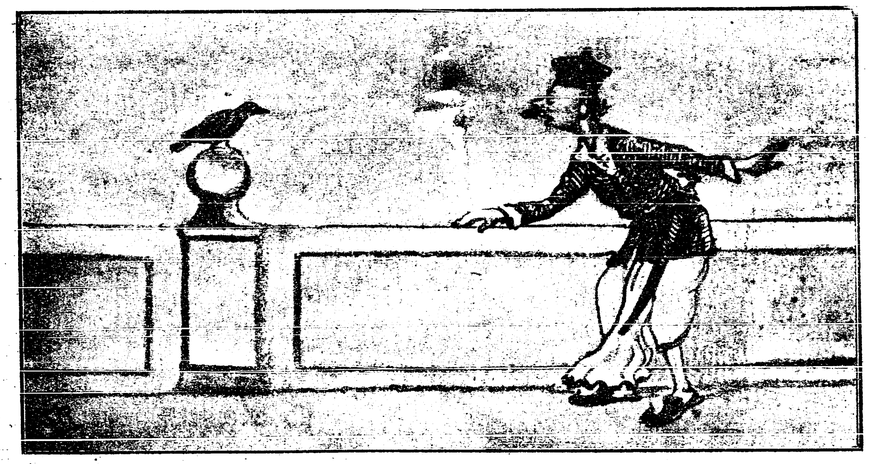

রঙিন ছবি।

সন্দেশে যে সকল ছবি ছাপা হয়, তার প্রায় সবই "হাফটোন" ছবি। এই হাফটোন ব্লকের কথা গত বৎসরের সন্দেশে কিছু কিছু বলা হ'য়েছিল। ছোট বড় বিন্দু বসিয়ে কেমন করে তা দিয়ে আলোছায়া সাদা-কালোর তফাৎ দেখান হয় তারও দুয়েকটা ছবি

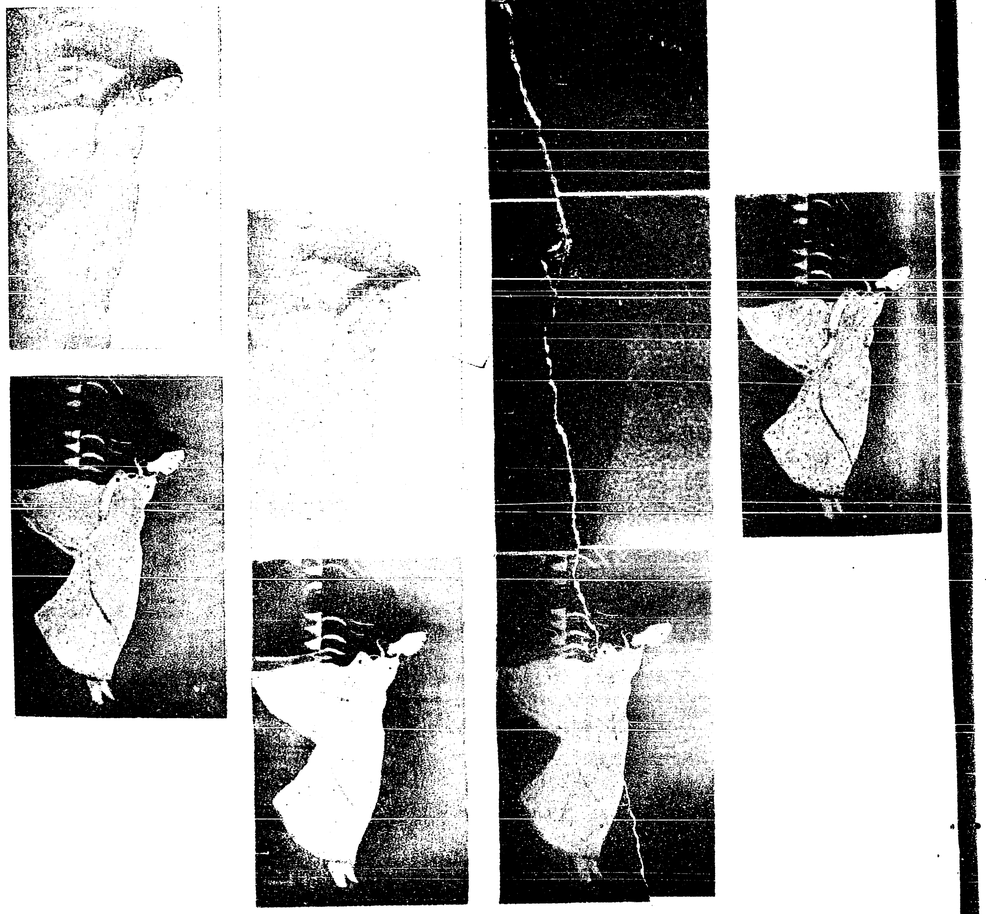

রঙিন ছবি।

২১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

বেরিয়েছে। এইখানে খুব মোটা মোটা বিন্দু দিয়ে একখানা হাফটোন ছবি ক'রে দেখান হয়ে'ছে। এটা দেখ্‌লে বুঝতে পারবে যে ছবির মধ্যে সাদা কাগজ আর কালো বিন্দু ছাড়া আর কিছুই নাই। সন্দেশের ছবিগুলাকে যদি কাচের "লেন্স" দিয়ে পরীক্ষা কর তা হ'লে তার মধ্যেও ওই রকম দানাদানা বিন্দু দেখতে পাবে—কিন্তু সেগুলি খুব মিহী।

ছবি যে রকম কালিতে ছাপবে তার সেই রকম রং হবে, এটা সহজেই বুঝতে পার; কিন্তু একই ছবিতে নানান্ রকম রং দেখায় কি ক'রে? ছাপাখানার প্রেসম্যান কি হাতে করে এক এক জায়গায় এক এক রকম কালি দেয়? তা যদি দিতে হ'ত তা হ'লে এক একটি ছবি ছাপতে এমন সাংঘাতিক সময় লাগত যে সারাটি মাস ধ'রেও সন্দেশের রঙিন ছবি ছেপে ওঠা যেত না।

কি রকম ক'রে রঙিন ছবি করতে হয় সেইটা বোঝবার জন্য এবার একটা ছবি দেওয়া হ'ল। এই ছবিটা বুঝবার আগে এটা বলা দরকার যে রঙিন ছবির মোট কথা এই—তিন রকমের তিনখানা হাফটোন ব্লক করে—তার এক একটাকে এক এক রকম কালি দিয়ে একটার উপর আর একটা ছাপতে হয়। সাদা কাগজের উপর হল্‌দে-লাল-নীল এই তিন রকম রং নানান্ ভাবে মিশিয়ে যে কোন রং ফলান যেতে পারে। তাই, ছাপবার সময় ঐ তিন রকম রঙের কালি ব্যবহার করে।

COLOURED DOCUMENT.

একখানা ব্লক বা ছবি হলদে কালিতে ছাপা হয়—সেটার মধ্যে ছবির যেখানে যে রকম হলদে দরকার সেই ব্লক সেখানে ছোট বড় দানা। মনে কর ছবির যেখানে খুব হলদে রং থাকা দরকার (যেমন হলদে সবুজ কমলা প্রভৃতি রং) সেখানে বড় বড় মোটা মোটা দানা, ছাপতে গেলে সেখানে বেশী কালি লাগে। আর যেখানে হল্‌দে রং কম থাকা দরকার (যেমন নীল বেগুনি গোলাপি প্রভৃতি রং) সেখানে বিন্দুগুলিও খুব ছোট ছোট ফাঁক ফাঁক—প্রায় সাদা বল্লেই হয়। তেমনি লাল রঙে ছাপবার ব্লকের মধ্যে সবুজ হলদে নীল প্রভৃতি রঙের জায়গায় হাল্কা দানা, আর লাল, কমলা, বেগুনি প্রভৃতি রঙে ভারি ভারি মোটা দানা—তাতে অনেকটা রং ধরে। নীল ব্লকটাতেও ঠিক এই রকম দরকার মত কোন জায়গায় হালকা ও কোন জায়গায় ঘনবিন্দু—যেখানে যেমন দরকার।

যেখানে তিনটা রংই খুব বেশী ক'রে থাকে সে জায়গা ছাপায় কালো দেখায়। সবগুলা আরও হাল্কা কর্‌লে ছেয়ে রং হয়। নীলটা একটু কমিয়ে দিলে, তাতে নানা রকম মেটে রং করা যায়। এই রকমে দরকার মত তিনটা কালির তফাৎ ক'রে যে কোন রং দেখান যেতে পারে।

এই যে তিনটে তিন রকম ব্লক করতে হয়—এটা করবার উপায় কি জান? মনে কর, একখানা রঙিন ছবি এঁকে সেটা সন্দেশে দেওয়ার কথা হ'ল। এখন সেটা থেকে তিন রকম ব্লক হবে কি ক'রে? প্রথমত, সেই ছবিখানা থেকে তিনখানা ফটো তুলতে হয়। যে ফটো তুলবে তার কাছে তিনখানা রঙিন কাচ আছে—সবুজ বেগুনি আর কমলা রঙের—অর্থাৎ যে যে রকম কালিতে ছাপা হবে ঠিক তার "উল্টা" রঙের। "উল্টা" রং কি রকম জান? এই তিনখানা কাচের ভিতর দিয়ে যদি কোন রঙিন ছবির দিকে তাকিয়ে দেখ তা হ'লে এক অদ্ভুত মজা দেখবে। কাচের রঙের দরুণ ছবির চেহারা একেবারে বদলিয়ে যাবে। বেগুনি কাচটার ভিতর দিয়ে দেখলে লাল আর নীল রং দেখায় হাল্কা আর হলদেটা খুব কালো হয়ে ফুটে ওঠে। সবুজ কাচের ভিতরে লাল রংটা খুব পরিষ্কার কাল দেখায়—কমলা রঙের কাচে নীল যেখানে যেটুকু আছে বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। এখন এই তিনখানা কাচ দিয়ে ছবি তুলে দেখা যায়—বেগুনি কাচের ভিতর দিয়ে তোলা ছবিতে রঙিন ছবির হল্‌দে জায়গাগুলো ওঠে, সবুজ কাচের ভিতর দিয়ে তোলা ছবিতে রঙিন ছবির লাল জায়গাগুলো ওঠে, আর কমলা রঙের কাচের ভিতর দিয়ে তোলা ছবিতে রঙিন ছবির নীল জায়গাগুলো ওঠে। এখন এই

হল্‌দের ছবি যদি হল্‌দে কালীতে ছেপে, লালের ছবিটা লাল কালী দিয়ে আর নীলের ছবিটা নীল কালী দিয়ে তার উপর ঠিক মিল ক'রে ছাপা যায়, তা' হ'লে রঙ্গিন ছবির অবিকল নকল পাওয়া যেতে পারে!

এই বিষয়টা ভাল ক'রে বুঝতে হ'লে এবারের রঙ্গিন ছবিটা দেখ। ওর উপরের ছবিখানা মনে কর মূল ছবি। তার নীচের লাইনের তিনখানা ছবিতে দেখান হয়েছে—বেগুনি, সবুজ আর কমলা রঙের কাঁচের ভিতর দিয়ে ছবিটাকে কি রকম দেখায়। তার নীচের লাইনে ছবির হল্‌দে, লাল, আর নীল ভাগটা দেখান হয়েছে। তার নীচের লাইনে প্রথমে দেখান হয়েছে হল্‌দের উপর লাল মিল ক'রে ছাপ্‌লে কি রকম দেখায়। ছবিখানা ছাপা শেষ হলে—অর্থাৎ হল্‌দে আর লালের উপর নীল ছাপা হলে কি রকম হয় তাই সকলের শেষে দেখান হয়েছে।

শিবিরাজের পরীক্ষা।

(প্রথম দিন।)

সে অনেক দিনের কথা। আমাদের এই ভারতবর্ষে শিবিনামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার গুণে রাজ্যের সকল লোক বড়ই বাধ্য ছিল এবং সকলেই তাঁহার কল্যাণ কামনা করিত।

একদিন ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে বসিয়া ভাবিলেন, ভারতবর্ষের রাজা শিবি কেমন দাতা তাহা আমাকে পরীক্ষা করিতে হইবে। এই ভাবিয়া ব্রহ্মা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিলেন ও রাজ সভায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ শিবি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহারাজ আমি ক্ষুধায় বড় কাতর হইয়াছি, অন্নাভাবে আমার শরীর বড় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমাকে শীঘ্র খাইতে দিন।" শিবি হাত যোড় করিয়া বলিলেন, "কিরূপ খাদ্যের আয়োজন করিব, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করুন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভাতের সঙ্গে মাংস খাইতে আমি বড় ভালবাসি, তুমি শীঘ্র মাংস ও ভাতের আয়োজন কর।" শিবি বলিলেন, "কিরূপ মাংস আপনার জন্য রন্ধন করাইব? পাখির মাংস কি হরিণের মাংস আপনার প্রিয়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—

"বৃহদ্‌গর্ভ নামে তব প্রিয় পুত্রে কাটি ;
রন্ধন করিলে মাংস হ'বে পরিপাটি।
সেই মাংস অন্ন সহ করিব ভোজন ;
বড় ক্ষুধা শীঘ্র তুমি কর আয়োজন।"

সর্ব্বনাশ! ব্রাহ্মণের আদেশ শুনিয়া সভার সকলে চমকিত হইয়া উঠিলেন। মহারাজ শিবি কিন্তু অকুণ্ঠিত চিত্তে উত্তর দিলেন, "যে আজ্ঞা!"

তখন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি পুষ্করিনী হইতে স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া আসি, তুমি আমার আদেশ মত আয়োজন কর।"

ব্রাহ্মণ স্নান আহ্নিক করিবার জন্য চলিয়া গেলে, শিবিরাজ অতিথি ব্রাহ্মণের আদেশ মত অন্ন ও মাংস রন্ধন করাইলেন এবং অতিথির আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মণের আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। তখন মহারাজ শিবি ভাবিতে লাগিলেন, "ব্রাহ্মণ এখন আসিতেছেন না কেন? আমার কি কোন ত্রুটী হইয়াছে? হায়, কোন দোষে আজ অতিথি ফিরিয়া গেল! সংসারে থাকিয়া যদি ক্ষুধিত অতিথিকে অন্নদান করিতে না পারিলাম, তবে আর জীবনে সুখ কি?" ভাবিতে ভাবিতে তিনি অন্ন ও মাংস হাঁড়ি করিয়া মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং সেই অতিথি ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানে নগরের রাজপথে বহির্গত হইলেন। পথে যাহাকে দেখিতে পান, তাহাকেই ব্রাহ্মণের কথা জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে ব্রাহ্মণের সংবাদ বলিতে পারে না।

ক্রমে বেলা অধিক হইল। শিবি চিন্তায় ও দুঃখে পথে পথে ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন আসিয়া বলিল, "মহারাজ! সেই অতিথি ব্রাহ্মণ রাজবাড়ীতে আপনাকে দেখিতে না পাইয়া ভয়ানক রাগ করিয়াছেন। তাঁহার রাগে আপনার গৃহ, ধনাগার, হাতী, ঘোড়া সব পুড়িয়া গেল, চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে!" শিবি বলিলেন, "সব যাক্, তা'তে আমি কিছুমাত্র ক্ষতি বোধ করিব না। এখন সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে পাইলে হয়!" তিনি ব্রাহ্মণের উদ্দেশে রাজবাড়ীর দিকে দৌড়িলেন।

রাজবাড়ীর সিংহদ্বারের সম্মুখে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই দেখুন অন্ন ও মাংস রন্ধন করা হইয়াছে। আপনার বিলম্ব হওয়ায় অন্ন ও মাংস লইয়া আমি আপনার অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম। দয়া করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা

করুন, অন্ন ও মাংস ভোজন করুন।" অন্ন ও মাংসের হাঁড়ি ব্রাহ্মণের সম্মুখে রাখিয়া গলায় কাপড় দিয়া শিবি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন সেই অতিথি ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইলেন। মানুষে এতখানি পারে, অতিথি সেবার জন্য—ক্ষুধিতকে ভোজন করাইবার জন্য—আপনার পুত্রকেও কাটিয়া রাঁধিয়া দিতে পারে, ইহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। কিন্তু যাহা ভাবিতে পারেন নাই, সত্য সত্যই শিবি তাহাই করিলেন দেখিয়া ব্রহ্মা খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তথাপি যেন বড়ই রাগ করিয়াছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "অন্ন ও মাংস রাঁধিতে তোমার বড়ই বিলম্ব হইয়াছে, এজন্য আমি তোমার উপর রাগ করিয়াছি। যদি এখন আমাকে সন্তুষ্ট করিতে চাও, তাহা হইলে আগে তুমি এই অন্ন ও মাংস খাও, পরে আমি খাইব। যদি না খাও তবে আমিও খাইব না, না খাইয়াই চলিয়া যাইব।" মহারাজ শিবি তখন অতিথির সন্তোষের জন্য অন্ন ও মাংসের কিছু অংশ গ্রহণ করিয়া খাইতে বসিলেন। তখন কেবল তাঁহার মনে হইতেছে, আমার দোষে যেন অতিথি ফিরিয়া না যান।

অতিথি ব্রাহ্মণরূপী ব্রহ্মা তখন অতিথি সেবার জন্য—ক্ষুধিতকে খাওয়াইবার জন্য—মহারাজ শিবিকে আপনার পুত্রের মাংস খাইতে উদ্যত দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন; ভাবিলেন এরূপ দাতা ও ধার্ম্মিক লোক কেবল এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেই শোভা পায়! তিনি শিবিকে খুব ধন্যবাদ দিলেন এবং তাঁহার হাত ধরিয়া অন্ন ও মাংস খাইতে নিষেধ করিলেন।

"মুখ তুলে চাহে শিবি সম্মুখে তখন ;
দেখিলা দাঁড়ায়ে তথা আপন নন্দন।
অতিথি ব্রাহ্মণে আর দেখিতে না পায় ;
উত্তীর্ণ হইল শিবি ঘোর পরীক্ষায়।"

"কীর্ত্তি-গাথা"—প্রণেতা।

কানে খাটো বংশীধর।

কাণে খাটো বংশীধর যায় মামা বাড়ী,
গুন গুনে গান গায় আর নাড়ে দাড়ী ॥
চলেছে সে এক মনে ভাবে ভরপূর,
সহসা বাজিল কানে সুমধুর সুর ॥
বংশীধর বলে, "আহা, না জানি কি পাখী,
সদূরে মধুর গায়, আড়ালেতে থাকি ॥
দেখ, দেখ, সুরে তার কত বাহাদুরি,
কালোয়াতী গলা যেন খেলে কারিকুরি ॥"
এ দিকে বেড়াল ভাবে, "এ যে বড় দায়,
প্রাণ যদি থাকে তবে ল্যাজখানি যায় ॥
গলা ছেড়ে চেঁচামেচি এত করি হায়,
তবু যে ছাড়ে না বেটা, কি করি উপায় ॥
আর তো চলে না সহা এত বাড়াবাড়ি,
যা' থাকে কপালে দেই এক থাবা মারি ॥"
বংশীধর ভাবে, "একি ! বেসুরা যে করে,
গলা গেছে ভেঙে তাই 'ফ্যাঁস্' সুর ধরে ॥"
হেনকালে বেরসিক বেড়ালের চাঁটি,
একেবারে সব গান করে দিল মাটি ॥

ছোট গল্প।

বেড়াল ওড়ে।

এক রাজার সভায় দুই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। একজন ছিলেন সত্যবাদী, আর একজন ছিলেন মিথ্যাবাদী। রাজামশাই রোজ রোজ সত্যি গল্প শুনতে চাইতেন, আর মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণ রোজই নূতন গল্প বানিয়ে রাজামশাইকে শুনিয়ে অনেক টাকা দক্ষিণা পেতেন—সত্যবাদী বেচারার আর কিছু জুটতো না। শেষে সত্যবাদীর দিন চলা ভার হয়ে উঠ্‌ল; না খেতে পেয়ে পেটের দায়ে শেষে তিনি মিথ্যা কথা বল্‌বেন স্থির করলেন। একদিন সকালে মিথ্যাবাদীর কাছে গিয়ে তিনি বল্‌লেন, "দেখ ভাই, আমি দেখ্‌ছি মিথ্যা না বল্লে আর দিন চলে না। আমিও কাল থেকে তোমার মত মিথ্যা বল্‌ব ঠিক করেছি। তা' ভাই আমিত আর তোমার মত ওস্তাদ নই—দু' একটা বেখাপ্পা কথা হয়ে গেলে তুমি শুধ্‌রে দেবে।" মিথ্যাবাদী বল্‌ল, "তা'র আর মুস্কিল কি? তুমি নির্ভয়ে মিথ্যা কথা বলো।" পরদিন সত্যবাদী ব্রাহ্মণ রাজসভায় গিয়েই বল্‌লেন, "রাজামশাই, আস্‌তে আস্‌তে দেখ্‌লুম যে একটা বেড়ালছানা উড়ে যাচ্ছে।" রাজা বল্লেন, "তাও কি হয়? বেড়াল কি কখনও ওড়ে? তোমার তো বড় মিছে কথা বলার অভ্যাস আছে দেখ্‌ছি হে—কাল থেকে তুমি আর এখানে এসো না।" মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণ অম্‌নি বলে উঠ্‌লেন, "মহারাজ, উনি মিথ্যা কথা বল্‌ছেন না। চিলে একটা বেড়ালছানাকে মুখে ক'রে উড়ে যাচ্ছিল, তারই ম্যাও ম্যাও শব্দ শুনে উনি মনে কর্‌লেন যে বুঝি বেড়ালছানাটাই উড়ে যাচ্ছে।" রাজামশাই তখন মহাখুসী হয়ে দুজনের জন্যই অনেক দক্ষিণার বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন।

পাতা আর ঢিল।

এক ছিল পাতা আর এক ছিল ঢিল। দুজনের খুব ভাব। সকল সময়েই একসঙ্গে থাকে আর বিপদে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। যখন জল হয় তখন পাতাটি ঢিলের উপরে থেকে ঢিলকে রক্ষা করে আর যখন ঝড় আসে তখন ঢিলটি পাতের উপরে চড়ে পাতাকে রক্ষা করে। এইরূপে দিন যায়;—একদিন ঝড়ও এসেছে আর জলও এসেছে আর তাতে পাতাটিও উড়ে গেছে আর ঢিলটিও গলে গেছে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দে।

নূতন ধাঁধা।

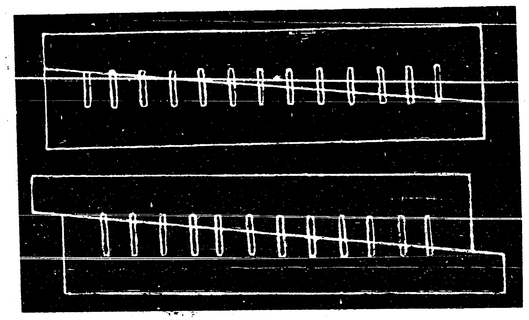

একদিন একটি ছেলে আর এক জনকে বল্‌ল, "ভাই, আমি একটা তামাসা দেখাতে পারি। এই যে কাগজে ১৩টা খুঁটির ছবি দেখ্‌ছ, এ গুলিকে কেটে এমন ক'রে সাজিয়ে দিতে পারি যে ১২টা খুঁটি হয়ে যায় —এই দেখ।" পাশের ছবিটা দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে কেমন করে হলো।

দ্বিতীয় ছেলেটি বল্‌ল—ভারী তো তামাসা! জিনিষ একটা উড়িয়ে দেওয়া শক্ত নয়। নূতন একটা তৈরী করতে পার তো বাহাদুরী বুঝি! এ একটা চৌকো কাগজে ৬৪টা ঘর আঁকা আছে। এটাকে চার টুকরো এমন ভাবে সাজাও দেখি যাতে ৬৪ ঘরের জায়গায় ৬৫ টা ঘর হয়। চারটা টুকরো কি রকম কাটতে হবে তাও আমি দেখিয়ে দিলাম।"

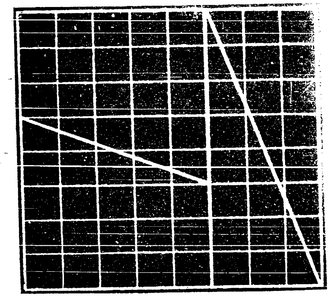

ভাদ্র মাসের ধাঁধার উত্তর—

গত মাসের সন্দেশে ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় ধাঁধার উত্তর ভুল বেরিয়েছে। উত্তর হবে,—কমলা-বেগুনি-সবুজ-হলদে-শাদা-গোলাপী-ছেয়ে-কাল-নীল- লাল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

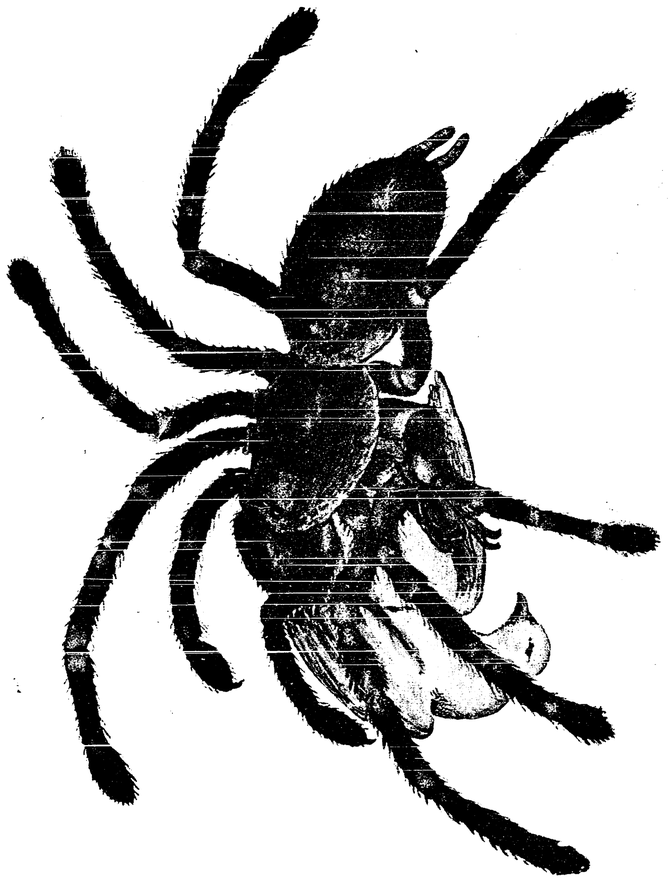

রাক্ষুসে মাকড়সা।

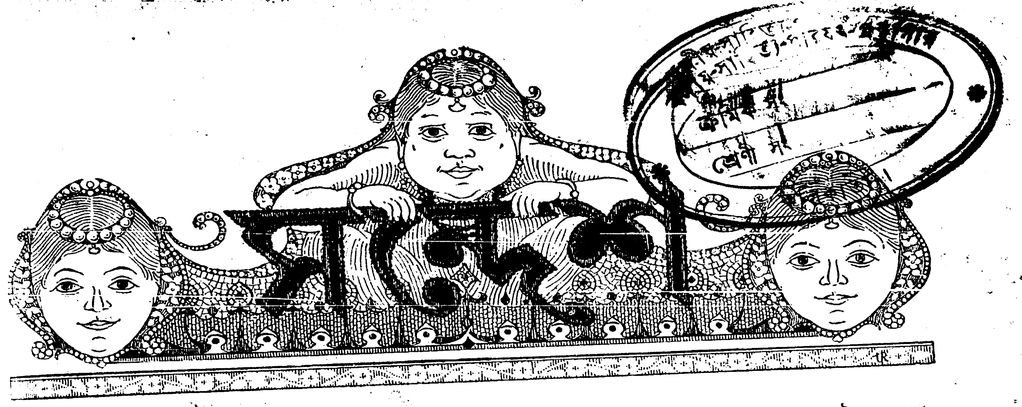

সন্দেশ

চতুর্থ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ | অষ্টম সংখ্যা

পড়ার হিসাব।

ফির্‌ল সবাই ইস্কুলেতে সাঙ্গ হ'ল ছুটি—
আবার চলে বই-বগলে সবাই গুটি গুটি।
পড়ার পরে কার ক্কি রকম মনটি ছিল এবার
সময় এল এখন তারই হিসেব খানা দেবার।
কেউ পড়েছেন পড়ার পুঁথি কেউ পড়েছেন গল্প,
কেউ পড়েছেন হদ্দমতন কেউ পড়েছেন অল্প।
কেউ বা তেড়ে গড়্গড়িয়ে মুখস্থ কয় ঝাড়া,
কেউ বা কেবল কাঁচুমাচু মোটে না দেয় সাড়া।
গুরুমশাই এসেই ক্লাশে বলেন, "ওরে গদাই
এবার কিছু পড়্‌লি? নাকি খেল্‌তি কেবল সদাই?"
গদাই ভয়ে চোক পাকিয়ে ঘাবড়ে গিয়ে শেষে
বল্লে, "এবার পড়ার ঠেলা বেজায় সর্ব্বনেশে—
মামার বাড়ি যেম্নি যাওয়া অম্নি গাছে চড়া
এক্কেবারে অম্নি ধপাস পড়ার মত পড়া!"

COLOURED DOCUMENT.

শুক্রাচার্য্যের তপস্যা।

দেবতাদিগের গুরু ছিলেন বৃহস্পতি। কথায় বলে—"বুদ্ধিতে বৃহস্পতি," বৃহস্পতি বাস্তবিকই অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন। শুক্রাচার্য্য দৈত্যদিগের গুরু, তিনি নাকি ছিলেন বৃহস্পতির চেয়েও বেশী বুদ্ধিমান।

সেকালে দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে ক্রমাগত হারিয়া অসুরদল যখন নিস্তেজ হইয়া পড়িল তখন তাহারা শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া বলিল—"প্রভু! দেবতাদের সঙ্গে আমরা আর কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছিনা। তাঁহারা বড় বড় দৈত্য যোদ্ধাদের প্রায় সকলকেই মারিয়াছেন এখন আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন, নতুবা আমরা পৃথিবী ছাড়িয়া পাতালে চলিয়া যাইব।"

ভৃগুমুনির পুত্র পরম জ্ঞানী শুক্রাচার্য্য দৈত্যদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"তোমাদের ভয় কি? পৃথিবীতে যত ভাল ঔষধ এবং মন্ত্র আছে তার সবই আমি জানি। সে গুলি যদি তোমাদের শিখাইয়া দেই তবে দেবতারা তোমাদের কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবেন না।"

এ দিকে দেবতারাও ভাবিলেন যে শুক্রাচার্য্য যদি তাঁহার ঔষধ মন্ত্র সব অসুরদিগকে বলিয়া দেন তাহা হইলে ত আর উপায় নাই! অতএব তাহার পূর্ব্বেই কেন আমরা অসুরকুল শেষ করিয়া ফেলি না? দেবতারা তখনি যুদ্ধের ঘটা করিয়া দৈত্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দুর্ব্বল অসুরেরা শুক্রাচার্য্যকে সম্মুখে রাখিয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিল দেবতাদিগকে গ্রাহ্যও করিল না। স্বয়ং শুক্রাচার্য্য দৈত্যদিগকে রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া দেবতারাও আর অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না।

উপস্থিত বিপদ কাটিয়া গেলে পর শুক্রাচার্য্য দৈত্যদিগকে বলিলেন, "একদিন স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিনটাই তোমাদের ছিল। বলিরাজার যজ্ঞে বিষ্ণু বামন অবতার সাজিয়া তিন পা জমি দক্ষিণা চাহিয়া তিন পায়ে সমস্তই দখল করিয়া লইয়াছেন, আর বলিরাজাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। জম্ভাসুর, বিরোচন প্রভৃতি বড় বড় দৈত্য যোদ্ধা বিষ্ণুর হাতেই মারা গিয়াছে, এখন তোমরা অতি অল্প লোকই বাঁচিয়া রহিয়াছ। আমার মনে হয় দেবতাদের সহিত এখন আর বিবাদ করিয়া কাজ নাই—কিছুকাল তোমরা চুপ করিয়া থাক। আমি মহাদেবের তপস্যা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সঞ্জীবনী

বিদ্যালাভ করিব। তারপর তোমরা পুনরায় দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিও—তখন তোমাদের জয় নিশ্চিত।"

এই উপদেশ মত দৈত্যপতি প্রহ্লাদ দেবতাদিগের নিকটে গিয়া প্রস্তাব করিল—"আমরা দানবদল সকলেই অস্ত্র ছাড়িয়াছি, আমরা আর যুদ্ধ করিবনা। এখন হইতে জটা বাকল পরিয়া বনে গিয়া আমরা তপস্যা করিব।" দেবতারাও তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন উভয় পক্ষ অস্ত্র ছাড়িয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল।

ইহার পর শুক্রাচার্য্য মহাদেবের তপস্যায় বাহির হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে দৈত্যদিগকে বলিয়া গেলেন, "তোমরা এখন কিছুকাল আমার পিতার অশ্রমে গিয়া সাধু সন্যাসীর মত থাক। আমি মহাদেবের তপস্যা করিয়া ফিরিয়া আসি।"

শুক্রাচার্য্য মহাদেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "প্রভু! দেবগুরু বৃহস্পতিরও অজ্ঞাত যে সঞ্জীবনী মন্ত্র আছে অসুর পক্ষের জয়ের জন্য আমি সেই মন্ত্র জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে শিখাইয়া দিন।"

মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠে, এমন মহামূল্য মন্ত্র শুক্রচার্য্য চাহিবা মাত্রই মহাদেব তাঁহাকে শিখাইয়া দিবেন—তাহাও কি হয়! তিনি বলিলেন—"একহাজার বৎসর একটিও কথা না বলিয়া এবং কেবল মাত্র ধূম পান করিয়া যদি আমার তপস্যা করিতে পার তাহা হইলে সঞ্জীবনী মন্ত্র তোমাকে শিখাইব।" মহাদেবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া শুক্রাচার্য্য সেইদিন হইতে এই গুরুতর তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ক্রমে এই তপস্যার কথা দেবতা দিগের কাণে পৌঁছাইল—তাঁহারা বিষম ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন অসুরেরা এখন সন্ধি করিয়া অস্ত্র ছাড়িয়াছে; এই সুযোগে শুক্রাচার্য্য ফিরিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে হইবে! তখনি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দেবতারা আবার অসুরদিগের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অসুরেরা যুদ্ধের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।

তাহারা নিরুপায় হইয়া গুরুমাতা ভৃগুপত্নীর শরণ লইল। ভৃগুপত্নী তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া বলিলেন—"বাছারা! তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব।" দেবতারা কিন্তু তবুও অসুরদিগকে আক্রমণ করিতে ছাড়িলেন না।

ভৃগুপত্নী তখন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন—"বটে! তোমাদের এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি অসুরদিগকে অভয় দিয়াছি তবুও তাহাদিগকে তোমরা বধ করিতেছ? আজ আমি তোমাদের দলপতি ইন্দ্রকেই মারিয়া ফেলিব।"—এই বলিয়া তিনি ইন্দ্রের দিকে

ছুটিলেন দেবসৈন্যের সাধ্য হইলনা যে তাঁহাকে বাধা দেয়। ভৃগুপত্নীর চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, তাঁহার তেজ দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। দলপতির দুর্দ্দশা দেখিয়া সৈন্যগণ তাঁহাকে ফেলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়! তখন বিষ্ণু আসিয়া ইন্দ্রকে তাড়াতাড়ি তাঁহার নিজের শরীরের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিলেন। তখন ভৃগুপত্নীর ক্রোধ ভীষণতর হইয়া বিষ্ণুর উপরে পড়িল। তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"আজ আর রক্ষা নাই! আমি সকলের সাক্ষাতে এখনি ইন্দ্র এবং বিষ্ণু দুজনকেই যোগ বলে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।"

এখন উপায়? বিষ্ণুর হাতে ছিল সুদর্শন চক্র, ইন্দ্র বলিলেন—"শীঘ্র সুদর্শন দিয়া উহার মাথা কাটিয়া ফেলুন।" স্ত্রীহত্যা করিতে হইবে ভাবিয়া বিষ্ণুর মনে ভারী দুঃখ হইল। কিন্তু তখন আর দুঃখ করিবার সময় নাই—তিনি চক্র দিয়া ভৃগুপত্নীর মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

এই ব্যাপার দেখিয়া মহর্ষি ভৃগু ক্রোধে বিষ্ণুকে অভিশাপ দিলেন—"এত বড় দেবতা হইয়া তুমি অবধ্য স্ত্রীলোককে হত্যা করিলে এই জন্য সাতবার তোমাকে মানুষ হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।"

ভৃগুমুনি তখন তাঁহার স্ত্রীর কাটা মাথাটি তুলিয়া লইয়া শরীরে লাগাইয়া তাহাতে জল ছিটাইয়া "দেবি, তুমি জীবিত হও" এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার পত্নী জীবিত হইলেন। তাঁহার এইরূপ আশ্চর্য্য তপস্যার বল দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

ইহার পর ইন্দ্র দেবপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে আর শান্তি নাই। সমস্ত রাত্রি চিন্তায় কাটাইয়া পরের দিন ভোর বেলায় তিনি তাঁহার কন্যা জয়ন্তীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"মা জয়ন্তী! দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী বিদ্যা পাইবার জন্য মহাদেবের তপস্যা করিতেছেন। ইহা পাইলে আমরা কিছুতেই অসুরদের সঙ্গে পারিয়া উঠিব না। তুমি গিয়া শুক্রাচার্য্যের সেবা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট কর।"

পিতার আদেশে জয়ন্তী যেখানে শুক্রাচার্য্য তপস্যা করিতেছিলেন সেখানে গিয়া দেখিলেন শুক্র অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া আছেন; তাঁহার শরীর শুকাইয়া গিয়াছে এবং মুখ দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। জয়ন্তী পরম ধৈর্য্যের সহিত বৎসরের পর বৎসর শুক্রের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। ক্রমে অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। এইরূপে হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে শুক্রাচার্য্যের ধূমব্রত শেষ হইল। তখন মহাদেব আসিয়া শুক্রাচার্য্যকে বলিলেন,—"একমাত্র তুমিই এই কঠোর তপস্যা করিতে

পারিলে, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি—তোমাকে আমি বর দিলাম।

বুদ্ধি, বল, তপস্যা এবং তোমার তেজ দ্বারা তুমি একাই দেবতাদিগকে জয় করিতে পারিবে। যে সঞ্জীবনী বিদ্যা পাইবার জন্য তুমি ব্যস্ত হইয়াছিলে তাহাও তোমাকে দিলাম। কিন্তু সঞ্জীবনী বিদ্যা তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।" এই বলিয়া মহাদেব চলিয়া গেলেন।

মহাদেব চলিয়া গেলে পর শুক্রাচার্য্য জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? কেন তুমি আমার দুঃখে কাতর হইয়া আমার সেবা করিতেছ? তোমার মিষ্ট ব্যবহারে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি—তুমি কি চাও বল, নিতান্ত কঠিন কাজ হইলেও আমি তাহা করিব।" জয়ন্তীর তখন ভারী লজ্জা বোধ হইল, এবং মাথা নীচু করিয়া শুক্রাচার্য্যের কথার শুধু এই উত্তর দিল,—"প্রভু! আপনি ত তপোবল দ্বারাই আমার মনের কথা জানিতে পারেন।"

শুক্রাচার্য্য যোগবলে জানিতে পারিলেন যে জয়ন্তীর ইচ্ছা সে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া দশ বৎসর তাঁহার সহিত সংসার বাস করে। শুক্রাচার্য্য তখন গৃহে ফিরিয়া গিয়া জয়ন্তীকে বিবাহ করিয়া দশ বৎসর কাল তাহার সহিত পরম সুখে সংসার করিতে

লাগিলেন। এই সময়ে তিনি যোগ বলে অদৃশ্য হইয়া রহিলেন কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে অসুরেরা যখন শুনিল যে গুরু শুক্রাচার্য্য মহাদেবের নিকট হইতে বর লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন তখন তাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। কিন্তু গুরু তখন মায়া বলে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন—কাজেই তাঁহাকে না পাইয়া তাহারা ফিরিয়া গেল।

শুক্রাচার্য্যের এই অদৃশ্য-বাসের সংবাদ পাইয়া দেবতাদিগের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি গজাইল। দেবগুরু বৃহস্পতি শুক্রাচার্য্যের রূপ ধরিয়া দৈত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—"শিষ্যগণ! তোমরা সকলে আইস, মহাদেবের প্রসাদে আমি যে বিদ্যা লাভ করিয়াছি তাহা তোমাদিগকে শিখাইব।" দৈত্যদের তখন আনন্দ দেখে কে! সকলে মিলিয়া শুক্রবেশধারী বৃহস্পতির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে ক্রমে শুক্রাচার্য্যের যখন দশ বৎসর পূর্ণ হইল তখন তিনিও দৈত্যদের নিকটে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, কি সর্ব্বনাশ! বৃহস্পতি তাঁহার রূপ ধরিয়া দৈত্যদিগকে ঠকাইতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন,—"দৈত্যগণ! আমিই তোমাদের গুরু শুক্রাচার্য্য আর ইনি দেবগুরু বৃহস্পতি—আমার রূপ ধরিয়া তোমাদিগকে ফাঁকি দিতেছেন, তোমরা ইঁহাকে ছাড়িয়া আমার নিকট চলিয়া আইস।"

দুইজনই দেখিতে ঠিক এক রকম; কে যে শুক্রাচার্য্য এবং কে যে বৃহস্পতি মূর্খ দৈত্যেরা তাহা কি করিয়া বুঝিবে! তাহারা দুই জনকেই বার বার দেখিতে লাগিল। বৃহস্পতিও ছাড়িবেন কেন? তিনিও জোর করিয়া বলিতে লাগিলেন—"দৈত্যগণ! আমিই তোমাদের গুরু শুক্রাচার্য্য, আর ইনিই দেবগুরু বৃহস্পতি—আমার রূপ ধরিরা তোমাদিগকে ভুলাইতে আসিয়াছেন।"

তাঁহার কথা শুনিয়া অসুরেরা এক সঙ্গে মহা কোলাহল করিয়া বলিয়া উঠিল,—"ইনিই দশ বৎসর যাবৎ আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, আমরাও ইঁহাকেই গুরু বলিয়া মানিয়াছি।" এই বলিয়া অসুরেরা বৃহস্পতির পায়ের ধূলা লইয়া আগন্তুক শুক্রাচার্য্যকে শাসাইয়া বলিল,—"ইনিই আমাদের গুরু, আমরা ইঁহার কথা মতনই কাজ করিব। তুমি কে হে বাপু? তোমাকে আমরা চাই না, শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাও।"

এই অপমান শুক্রাচার্য্য সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দানবদিগকে অভিশাপ দিলেন—"ওরে দুষ্ট দানবগণ! তোদের মঙ্গলের জন্য এত করিলাম, এত বুঝাইলাম, তবু মুর্খেরা আমার কথা না শুনিয়া আমার অপমান করিলি। তোদের এই অপরাধে তোরা দেবতাদের নিকট পরাস্ত হইবি!" এই বলিয়া শুক্রাচার্য্য চলিয়া গেলেন।

বৃহস্পতি মনে মনে ভারী সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যই ছিল যাহাতে দানবেরা শুক্রাচার্য্যের বিদ্যা না শিখিতে পারে। এখন তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। আবার শুক্রাচার্য্য অভিশাপও দিয়াছেন—এখন দেবতাদের আর ভয় কিসের? এইরূপে দৈত্যদের সর্ব্বনাশ করিয়া তিনি নিজের রূপ ধরিয়া প্রস্থান করিলেন।

তখন অসুরেরা সবই বুঝিতে পারিল। তাদের মনের দুঃখে আর অনুতাপে তাহারা সকলে দলপতি প্রহ্লাদকে লইয়া শুক্রাচার্য্যের পায়ে লুটাইয়া পড়িল—কত যে কাঁদিল, কত যে অনুনয় বিনয় করিল! দৈত্যদের দুঃখ দেখিয়া শুক্রাচার্য্য গলিয়া গেলেন—তাঁহার রাগ দূর হইল। তিনি বলিলেন,—"দৈত্যগণ! আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, দেবতারা একবার তোমাদিগকে হারাইবেন তোমরাও কিছু দিনের জন্য পাতালে গিয়া আশ্রয় লইবে। কিন্তু আমার বিদ্যার বলে তোমরা আবার ফিরিয়া আসিবে এবং যুদ্ধে জয় লাভ করিবে।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

নিরেট গুরুর কাহিনী।

৪। ছিপ ফেলিয়া ঘোড়া ধরার গল্প।

আগের দিন গরমে খুব কষ্ট পাইতে হইয়াছিল বলিয়া, এবার শিষ্যেরা খুব ভোর বেলাতেই পোঁটলা পুঁটলি বাঁধিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু এবারেও বেচারারা রক্ষা পাইল না। গুরুও হাঁটিয়া চলিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা খুব আস্তে আস্তে যাইতেছিল, কাজেই বেশী দূর যাইবার আগেই রোদ উঠিয়া পড়িল এবং গরমে তাহাদের কষ্ট হইতে লাগিল। কাছেই একটা বাগান দেখা যাইতেছিল, তাহারা সকলে সেইখানে গিয়া বসিল, এবং সকলে মিলিয়া বাতাস খাইয়া ঠাণ্ডা হইতে লাগিল। এমন সময় বোকা ভাবিল, "আমি কেন এই বেলা স্নানটা সেরে নিই না? কাছে একটা পুকুরও ত আছে"।

সেই পুকুরের পাড়েই একটা মন্দির ছিল, আর মন্দিরের উঠানে একটা মস্ত বড় মাটির ঘোড়া দাঁড় করান ছিল। ঘোড়াটা বোধ হয় কেহ দেবতার নিকট মানত করিয়া থাকিবে, ইচ্ছা পূর্ণ হওয়াতে উঠানে রাখিয়া গিয়াছে। পুকুরটি জলে থই থই করিতেছিল, আর জলটা পরিষ্কারও খুব ছিল; কাজেই জলের মধ্যে ঘোড়াটার চমৎকার ছায়া পড়িয়াছিল। বোকা জলের মধ্যে একটা ঘোড়া দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, কিন্তু উপরের ঘোড়াটার দিকে চাহিয়া দেখিল যে সেটা এবং জলের ভিতরের ঘোড়াটা ঠিক এক রংয়ের এবং এক সমান, তখন তাহার মনে হইল যে, হয় ত জলের ভিতরের জিনিষটা আর একটা ঘোড়া নয়, উপরের ঘোড়ারই ছায়া।

এমন সময় একটু জোরে বাতাস বহাতে জলে ঢেউ উঠিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার ছায়াটাও নড়িতে লাগিল। বোকা তাড়াতাড়ি মাটীর ঘোড়াটার দিকে চাহিয়া দেখিল যে সেটা মোটেই নড়িতেছে না, আগের মত চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে, তখন তাহার স্থির বিশ্বাস হইল যে জলের ঘোড়াটা মাটীর ঘোড়া হইতে একেবারে আলাদা, এবং সেটা নিশ্চয় বাঁচিয়াও আছে, তাহা না হইলে নড়িবে চড়িবে কেমন করিয়া? তবুও একেবারে সব সন্দেহ দূর করিবার জন্য সে জলে একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিল। জলে ঢিল পড়িবামাত্র ছায়াটা খুব জোরে নড়িয়া উঠিল, বোকার মনে হইল যে, ঘোড়াটা মাথা তুলিয়া, পা ছুঁড়িয়া খুব জোরে লাফাইতে লাগিল। সে তখন ভয় পাইয়া ছুটিয়া গিয়া নিজের সঙ্গীদের খবর দিল।

শুনিবামাত্র বোকার সঙ্গীরা ছুটিয়া গিয়া পুকুরের ধারে উপস্থিত হইল। সব দেখিয়া শুনিয়া তাহারা বুঝিল যে বোকা ঠিক কথাই বলিয়াছে। জলের ঘোড়াটাকে কি রকম করিয়া ধরা যাইতে পারে ইহাই এখন ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কেহই জলে নামিয়া সেটাকে ধরিতে রাজি হইল না, নানা জনে নানা রকম উপায় বাহির করিতে লাগিল, কিন্তু কোনটার দ্বারাই কাজ উদ্ধার হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। শেষে ঠিক হইল যে ছিপ ফেলিয়া যেমন করিয়া মাছ ধরে, সেই রকম করিয়া ঘোড়াটাকে ধরিয়া ডাঙ্গায় তুলিতে হইবে। ছিপে করিয়া ত ধরা হইবে, কিন্তু বঁড়শী কোথায় পাওয়া যায়? পাঁচ বুদ্ধিমানের মধ্যে একজন একখানা কাস্তে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, সেইখানাকেই বঁড়শী করা স্থির হইল। গুরুর পাগড়ীতে কাস্তে বাঁধিয়া চমৎকার ছিপ তৈয়ারী হইল, টোপ হইল এক পোঁটলা ভাত, সেটাও এক শিষ্যের সম্পত্তি। যাক, এইবারে ছিপটি জলে ফেলা হইল, জিনিষটি বিশেষ হালকা

ছিল না, কাজেই খুব জোরে ঝপাৎ করিয়া গিয়া পুকুরে পড়িল। ঘোড়ার ছায়াটাও খুব জোরে নড়িয়া উঠিল। শিষ্যেরা দেখিল যে ঘোড়াটা ভয়ানক লাফাইতেছে এবং পা ছুঁড়িতেছে; তাহাদের ভয় হইল পাছে ঘোড়াটা লাফাইয়া বাহিরে আসিয়া তাহাদের দুই চার লাথি কসাইয়া দেয়। অতএব সকলে মিলিয়া সেখান হইতে দৌড় দিল। কেবল যে ছিপ ধরিয়াছিল সে পালাইল না, সেইখানেই বসিয়া রহিল। খানিক পরেই জলটা একটু স্থির হইল, তখন সকলে আবার আস্তে আস্তে আগাইয়া আসিতে লাগিল। এদিকে ভাতের পুঁটলীতে মস্ত এক মাছ আসিয়া কামড় দিয়াছে, ছিপে টান পড়িবা মাত্র যে ছিপ ধরিয়াছিল সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, দেখ, ঘোড়াটা টোপ গিলছে"। ইতিমধ্যে মাছটি পোঁটলা শুদ্ধ ভাত পার করিয়া বসিয়া আছে, আর কাস্তেখানি জলের

মধ্যের কতগুলি গাছ পালায় আট্‌কাইয়া গিয়াছে। ছিপ টানিয়া তুলিতে গিয়া তাহারা দেখিল যে সেটা উঠিতে চায় না, তখন সকলে আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,

"বঁড়শীটা একেবারে ঘোড়ার মুখে বিঁধে গিয়েছে, বাছা এইবার আমাদের হাতে এসেছেন"। ঘোড়াটাকে এইবার টানিয়া তুলিলেই হয়; সকলে মিলিয়া ছিপটাকে ধরিয়া খুব জোরে "হ্যাঁইও" করিয়া এক টান দিল আর সঙ্গে সঙ্গে পাগড়ী ছিঁড়িয়া সকলেই চিৎপাত! পাগড়ী বেচারার বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, একে গুরুমশায় তাহাকে অনেক বৎসর ধরিয়া মাথায় বাঁধিতেছিলেন, তার উপর পাঁচটি নাতুস্ নুতুস্ শিষ্যের টান।

ঐ সময় সেখান দিয়া একজন ভালমানুষ গোছের লোক যাইতেছিল। সে পুকুর পাড়ে পাঁচ জন লোককে গড়াগড়ি যাইতে দেখিয়া, কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তাহাদের কি হইয়াছে। শিষ্যেরা সকল কথা খুলিয়া বলিল। সে ব্যক্তি দেখিল যে ইহাদের বুদ্ধি কিছু বেশী, ইহাদিগকে আপনাদের ভুল বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। সে তখন একখানা কাপড় আনিয়া মাটীর ঘোড়াটাকে ঢাকিয়া দিল আর উহাদিগকে জলের ভিতর দেখিতে বলিল। জলের ঘোড়াটিকেও কাপড় ঢাকা দেখিয়া, তখন তাহারা ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিল। তখন তাহাদের মনে হইল যে এমন একজন ভাল লোক যখন পাওয়া গিয়াছে তখন তাহাকে আপনাদের সব সুখ দুঃখের কথা খুলিয়া বলা উচিত। লোকটিকে লইয়া গিয়া তাহারা প্রথমে গুরুকে দেখাইল। তারপর নিজেদের একটা ঘোড়ার দরকার, সেই জন্য অল্প দামে একটা ঘোড়ার ডিম কেনা, সেই ডিমটা নষ্ট হইয়া যাওয়া এবং ষাঁড় ভাড়া করা, প্রভৃতি যত ঘরের কথা ছিল কিছুই বলিতে বাকী রাখিল না। সে লোকটি দেখিল যে ইহারা ভাল মানুষ, যদিও ইহাদের বুদ্ধির কিছু অভাব আছে। বোকাদের প্রতি তাহার একটু দয়া হইল, সে বলিল, "আমার একটা খোঁড়া ঘোড়া আছে, সেটা বুড়োও হয়েছে কাজেই তাতে চড়তে কোনও ভয়ের কারণ নেই। টাকা কড়ি কিছুই দিতে হবে না, আমি ঘোড়াটা অমনিই তোমাদের দেব। তোমরা সকলে আমার বাড়ী এস।" এই বলিয়া সে সকলকে লইয়া নিজের বাড়ী চলিল।

(ক্রমশঃ)

"কালা"।

যার কথা বল্‌তে যাচ্ছি তার নাম "কালা"—সে কিন্তু গোরা দেশেরি জীব, একটি অষ্ট্রেলিয়ান ওয়েলার ঘোড়া। কালো সে বটে, একদম্ 'কালো আদমি'—কপালে দুধের রংএর একটি টিপ ছাড়া তার শরীরে কোথাও সাদার চিহ্ন মাত্র নাই। এ টিপ সহি করে তার দেশ-মা যেন তার জাতীয়ত্বের দলিল রেজিষ্ট্রি করে দিয়েছেন, সে সনন্দ অপ্রমাণ করে আর কার সাধ্য। ঘোড়াটি দেখতে দিব্যি সুন্দর, কিছু সৌখীন, কিঞ্চিদধিক পরিমাণে খাম খেয়ালি! অভিজাত বংশীয় বলে তার বিশেষ অহঙ্কার আছে। কুলি মজুরের কালো কাপড়, মোট বইবার ঝুড়ি দেখলে একেবারে আঁতকে ওঠে। রাস্তায় তার নাকের পাশ দিয়ে হাওয়া গাড়ী ভোঁ ভোঁ করতে করতে গেলে, কিম্বা রাস্তা সারাবার এঞ্জিন গাড়ী যদি প্রবল শব্দে অত্যধিক ব্যস্ততার সহিত অনবরত যাওয়া আসা করে, তাহলেও এ বীর তুরঙ্গম কিছু মাত্র বিচলিত হয় না; কিন্তু ঝাঁকা মুটে-বেচারী পাশ কাটিয়ে গেলেও, সে চমকে, থমকে দাঁড়ায়; আর রাস্তার ধারে আঁচল-পাতা ভিখারিণীকে দেখলেত আর রক্ষা থাকে না, একেবারে মুখ ফিরিয়ে অন্য পথে যাবার জন্যে লম্ফ ঝম্প আরম্ভ করে। তখন তাকে অনেক দিলাসা দিতে হয়, বলতে হয় "গুড বয় গো অন্"—সহিস তার পিঠ চাপড়ায়, কোচম্যান বলে "চলো চলো"—আর মুনিব বলেন "আরে কালা কি দুষ্টামি করছিস্ শীগ্‌গির চল্"—অনেক স্তব স্তুতি এবং সেই সঙ্গে দুএকবার চাবুকেরও শব্দ হবার পর, স্থগিত যাত্রা আবার আরম্ভ হয়।

অভিজাত বংশীয় হলে কি হয়—কালার ক্ষুধা, নিবৃত্তি জানে না; ভোর ছয়টায় সে একবার দানা খায়, আর কিছু পূর্ব্ব হ'তেই চীৎকার আরম্ভ করে, "খাবার দাও", "খাবার দাও"। যখন দেখে দরওয়ান ভাঁড়ার খুলে সহিসকে দানা ওজন করে দিচ্ছে তখন সে আরো অস্থির হয়, চীৎকার করে, লাফায়, আবার এক এক দিন আস্তাবলের দরজার বাঁশ পা দিয়ে তুলে ফেলে, বাহিরে দৌড়ে আস্‌তে চায়। এর জন্যে তার শাসন যে হয় না তা নয়, তবে তাতে কোন ফল হয় না—আবার বেলা একটায় মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় সেই একই অভিনয় চলে। 'কালা'র কাণ্ডালপনারও অন্ত নেই, আপন খাবার খেয়ে আশ মেটে না, শোবার বিচালি পর্য্যন্ত শেষ করে। এটা ক্ষুধা নয়ত লোভ, এর আর অন্ত কোথায়, "যতই করিবে গ্রাস তত যাবে বেড়ে।" কালার

এটা স্বভাব-দোষ, সংশোধন হওয়া দুষ্কর—জানই ত কথায় বলে, "ইল্লত যায় ধুলে আর স্বভাব যায় ম'লে"—কালা ম'লে বড় অসুবিধা, লোভী হয়েই বেঁচে থাকুক কি করা যায় বল ?—কালা লোভী হলেও, তার আরও সদ্‌গুণ আছে। সে কুকুরের মত বাড়ী পাহারা দিতে জানে। অজানা লোক বাড়ীর ভিতর ঢুকলে, কিম্বা আস্তাবলের কাছে গেলে, সে চীঁহি চীঁহি সুরে এম্নি বাঁশরী বাজাতে আরম্ভ করে, যে, চাকর বাকর যে যেখানে আছে সবাইকে ঘরের বার ক'রে তবে সে ছাড়ে। অপরিচিত লোকটির সদ্‌গতি না করে কালা আর সুস্থির হয় না। তার চলন ভঙ্গীটি বড় সুন্দর, সে যখন ঘাড় বাঁকা করে, কাঁধের চুল নাচাতে নাচাতে, সমুদ্রের তরঙ্গের মত দুলতে দুলতে দৌড়ে যায়, তখন তাকে বড় চমৎকার দেখায়; যে দেখে সে বাহবা না দিয়ে থাকতে পারে না। কাজে তার আপত্তি নেই, যত দূরই নিয়ে যাও না খুসী মনেই যায়; তবে রাস্তা সম্বন্ধে বাচ বিচার আছে। কলিকাতার লাল রাস্তা আর গঙ্গা কিনারায় হাওয়া খাওয়াটাই তার পছন্দ সই—সহরের কাছাকাছি পাড়াগাঁয়ের মেঠো পথ, আর ধেনো জমী, আদপেই তার মনে ধরেনা; সে দিকে যেতে হলে হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টায় থাকে—কিন্তু শেষ অবধি জিদ্ বজায় রাখতে পারে না, কি করে রাখবে বল, পরাধীন, ছাঁদন দড়ি বাঁধন দড়ি দিয়ে গাড়ীর গায়ে বাঁধা, সহিসের তম্বি; কোচম্যানের চাবুক; সবাই মিলে তাকে কাবু করে ফেলে; তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চালকের ইঙ্গিত মত ছুটে চলে। রাস্তায় মধ্যে যদি কোথাও আটকান জল কিম্বা কলার পাতা কি বাস্‌না পড়ে থাকতে দেখে তবে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে; তার আকার প্রকার দেখলে বেশ বোঝা যায় ভারী ভয় পেয়েছে, সেখানে আর দাঁড়ায়না কি তাকায়না, একেবারে প্রাণপণ করে ছুটে চলে; কতক্ষণে এ বিভীষিকা এড়িয়ে যাবে, এই তার একান্ত চেষ্টা হয়। আর সে ভয় করে নিজের ছায়াকে, জ্যোৎস্না রাতে যখন সওয়ারিতে যায়, তখন সে এই আপন ছায়াকে দেখে আর অবাক হয়; কিছুই ঠাওর করতে পারেনা, এ সঙ্গী দাঁড়ালে দাঁড়ায়, ছুটলে আগ বাড়িয়ে যায়, কোন মতেই তাকে দূরে ফেলে যাবার যো নেই, যতই দৌড় দিক্ না বন্ধু সঙ্গে সঙ্গেই চলে, তবু তার কেমন ভয় হয়, হয়ত বা এ তার বন্ধু নয়; শত্রুই হবে বুঝি বা! সে যায় আর ফিরে ফিরে দেখে, আলোর দিক অনুসারে ছায়াও দিক্ পরিবর্ত্তন করে, আর এই অবোধ জীবটি দিশেহারা হয়ে পড়ে। সে তাই জ্যোৎস্নার চেয়ে অন্ধকারকেই পছন্দ করে বেশী, তখন এ নাছোড়বান্দা ছায়া তো সঙ্গে থাকেনা, "কালা" মনের আনন্দে চলে, নিজে

কালো; সে কালোকেই ভালবাসে, যেমন চোরে চোরে মাসতুত ভাই। আলোত তার জ্ঞাতি কুটুম্ব নয় তাই তাকে দূরে রাখে। পরকে আপন করা চতুস্পদের কর্ম্ম নয়।

"কালা" বড় আদুরে, সকালে সওয়ারি দিতে তার মন সরে না, তিনি চান সন্ধ্যার ফুর ফুরে হাওয়াটি যখন দেবে, তখন ফুল বাবুটির মত বেরোবেন। সকাল বেলায় ঘুম ভেঙে উঠে দিব্যি আরামে জিরিয়ে জিরিয়ে প্রাতরাশের সদ্ব্যবহার করবেন, ধীরে ধীরে দেহ হতে ঘুমের আলস ছুটবে, তারপর সহিসের হাত ধরে আহ্লাদে আলালের ঘরে দুলালের মত, দুল্‌তে দুল্‌তে বেড়াতে যাবেন, এই তাঁর মনগত অভিপ্রায়; কিন্তু কার্য্য-গতিকে যে দিন এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় সে দিন ভারী চটে যান। গাড়ী জুতবার সময় বার বার ফিরে ফিরে তাকায়, ভাবখানা, দেখত আমার "ভোরের চা রুটির তোস" সব পড়ে রইল আমায় কোথায় নিয়ে যায় ?" তবে ফিরে এসে যখন মুখভরে আখ খেতে পায় তখন সে খুব খুসী হয়। "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এ কথা তো আমরা সবাই মানি, তা "কালা" কোন ছার ?

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

রাক্ষুসে মাকড়সা।

ভাই সন্দেশ,

তুমি আশ্বিনের সংখ্যায় রাক্ষুসে কাঁকড়া আর নারকেল্-খেকো কাঁকড়ার কথা লিখেছ, তা পড়ে খুব আশ্চর্য্য বোধ হল।

উড়িষ্যায় আমার বাড়িতে, কাল যে কাঁকড়ার মাসতুত ভাই এক মাকড়সাকে দেখলাম সেও কম অদ্ভুত নয়। তার ছবি দেখলে আর তার বিষয় পড়্‌লে তুমি নিশ্চয় আশ্চর্য্য হবে।

কাল রাত্রিতে আমার রাঁধুনি বামুন খাবার তৈয়ারি কত্তে বড়ই দেরী কল্লে। কারণটা কি বুঝবার জন্য রান্নাঘরে গেলাম। রান্না ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছি এমন সময়ে দেখলাম দরজার পাশে উপর থেকে একটা কি থপ্ করে পড়ল। ল্যাণ্ঠন দিয়ে দেখলাম কাঁকড়ার মত প্রকাণ্ড একটা মাকড়সা একটা টিক্‌টিকি ধরেছে আর টিক্‌টিকিটে তার পেটের তলা থেকে ছট্‌ফট্ কচ্ছে। খানিক পরেই, দেখতে দেখতে, টিকটিকিটার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। দেখলাম

মাকড়সাটা, বাঘের নখের মত বড় বাঁকা ও ধারাল, তার দাঁত দুটো টিকটিকির পিঠে ফুটিয়ে দিয়ে রক্ত চুষে খাচ্চে।

রান্না ঘরে আগুন তুলবার একটা বড় লোহার চিম্‌টে চুলোর পাশে পড়ে ছিল, আমি সেই চিম্‌টে নিয়ে ধীরে ধীরে মাকড়সার কাছে এসে তাকে চিম্‌টে দিয়ে ধরে তুল্লাম। সে তার বড় বড় ঠ্যাং চারিদিকে ছুঁড়্‌তে লাগল। আমি তাকে নিয়ে খুব বড় একটা কাঁচের চওড়া-মুখো বোতলের মধ্যে ফেলে দিয়ে বোতলের মুখ একখানা ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে মাকড়সাটাকে কয়েদ করে রাখলাম। আর তার চেহারা আর ভাবগতিক দেখতে লাগলাম। সে ভারি চটেছিল। চটে কর্ব্বেন কি, বাছাধন বন্দী! হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন এর পাঁচ যোড়া বা দশটা পা। তা কিন্তু নয়। মাথার সাম্‌নে প্রথম যোড়াটা দেখতে অন্য পাগুলোর মত হলেও সে দুটো গোঁফ বা শুঁয়োর কায করে। ফড়িং, আর্স্থলো, প্রজাপতি প্রভৃতির যেমন এক যোড়া করে সরু শুঁয়ো থাকে, মাকড়সাদেরও তেমনি শুঁয়ো না থাকলেও এক যোড়া শুঁয়োর মত আছে, সে যোড়া সরু নয়, মোটা ও দেখতে ঠিক পায়ের মত। আর চার-যোড়া পা, সেই আটটা পা দিয়ে চলা ফেরা করে। প্রথম যোড়া দিয়ে ধ'রে বা স্পর্শ ক'রে দেখে তাই এ যোড়াকে "স্পর্শনি" বলে।

এ মাকড়সাটা কাঁচের বোতলের মসৃণ গা বেয়ে উঠতে লাগল। দেখলাম পিছনের তিন যোড়া পা দিয়েই উঠছে, আর প্রথম পা যোড়া ও শুঁড় যোড়া সামনের দিকে তুলে নাড়চে যেন হাতড়ে হাতড়ে সব দেখছে। সাধারণ মাকড়সারা চার যোড়া পায়ে হাঁটে, এরা পিছনের তিন যোড়া পায়ে হাঁটে, প্রথম দুযোড়া স্পর্শনির কায করে। তারপর টেবিলের উপর আঙ্গুল দিয়ে টোকা মাল্লে যেমন ঠক্ ঠক্ করে শব্দ হয়, বোতলের মধ্য থেকে সেই রকম শব্দ বেরুচ্ছে। মনে কল্লাম পায়ের আগায় নখ আছে তাই

দিয়ে বুঝি টোকা মাচ্ছে, অথবা দাঁতে ঘা মারছে। আলো দিয়ে বেশ করে দেখলাম, তাতে বুঝলাম ও রকমে শব্দ হচ্চে না। পায়ের তলা নরম রোমে ঢাকা, তাতে নখ নাই, থাক্‌লেও এত ছোট ও সরু যে তা দিয়ে শব্দ হয় না। তারপর দেখলাম যখনই শুঁয়ো তুলে চোয়ালে ঘষে তখনই ঠক্ করে শব্দ হয়। চোয়ালের গায়ে ছোট ছোট কাঁটা আছে, স্পর্শনির শক্ত গোড়াটা তাতে বাধিয়ে টান্‌লেই ঐ রকম শব্দ হয়। শব্দ করে' বোধ হয় ভয় দেখায়। পায়ের তলা এমন ভাবে গড়া যে খাড়া কাঁচের গা বেয়েও উঠতে পারে পিছলে পড়ে না। পিঁপ্‌ড়ে ও রকম উঠতে পারে না, মাছিতে পারে।

এর গলা নাই। মাথা ও বুক মিশে এক হয়ে গিয়েছে। পেট্‌টা বুক থেকে ভিন্ন আছে। শরীরটা দুভাগে বিভক্ত,—মাথাযুক্ত বুক আর পেট। সব মাকড়সার ঐ রকম। কাঁকড়ার মাথা-বুক-পেট সব যুড়ে এক হয়ে গিয়েছে। এর মুখের সাম্‌নে দুটো শক্ত ঢিব্‌লে আছে, সে দু'টো তার চোয়াল বা ঠোঁট। সেই ঠোঁটের আগায়, তলার দিকে বাঁকান, বিড়ালের নখের মত শক্ত, বাঁকা ও ছুচল বিষ দাঁত আছে। সাপের বিষ দাঁতের মত এদের দাঁতেও ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়ে ঠোঁটের গোড়ায় বিষের থলি থেকে বিষ বেরিয়ে আসে। টিকটিকিটার পিঠে দাঁত ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দিয়েছিল বলে টিকটিকিটা নিস্তেজ হয়ে পড়্‌ল আর তারপর মরে গেল। ছোট মাকড়সাদেরও ঐ রকম বিষ দাঁত আছে। তারা মাছি বা অন্য পোকা ধরে দাঁত বসিয়ে, বিষ ঢেলে মেরে ফেলে তারপর রক্ত চুষে খায়। এই ঠোঁট দুটাকে "দংশনোষ্ঠ" বলে। কাঁকড়ার সামনের দুটো পা তার শিকার ধরবার চোয়ালের অথবা হাতের কায করে, কিন্তু সে দুটা তাদের ঠোঁট নয়, আর তাদের বিষ দাঁতও নাই। মাকড়সার দুটো দাঁত মুখের মধ্যে নয়, আর তা দিয়ে খাবার চিবুনো বা ছেঁড়াও যায় না, সুতরাং এদুটো সত্যিকার দাঁত নয়। ঐ শিকার মারা কল, আর শিকার ধরে মুখের মধ্যে পূরে দেবার যন্ত্র। তা ছাড়া এ দিয়ে খাবার ধরে মুখের কাছে আনে।

এর পায়ে অনেকগুলি গাঁট বা পর্ব্ব বা পাঁপ্ আছে। প্রত্যেক পায়ে সব শুদ্ধ সাতটা পর্ব্ব আছে। কাকড়া ও চিঁড়ি,, পতঙ্গ ও তেঁতুলে বিছা আর কেন্নোর পাও এই রকম অনেক ভাগে বা পর্ব্বে বিভক্ত। সেই জন্য এই সব প্রাণীকে এক বিভাগে ভুক্ত করা হইয়াছে, এই বিভাগের প্রাণীদের নাম "পর্ব্বপদ" প্রাণী। কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি যে সব পর্ব্বপদ প্রাণীর দেহ শক্ত খোলায় ঢাকা তাদের এক শ্রেণীতে রাখা হয়েছে, তার নাম "খোলাকী"—ফড়িং, প্রজাপতি, মশা মাছি, বোল্‌তা পিঁপড়ে প্রভৃতি

যে সব পর্ব্বপদ প্রাণীর দেহ তিন ভাগে কাটা বা বিভক্ত, অর্থাৎ যাদের মাথা বুক আর পেট ভিন্ন দেখা যায় তাদের অন্য এক শ্রেণীতে রাখা হয়েছে। তাদের "খণ্ডিত-দেহী" বলে। ইংরাজিতে এদের in-sect বলে, তার অর্থ—"খণ্ডিত দেহ"। এদের সকলেরই বুক্ থেকে তিন যোড়া বা ছ'টা পা বেরোয় সেই জন্য এদের আমরা "ষটপদও" বলি। কেন্নো, তেঁতুলে বিছে প্রভৃতি প্রাণীর দেহ অনেক ভাগে বিভক্ত এবং তাদের অনেকগুলি পা থাকে, তাই তাদের অন্য এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে আর তার নাম দেওয়া হয়েছে—"বহুপদ"।

যে সব প্রাণী মাকড়সার মত আর যাদের মাথা আর বুক এক হয়ে গিয়েছে তাদের শ্রেণীর নাম "মাকড়সা শ্রেণী"। মাকড়সা, কাঁকড়াবিছা,—আর কুকুর ও ছাগলে গায়ে যে 'টিক্' পোকা বা এঁঠুলি পোকা হয়—আর যে সব ক্ষুদে ক্ষুদে পোকা তোমার গায়ে বাসা করে তোমার খোস্ বা পাঁচড়া জন্মায়—তারা সব এই মাকড়সা শ্রেণী ভুক্ত। মাকড়সা in-sect নয়। যাদের মাথা, বুক ও পেট এই তিন ভাগ পৃথক ও স্পষ্ট ও যাদের ছ'টা ক'রে পা থাকে তারাই কেবল insect. মাকড়সাদের আটটা পা।

এই যে জাতের মাকড়সা ধরেছি তাদের রাক্ষুসে মাকড়সা বা বাঘা-মাকড়সা বলে। এরা অন্যান্য মাকড়সার মত জাল বুনে ফাঁদ পেতে শিকার ধরে না। বাঘের মত শিকারের পিছু পিছু নিঃশব্দে গিয়ে হঠাৎ তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে বিষ দাঁত ফুটিয়ে তাকে মেরে ফেলে। কয়েক জাতের ছোট ছোট মাকড়সা আছে তারাও ঐ রকমে মাছি ও অন্য ছোট ছোট পোকা শিকার করে। যারা এই রকমে শিকার ধরে তাদের শিকারী মাকড়সা বলে। অনেক জাতের মাকড়সা আছে তারা জাল বুনে ফাঁদ্ পেতে পোকা ধরে। তাদের মধ্যে কোন কোন জাত ঘরের মধ্যে দেয়ালের কোণে ও ছাদে জাল পাতে; কোন কোন জাত বাগানে গাছের ডালের মাঝে জাল পাতে; আবার কোন কোন জাত মাটিতে ঘাসের উপর জাল পাতে। জাল বোনার ধরণও সব জাতের সমান নয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতের মাকড়সা ভিন্ন ভিন্ন রকমের জাল তৈয়ার করে।

এই রাক্ষুসে মাকড়সার গা-ময় ঘন কোমল চিক্কণ লোমে ঢাকা, দেখ্‌তে মখ্‌মলের মত। রং কাল বা গাঢ় ধূসর। পা গুলিতে সাদা ও কাল ডোরা, দেখ্‌তে বেশ সুন্দর। মাথার উপরে মাঝখানে এক জায়গায় ছোট ছোট আটটি চোখ আছে।

এই জাতের রাক্ষুসে মাকড়সা ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়, সুমিত্রা, যব ও গায়না দ্বীপ এবং অষ্ট্রেলিয়া দেশে বাস করে। ইহারা খোড়ো ঘরের চালে, পুরাতন বাড়ীর

দেয়ালের ফাটলে, গাছের কোটরে, পাহাড়ের পাথরের ফাঁকে, ইঁট পাথর ও কাঠের গুড়ির তলায় বাস করে। ছবিতে দেখ, ইহার পিছন দিকে দু'টা উঁচু গোঁজের মত বাহির হইয়া রহিয়াছে, ও দু'টা ইহার সূতা-কাটা থলি। ঐ থলি হইতে সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে রস বাহির হইয়া জমিয়া সূতা হয়। সব মাকড়সার ঐ রকম সূতাকাটা থলি থাকে, সেই সূতায় জাল বুনে। ইহারা জাল না বুনিলেও সূতা অন্য কাযে লাগায়। ইহারা পেটের থলি হইতে সূতা বাহির করিয়া, ঘন করিয়া বুনিয়া রেসমের কাপড়ের মত তৈয়ার করে, সেই নরম কাপড় বাসায় পাতিয়া দিয়া আরামে বাস করে। স্ত্রী-মাকড়সা সূতা দিয়া ছোট্ট রেকাব বা বাটীর মত তৈয়ার করিয়া তাতে ডিম পাড়ে, পরে বাটীটার মুখ আর এক খানা কাপড়ের চাকৃতি দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। সেই কাপড়ের থলিয়ার ভিতর ডিমগুলি থাকে, পরে যথা সময়ে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। মা ক্ষুদে ক্ষুদে বাচ্চাদের কাছে কাছে থাকে আর তাদের খাওয়ায়। বাচ্চারা বড় হলে নিজেরাই শিকার ধরে খায়। কখন মা আর তাদের খোঁজ খবরও লয় না, বরং পেলে ধরে খেতেও ছাড়ে না। বাচ্চারা বড় হতে থাক্‌লে তাদের শরীরের চামড়াটা ফেটে যায়, তার তলে নূতন চামড়া গজায়, বাচ্চার শরীরটাও বড় হয়, আর পুরাণ চামড়াটা খসিয়া পড়ে। সাপে

ব্রেজিল দেশের পোষা 'রাক্ষুসে' মাকড়সা।

যেমন খোলস ছাড়ে, মাকড়সা, কাঁকড়া, চিংড়িও সেই রকম মাঝে মাঝে খোলস বদলায়, প্রত্যেক বারে শরীরটা পূর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়। পূর্ণবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত মাকড়সা সাত আট বার খোলস বদলায়।

আমি যে মাকড়সাটা ধরিয়াছি সেটার পা ছড়াইয়া দিলে, একপা'র আগা থেকে অপর পাশের পা'র আগা পর্য্যন্ত ৭ইঞ্চ লম্বা—সন্দেশের পাতার চেয়েও বেশী চৌড়া-স্থান জুড়িয়া থাকে। এর মাথার আগা থেকে পেটের শেষ পর্য্যন্ত আড়াই ইঞ্চ। এক একটা এর চেয়েও বড় হয়। এদেরি মত অন্য জাতের রাক্ষুসে মাকড়সা আমেরিকায় ও আফ্রিকায় দেখা যায়।

ব্রাজিল দেশে একরকম "রাক্ষুসে" মাকড়সা আছে। সেগুলি নাকি এমন পোষমানে যে সে দেশের ছেলেমেয়েরা অনেক সময় তাদের কোমরে দড়ি বাঁধিয়া এদিক ওদিক খেলাইয়া বেড়ায়। ঠিক যেন পোষা কুকুর।

ইহারা সাধারণতঃ আর্সল্লা, গুবরে পোকা, ফড়িং প্রভৃতি নানা প্রকার কীট পতঙ্গ, ছোট ছোট টিক্‌টিকি, গিরগিটি, সাপের বাচ্চা ও ছোট ছোট পাখীর বাচ্চা ধরিয়া খায়। ছবিতে দেখ, রাক্ষুসে মাকড়সায় কেমন টিকটিকি আর পাখী ধরে খাচ্চে।

আগামী বারে তোমায় কাঁকড়া-বিছে আর তেঁতুলে বিছার কথা বল্‌ব। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার মেজ দাদামশায়।

চার বিদ্যে।

এক ছিল বুড়ো—সে বেচারা নেহাৎ গরীব—তার চারটী ছেলেকে নিয়ে খুব কষ্টেস্থষ্ঠে দিন কাটাত। একদিন সে তার ছেলেদের ডেকে বল্লে "দেখ বাবা আমি ত বুড়ো হয়েছি আর কদিনই বা বাঁচব; তা তোমরা এই বেলা কিছু কাজ কর্ম্ম শিখে নাও যাতে তোমাদের আর আমার মত কষ্ট পেতে না হয়"। এই কথা শুনে ছেলেরা ভাবলে "তাইত বাবা ত ঠিক কথাই বলেছেন, একটা কিছু কাজ কর্ম্ম শিখে নেওয়া যাক।" এই বলে তারা চারজন যার যা কিছু পুঁজি ছিল তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারা ক্রমাগতই চল্‌তে চল্‌তে, কত গ্রাম, কত বন পার হয়ে শেষে একটা চৌমাথা রাস্তায় এসে পড়ল। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, সমস্ত দিন রোদে ঘুরে ঘুরে তাদের

গা, হাত, পা সব ঝিম ঝিম করছে। তারা আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে সেই খানেই ধপ্ করে বসে পড়ল। কাছে একটা ভাঙ্গা প'ড়ো বাড়ী ছিল, তারা রাত্তিরটা সেই খানেই কাটাবে ঠিক কল্লে"। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে চারজনে পরামর্শ করলে যে "আমরা চারজনে চারটি রাস্তা ধরে যাব কিন্তু ঠিক চার বৎসর পরে আবার এইখানে এসে জড় হয়ে তারপর এক সঙ্গে বাড়ী যাব।" এই ঠিক ক'রে চার জনে চার দিকে চলে গেল। বড় ছেলেটী খানিকটা যেতে না যেতে দেখতে পেলে যে একটি লোক তাকে হাত বাড়িয়ে ডাক্‌ছে। সে তখুনি তার কাছে গেল। সেই লোকটি জিজ্ঞেস কল্লে "তুমি কোথা যাচ্ছ?" বড়ছেলেটি বল্লে,"আমি কিছু একটা কাজ টাজ শেখবার জন্যে বিদেশে যাচ্চি"। সে বল্লে তার আর ভাবনা কি? আমার কাছে থাক, আমি তোমাকে সেরা বিদ্যে শিখিয়ে দোব। ছেলেটি জিজ্ঞেস কল্লে,"সে কি রকম?" সে লোকটা বল্লে "সে যা হচ্ছে এমন বিদ্যে যে তুমি যে জিনিষটা মনে করবে সেই জিনিষটা আনতে পারবে অথচ কেউ টের পাবেনা।" বড় ছেলেটি তাইতেই রাজী হয়ে তার সঙ্গে থেকে গেল। এদিকে মেজ ছেলেটিও যেতে যেতে একটা বুড়ো লোকের দেখা পেলে। সে লোকটা বল্লে "তুমি আমার চেলা হও আমি তোমায় এমন বিদ্যে শেখাব যাতে তুমি পৃথিবীর সব জিনিষ দেখতে পাবে।" মেজ ছেলেটিও তখন তার চেলা হয়ে রইল। সেজ ছেলেটিও ঐ রকম এক শিকারীর পাল্লায় পড়ল। শিকারী বল্লে "আমি তোমায় অব্যর্থ শিকার বিদ্যে শেখাব"। সেজ ছেলেটি শিকার শিখতে লেগে গেল। ছোট ছেলেটি যেতে যেতে দেখতে পেলে, রাস্তার ধারে একটা দর্জ্জি বড় বড় ইঁট পাটকেল সেলাই কচ্ছে। ছেলেটাকে দেখেই সে বল্লে "তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমার কাছে থাকনা আমি তোমায় আশ্চর্য্য রকম দর্জ্জির কাজ শেখাব"। ছোট ছেলেটি তার কাছেই রয়ে গেল। চার বৎসরের মধ্যেই তারা চারজনে পাকা ওস্তাদ হ'য়ে চার বিদ্যে শিখে ফেল্লে। ততদিনে তাদের ফিরে আসবার সময় হয়ে এল। তখন বড় ছেলেটি তার ওস্তাদের কাছে সেরা বিদ্যের কলকায়দা সব আদায় ক'রে নিল। মেজ ছেলেটিও আসবার সময় সেই বুড়োর কাছ থেকে এক টুকরো কাঁচ নিয়ে এল, তা দিয়ে পৃথিবীর সব জিনিষ দেখতে পাওয়া যায়। সেজ ছেলেটিকে সেই শিকারি একটি তীর ধনুক দিয়ে বল্লে যে "তুমি যাকে লক্ষ্য করে মারবে সেই মরে যাবে।" এই রকম ছোট ছেলেটিরও আসবার সময় দর্জ্জিটা তাকে একটা ছুঁচ দিয়ে বল্লে "তুমি এই ছুঁচ দিয়ে যা সেলাই কর্ত্তে যাবে তাই সেলাই হয়ে যাবে"। এই রকমে চার ভাই যার যার মত কাজ শিখে সেই চৌমাথার কাছে এসে

হাজির হলো। তারপর তারা খুব আনন্দে নিজের নিজের বিদ্যের কথা বলতে বলতে বাড়ী ফিরে এল। তাদের বাবা যখন শুনলেন যে তারা চারজনে চার রকম বিদ্যে শিখে এসেছে তিনি তাদের বিদ্যে পরীক্ষা করবার জন্যে এক দিন তাদের একটা গাছতলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে মেজ ছেলেকে বল্লেন "আচ্ছা! তুমি কি রকম বিদ্যে শিখেছ দেখি। মাঠের ওপারে ঐ বড় গাছটার আগায় কি আছে বল দিখিনি"। সে অমনি কাঁচ দিয়ে দেখে বল্লে যে একটা ধাড়ী পাখী পাঁচটা ডিমের ওপর বসে তা' দিচ্ছে। তারপর তিনি বড় ছেলেকে বল্লেন, "তুমি কেমন বিদ্যে শিখেছ দেখি! ওই ডিমগুলোকে এমন ভাবে পেড়ে নিয়ে এস যেন ধাড়ী পাখীটা না টের পায়"। বড় ছেলেটি বলবামাত্রই অমনি দৌড়ে গিয়ে ডিম পেড়ে নিয়ে এল। তখন তিনি পাঁচটি ডিমকে আলাদা আলাদা করে রেখে সেজ ছেলেকে সেই ডিমগুলোকে এক বাণে দশ টুকরো কর্ত্তে বল্লেন। সেজ ছেলে অমনি ডিম পাঁচটিকে দশ টুকরো করে ফেল্লো। এই বার ছোট ছেলের পালা। তিনি ছোট ছেলেকে বল্লেন, "আচ্ছা! তুমি এইগুলো যেমন ছিল ঠিক তেমনি করে সেলাই কর দিখিনি!" ছোট ছেলে অমনি চটপট সব বেমালুম সেলাই করে ফেল্লে। তিনি তখন বড় ছেলেটিকে ডিমগুলো যেমন ছিল তেমনি ভাবে রেখে আস্‌তে বল্লেন। ধাড়ী পাখীটা ডিমে তা দিচ্ছিল কিন্তু সে এর কিছুই টের পেলেনা। তখন বুড়োর মুখে চার ছেলের প্রশংসা আর ধরে না।

এদিকে হয়েছে কি সে দেশের রাজকন্যাকে একটা রাক্ষস নিয়ে পালিয়ে গেছে। রাজা চারিদিকে ঢেরা পিটিয়ে দিয়েছেন, যে রাজকন্যাকে উদ্ধার কর্ত্তে পারবে সে রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব পাবে। এই কথা শুনে চার ভাইয়ে বলে উঠল আমরা রাজকন্যাকে উদ্ধার করব। মেজ ছেলেটি অমনি সেই কাঁচটা দিয়ে দেখে বল্লে, "সমুদ্রের ওপারে রাক্ষসটি রাজকন্যার কোলে মাথা রেখে খুব ঘুমোচ্ছে।" তারা তখনই নৌকা ক'রে সমুদ্র পার হ'য়ে সেইখানে হাজির হ'লো; তারপর বড় ভাইটি গিয়ে আস্তে আস্তে রাজকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে এল। কিন্তু যেই তারা নৌকায় উঠেছে, অমনি রাক্ষসটারও ঘুম ভেঙে গেছে। সে তখন আকাশ অন্ধকার ক'রে, হাতের ঝাপ্‌টায় ঝড় বইয়ে মেঘের উপর দিয়ে রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে যেই নৌকায় লাফ দিতে যাবে অমনি সেজ ভাইয়ের বাণের ঘায়ে টুকরো টুকরো হ'য়ে ঝপাস ক'রে জলের মধ্যে এম্নি জোরে পড়ল, যে পাহাড়ের মতন ঢেউ উঠে এক বাড়িতে নৌকাটাকে মড়মড়িয়ে ভেঙ্গে ফেল্‌ল। এখন উপায় কি? ছোট ছেলেটী চটপট ছুঁচ চালিয়ে ভাঙা নৌকা

জুড়ে ফেল্‌ল। আর সবাই মিলে সেই নৌকাতেই নদী পার হ'য়ে রাজকন্যাকে নিয়ে একেবারে রাজার কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। রাজা মশাইত মহা খুসী। রাজ্যের মধ্যে ধূমধাম পড়ে গেল। রাজা খুব টাকাকড়ি দান করতে লাগলেন। কিন্তু রাজকন্যাকে কে বিয়ে করবে এই নিয়ে একটা মহা গোলযোগ উপস্থিত হলো। চার ভায়ের সকলেই নিজের নিজের প্রশংসা কর্ত্তে লাগল। মেজ ছেলে বল্লে আমি যদি না দেখতুম তা হলে সন্ধান হ'ত কি ক'রে? বড় ছেলে বল্লে আমি যদি না আনতুম তা'হলে খবর পেয়েই বা কি লাভ হত? সেজ ছেলে বল্লে, "এনেছিলে ভালই, কিন্তু রাখতে কি পারতে? আমি যদি না রাক্ষসটাকে মারতুম তা'হলে ত সবই মাটি হত"। ছোট ছেলে বল্লে, "আমি যদি না নৌকা তৈরি কর্ত্তুম তা'হলে কাউকে আর ফিরে আসতে হত না। শেষ রক্ষা করলাম আমি"। রাজামশাই তখন খুব গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "বাপু সকল, আমি তোমাদের গোলমাল মিটিয়ে দিচ্ছি। তোমরা কেউ রাজকন্যাকে বিয়ে কর্ত্তে পাবে না। অতএব আমার কথা মত আমি তোমাদের অর্দ্ধেক রাজত্ব দিচ্ছি তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও"। চার ভাইয়ে ভাবলে, তাই বা মন্দ কি অর্দ্ধেক রাজত্বত বড় কম কথা নয়! তখন তাদের বুড়ো বাপের আনন্দ দেখে কে?

শ্রীফণিভূষণ বসু।

ডাকঘরের কথা।

সন্দেশের ধাঁধার উত্তরের চিঠিগুলি সে দিন দেখছিলাম। কেউ আধ মাইল দূর থেকে লিখেছে চিঠি, কেউ লিখেছে ১৫০০ মাইল দূর থেকে—কিন্তু ১ পয়সার পোষ্ট কার্ডে প্রায় সকলেই লিখেছে। ১ পয়সা খরচে ১৫০০ মাইল চিঠি পাঠান, একি কম সস্তা হ'লো? হঠাৎ মনে হ'তে পারে অত কম মাশুলে এতদূর চিঠি পাঠাতে ডাকঘরের বুঝি লোকসান হয়;—কিন্তু তারা কি ২।১ খানা চিঠি পাঠায়?—প্রতিদিন লাখে লাখে চিঠি আর পার্শেল তারা পাঠায়;—তা'তেই তাদের খরচে পুষিয়ে যায়। ডাকঘরের বন্দোবস্তই বা কি কম আশ্চর্য্য রকম! তুমি হয় তো কল্‌কাতায় ব'সে একটা পোষ্ট কার্ডে চিঠি লিখে ডাক-বাক্সে সেটাকে ফেলে দিলে। কিছুক্ষণ পরে ডাকঘরের লোক এসে ডাক-বাক্সের চাবি খুলে চিঠিগুলো ডাকঘরে নিয়ে গেল। সেখানে অনেকগুলি লোকে মিলে চিঠির উপরে ডাকঘরের ছাপ মারে, আর এক একটা থলিতে এক একটা রেলে পাঠাবার চিঠিগুলি ভরে ফেলে—যেমন দার্জ্জিলিং মেলে, দার্জ্জিলিং, খরসান, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী, কুচবেহার, এই সব জায়গার চিঠি; পাঞ্জাব মেলে, বর্দ্ধমান, মধুপুর, পাটনা, বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, দিল্লী, লাহোর, এই সব জায়গার চিঠি। তারপর সব ছোট ডাকঘর থেকে বড় ডাকঘরে থ'লেগুলি পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে ষ্টেশনে চ'লে যায়। রেলের গাড়ীর মধ্যে আবার ডাকঘরের বন্দোবস্ত আছে। সেখানে থলিগুলো খুলে, প্রত্যেক জায়গাকার চিঠি আলাধা ক'রে এক একটা খোপে ভরে রাখে। তারপর সব চিঠি বাছা হয়ে গেলে, এক এক জায়গার চিঠি এক একটা আলগা থলিতে ভ'রে ফেলে। সেখানে যখন রেল পৌঁছায় তখন রেলের ডাকঘর থেকে সেই সেই জায়গার চিঠিগুলো নামিয়ে দেয়। তারপর

রেলের ডাকঘর।

আবার ডাকঘরে সেই থলি নিয়ে গিয়ে, তার থেকে চিঠি বের ক'রে, বেছে, পিয়ন দিয়ে

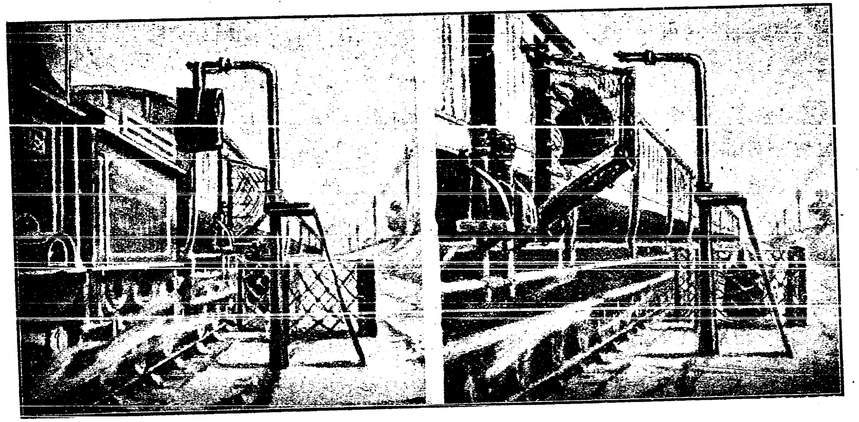

চলন্ত রেল থেকে ডাক দেওয়া আর নেওয়া।

বাড়ী বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এত হাঙ্গামার পরেও চিঠি যে ঠিকমত গিয়ে পৌঁছায়, এই আশ্চর্য্য—ক্বচিৎ ডাকঘরের কোন লোকের দোষে হারাতে পারে। পৃথিবীর যে-কোন জায়গার একজন লোকের ঠিকানা খুঁজে বের ক'রে তার ঠিকানায় একখানা চিঠি লিখে দাও; তারপর বাস্, তোমাকে আর ভাবতে হবে না—সেটা ঠিক সেই লোকের কাছে হাজির হবে!

সব সময়ই যে রেলে ডাক যায় তা' নয়। রেলে যায়, জাহাজে যায়, ছোট ষ্টিমারে যায়, নৌকায় যায়, গাড়ীতে যায়, মানুষের পিঠে যায়, কুকুরেটানা গাড়ীতে যায়—এমন কি এরোপ্লেনে ক'রে আকাশ দিয়েও যায়। এমন জায়গাও তো আছে যেখানে ডাকঘর নাই। সেখানের ঠিকানাতে চিঠি লিখলেও চিঠি ঠিকই পৌঁছায়। তবে সেখানে চিঠি যেতে কিছু দেরি লাগে। ইউরোপে যে সব সৈন্য যুদ্ধ কর্‌ছে তাদের কাছেও চিঠি যাবার উপায় আছে। সে যেখানেই থাকুক না কেন, তার নাম, আর তার সৈন্য-দলের নাম, এইটুকু জান্‌লেই লড়াইএর ডাকঘরওয়ালারা ঠিক তার কাছে চিঠি কিম্বা পার্শেল পৌঁছে দেবে। আমাদের দেশে অনেক জায়গায় 'রাণার'এর ডাকের বন্দোবস্ত আছে। একজন লোক কাঁধে ক'রে চিঠির থলি নিয়ে এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাক-

ঘরে পৌঁছে দেয়। হাজারিবাগে আগে ঐ রকম বন্দোবস্ত ছিল। তখন অনেক 'রাণার' বাঘের মুখে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। অনেক সময় দুষ্টু লোকে, নির্জ্জন রাস্তায় পেয়ে 'রাণার'কে মেরে চিঠি-পত্র খুলে টাকা-কড়ি নিয়ে চ'লে যায়।

প্রায় ৭০ বৎসর আগে কোন দেশে টিকিট অথবা পোষ্টকার্ড ব্যবহারের নিয়ম ছিল না। তখন চিঠিপত্র পাঠাতে অত্যন্ত বেশী খরচ হ'তো। ইংলণ্ডের সার রোল্যাণ্ড হিল প্রথমে টিকিট ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। সে সময়ে চিঠির মাশুল এত বেশী ছিল, যে গরিব লোকের পক্ষে চিঠি পাওয়া বড় মুস্কিলের কথা ছিল। যার কাছে চিঠি যাবে তাকেই মাশুল দিতে হ'তো; আর অনেক সময় মাশুল দিতে না পারায়, অনেক গরিব লোককে দরকারী চিঠিও ফিরত দিতে হ'তো। লণ্ডন থেকে মাত্র ৪ মাইল দূরে একটা জায়গায় একটা চিঠি পাঠাতে ১৲ টাকারও বেশী খরচ হ'তো! পার্লামেণ্ট সভার সভ্যেরা বিনা পয়সায় চিঠি পাঠাতে পারতেন—চিঠির উপর তাঁর একটা নাম সই থাক্‌লেই হ'লো। তাঁরা অনেক সময় তাঁদের বন্ধুদের চিঠির উপরও সই করে দিতেন, আর বন্ধুরা সব বিনা পয়সায় চিঠি পাঠাতেন। কেবল চিঠি নয়, অনেক বড় বড় জিনিষও তারা ঐ রকম সই করে বিনা পয়সায় পাঠাতেন! গরিব লোকেরই বড় মুস্কিল হ'তো। তারা নিরুপায় হয়ে শেষে নানারকম ফাঁকি দিতে আরম্ভ করলো। একজন তার বোনকে বল্‌লো যে সে যখন তাকে চিঠি লিখ্‌বে, তার উপরের ঠিকানার পাশে কতকগুলি চিহ্ন থাকবে; সেই চিহ্ন দেখে বোঝা যাবে সে ভাল আছে, কি অসুস্থ হয়েছে। বোনও সেই রকম চিহ্ন দিয়ে তার ভাইকে চিঠি লিখ্‌ত। চিঠির ভিতরে কিন্তু কেবল সাদা কাগজ। চিঠি যখন পৌঁছাত, তখন তার উপরের চিহ্নগুলি দেখে নিয়ে তারা চিঠিটা ফেরত দিত আর বল্‌ত, "অত মাশুল দিয়ে চিঠি নেবার ক্ষমতা আমার নেই।" এই রকম আরও কত উপায়ে লোকেরা ডাক ঘরকে ঠকাতো।

রোল্যাণ্ড হিল যখন টিকেট ব্যবহারের প্রস্তাব করেন তখন বিলাতের পার্লামেণ্ট সভায় ভয়ানক আপত্তি হয়। কিন্তু অনেক খবরের কাগজওয়ালা তাঁর প্রস্তাবের স্বপক্ষে লেখেন আর সাধারণ লোকেও অনেক সভা সমিতি ক'রে তাঁ'র হয়ে বলেন। রোল্যাণ্ড হিল ছেলেবেলায় গরিব লোক ছিলেন; তিনি গরীবের কষ্ট ভাল করে বুঝ্‌তেন আর তাদের জন্য খাট্‌তেও সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর মনে ছিল, ছেলেবেলায় একদিন তাঁকে একটা চিঠির মাশুল জোগাড় করার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ছেঁড়া কাপড় বিক্রী

করতে হয়েছিল। তিনি চিঠি পাঠাবার খরচ সম্বন্ধে অনেক হিসাব ক'রে বল্‌লেন, "চিঠি পাঠাবার খরচ অত্যন্ত সামান্য; বেশী খরচ ডাকঘরেই হয়। আর অনেক চিঠি লোকে নেয় না ব'লে ডাক ঘরের বিস্তর টাকা লোকসান হয়। বড় লোকেরা তো বিনা পয়সায়ই অনেক চিঠি পাঠান। এর চেয়ে ভাল বন্দোবস্ত হয়, যদি নিয়ম করা যায় যে চিঠি পাঠাবার আগে মাশুল দিতে হবে। আর মাশুল দেওয়া হয়েছে কিনা বুঝ্‌বার জন্য চিঠির উপর একটা টিকিট লাগিয়ে দিলেই হবে। কত মাশুল দেওয়া হ'লো তা' টিকিটেই লেখা থাক্‌বে।" অনেক আপত্তির পর পার্লামেণ্ট একবার এ উপায়টা পরীক্ষা করতে রাজি হলেন। রোল্যাণ্ডহিলের উপরেই সব বন্দোবস্তের ভার পড়ল। কয়েক বৎসর পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল যে এই ডাক টিকিটের বন্দোবস্ত এত সুবিধাজনক, যে এর বিরুদ্ধে আর কোন আপত্তিই টেকে না। তখন থেকে বিলাতে টিকিটের চল আরম্ভ হলো আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত পৃথিবীময় টিকিটের ব্যবহার আরম্ভ হ'লো। ডাকঘরের বন্দোবস্তও রোল্যাণ্ড হিলের বুদ্ধিতেই অনেকটা হয়েছে।

সার রোল্যাণ্ড হিল।

প্রথম ডাক টিকিট।

ছয় বীর।

সে প্রায় ছয়শত বৎসর আগেকার কথা—সে সময়ে ইংরাজ ও ফরাসিতে প্রায়ই যুদ্ধ চলিত। দুই পক্ষেই বড় বড় বীর ছিলেন—তাঁহাদের আশ্চর্য্য বীরত্বের কাহিনী ইউরোপের দেশ বিদেশে লোকে অবাক হইয়া শুনিত।

ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ড তখন খুব বড় সৈন্যদল লইয়া ফ্রান্সে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ফ্রান্সের উত্তর দিকে সমুদ্রের উপকূলে ইংলণ্ডের খুব কাছাকাছি একটি সহর আছে, তাহার নাম 'ক্যালে' (Calais)। এই সহরটির উপর বহুকাল ধরিয়া

ইংরাজদের চোখ ছিল—কারণ এইটি দখল করিতে পারিলে ফ্রান্সে যাওয়া আসার খুবই সুবিধা হয়। এড্‌ওয়ার্ড জলস্থল দুই দিক হইতে এই সহরটিকে ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন। ক্যালে' সহরে সৈন্য সামন্ত বেশী ছিল না, কিন্তু সেখানকার দুর্গ বড় ভয়ানক। তার চারিদিক উঁচু দেয়ালে ঘেরা—সেই দেয়ালের বাহিরে প্রকাণ্ড খাল—এক একটা ফটকের সামনে এক একটি পোল—সেই পোল দুর্গের ভিতর হইতে গুটাইয়া ফেলা যায়। সে সময়ে কামান ছিল বটে—তাহার গোলাতে মানুষ মরে কিন্তু দুর্গ ভাঙে না। সুতরাং জোর করিয়া দুর্গ দখল করা বড় সহজ ছিল না। কিন্তু এড্‌ওয়ার্ড তাহার জন্য ব্যস্ত হইলেন না—তিনি সহরের পথঘাট আটকাইয়া প্রকাণ্ড তাম্বু গাড়িয়া দিনের পর দিন নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মৎলবটি এই যে, যখন দুর্গের ভিতরের খাবার সব ফুরাইয়া আসিবে আর ভিতরের লোক জন ক্রমে কাহিল হইয়া পড়িবে, তখন তাহারা আপনা হইতেই হার মানিবে; মিছামিছি লড়াই হাঙ্গামা করিবার দরকার হইবে না।

ক্যালে'র লোকেরা যখন দেখিল ইংরাজেরা চারিদিক হইতে পথঘাট ঘিরিয়া ফেলিতেছে, তখন তাহারা শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম এবং দুর্ব্বল লোকদিগকে এবং স্ত্রীলোকদিগকে সহরে বাহিরে পাঠাইয়া দিল।

তারপর কিছুদিন ধরিয়া ইংরাজ ও ফরাসিতে রেষারেষি চলিতে লাগিল। ফরাসিদের মৎলব বাহির হইতে দুর্গের ভিতরে খাবার পৌঁছাইবে—ইংরাজের চেষ্টা যে সেই খাবার কিছুতেই ভিতরে যাইতে দিবে না। ভাণ্ডার পথে খাবার পৌঁছান একরূপ অসম্ভব ছিল—কারণ সে দিকে ইংরাজদের খুব কড়াকড় পাহারা। সমুদ্রের দিকেও ইংরাজদের যুদ্ধজাহাজ সর্ব্বদা ঘোরাঘুরি করিত কিন্তু অন্ধকার রাত্রে তাহাদের এড়াইয়া ফরাসি নাবিকেরা মাঝে মাঝে রুটি মাংস শাক সবজি প্রভৃতি সহরের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিত। মোরঁৎ ও মেস্ত্রিয়েল নামে দুইজন নাবিক এই কাজে আশ্চর্য্য সাহস ও বাহাদুরি দেখাইয়াছিল। একবার নয় দু'বার নয়, তাহারা বহুদিন ধরিয়া এই রকমে সেই সহরে খাবার জোগাইয়াছিল। ইংরাজেরা তাহাদের ধরিবার জন্য কতবার কত চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিবারেই তাহারা ইংরাজ জাহাজগুলিকে ফাঁকি দিয়া পলাইত।

এই রকমে ছয় মাস কাটিয়া গেল, তবু দুর্গের লোকেরা দুর্গ ছাড়িয়া দিবার নাম পর্য্যন্ত করে না। তখন রাজা এড্‌ওয়ার্ড কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি আরো লোকজন আনাইয়া সমুদ্রের তীরে দুর্গ বানাইলেন, সেখানে খুব জবরদস্ত পাহারা

বসাইলেন, সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের বড় বড় পাথর ছুঁড়িবার যন্ত্র বসাইলেন। নৌকার সাধ্য কি সে দিক দিয়া সহরে প্রবেশ করে। খাবার আসিবার পথ যখন বন্ধ হইতে চলিল দুর্গের লোকেদেরও তখন হইতে ক্ষুধার কষ্ট আরম্ভ হইল, তাহার দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় তাহাদের মধ্যে নানারকম রোগ দেখা দিতে লাগিল। তবু তাহারা মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া ইংরাজদের শিবির হইতে খাবার কাড়িয়া আনিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহাতে যেটুকু খাওয়া জুটিত তাহা অতি সামান্য। দুর্গের সৈন্যেরা মাসের পর মাস ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিয়াও আশ্চর্য্য তেজের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিল—তাহাদের এক ভরসা ছিল যে ফরাসি রাজা ফিলিপ নিশ্চয়ই সৈন্য সামন্ত লইয়া তাহাদের সাহায্য করিতে আসিবেন।

একদিন সত্যসত্যই দেখা গেল সহর হইতে কিছুদূরে ফরাসি সৈন্যদল আসিয়া হাজির হইয়াছে। তাহাদের রঙ্গিন নিশান আর সাদা তাম্বুগুলি দুর্গের লোকেরা যখন দেখিতে পাইল, তখন তাহাদের আনন্দ দেখে কে! তাহারা ভাবিল, আমাদের এত দিনের ক্লেশ সার্থক হইল। যাহা হউক, ফিলিপ আসিয়াই ইংরাজেরা কোথায় কেমন ভাবে আছে, তাহার খবর লইয়া দেখিলেন যে, এখান হইতে ইংরাজদের হঠান বড় সহজ হইবে না। ক্যালে' ঢুকিবার পথ মাত্র দুইটি, একটি একেবারে সমুদ্রের ধারে—সে দিকে ইংরাজের বড় বড় যুদ্ধজাহাজ চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয়। আর একটি পথে পোলের উপর দিয়া নদী পার হইতে হয়—সেই পোলের উপর ইরাজেরা রীতিমত দখল জমাইয়া বসিয়াছে। পোলের মুখে দুর্গ বসাইয়া বড় বড় যোদ্ধারা তাহার মধ্যে তীরন্দাজ লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে—তাহারা প্রাণ থাকিতে কেহ পথ ছাড়িবে না। ইহা ছাড়া আর সব জলাভূমি, সেখান দিয়া সৈন্যসামন্ত পার করা এক দুরূহ ব্যাপার।

ফিলিপ তখন ইংরাজ শিবিরে দূত পাঠাইয়া প্রস্তাব করিলেন, "আইস! তোমরা একবার খোলা ময়দানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর"। এড্‌ওয়ার্ড উত্তর দিলেন, "আমি আজ বৎসর খানেক এইখানে অপেক্ষা করিয়া আছি, ইহাতে আমার খরচ পত্র যথেষ্ট হইয়াছে। এতদিনে দুর্গের লোকেরা কাবু হইয়া আসিয়াছে, এখন তোমার খাতিরে আমি এমন সুযোগ ছাড়িতে প্রস্তুত নই। তোমার রাস্তা তুমি খুঁজিয়া লও।"

তিন দিন ধরিয়া দুই দলে আপোষের কথা বার্ত্তা চলিল, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ মীমাংসা হইল না। তখন ফিলিপ অগত্যা তাঁহার সৈন্যদল লইয়া আবার বিনাযুদ্ধেই ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া দুর্গবাসীদের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া

পড়িল। এতদিন তাহারা যে ভরসায় সকল কষ্ট ভুলিয়া ছিল, এখন সে ভরসাও আর রহিল না। তখন তাহারা একেবারে নিরাশ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল।

এডওয়ার্ড বলিলেন, "সন্ধি করিতে আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু তোমরা আমায় বড় ভোগাইয়াছ, আমার অনেক জাহাজ ডুবিয়াছে, টাকা ও সময় নষ্ট হইয়াছে, এবং অন্য নানারকমের ক্ষতি হইয়াছে। আমি ইহার ষোল-আনা শোধ না লইয়া ছাড়িব না। আমার সন্ধির সর্ত্ত এই,—ক্যালের দুর্গ সহর টাকা কড়ি লোকজন সমস্ত আমার হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে—আমার যেমন ইচ্ছা ফাঁসি, কয়েদ, জরিমানা ইত্যাদি দণ্ড বিধান করিব এবং ইহাও জানিও যে আমি যে শাস্তি দিব তাহা বড় সামান্য হইবে না।"

ইংরাজ দূত যখন ক্যালের লোকেদের এই কথা জানাইল, তাহারা এমন সর্ত্তে সন্ধি করিতে রাজি হইল না। তাহারা বলিল, "রাজা এডওয়ার্ড স্বয়ং একজন বীরপুরুষ, তাঁহাকে বুঝাইয়া বলুন, তিনি এমন অন্যায় দাবী কখন করিবেন না"। ইংরাজদলের ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা তখন তাহাদের পক্ষ হইয়া রাজাকে অনেক বুঝাইলেন। ক্যালের লোকেরা কিরূপ সাহসের সহিত কত কষ্ট সহ্য করিয়া বীরের মত দুর্গ রক্ষা করিয়াছে, সে সকল কথা তাঁহারা বার বার বলিলেন। এমন শত্রুকে যে সম্মান করা উচিত একথা একবাক্যে সকলে স্বীকার করিলেন। কিন্তু এডওয়ার্ডের প্রতিজ্ঞা অটল। অনেক বলা কওয়ার পর তিনি একটু নরম হইয়া এই হুকুম দিলেন—"ক্যালের লোকেরা যদি ক্ষমা চায় তবে তাহাদের ছয়জন প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিউক—তাহারা দুর্গের চাবি লইয়া, খালি পায়ে খালি মাথায় গলায় দড়ি দিয়া আমার কাছে আসুক এবং সকলের হইয়া শাস্তি গ্রহণ করুক। তাহা হইলে আর সকলকে মাপ করিতে পারি, কিন্তু এই ছয় জনের আর রক্ষা নাই"।

ইংরাজদূত আবার দুর্গে গিয়া এই হুকুম জানাইল। দুর্গের লোকেরা রাজার আদেশ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া অপেক্ষা করিতে ছিল—এই হুকুম শুনিয়া তাহারা স্তব্ধ হইয়া গেল। তখন ক্যালের সম্ভ্রান্ত ধনী বৃদ্ধ সেণ্ট্ পিয়ের বলিয়া উঠিলেন, "বন্ধুগণ, আমার জীবন দিয়া যদি তোমাদের বাঁচাইতে পারি, তবে ইহার চাইতে সুখের মৃত্যু আমি চাহি না। আমি ছয় জনের মধ্যে প্রথম প্রতিনিধিরূপে দাঁড়াইলাম।" এই কথায় চারিদিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল—অনেকে সেণ্ট্ পিয়েরের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আরও পাচজন লোক অগ্রসর হইয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, "আমরাও মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি"। এই দৃশ্য

দেখিয়া ইংরাজদূতের চক্ষে জল আসিল—তিনি বলিলেন, "রাজা এড্ওয়ার্ড যাহাতে ইঁহাদের প্রতি সদয় হ'ন, আমি সে জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব"।

ছয়জন প্রতিনিধিকে রাজার সভায় উপস্থিত করা হইল। তাঁহারা শান্তভাবে রাজার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন, তারপর সেণ্টপিয়ের ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "আমাদের ক্যালে'বাসী বন্ধুগণ এতদিন অসহ্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া দুর্গ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদেরই অযোগ্য প্রতিনিধি আমরা আজ তাঁহাদের জীবন রক্ষার জন্য দুর্গের চাবি আপনার কাছে দিতেছি। এখন আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনার ইচ্ছা ও আদেশের অধীন রহিলাম।"

সভাসুদ্ধ লোকে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। ছয়জনের সকলেই বয়সে বৃদ্ধ; বহুদিন অনাহারে তাঁহাদের শরীর শুকাইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের গম্ভীর প্রশান্ত মুখে কষ্টের রেখা পড়িয়াছে, এক একজন এত দুর্ব্বল যে চলিতে পা কাঁপে অথচ তাঁহাদের মন এখনও তেজে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের দেখিয়া ইংরাজ যোদ্ধাগণের মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, "ইহাদের উপর শাস্তি দিয়া প্রতিশোধ লওয়া কখনই উচিত নয়"। যিনি দূত হইয়া গিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, "ইহাদের শাস্তি দিলে রাজা এড্ওয়ার্ডের কলঙ্ক হইবে—ইংরাজ জাতির কলঙ্ক হইবে"। কিন্তু এড্ওয়ার্ডের মন গলিল না—তিনি জল্লাদ ডাকিতে হুকুম দিলেন। তখন ইংলণ্ডের রাণী ফিলিপা বন্দীদের মধ্যে কাঁদিয়া

পড়িলেন এবং দুই হাত তুলিয়া ভগবান যীশুর দোহাই দিয়া এডওয়ার্ডকে বলিলেন, "ইহাদের তুমি ছাড়িয়া দাও"। তখন এডওয়ার্ড আর "না" বলিতে পারিলেন না।

ছয় বীরকে মুক্তি দিয়া রাণী তাহাদিগকে তাঁহার নিজের বাড়ীতে লইয়া পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন এবং নানা উপহার দিয়া বিদায় দিলেন। ইঁহাদের বীরত্বের কথা ফরাসিরা আজও ভোলেন নাই—ইংরাজও তাহা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন।

সাবধান!

আরে আরে ওকি কর প্যালারাম বিশ্বাস!
ফোঁস ফোঁস অত জোরে ফেলনাক নিশ্বাস।
জাননাকি সে বছর ওপাড়ার ভূতোনাথ
নিশ্বেস নিতে গিয়ে হয়েছিল কুপোকাৎ?

হাঁপ ছাড় হাঁসফাঁস ও রকম হাঁ করে!
মুখে যদি ঢুকে বসে পোকা মাছি মাকড়ে?
বিপিনের খুড়ো হয় বুড়ো সেই হল' রায়
মাছি খেয়ে পাঁচমাস ভুগেছিল কলেরায়।
তাই ব'লি, সাবধান! ক'রোনাক ধুপধাপ
টিপিটিপি পায় পায় চলে যাও চুপচাপ।
চেয়োনাক আগে পিছে যেওনাক ডাইনে
সাবধানে বাঁচে লোক,—এই লেখে আইনে।
পড়েছত কথামালা—কে যেন সে কি ক'রে
পথে যেতে পড়েগেল পাতকো'র ভিতরে?
ভাল কথা,—আর যেন ঘোষেদের পুকুরে
নেয়োনাক কোন দিন সকালে কি দুপুরে।
দেখনা পাঁড়েজি সেথা স্নান করে নিত্য
তবুত সারে না তার বায়ু কফ পিত্ত।
এরকম মোটা দেহে কি যে হবে কোন্ দিন
কথাটাকে ভেবে দেখ, কি রকম সঙ্গীন!
চটো কেন? হয় নয় কেবা জানে পষ্ট
যদি কিছু হ'য়ে পড়ে পারে শেষে কষ্ট।
ভারি তুমি পণ্ডিত সব কর তুচ্ছ
মহামহোপাধ্যায় গজিয়েছ পুচ্ছ।
মিছি মিছি ঘ্যান্ ঘ্যান্ কর শুধু তক্ক
শিখেছ জ্যাঠামি খালি ইঁচড়েতে পক্ক।
মান্‌বে না কোন কথা চলাফেরা আহারে
একদিন টের পাবে ঠেলা কয় কাহারে।
রমেশের মেঝমামা সেও ছিল সেয়না
যত বলি ভাল কথা কানে কিছু নেয়না—
শেষকালে একদিন চাঁদির বাজারে
প'ড়ে গেল গাড়ীচাপা রাস্তার মাঝারে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর—

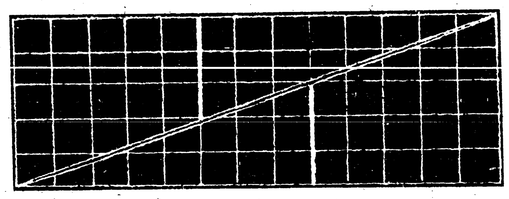

চারটি টুকরা এইরূপে সাজালেই ৬৪ ঘরের জায়গায় ৬৫ ঘর মনে হইবে। (৬৫ ঘর মনে হয় বটে, কিন্তু মাঝে খুব সরু লাইনের মত একটা ফাঁক থাকে। সেই ফাঁকটুকুই একটি ঘরের সমান।)

নূতন ধাঁধা।

১। আছে এক জানোয়ার—চেহারা দেখনি তার ?—
একটারে ল্যাজ কেটে দেখি সে হ'য়েছে চার।

২। দুইটি আকার দেখি তবুও সে নিরাকার
দেখেও দেখিনে তারে চলে ফিরে বারেবার ;
আবার সাকার হ'লে কত স্বাদ পাই রে
টপাটপ মুখে ফেলি মজা ক'রে খাই রে।

৩। আমি বলি 'ঠ্যাং খাও' এই মোর পরিচয়,
সাহসে আপনা মেলি উঠেছি আকাশ ঠেলি
তোমাদেরি ঘরে ঘরে গ্রীষ্মেরে করি জয়।

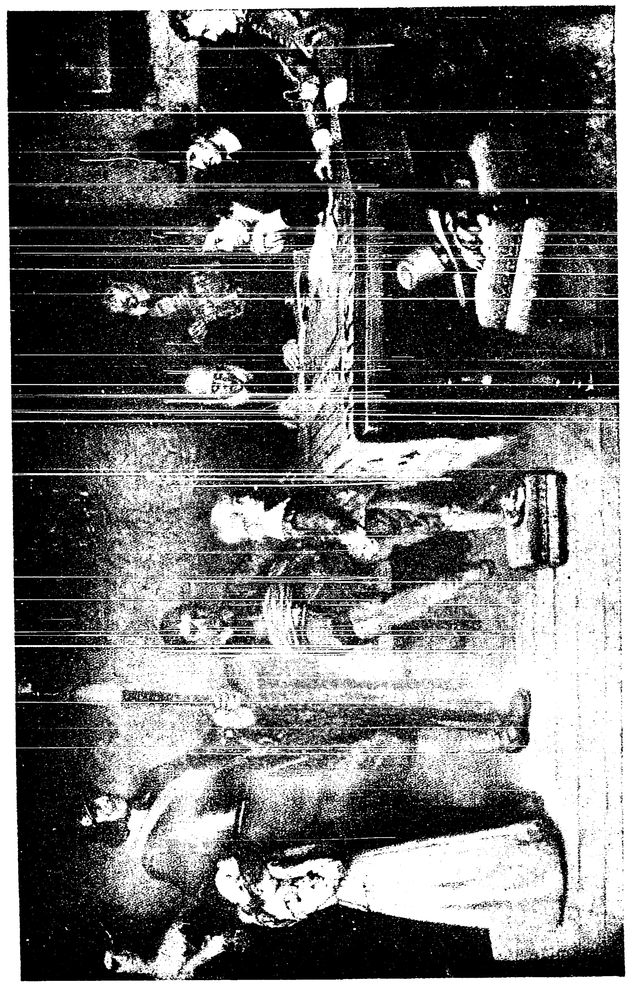

রাজার বন্ধু।

নির্ভয়ে বুক উঁচু করে চালাল উত্তর দিল "কেন করব না? আমি যে পেলহাম; পেলহাম পরিবারের লোকেরা চিরকালই রাজভক্ত, তারা রাজার হয়েই যুদ্ধ করে।"

—"রাজার বন্ধু" গল্প দেখ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সন্দেশ

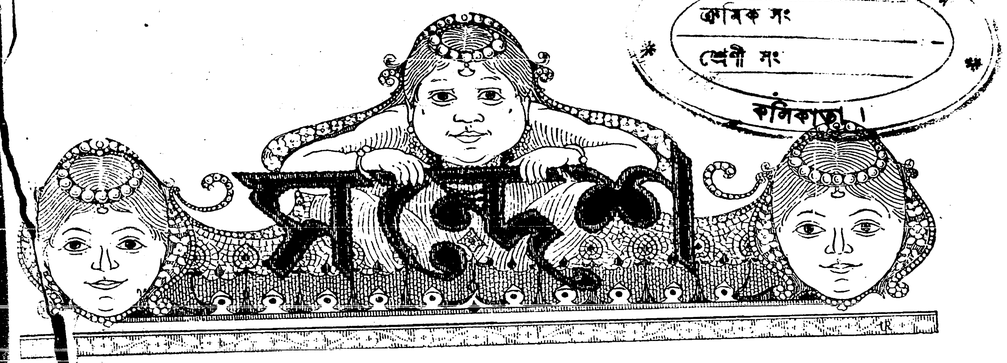

চতুর্থ বর্ষ | পৌষ, ১৩২৩ | নবম সংখ্যা

প্রভাতে।

মধুর প্রভাতে পৃথিবী সাজাতে
বনে ফুটে কত ফুল,
লইবারে মধু আসিয়াছে শুধু—
পিপাসিত অলিকুল।
গিরি হতে নামি যে সাগরগামী
চলেছে সাগর পানে,
সকলের চিত করে আনন্দিত
প্রভাতের কল গানে।
ঘুম ভাঙা আঁখি ডালে বসে পাখী
কি সুমিষ্ট গান গায়,
সোণার বরণ রবির কিরণ
পড়েছে তাহার গায়।
কচি শিশুগুলি, শিখে মিষ্ট বুলি
বসিয়া মায়ের কোলে,
তাই তাই তাই মামা বালী দাই—
বলে মার তালে তালে।

COLOURED DOCUMENT.

ঊষার বাতাসে সবে সুখে ভাসে
গাহে শুধু সুখ গান,
সেই গান শুনে অলসের মনে
আসিল নূতন প্রাণ।

শ্রীসতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

নিরেট গুরুর কাহিনী।

ঘোড়ায় চড়ে বাড়ী যাওয়ার গল্প।

সেই লোকটী গুরু শিষ্য সকলকেই আপনার গাঁয়ের বাড়ীতে লইয়া গেল। সে বিশেষ বড়লোক না হইলেও তাহার দান করা অভ্যাস ছিল, কাজেই সে অতিথিদের খুব ভাল করিয়াই খাওয়াইল,—দই, ঘি, দুধ কিছুরই কম্‌তি হইল না। খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া তাহারা মনের আনন্দে পান সুপারী চিবাইতে লাগিল।

তারপর দিন সেই ঘোড়াটাও আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহার মালিক তাহাকে গুরুজীকে দান করিল। ঘোড়াটী বুড়ো ত বটেই, তার উপর আবার তাহার এক চোখ কানা, একটী কান কাটা এবং একটি পা খোঁড়া। এমন গুণের ঘোড়া, গুরু মহাশয়কে খুবই মানাইয়া ছিল, কারণ তাঁহার চেহারাও কতকটা ঐ গোছেরই ছিল। কিন্তু অমন ঘোড়া পাইয়াই গুরু আর তাঁহার চেলারা খুব খুসী হইয়া উঠিল; একে ঘোড়া পাওয়া গেল, তাও বিনা পয়সায়। আনন্দে তাহারা ঘেড়াটার চারিধার ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া লাফা-লাফি আরম্ভ করিয়া দিল। কেউ তাহার পা চাপড়ায়, কেউ তাহার পা ধরিয়া টানে, কেউ বা তাহার লেজ ধরিয়া ঝোলে!

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা ছেঁড়া, পোকায় কাটা ঘোড়ার সাজ পাওয়া গেল, কিন্তু তার অনেক জায়গা একেবারেই উড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু চেলারা হারিবার পাত্র নয়, যা যা ছিলনা সবই তাহারা অদ্ভুত উপায়ে জোগাড় করিয়া নিল। লাগামটা পাওয়া যাইতে ছিলনা, একজন চেলা মাঠ হইতে এক বোঝা ঘাস ছিঁড়িয়া আনিল, এবং সেইগুলা দড়ি পাকাইয়া চমৎকার লাগাম তৈরী হইয়া গেল। আর যা কিছু বাকী ছিল, তাহা আকাট গাঁয়ের দোকান হইতে কিনিয়া আনিল।

তারপর শুভমুহূর্ত্তে দিনক্ষণ দেখিয়া তাহারা বাহির হইল। তাহাদের যাইবার সময় খুবই ঘটা হইল, সমস্ত গাঁয়ের লোক চেঁচামেচি করিয়া বাহির হইয়া আসিল, কাজেই

গোলমালখানা কিছু কম হইল না। গুরু আগে আগে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলেন, পিছনে তাঁহার চেলারা জিনিষপত্র ঘাড়ে করিয়া চলিল। কিন্তু আবার এক মুস্কিল হইল, ঘোড়াটা কিছুতেই চলিতে চায় না। পাঁচ চেলায় মিলিয়া তাহাকে চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একজন তাহার লাগাম ধরিয়া সামনের দিকে টানিতে লাগিল, আর একজন পিছনে দাঁড়াইয়া ধাক্কা মারিতে লাগিল, দুইজন দুইপাশে দাঁড়াইয়া গুরুর দুই পা ধরিয়া তাঁহাকে সামলাইয়া রাখিল, আর বাকীজন আগে আগে চীৎকার করিয়া চলিল "সাবধান, সাবধান, সরে যাও, সরে যাও"।

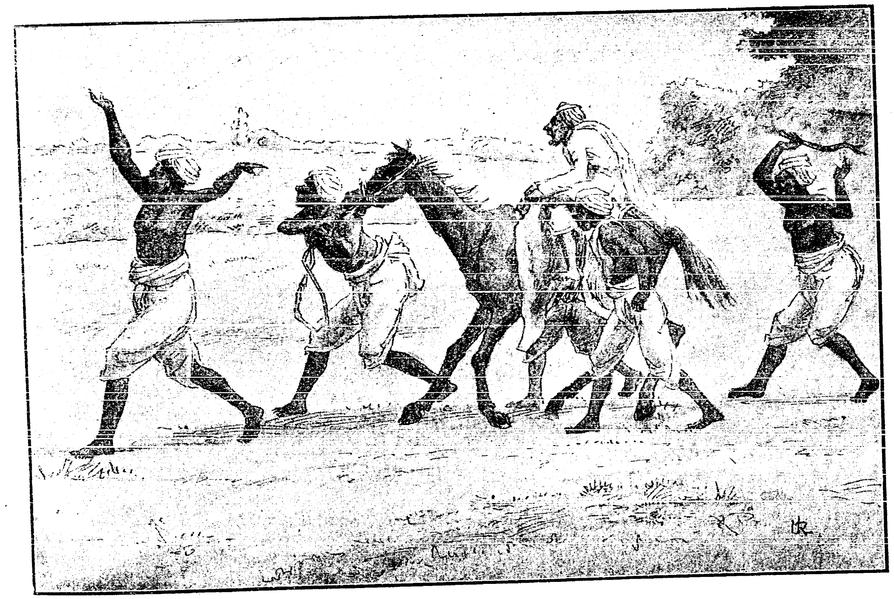

এইরকম করিয়া খানিক পথ তাহারা বেশ আনন্দেই চলিল, এবং গাঁয়ের পথ ছাড়াইয়া, বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। বড়রাস্তায় দাঁড়ইয়া একজন লোক মাশুল আদায় করিত, সে অত বড় একদল দেখিয়া তাড়াতাড়ি ছুটীয়া আসিল, আসিয়াই ঘোড়াটার জন্য পাঁচ পয়সা মাশুল চাহিয়া বসিল। চেলারা রাগিয়া আগুন। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, "গুরুমশায় চড়ে যাচ্ছেন, এই ঘোড়ার মাশুল পাঁচ পয়সা?

আমরা কি ঘোড়টাকে বেচতে নিয়ে যাচ্ছি না কিনেছি যে, তুমি মাশুল চাচ্ছ? এটা একজন লোক ওঁকে চড়বার জন্য দিয়েছে।" সে লোকটাও পয়সা না নিয়া ছাড়িবেনা, চেলারাও পয়সা দিবেনা, দুই পক্ষে ঝগড়া করিতে করিতে দুপুর হইয়া গেল। শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া ট্যাঁক হইতে পাঁচ পয়সা বাহির করিয়া, ঘোড়াটাকে মাশুলওয়ালার হাত হইতে উদ্ধার করিল। ঘোড়াটা না থাকিলে আর এই পাঁচ পয়সা খরচ করিতে হইত না এই ভাবিয়া গুরুর দুঃখের সীমা রহিল না।

পথে চলিতে চলিতে তাহারা খুবই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কাছেই একটা সরাই দেখিয়া, একটু বিশ্রাম করিবার জন্য সেইখানে গিয়া উঠিল। গুরু ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলেন যে একজন লোক বসিয়া রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার কাছে নিজের দুঃখের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখুন ত মশায়, আমি জন্মে অবধি কখনও ঘোড়ায় চড়িনি, আজ এই প্রথমবার চড়লাম, আর আজই কিনা আমার উপর এমন অত্যাচার! সে যে আমার কাছ থেকে অন্যায় করে পয়সা নিল, এতে কি তার ভাল হবে? আমার বুক ফাটিয়ে যে পয়সা নিয়েছে সে পয়সা আগুন হয়ে তার হাত পুড়িয়ে দেবে"! লোকটি বলিল, "আর মশায় দুঃখ করে কি করবেন? এই হচ্ছে আজকালকার নিয়ম। এখন টাকাই গুরু, টাকাই দেবতা; কথায় বলে, 'টাকার নাম করলে মরা মানুষও হাঁ করে'। টাকা ছাড়া এখন আর কেউ কিছু বোঝে না।" গুরু বলিলেন, "এ কথা ঠিক, টাকা যদি গোবরের মধ্যেও থাকে তা হলেও লোকে সেটা চেটে চেটে বার করবে।"

আজকালকার লোকদের টাকার লোভ সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে দুপুর কাটিয়া গেল, বিকাল বেলায় আবার গুরু ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইলেন এবং রাত্রি হইলে পর একটি গাঁয়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। চেলারা ভাবিল, "ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে কি হবে, বরং ছেড়ে দিলে বেশ সারারাত চরে খাবে"। এই ভাবিয়া তাহারা সেটাকে ছাড়িয়া দিয়া ঘুমাইতে গেল। সকালে উঠিয়া ঘোড়াটাকে আনিতে গিয়া, তাহাকে কিছুতেই খুঁজিয়া পাইল না। অনেক খোঁজাখুঁজি গোলমালের পর জানা গেল যে একজন চাষা সেটাকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। শুনিয়াই ত সকলে দলবলে সেখানে গিয়া হাজির হইল এবং চাষাকে তাহাদের ঘোড়া ছাড়িয়া দিতে বলিল। সে ত দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "তা আর নয়? সারা রাত ধরে তোমাদের ঘোড়া আমার ফসল খেয়েছে, আর আমি এখন তাকে ছেড়ে দি। আমার জিনিষের দাম দেবে কে"? মহা গোলমাল

লাগিয়া গেল; গাঁয়ের মোড়ল ছুটিয়া আসিয়া চাষাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে বুঝিবার পাত্রই নয়! কেবলি মাথা নাড়ে আর বলে, "আমার জিনিষের দাম দাও, আমি ঘোড়া ছেড়ে দিচ্ছি, তা না হলে কে ঘোড়া নেয়, আমি দেখব"! ক্রমে ক্রমে গাঁয়ের সব লোক আসিয়া জড় হইল এবং অনেক বকাবকির পর ঠিক হইল যে ঘোড়াটি প্রায় দুই তিন টাকার জিনিষ খাইয়াছে আর নষ্ট করিয়াছে, সুতরাং চাষাকে তিন টাকাই দেওয়া উচিত, তবে গুরু মশায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, আর এ গাঁয়ে অতিথির মত আসিয়াছেন, অতএব এক টাকা দিলেই তাঁহারা ঘোড়া ফিরিয়া পাইবেন। চাষাও এক টাকা লইয়া ঘোড়াটাকে ছাড়িয়া দিল।

ঘোড়াত পাওয়া গেল, কিন্তু এক টাকা খরচ হওয়াতে গুরু খুবই কাতর হইয়া পড়িলেন; তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, "এ ঘোড়াটা পেয়ে আমার কি লাভ হল? এটাকে নেওয়ার পর থেকে আমার যে কত টাকা গেল আর কত দুঃখ লাঞ্ছনাই সইতে হল, তার আর লেখা জোখা নেই। এ সব আর আমার বয়সে পোষায় না"। এই বলিয়া তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন। চেলারা যদিও তাঁহাকে অনেক করিয়া ঘোড়ায় উঠিতে বলিল, তিনি কাহারও কথা না শুনিয়া হাঁটিয়াই চলিলেন। ব্যাপার দেখিয়া চেলারা এবং গাঁয়ের লোকেরা এক জোট হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "আরে মশাই করেন কি, করেন কি? আপনার বয়সে কি হেঁটে যাওয়া চলে, না সেটা ভাল দেখায়"? গোলমাল শুনিয়া একজন ভণ্ড দৈবজ্ঞ সেখানে আসিয়া হাজির হইল। সে সব দেখিয়া শুনিয়া বলিল, "মশায় আপনি দুঃখ করবেন না। নিশ্চয়ই ঘোড়াটার ভিতর অনেক পাপ আছে, তাই এ সব কাণ্ড হচ্ছে। তা, আপনারা যদি আমাকে আট নয় আনা পয়সা দেন, তা'হলে আমি ওর সব পাপ খণ্ডিয়ে দিই"। গুরু আর চেলারা পরামর্শ করিয়া দেখিল যে খরচের ভাবনা করিতে গেলে কাজ চলে না; তখন তাহারা লোকটার হাতে পয়সা দিয়া তাহাকে পাপ দূর করিয়া দিতে বলিল।

লোকটা তখন তাহাদের ঠকাইবার জন্য অনেক রকম বুজরুকী আরম্ভ করিল। সে নানা রকম সুরে যা-তা বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে, ঘাস ছিঁড়িয়া ঘোড়াটার গায়ে ফেলিতে লাগিল, এবং উহার চার পাশে অনেকবার ডিগ্‌বাজী খাইল। শেষে ঘোড়াটাকে আচ্ছা করিয়া চাপড়াইয়া তাহার কাণ ধরিয়া বলিল, "এই কাণের ভিতরই ওর সব পাপ আছে। ইঃ এ ঘোড়াটার দেখছি আগে ভয়ানক পাপ ছিল, একটা কাণ কেটে তবু খানিক কমেছে, এইটা কেটে দিলে একেবারে সব ঠিক হয়ে যাবে"। এই

বলিয়া সে একখানা কাস্তে আনিয়া একটানে ঘোড়ার কাণটা কাটিয়া ফেলিল, এবং তৎক্ষণাৎ সেটা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, পাছে পাপ কাণ হইতে বাহির হইয়া আর কাহারও গায়ে লাগিয়া যায়! পাপ দূর করা দেখিতে অনেক লোক আসিয়া জুটিয়াছিল, কিন্তু পাপ দূর হইবামাত্র ঘোড়াটা চার পা তুলিয়া এমন এক লাফ দিল যে সকলে সেখান হইতে দে ছুট! তারপর সকলে মিলিয়া একটা খুব গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া, কাণটাকে পুঁতিয়া ফেলিল। এই সব কাজেই দিনটা কাটিয়া গেল, কাজেই সে দিন আর তাহাদের যাওয়া হইল না। তার পর দিন বাহির হইয়া, অনেক কষ্ট ভুগিয়া তাহারা আপনাদের মঠে আসিয়া পৌঁছিল।

"হাইদর।"

গতবারে তোমাদের "কালা"র কথা বলেছি। "কালা", গোরা দেশের জীব হয়েও, দেশের নাম রক্ষা করতে পারেনি, সে 'মিশির' মত, "অমাবস্যা নিশির" মত আর "গদাধরের পিসির" মত কালো; আর "হাইদার", কালো আসিয়ার আরব দেশের জীব হয়েও বর্ণগৌরবে গোরার সমকক্ষ, সে একেবারে দুধের মত সাদা, ঘাড়ের চুল গুলি পর্য্যন্ত কালো নয়, ফিকে হলদে রেশমের মত। সে চুল ইংরাজী রূপসী পেলে গৌরব বোধ করতেন। হাইদরের সঙ্গে আমার পরিচয়ের দীর্ঘ অবসর হয়নি, তবু তার প্রভুর কাছে যা শুনেছিলাম আর নিজে যা দেখেছিলাম তাই তোমাদের জানাব।

মধ্য প্রদেশের একজন করদ, প্রায়-স্বাধীন রাজা তার রূপের খ্যাতি আর গুণের প্রশংসা শুনে তাকে বোম্বাই হতে বহুমূল্যে ক্রয় করে এনেছিলেন। তখন তার বয়স সবে চার বৎসর; সেটা ঘোড়ার পক্ষে কিশোর বয়স। রাজার ঘরে এসেও হাইদরের অদৃষ্টে সুখ লেখা ছিলনা, তার কপালের মাঝটিতে আর চার পায়ের গোড়ালিতে চারটি কালো ছাপ ছিল,এতে তাকে দেখতে আরো সুন্দর করেছিল, কিন্তু হলে কি হয়, ঘোড়ার পক্ষে নাকি এমন পঞ্চ তিলক ধারণ সুলক্ষণ নয়। যার এমন থাকে সে 'রাক্ষসগণে'র মত নিকটবন্ধুর প্রাণ হানি করে। ঘোড়া এল, রাজকুমার উৎসাহ করে তাকে অভ্যর্থনা করতে গেলেন, সঙ্গে তাঁর শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতও ছিল; রাজকুমার সুন্দর সুদর্শন অশ্বটিকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হলেন, তাকে যে কি আদরে রাখবেন ভেবেই

পেলেন না। পণ্ডিতজী কিন্তু অশ্বের কৃষ্ণ তিলকগুলি দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন, বল্লেন এ অশ্বকে কখনই অশ্বশালে স্থান দেওয়া হতে পারে না। এ একেবারে মূর্ত্তিমান কৃতান্ত—যে গৃহে প্রবেশ করবে তাকে শ্মশানে পরিণত করে তবে ছাড়বে। রাজকুমার আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত, তিনি বল্লেন "এসব বাজে কথা,—ঘোড়া আমার রাজপুরীর শোভা বর্দ্ধন ছাড়া, কোন হানি করতেই পারে না, আমি একে কিছুতেই ছাড়ছিনে।" কিন্তু তাঁর জিদ বজায় রইল না, রাজমাতা যখন হাইদরের কুলক্ষণের কথা শুনলেন, তখন তাকে রাজপুরীর ত্রিসীমানার মধ্যে রাখা নিষেধ হয়ে গেল। পণ্ডিতের শাস্ত্র-বচন লঙ্ঘন করতে কুমারের দ্বিধা মাত্র হয়নি, কিন্তু মাতৃ আজ্ঞা অবজ্ঞা করবার মত অসৌজন্য তাঁর স্বভাবে ছিল না কাজেই হাইদর নির্ব্বাসিত হয়ে পল্লীর বহুদূরে একটি ভগ্নপ্রায় কুটীরে আশ্রয় লাভ করলে! দিনান্তে অপর্য্যাপ্ত আহার অযত্নে অপরিষ্কৃত স্থানে তার দিন যাপন হ'তে লাগল, পূর্ব্বের স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য ক্রমে হ্রাস হয়ে এল।

এই সময়ে রাজ পরিবারে বড় একটি মামলা বহুদিন হতে চলছিল,—রেলওয়ে কোম্পানীর সঙ্গে জমি নিয়ে বিবাদ; তখন মধ্য প্রদেশে নতুন রেলের লাইন নির্ম্মান হচ্ছিল। রেলওয়ে কোম্পানীর সঙ্গে ঝগড়া মানে প্রকৃত পক্ষে সরকার বাহাদুরের সঙ্গেই ঝগড়া, সবাই ভীত তটস্থ, মীমাংসা কিছুতেই হচ্ছিল না। তাই যখন যখন রাজকুমারের পাগড়ী ভাই আর রাজমাতার স্নেহ পাত্র নতুন উকীল "বাবু সাহেব" তর্ক, যুক্তি, ও আইনের প্রমাণ প্রয়োগে এ মামলা তাঁদের জিতিয়ে দিলেন তখন রাজপুরী উৎসবময় হয়ে উঠল। উকীল বাবুসাহেব ভালরকম 'ফী'তো পেলেনই, তার উপর পুরস্কারের ব্যবস্থাও হল; মহারাণী নিজে তাঁর দুই হাতে সোণার বালা পরিয়ে দিলেন, আর বাবু সাহেব আরো যা চাইবেন তাই দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। এই বাবু সাহেবটি ঘোড়া বড় ভালবাসতেন, তিনি হাইদারের কাহিনী শুনেছিলেন, আর স্বচক্ষে তার দুরবস্থা দেখে অবধি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়েছিল। তাই মহারাণী পুরস্কারের কথা বলবামাত্র তিনি ঘোড়াটিকে চেয়ে বস্‌লেন। এ কুলক্ষণ ঘোড়া রাজ্য হতে বিদায় করতে পারলে মহারাণী নিশ্চিন্ত হতে পারতেন সত্য, কিন্তু এই বাবু সাহেবকে তিনি যথার্থ স্নেহ করতেন, নিজ পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় যে জন্তুটিকে দূর করে দিয়েছিলেন, তাকেই আবার অপরের সন্তানকে দেন কি করে, বিশেষ যখন তাঁর আত্মীয় বন্ধু কেউ

কাছে নাই। তবে বাবু সাহের তো ছাড়বার পাত্র নন, মহারাণীও বাক্য ভঙ্গ করতে পারেন না, তাই যথাশাস্ত্রবিধি শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে হাইদরকে বিদায় করলেন। "বাবু সাহেব" ঘোড়াটিকে বাড়ী এনে বিশেষ তদ্বির করে আবার সুস্থ সবল করে তুল্লেন। তখন এই অবোলা জীব আর বুদ্ধিজীবি মানুষটির আজীবন বন্ধুত্বের সূচনা হ'ল। হাইদরের বয়স অল্প হ'লেও সে দুষ্ট কিম্বা দুরন্ত ছিল না—ভাল ঘোড়ার সমস্ত সদ্‌গুণই তার ছিল, সে তেজী অথচ শান্ত; পরিশ্রমী এবং প্রভুভক্ত। প্রতিদিন সকালে প্রভুকে পিঠে চড়িয়ে নিয়ে কত দূরে দূরে হাওয়া খাইয়ে আন্‌ত—প্রভুর ইঙ্গিত মাত্র সে প্রশস্ত খাল, সমুচ্চ বেড়া অনায়াসে লাফ দিয়ে পার হয়ে যেত। একবার এই সময়ে ঘোড়ার অত্যধিক বেগ সহ্য করতে না পেরে তার প্রভু পড়ে গিয়ে বিশেষ আঘাত পান, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাহায্য এসে না পৌঁছেছিল, ততক্ষণ হায়দর সেখান হতে এক পাও নড়েনি; স্থির হয়ে তাঁকে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মধ্যদেশে ঘোড়দৌড় খেলায় সে প্রতিবারেই জিতে আস্‌ত, কিন্তু আপন প্রভু ছাড়া আর কাউকে সে সওয়ারি হ'তে দিত না।

একবার 'হাইদরে'র প্রভু পীড়িত হ'ন, চিকিৎসকেরা বল্লেন সমুদ্র-পথে বায়ু পরিবর্ত্তন করে না এলে তাঁর জীবন রক্ষা হওয়া কঠিন। তিনি একা মানুষ; বহু দীর্ঘ সময়ের জন্য ঘর দুয়ার অপরের হাতে দিয়ে চলে যেতে হবে, তাই ঘোড়াগুলিকে আপনার একজন ইংরাজ বন্ধুকে বিক্রয় করবেন বলে স্থির করলেন। 'হায়দর'কে পাবার জন্যে সে বন্ধুরও আগ্রহ খুব ছিল, দামের জন্যে আটকাল না, দুর্ম্মূল্য হলেও হাইদরকে তিনি কিন্‌লেন। ঘোড়া যাবার আগেই সাহেব টাকা পাঠিয়ে দিলেন। হাইদরের প্রভুর বিদেশ যাত্রার সব ঠিক হ'ল; যে রাত্রে রওয়ানা হবেন, সেই দুপুরে হাইদরকে পাঠিয়ে দেবেন স্থির ছিল। হাইদরের প্রভু বারন্দায় একটা ক্যাম্প খাটে শুয়েছিলেন, সাহেবের লোক ঘোড়া নিতে এসেছে শুনে, তিনি বল্লেন নিয়ে যাবার আগে হাইদরকে যেন একবার তাকে দেখিয়ে নিয়ে যায়। নাম ধরে ডাকবামাত্র সে দুচার ধাপ সিড়ি উঠে প্রভুর বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল, তার মুখে গলায় হাত বুলিয়ে দেবা মাত্র সে একবার কাতর স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, সে যেন বলে উঠল, "আমার কি দোষে বিদায় করে দিচ্ছ, আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না"। তার প্রভুর চোখ জলে ভরে এল—তিনি চিঠি লিখে বন্ধুকে টাকা ফিরিয়ে দিলেন, হাইদরকে আর বিক্রী করা হ'ল না।

আমি যখন তাকে দেখি তখন তার যৌবন কাল অতীত হয়ে গিয়েছিল, তবুও সে তেমনি তেজস্বী আর সুন্দর ছিল। তার মত ঘাড় বাঁকিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রে নাচতে নাচতে কোন ঘোড়া যেতে পারত না। এই ঘোড়া আর তার সওয়ারকে দেখ্‌বার জন্য প্রতিদিন পথে জনতা হ'ত। প্রথম যে দিন আমি তার প্রভুর সঙ্গে তাকে আস্তাবলে দেখ্‌তে গেলাম, সেদিন সে আমার সঙ্গে শিষ্টাচার করা দূরে থাকুক, আমাকে খাতিরেই আনলে না। তার প্রভুর স্নেহের আবার একজন অংশীদার জুটেছে এটা তার আদপেই ভাল লাগেনি। আমার দেওয়া রুটি, চিনি বিস্কুট কিছুই সে মুখেই নিত না, এম্নি ভাব করতো যেন আমাকে সে দেখতেই পায়নি। কিন্তু ক্রমে তার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গিয়েছিল, তার প্রভু সওয়ারি হতে ফিরে এলে আমি প্রতিদিন তাকে মিষ্টান্ন খাওয়াতাম। মিষ্টির লোভ কয়জন এড়াতে পার বল দেখি! এরি জন্যে পরে সে আমার ডাকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে আস্‌ত, আমি মিষ্টি হাতে করে ঘুরে বেড়াতাম সেও আমার পিছে পিছে ঘুরত। আশ্চর্য্য এই, একটি দিনও সে কোন জিনিস উল্টে ফেলেনি, কিম্বা আমায় কোন আঘাত দেয়নি। মিষ্টান্ন খাওয়া হলে তাকে বলতাম, "যা হাইদার চলে যা, আর পাবিনে, লোভী হ'লে মার খাবি"; আর অম্নি সে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আপন সহিসের কাছে চলে যেত, যাবার সময় ফিরে ফিরে আমার দিকে চাইত, আর মুখ বাড়াত; ভাবখানা "আমায় আর একটু আদর করো—কাল আবার খেতে পাবত?" কথা কইতে পারত না সত্যি, কিন্তু চোখ দিয়ে সে অনেকই বল্‌ত।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

মহাদেব ও হনূমান।

রাবণকে সবংশে বধ করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করিলে পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি রাজা হইলেন। রাবণ ছিল বিশ্রবা মুনির পুত্র—সুতরাং ব্রাহ্মণ। তাহাকে বধ করিয়া রামের ব্রহ্মহত্যা পাপ হইল এবং এই পাপ নষ্ট করিবার জন্য মহামুনি অগস্ত্য তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার উপদেশ দিলেন।

ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার মত সুন্দর সাদা ধপধপে একটি অশ্বের কপালে যজ্ঞকর্ত্তার নাম এবং তাঁহার বলের পরিচয় দিয়া পত্র লিখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হয়। বড়

বড় যোদ্ধারা সৈন্য সামন্ত লইয়া এই যজ্ঞের অশ্ব যেখানে যাইবে তাহার পশ্চাৎ সেইখানে যাইবে। যদি কেহ বলপূর্ব্বক অশ্বটিকে বাঁধিয়া রাখে তবে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এইরূপ সমস্ত রাজাদিগকে বশীভূত করিয়া অশ্ব ফিরিয়া আসিলে সেই অশ্বদ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হয়। রাম এই অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর শত্রুঘ্ন, ও ভরতের পুত্র পুষ্কল, হনূমান, সুগ্রীব ও অঙ্গদের সহিত কোটি অক্ষৌহিণী সৈন্য সঙ্গে লইয়া অশ্বকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মহামুনি বশিষ্ঠ সুসজ্জিত যজ্ঞাশ্বের কপালে রামচন্দ্রের নাম এবং তাঁহার বলের পরিচয় দিয়া পত্র লিখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কত রাজার দেশ পার হইয়া অশ্ব চলিল! কেহ বা কেবল রামের নাম শুনিয়াই বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অনেক তেজস্বী ক্ষত্রিয় রাজারা যজ্ঞের অশ্ব ধরিলেন বটে কিন্তু সকলকেই শেষে হার মানিয়া অশ্ব ফিরাইয়া দিতে হইল।

এইরূপে ক্রমে যজ্ঞের অশ্ব দেবপুরে প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজা বীরমণির রাজ্যে গিয়া উপস্থিত। রাজা বীরমণি মহাদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং রাজবাড়ীতে থাকিয়া সর্ব্বদা রাজাকে বিপদ্ আপদ হইতে রক্ষা করিতেন। রাজকুমার রুক্মাঙ্গদ অশ্বটিকে বাঁধিয়া রাজ বাড়ীতে লইয়া আসিলে পর সেই পত্র পড়িয়া বীরমণি জ্বলিয়া উঠিলেন—"কি! অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া রামচন্দ্র সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে বশ করিতে চান—কেন, আমাদের কি শক্তি সামর্থ্য নাই? অশ্ব বাঁধিয়া রাখ, বিনা যুদ্ধে কখনই তাহা ফিরাইয়া দিবনা।" রাজার দূত গিয়া শত্রুঘ্নকে এই সংবাদ জানাইল।

দেখিতে দেখিতে দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্রথমে রাজকুমার রুক্মাঙ্গদ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পুষ্কলের সহিত সমানে সমানে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পুষ্কলের একটি সাংঘাতিক বাণের আঘাতে রথের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন রাজা বীরমণি ক্রোধে পুষ্কলকে আক্রমণ করিলেন। বীরমণি প্রবীণ যোদ্ধা, পুষ্কল বালক! কিন্তু বালক হইলে কি হয়, ভরতের পুত্র পুষ্কল অসাধারণ যোদ্ধা—আশ্চর্য্য কৌশলে বীরমণির অস্ত্র সকল নিবারণ করিয়া সে একটি ভয়ানক বাণ মারিয়া তাঁহাকেও অজ্ঞান করিয়া ফেলিল।

ভক্তের দুর্গতি দেখিয়া মহাদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহার অনুচর বীরভদ্রকে বলিলেন—, "যাও বীরভদ্র! পুষ্কলের সহিত যুদ্ধ

করিয়া আমার ভক্তের এই অপমানের প্রতিশোধ লও।" পুষ্কলের সহিত বীরভদ্র তখন ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। মহাবীর বীরভদ্রের সহিত ক্রমাগত পাঁচদিন ধরিয়া পুষ্কলের যুদ্ধ হইল; বীরভদ্র তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। ষষ্ঠ দিনে মহাদেবের ত্রিশূলের আঘাতে তিনি পুষ্কলের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। শত্রুঘ্নের সৈন্যদলে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল।

শত্রুঘ্ন তখন রাগে দুঃখে পাগলের মত হইয়া একেবারে মহাদেবকেই আক্রমন করিয়া বসিলেন। একদিকে সাক্ষাৎ রামচন্দ্রের মত তেজস্বী মহাবীর শত্রুঘ্ন, অপরদিকে মহাদেব স্বয়ং! সকলের মনে ভয় হইল বুঝি বা প্রলয় কাল উপস্থিত! ক্রমান্বয়ে এগার দিন এই যুদ্ধ হইল। দ্বাদশ দিনে শত্রুঘ্ন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেবকে মারিবার জন্য ব্রহ্মশির নামক অতি ভয়ঙ্কর এক অস্ত্র ছাড়িলেন। কিন্তু এই সংঘাতিক অস্ত্রটিকে মহাদেব হাসিতে হাসিতে গিলিয়া ফেলিলেন।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া শত্রুঘ্ন একেবারে অবাক্! তখন কি যে করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ইত্যবসরে মহাদেব আগুনের মত উজ্জ্বল এক ভীষণ অস্ত্র মারিয়া শত্রুঘ্নকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন।

তখন পবননন্দন হনূমান রাগে আগুন হইয়া মহাদেবের নিকটে গিয়া বলিল—"তুমি নিতান্ত অন্যায় কাজ করিয়াছ সে জন্য তোমাকে আমি কিছু শাসন করিতে ইচ্ছা করি। মুনি ঋষিদের নিকট চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছি যে প্রভু রামচন্দ্রকে তুমিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি কর। কিন্তু আজ যখন তুমি যুদ্ধ করিয়া আমার প্রভুর ভাই শত্রুঘ্নকে অজ্ঞান করিয়াছ এবং মহাবীর পুষ্কলকে বধ করিয়াছ তখন সে সমস্ত কথাই মিথ্যা—আজ আমি সকলের সাক্ষাতে তোমাকে বধ করিব, তুমি প্রস্তুত হও।"

মহাদেব বলিলেন,—"হনুমান! তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ! রামকে আমি বড় দেবতা বলিয়া মানি এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি ইহাও সত্য। কিন্তু বীরমণি আমার পরম ভক্ত—তাহাকে বিপদের সময় রক্ষা না করিয়া ত পারি না।" মহাদেবের কথায় হনুমান রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া প্রকাণ্ড একটা পাথর দিয়া মহাদেবের সারথি, অশ্ব, রথ চুরমার করিয়া দিল। রথহীন হইয়া মহাদেব তাঁহার বাহনে চড়িবা মাত্র হনুমান একটা শালগাছ তুলিয়া লইয়া তাঁহার বুকে গুরুতর এক ঘা বসাইয়া দিল। দারুণ আঘাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তখন মহাদেব ভয়ঙ্কর এক শূল দিয়া হনূমানকে আঘাত করিলেন, হনূমান তাহা দুই হাতে ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। মহাদেব জ্বলন্ত

এক শক্তি মারিলেন, হনূমান সে আঘাতও অগ্রাহ্য করিয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষ দ্বারা পুনরায় তাঁহার বুকে দারুণ আঘাত করিল—মহাদেবের শরীরের সাপগুলি হনূমানের তাড়নায় ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে চারিদিকে পলায়ন করিল।

ইহা দেখিয়া মহাদেব ভীষণ এক মুষল হাতে লইয়া বলিলেন,—"তবেরে বানর! শীঘ্র পলায়ন কর নতুবা এই মুষল দিয়া তোকে আজ বধ করিব।" মহা ক্রোধে মহাদেব মুষল ছাড়িলেন কিন্তু হনূমান রাম নাম স্মরণ করিয়া, এবারেও ফাঁকি দিল। তারপর সে এমন আশ্চর্য্য যুদ্ধ আরম্ভ করিল যে মহাদেব বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। হনূমান চক্ষের নিমেষে কখনো পাথর ছুঁড়িয়া মারিতেছে কখনো প্রকাণ্ড বড় গাছ লইয়া আঘাত করিতেছে আবার কখনো বা লেজ দিয়া মহাদেবকে জড়াইয়া ধরিয়া টানাটানি করিতেছে—কোনটা যে তিনি ব্যর্থ করিবেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া মহাদেব বলিলেন,—"বাছা হনূমান! তোমার আশ্চর্য্য বীরত্ব দেখিয়া আমি মহা সন্তুষ্ট হইয়াছি, পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এখন তুমি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া বর প্রার্থনা কর।" মহাদেবকে যুদ্ধে নিরস্ত করিয়া হনূমানের বড়ই হাসি পাইল। যাহা হউক তিনি যখন সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তখন আর কথা কি! হনূমান বলিল,—"প্রভু! রঘুনাথের প্রসাদে আমার অভাব কিছুই নাই, তবু আপনি যখন সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিয়াছেন তখন আমি এই প্রার্থনা করি যে যুদ্ধে শত্রুঘ্ন মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, পুষ্কল প্রভৃতি অনেক বড় বড় যোদ্ধারা হত হইয়াছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের শরীর রক্ষা করুন। আপনার ভূত, প্রেতগুলি যেন উঁহাদিগকে খাইয়া না ফেলে; আমি ইত্যবসরে দ্রোণপর্ব্বত হইতে মৃত সঞ্জীবনী ঔষধ লইয়া আসি।" মহাদেব তখন "তথাস্তু" বলিয়া যুদ্ধস্থল রক্ষা করিতে লাগিলেন, হনূমানও দ্রোণপর্ব্বত আনিবার জন্য চলিয়া গেল।

পবননন্দন হনূ পবনের ন্যায় বেগে চক্ষের নিমেষে দ্রোণপর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত। পর্ব্বতটিকে জড়াইয়া ধরিয়া টান দিবা মাত্র উহা টলমল করিয়া উঠিল। পর্ব্বত রক্ষক দেবতারা ভাবিলেন—কি সর্ব্বনাশ! পর্ব্বত নড়িতেছে কেন? তাঁহারা সন্ধান করিয়া দেখিলেন বিশাল দেহ মহা ভয়ঙ্কর এক বানর পর্ব্বতকে জোর করিয়া তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। তখন দেবতারা সকলে মিলিয়া হনূমানকে আক্রমণ করিলেন। মহাবীর হনূর নিকট জনকতক রক্ষী দেবতা আর কি, নিমেষ মধ্যে প্রায়

সকলকেই সে যমালয়ে প্রেরণ করিল। দু একজন যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহারা পলায়ন কবিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গিয়া সংবাদ দিলেন। ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া

সমস্ত দেব সৈন্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—"যাও, তোমরা শীঘ্র গিয়া এই বানরকে বাঁধিয়া লইয়া আইস।"

অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দেবসৈন্য হনূমানকে গিয়া আক্রমণ করিল, কিন্তু হনূমান তাহাদিগকেও মুহূর্ত্ত মধ্যে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। এই সংবাদে ভয় পাইয়া ইন্দ্র বৃহস্পতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গুরু! যে বানর দ্রোণপর্ব্বত লইতে আসিয়াছে এবং প্রায় সমস্ত দেবসৈন্যকে যুদ্ধে বধ করিয়াছে সে কে?" বৃহস্পতি বলিলেন—"রাবণকে সবংশে বধ করিয়া যে রাম সীতাকে উদ্ধার করিয়াছেন এই বানর তাঁহারই সেবক—ইহার নাম হনূমান। রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন। শিবভক্ত রাজা বীরমণি রামের যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়াছেন বলিয়া সেখানে মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছে। সেই যুদ্ধে স্বয়ং মহাদেব শত্রুঘ্ন এবং পুষ্কল প্রভৃতি রামের অনেক বড় বড় যোদ্ধাকে বধ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য মহাবীর হনূমান দ্রোণপর্ব্বত লইতে আসিয়াছে। দেবরাজ! তুমি শত সহস্র বৎসর যুদ্ধ করিলেও হনূমানকে পরাজয় করিতে পারিবে না, অতএব শীঘ্র গিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট কর।"

বৃহস্পতির কথায় ইন্দ্র মহা ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। হনূমানকে সন্তুষ্ট করিতেই হইবে, কিন্তু দ্রোণপর্ব্বত যদি লইয়া যায় তাহা হইলে দেবতাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা পুনরায় জীবন পাইবেন কি করিয়া? নিরুপায় হইয়া ইন্দ্র বৃহস্পতিকেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃহস্পতি ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবতাদিগকে লইয়া হনূমানের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে মিলিয়া অনেক স্তুতি মিনতি করিলে পর হনূমান সন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—"বীরমণির সহিত যুদ্ধে মহাদেবের হাতে আমাদের বড় বড় যোদ্ধারা অনেকে মারা গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য আমি দ্রোণ পর্ব্বত লইয়া যাইতে আসিয়াছি। হয় আমাকে সেই মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ দাও আর না হয় আমি দ্রোণ পর্ব্বত মাথায় করিয়া লইয়া যাইব। ইহা শুনিয়া দেবতারা সঞ্জীবনী ঔষধ দিয়া হনূমানকে বিদায় করিলেন।

সঞ্জীবনী ঔষধ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়া হনূমান সকলকেই বাঁচাইয়া দিল।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

কাঁকড়া-বিছে।

ভাই সন্দেশ,

তোমরা কলকাতায় থাক, বেশ সুখে আছ। আমি থাকি পাড়াগাঁয়ে তাতে পাহাড় পর্ব্বতের মধ্যে। চারিদিকে বন জঙ্গল, রাত্রিতে বাড়ীর আশে পাশে বাঘ ভালুক ঘোরে। আমার বাড়ীর চারিদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা, পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে বাঘ ভালুক আসে না, আর দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে থাক্‌লে কোন ভয় থাকেনা। ভাই, ঘরের মধ্যেও নিস্তার নাই। মেঝেতে ব্যাং থপ্ থপ্ করে যাচ্চে, বাক্সের কোণে সাপ ঢুকচে, ঘরের চাল থেকে রাক্ষুসে মাকড়সা লাফিয়ে পড়্‌ছে, আল্‌নায় জামার ভিতরে, বিছানায় বালিসের তলে, তেঁতুলে বিছে, বইএর আল্‌মারিতে আর জুতোর মধ্যে কাঁকড়াবিছে, কখন যে কোনটা কামড়াবে এই ভয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাক্‌তে হয়। ফস্‌করে জুতোর মধ্যে পা গলিয়ে দেবে, আর জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেবে, আর ঝট্ করে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়্‌বে, সে যো'টি নাই। এ ছাড়া পোকার উৎপাত কত। উই পাখা ধরে পালে পালে ঘরের কোণ থেকে বেরুচ্ছে, বড় বড় সিংওয়ালা গুবরে পোকা ভোঁ করে উড়ে এসে ঠকাস্ করে পড়েছে। গান্ধি পোকা, ছোট গুবরে, গঙ্গাফড়িং, ডাল ফড়িং, পাতা ফড়িং কত রং বেরংএর পোকা এসে জ্বালাতন করে।

কাল সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে যাবো বলে চাকরটাকে বুট জুতো যোড়া আন্‌তে বল্লাম। পাঁচ সাত দিন এ জুতো পরি নাই, ঘরের এক কোণেই রাখা ছিল। চাকরটা জুতো যোড়া বারান্দায় এনে, পোকা টোকা আছে কিনা দেখবার জন্য তাকে উল্টিয়ে মাটীতে ঠুক্‌লে। যেই ঠোকা অমনি প্রকাণ্ড এক কাঁকড়াবিছে—যাকে বলে বৃশ্চিক! না ঝেড়ে যদি তাড়াতাড়ি জুতোর মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিতাম তা'হলে আমার কি দশাই না হত! বিছের কামড়ের যে কি যাতনা, যে সে কামড় খেয়েছে সেই জানে! তবে নাকি এরা মুখ দিয়ে কামড়ায় না, হুল্ ফুটিয়ে দেয়। তাইতে যন্ত্রণা হয়।

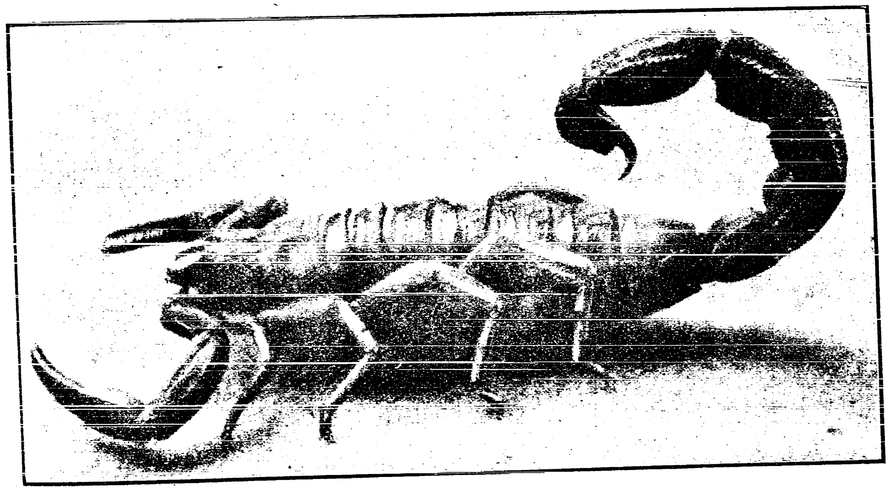

এ বিছাটা মস্ত বড়, রং কাল, গায়ে অল্প অল্প রোম আছে। কাঁকড়ার দাঁড়ার মত বড় বড় এক যোড়া দাঁড়া আছে। জুতো থেকে বেরিয়েই, লেজটা পিঠের উপর উঁচু করে অন্ধকার কোণের দিকে ছুট্। চাকর জানে তার বাবু ওটিকে নেড়ে চেড়ে না দেখে ছাড়বেন না। তাই সে দৌড়িয়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে লোহার বড় চিমটে খানা এনে আমার হাতে দিলে। ওর কাছেও যেতে তার সাহস হল না। আমি চিম্‌টেটা হাতে করে তার কাছে গেলাম। সেটা দেয়ালের কোণেই দাঁড়িয়ে ছিল। যেই চিম্‌টে দিয়ে তাকে ধল্লাম অমনি ফঁস্ ফঁস্ শব্দ কত্তে লাগ্‌ল, আর সাঁড়াসির মত দাঁড়া দিয়ে চিম্‌টেটাকে

চেপে ধল্লে আর তার লেজ ছুঁড়ে চিমটের গায়ে হুল ফোটাতে চেষ্টা কত্তে লাগ্‌ল। আমি তাকে তুলে নিয়ে সেই বড় কাঁচের বোতলের মধ্যে পূরে ফেল্লাম।

এটা খুব মস্ত বিছা। এত বড় বিছা সচারাচর দেখা যায় না। আমি আরো অনেক বিছা মেরেছি। কোনটা লাল্‌চে মেটে, কোনটা ধূসর, কোনটা কাল, কিন্তু সে সবগুলিই এর চাইতে ছোট। এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতের ছোট বড় নানা রকমের কাঁকড়া-বিছে আছে। যে জাতের বিছে ধরেছি সেগুলি সব চাইতে বড় হয়।

মাকড়সার মত এরও মাথা ও বুক মিশে এক হয়েছে। পেট্‌টাতে অনেক ভাগ আছে, পেটের শেষের পাঁচটা ভাগ লম্বা ও সরু হয়ে লেজের মত হয়েছে, আর তার আগায় ঢিব্‌লের মত একভাগ আছে, সেইটের আগায় বিড়ালের নখের মত বাঁকা শক্ত ও ছুঁচ্‌ল হুল্ আছে। এই ঢিব্‌লেটায় বিষের থলি আছে, আর ঐ হুলের মধ্যে সরু ছিদ্র আছে। হুল্ ফুটিয়ে দিলে সেই ছিদ্র পথে বিষ বেরিয়ে গায়ে ঢোকে আর তাতেই যন্ত্রণা হয়। মাকড়সার পেট দেখতে একটা খণ্ড, তাতে ভাগ নাই—এদের পেট অনেক ভাগে বিভক্ত, সে ভাগগুলো বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। লেজটাও ওর পেটেরই অংশ।

কাঁক্‌ড়া-বিছে মাকড়সার জ্ঞাতি। এর চার যোড়া পা আছে, তা' দিয়ে হাঁটে। সামনের স্পর্শনি যোড়া খুব বড় ও মোটা আর তা দেখ্‌তে কাঁকড়ার দাঁড়ার মত। প্রত্যেকটার আগায় সাঁড়াশির মত দুটা শক্ত আঙ্গুল বা নখ আছে, নখের ভিতর পাশ খাঁজকাটা বা দাঁতযুক্ত। এ দিয়ে শিকার চেপে ধরে, আর তার গায়ে লেজের বাড়ি মেরে হুল্ ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দেয়। সেই বিষে শিকারটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে বা মরে যায়। মুখের সাম্‌নে এক যোড়া ছোট্ট সাঁড়াশির মত আছে। তা দিয়ে খাবার ধ'রে খণ্ড খণ্ড করে আর মুখে পোরে। এরই নীচে ওর ঠোঁট আর মুখের ছিদ্র।

এই দাঁড়ায় আর প্রথম পায়ের গোড়ার দিকে বুকের পাশে কাঁটার মত শক্ত শক্ত লোমের গোছা আছে। বিছা যখন রাগে তখন দাঁড়া যোড়া নড়তে থাকে, তাতে সেই কাঁটাগুলোতে ঘষা লেগে ফস্ ফস্ শব্দ হয়। তোমাদের দাঁত-মাজা শক্ত বুরুষের গায়ে আঙ্গুল টেনে দেখ কেমন শব্দ হয়। এই শব্দও অনেকটা ঐ রকম। এরা ভয় দেখাবার জন্য ঐ রকম শব্দ করে। সতর্ক করে দেয়, যেন বলে, বাপু হে এই বেলা পালাও, কাছে এসো না, এলেই হুল্ ফুটিয়ে দেব।

কাঁকড়া-বিছে যখন হাঁটে তখন লেজটাকে তুলে পিঠের উপর বাঁকিয়ে রেখে চলে। শিকার মারতে হলে তার দিকে হঠাৎ পিছন ফিরে লেজটাকে ঝট্‌করে সোজা ক'রে

তার গায়ে ছুঁড়ে মারে আর অম্‌নি লেজের আগায় সেই বাঁকা ধারাল হুল্‌টা তার গায়ে বিঁধে যায় আর বিষ বেরিয়ে শরীরের মধ্যে ঢুকে যায়।

এর বিষের ভারি তেজ। মানুষের গায়ে এ বিষ ঢুক্‌লে মানুষ মরে না বটে, কিন্তু এত জ্বালা হয় যে ছট্‌ফট্ কত্তে হয়, আর সে যন্ত্রণা অনেকক্ষণ থাকে। কখন কখন দু'তিন দিন পর্য্যন্ত থাকে। সময়ে সময়ে জ্বর হয়, গা বমি বমি করে, মাথা ঘুরোয়, খেতে ইচ্ছে থাকে না। যন্ত্রণা কমে গেলেও তিন চার দিন পর্য্যন্ত শরীর অসুস্থ থাকে। ছোট ছেলেকে খুব বড় বিছায় কামড়ালে, সে মারা পড়্‌তেও পারে। এরা মানুষকে খাবে বলে হুল্ ফুটোয় না। স্বভাবতঃ এরা ভীরু, মানুষ দেখ্‌লে পালায়। তবে খুব ভয় পেলে আর পালাবার সুবিধা না পেলে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে হুল ফুটিয়ে দেয়।

এরা পাহাড় ও বালীময় শুষ্ক প্রদেশেই বেশী থাকে। খোড়ো ঘরের চালে, দেয়ালের ফাটলে, পাহাড়ের পাথরের ফাঁকে ইট, পাথর, কাঠের তলায় বাস করে। কোন কোন জাত মাটীতে গর্ত্ত খুঁড়েও তাতে থাকে। এরা দিনের বেলায় ঐ সব যায়গায় লুকিয়ে থাকে। রাত্রিতে শিকারের খোঁজে বাহির হয়। দিন হলেই, কোণা ঘুঁচিতে যেখানে অন্ধকার পায় সেইখানেই ঢুকে লুকিয়ে থাকে।

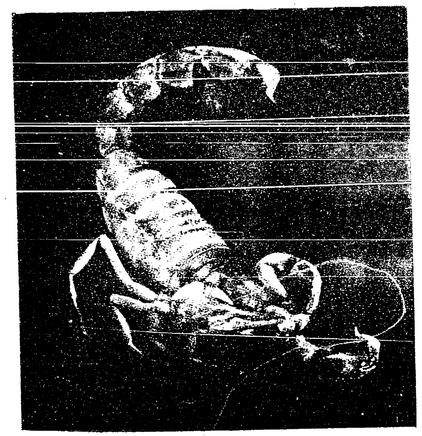

একটা বিছে আরকটাকে প্রায় খেয়ে ফেলেছে

কাঁকড়া-বিছে সাধারণতঃ কীট পতঙ্গ, ও মাকড়সা ধরে খায়। বড় জাতের বিছে ছোট ছোট টিক্‌টিকি, নেংটে ইন্দুর, পাখীর ছোট ছোট বাচ্চাও ধরে খায়। ছোট যে কোন প্রাণীকে ধরে আয়ত্ত করতে পারে তাকেই খায়। এরা একলা একলা থাক্‌তেই ভাল-বাসে। একটা অপরটাকে দেখ্‌লে, দুজনে খুব যুদ্ধ বেধে যায়। যেটা জিতে যায় সেটা অপরটাকে খেয়ে ফেলে।

মাকড়সার মত এরা ডিম পাড়ে না। ডিম মার পেটের ভিতরেই ফোটে, আর জিয়ন্ত ক্ষুদে ক্ষুদে বাচ্চা পেট থেকেই বেরোয়। এক এক বারে অনেকগুলি এমন কি ৫০।৬০টা বাচ্চা জন্মে। ছোট ছোট বাচ্চারা মার পেট থেকে বেরিয়েই মায়ের গায়ে পিঠে চড়ে বসে আর

আঁকড়ে ধরে থাকে। মাসখানেক এই রকম অবস্থায় থাকে। প্রথম খোলস বদলানর পর বাচ্চারা নিজে নিজে খাবার ধরে খায়। বড় না হওয়া পর্য্যন্ত মা বাচ্চাদের ভারি

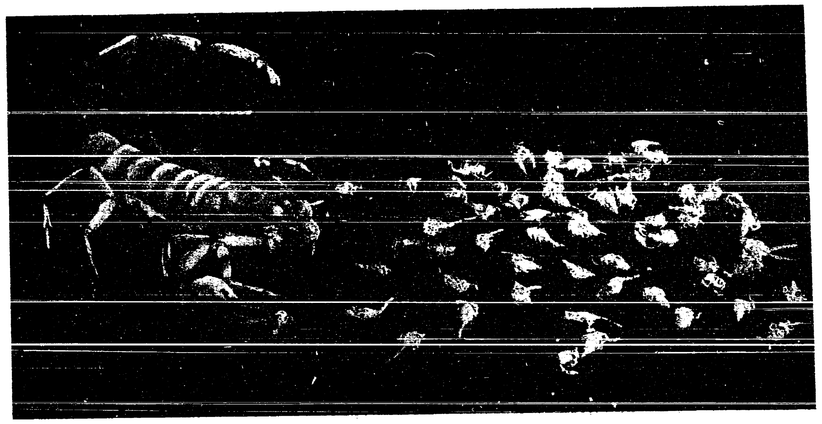

যত্ন করে। আবার সময়ে সময়ে নিজের বাচ্চাদের ধরে ধরে খেয়েও ফেলে।

কাঁকড়া আর মাকড়সার মত বিছাও মাঝে মঝে খোলস বদলায়। দৈবাৎ কোন রকমে একটা পা ছিঁড়ে বা খসে গেলে পরের বারে খোলস বদলাবার সময়ে নূতন পা গজায়। কাঁকড়া আর মাকড়সাদের নূতন পা গজাবার ক্ষমতা আছে।

পৃথিবীতে অনেক জাতের কাঁকড়া-বিছে আছে। প্রায় সব গরম দেশেই বিছা দেখ্‌তে পাওয়া যায় কেবল টাস্‌মেনিয়া দ্বীপে নাই। অল্প গরমের দেশে, যেমন ইউরোপের দক্ষিণ অংশে, কেবল ছোট রকমের বিছাই দেখা যায়। তারা ২।৩ ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না। আর বড় জাতের রাক্ষুসে বিছে কেবল ভারতবর্ষে আর আফ্রিকায় দেখা যায়। এই সব বিছা ৭।৮ ইঞ্চ লম্বা হয়। আমি যেটা ধরেছি সেটা সাত ইঞ্চ লম্বা।

ছবিতে দেখ বিছার কেমন দাঁড়া, কেমন লেজ আর হুল, আর দেখ একটা বিছে কেমন আর একটাকে খাচ্চে, সবটা খেয়েছে কেবল লেজের আগাটা বেরিয়ে আছে। আরও দেখ মা—রাক্ষুসীটা তা'র ছানাদের ধরে ধরে খাচ্চে, দুই দাঁড়ায় দু'টো ধরেছে, আর মুখে একটা পূরেছে। কেমন ভায়া এ সব অদ্ভুত কি না?

তোমার মেজ দাদামশায়।

হিপ্পপটেমাসের হাঁ।

এক গ্রাসে এ যত খাবার মুখে পুর্‌তে পারে, পাঁচদিনেও তুমি তা' সাবাড় কর্‌তে পার্‌বে না। তিমি ছাড়া আর কোন জন্তুই এত বড় হাঁ কর্‌তে পারে না।

রাজার বন্ধু।

প্রায় তিনশ বছর পূর্ব্বেকার কথা বল্‌ছি, তখন ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন প্রথম চার্লস্। এই চার্লসের অন্যায় শাসনে ইংলণ্ডের লোকেরা বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। তার ফলে অনেক যুদ্ধ এবং রক্তপাতের পর রাজা প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড হয় এবং ওলিভার ক্রমওয়েল্ দেশের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হন। প্রথম চার্লসের বন্ধু বান্ধব যাঁরা তাঁর হয়ে অনেক যুদ্ধ করেছিলেন তাঁরা কিন্তু ওলিভারের শাসন পছন্দ করলেন না। তাঁদের ইচ্ছা রাজকুমার চার্লস্‌ই ইংলণ্ডের রাজা হয়ে রাজ্য শাসন করেন। এই উপলক্ষে রাজকুমারের দলের সঙ্গে ক্রমওয়েলের ঘোরতর যুদ্ধ বাধে কিন্তু পদে পদে পরাস্ত হয়ে অবশেষে যুবরাজ চার্লস্‌কে ফ্রান্সে পলায়ন করতে হয়েছিল।

যুবরাজের পলায়নের পর তাঁর যে সব বন্ধু বান্ধব ইংলণ্ডে রইলেন তাঁদের মহা বিপদ উপস্থিত হ'ল। ক্রমওয়েলের হাতে ধরা পড়লে রক্ষা নাই, সুতরাং গোপনে লুকিয়ে থাকা ভিন্ন তখন তাঁদের আর উপায় ছিলনা। এই যে ছোট গল্পটি তোমাদের আজ বল্‌ছি এটি পড়লেই তোমরা বুঝ্‌তে পারবে যে যুবরাজের বন্ধুরা তখন কিরূপ বিপদে পড়েছিলেন।

যুবরাজের বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন সার রাল্‌ফ্ পেল্‌হাম্। সাহসী বীর সার রাল্‌ফ্ রাজার পক্ষে অনেক যুদ্ধ করে শেষে তাঁর মৃত্যুর পর যুবরাজের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু যুবরাজের পলায়নের পর তাঁর আর কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায়নি। তিনি বেঁচে রইলেন কি যুদ্ধে মারা গেলেন সে সংবাদও কেউ বলতে পারল না। পেল্‌হাম বংশ খুব সম্ভ্রান্ত ধনীবংশ তাঁদের থাকবার প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল, তার নাম 'কেমুর হল'। সার রাল্‌ফের দুটি সন্তান, বড়টি ছেলে—তার নাম চার্লস্, ছোটটি মেয়ে—কিটি। তাছাড়া সার রাল্‌ফের ভগ্নী আছেন—আণ্ট্ বেসি। সার্ রাল্‌ফ্ নিরুদ্দেশ হবার কিছুকাল পরে একদিন শীতের রাত্রিতে তাঁর স্ত্রী লেডি রাল্‌ফ্ "কেমুর হলে" একটি ঘরে বসেছিলেন। তখন অনেক রাত হয়েছে চার্লস্ আর কিটি ঘুমাতে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আণ্ট্ বেসিও গেছেন। লেডি রাল্‌ফ্ একলা চুপটি ক'রে আগুনের পাশে বসে স্বামীর কথা ভাবছেন। এমন সময় হঠাৎ বাইরের দরজায় খুব জোরে ঠক্ ঠকানির শব্দ শুনে তিমি চম্‌কে উঠলেন। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর বৃদ্ধ চাকরটি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘরে এসে উপস্থিত—উৎসাহে আর আনন্দে তার মুখ চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে

উঠেছে। ঘরে ঢুকেই সে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্ল—"মা ঠাক্‌রুণ! বড় সুখের সংবাদ এনেছি। তার কথা শেষ হতে না হতেই লম্বা চেহারা একটি পুরুষ তাকে ঠেলে সরিয়ে একেবারে লেডি রাল্‌ফের সম্মুখে এসে উপস্থিত! লোকটিকে দেখেই "রাল্‌ফ্!" বলে এক চীৎকার দিয়েই লেডি রাল্‌ফ্ তার দিকে ছুটে গেলেন। ততক্ষনে আণ্ট বেসিও ঘরে এসে উপস্থিত। এতদিন পরে ভাইকে দেখে তাঁর চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল পড়তে লাগল। তিনি তাড়াতাড়ি ছেলেদের ডেকে আনলেন। তখন সকলের আনন্দ আর ধরে না।

রাজকুমারের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে সার রাল্‌ফ্ গুরুতর আঘাত পান। তারপর এতদিন বনের মধ্যে এক গরীব লোকের বাড়ীতে লুকিয়ে থেকে সেই লোকটির যত্নে আরাম হয়েছেন। তখনও তাঁর বিপদ যায়নি, ক্রমওয়েলের লোকেরা তখনও তাঁর সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। তাঁর বাড়ীতেও হয়ত বা তারা এসে উপস্থিত হতে পারে।

তিনি ঘর থেকে বেরুতে যাবেন এমন সময় মহা ব্যস্তসমস্ত হয়ে একজন সৈনিক ঘরে ঢুকে বল্ল—"সার রাল্‌ফ্! এই বেলা পালান, এক মুহূর্ত্তও দেরি করবেন না! ক্রমওয়েলের লোক আপনার পিছু নিয়েছে—ঐ শুনুন তারা এসে পড়ল, ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সর্ব্বনাশ! আর উপায় নাই—বাড়ী ঘিরে ফেলেছে।" সার রাল্‌ফ্ মহাব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন "বেসি! আর উপায় নাই, সেই চোরাই পথে এখন লুকিয়ে থাকি গিয়ে।" সেকালের বড়লোকদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই বিপদের সময় লুকাবার জন্য একটা ঘরে গুপ্ত পথ রাখা হতো। আণ্ট বেসি তাড়াতাড়ি সার রালফ্‌কে তাঁর বাড়ীর সেই চোরা পথে লুকিয়ে ফেল্‌লেন। দেখতে দেখতে ক্রমওয়েলের সশস্ত্র সৈনিকদল বাড়ীতে এসে উপস্থিত। তারা চারদিক খুঁজে এঘর, ওঘর, একোণ সেকোণ, রাস্তা, বাগান কিছুই বাকি রাখল না। ভয়ে সকলের গা কাঁপ্‌তে লাগল—যদি সার রাল্‌ফ্ ধরা পড়ে যান!

প্রায় রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত খুঁজে খুঁজে যখন সার রাল্‌ফ্‌কে পাওয়া গেল না, তখন তাদের দলপতি লেডি রাল্‌ফকে বল্‌লেন—"বিদ্রোহী যে এ বাড়িতেই লুকিয়ে আছে তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। যা হোক্, আজ রাতটা আমার লোকজন বাড়ী পাহারা দিবে কাল সকালে আমরা আবার সন্ধান করব।"

এদিকে সার রাল্‌ফ্ মৎলব করছেন এখন কি করা যায়। প্রায় ঘণ্টা খানেক পর গুপ্ত পথের দরজা আস্তে আস্তে একটু খুলে গেল এবং আণ্ট্ বেসি এসে তাঁর কাণে

বল্‌লেন—"একটিও কথা বলোনা, বাড়ীর চারদিকে পাহারা বসেছে—কাল আর তোমার পালাবার উপায় থাক্‌বে না, তোমাকে এখনি পালাতে হবে।"

পালাবার আগে ছেলেমেয়েদের এবং স্ত্রীকে শেষ দেখা একবার না দেখে সার রাল্‌ফ্‌ কিছুতেই যেতে রাজি হলেন না। আণ্ট্‌ বেসি তাতে অনেক আপত্তি করলেন বটে কিন্তু কিছুতেই তিনি যখন মানলেন না তখন চোরের মত হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে দুজনে ছেলেদের ঘরে গেলেন। সেখানে তখন লেডি রাল্‌ফ্‌ও ছিলেন। আণ্ট্‌ বেসি বল্‌লেন—"কিটি! চার্লস্‌! তোমরা চুপটি করে থাক কান্না কাটি করো না। বাবা বাড়ী এসেছেন বটে কিন্তু এখনি আবার তাঁকে চলে যেতে হবে।"

দৃঢ়চিত্ত সার রাল্‌ফেরও তখন চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, তিনি ছেলে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কিটি তাঁর গলায় ধরে কত মিনতি করে বল্ল—"বাবা! তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেওনা।" কিন্তু সার রাল্‌ফ্‌ কি না গিয়ে পারেন! তিনি মেয়েকে বল্লেন,—"আমাকে যেতেই হবে মা। এখানে থাক্‌লে আমার অনিষ্ট হবে। লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাক, আমি যতদিন ফিরে না আসি মাকে সুখী করতে চেষ্টা করো।"

চার্লস্‌ ততক্ষণে সমস্ত ব্যাপার বুঝ্‌তে পেরেছে। সে জিজ্ঞাসা করল—"বাবা! ওরা কি তোমাকে ধরে নেবে বলে এখানে এসেছে?

স্যার রালফ্‌ বল্লেন—"হাঁ বাবা, তুমি ঠিকই বলেছ। যাহোক্‌ এখন ও ব কথা তুমি বুঝতে পারবে না। যাবার সময় একটি কথা তোমাকে বলে যাচ্ছি—বিশেষ করে সর্ব্বদা মনে রেখো যে তুমি সম্ভ্রান্ত বংশের এবং ভদ্র-ঘরের ছেলে আর তোমার বাবা শেষ পর্য্যন্ত রাজার খুব বন্ধু ছিলেন। সকল অবস্থায় এই কথাই স্মরণ করো—পেলহাম্‌ পরিবারের সকলে ধার্ম্মিক এবং রাজভক্ত। আমি যদি আর কখন ফিরে না আসি, আমার কথাগুলি ভুলে যেও না—চিরজীবন সাহসী, সত্যবাদী থেকে রাজার সেবায় প্রাণ দেবে। ভয় কি! আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি যুবরাজ চার্লস্‌ শীঘ্রই ইংলণ্ডের রাজা হবেন।"

সার রালফ্‌ সকলের কাছে শেষ বিদায় নিয়ে আবার গুপ্তপথে ফিরে চল্লেন। সে পথ দিয়ে গভীর বনে যাওয়া যায়। একবার সে বনে প্রবেশ করতে পারলে আর ভাবনা কি? ক্রম্‌ওয়েলের সৈন্যেরা তাঁর কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না।

সে রাত্রি আণ্ট্‌ বেসি আর লেডি রালফ্‌ আর ঘুমাতে পারলেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেল, ক্রমে রাত্রি প্রভাত হলো; তখন তাঁরাও এই ভেবে, মনকে সান্ত্বনা দিলেন যে সার রালফ্‌ নিরাপদে বনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছুতে পেরেছেন।

ভোর হতেই আবার সৈন্যদের মধ্যে খোঁজা খুঁজির ধুম পড়ে গেল। বাড়ীতে কিছু সন্ধান না পেয়ে সারাদিন সমস্ত গ্রামটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াল কিন্তু সার রালফের কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না। তখন একেবারে নিরাশ হয়ে দলপতি বাড়ীতে জনকয়েক প্রহরী রেখে সন্ধ্যার সময় চলে গেলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর আবার চারজন লোক এসে উপস্থিত। এরাও ক্রম্‌ওয়েলেরই লোক। তাদের মধ্যে সর্দ্দার যে, সে একটা টেবিলের পাশে বসে মেয়েদের এনে সার রালফ্‌ সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল। লেডি রালফ্‌ একেবারে নিরুত্তর একটি কথারও উত্তর দিলেন না, এদিকে আণ্ট্‌ বেসিও যেন হঠাৎ কালা বোবা হয়ে পড়লেন।

সর্দ্দারের পাশেই যে লোকটি বসে ছিল সে তখন বল্ল—"আরে মশাই! আমরা বোধ হয় ভূতের বেগার খাট্‌তে এসেছি। সার রালফ্‌ কি এমনই বোকা যে আমাদের জন্য এখানে এসে লুকিয়ে থাক্‌বে।" তখন আর একটি লোক ফিস্‌ ফিস্‌ করে সর্দ্দারের কাণে কি জানি বল্ল আর তিনিও মেয়েদের একটু সরে দাঁড়াতে বলে চার্লস্‌কে ডাক্‌লেন —"এস ত হে ছোক্‌রা! টেবিলের সাম্‌নে এই টুলটাতে দাঁড়িয়ে আমার কথার উত্তর দাও। আচ্ছা! তোমার নাম কি বল দেখি?" পরিষ্কার গলায় উত্তর হলো—"আমার নাম চার্লস্‌ পেল্‌হাম্‌।"

"আচ্ছা, চার্লস্‌! বল দেখি তোমার বাবাকে তুমি শেষ কবে দেখেছ? ঠিক করে সত্যি কথা বল।"

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে চার্লস্‌ একটু থমমত খেয়ে গেল। বাড়ীর মেয়েদের প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ল পাছে সে সব কথা বলে দেয়—তা হলেইত সর্ব্বনাশ! আবার প্রশ্ন হলো। তখন চার্লস্‌ নির্ভয়ে উত্তর করল—"অনেক দিন হলো বাবা রাজার হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। আমি যদি বড় হতাম তাহলে আমিও রাজার দলে যুদ্ধ করতাম।"

চার্লসের উত্তর শুনে সর্দ্দার ভারী আমোদ পেয়ে বল্ল—"তাই নাকি? কেন, রাজার হয়ে যুদ্ধ করবে কেন?" নির্ভয়ে বুক টান করে চার্লস্‌ উত্তর দিল—"কেন করব না? আমি যে পেল্‌হাম্‌—পেল্‌হাম্‌ পরিবারের লোকেরা চিরকালই রাজভক্ত, তারা রাজার হয়েই যুদ্ধ করে।"

ছোট শিশুর মুখে এমন উত্তর শুনে সর্দ্দারের মন গলে গেল, তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে চার্লস্‌কে বল্লেন—"সাবাস্‌ বাচ্চা! তোমার মত সাহসী ছেলের বাবা যে আমাদের

ফাঁকি দিয়ে পালাতে পেরেছেন তাতে আমি একটুও দুঃখিত নই।" এই কথা বলেই তিনি সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেলেন—কেমুর হল আবার নিরাপদ হলো।

ইহার বছর কয়েক পরেই যুবরাজ চার্লস্ "দ্বিতীয় চার্লস্" নামে ইংলণ্ডের রাজা হলেন। তখন সার রালফ্ নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরলেন। বালক পেল্‌হামের সাহসের কথা রাজার কাণেও পৌঁছেছিল, তিনি এই তেজী ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কত আদর করেছিলেন। পেল্‌হাম্ বংশ এখনও কেমুর হলে বাস করেন। এখনও সেখানে গেলে এই বালক বীরের সুন্দর ছবি দেখতে পাবে।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

মই ভুত।

বন্দীপুরে জেলেদের এক ষণ্ডামার্ক ছেলে ছিল—তাহার নাম গণেশচন্দ্র। রাত-ভিতে উঠিয়া চোর ছ্যাঁচোড় তাড়াইতে তাহার মতন বড় একটা কেউ সে গ্রামে ছিল না। একদিন কতকগুলা নিষ্কর্ম্মা গাঁজাখোর আড্ডায় বসিয়া তর্ক করিতেছিল—"কেউ ভূত দেখিয়াছ কি না।" কেহ বলিল—"হাঁ দেখিয়াছি।" কেহ বলিল—"ভূত দেখা যায় না, কেবল একটা হাওয়া মাত্র।" একজন বলিল ভূত নিশ্চয়ই আছে—কারণ, তার বাড়ীওয়ালার জামাইয়ের পিশতুতো ভাই নাকি স্বচক্ষে ভূত দেখিয়াছে! আবার কেহ বলিল—"ভূত বড় ভয়ানক জিনিস, ঘাড়ের রক্ত চুষিয়া খায়।" জেলেদের গণেশচন্দ্র রাস্তায় দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিয়া উঁকি মারিয়া একবার তার্কিক মহাশয়দের দেখিয়া লইল এবং মনে মনে বলিল—"ভূত না দেখিলে ইহাদিগের ঘাড়ের ভূত ছাড়িবে না।"

তখন শুক্ল পক্ষ। বন্দীপুরের মাঠে ঘাটে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, লোকজন চলাফেরা করিলে বেশ স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় দিবসে রাত্রি বারটার পর বন্দীপুরে এক ভীষণ কাণ্ড ঘটিল। গ্রামের লোকজন শুনিতে পাইল কে একজন ভয়ানক সুরে রাস্তার উপর দিয়া কাঁদিয়া চলিয়া যাইতেছে। এম্‌নি করিয়া আরও দুই দিবস কাটিল; চাষামহলে বাবুমহলে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, এই কান্নার কথা চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল।

একদিন তাল ঠুকিয়া কয়েকজন এই ব্যাপার দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। যথা সময়ে তাহারা সেই স্বর শুনিতে পাইয়া খুব সাবধানে দল বাঁধিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল। ক্রমে স্বর যখন আরও নিকটবর্ত্তী হইল, জ্যোৎস্নার আলোকে তাহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইল প্রায় চৌদ্দ হাত লম্বা একটা ভয়ানক মূর্ত্তি কঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিতেছে। তখন সকলেরই আত্মারাম প্রায় খাঁচাছাড়া হইয়া গিয়াছিল। মূর্ত্তিটা তাদের সম্মুখ দিয়া বিকট কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া অনেক দূরে চলিয়া গেল। তখন সকলেরই ধড়ে প্রাণ আসিল, তাহারা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"এ নিশ্চয়ই ভূত; এক রকম উড়ো ভূত আছে—এ সেই জাতের;"—শুনিয়া সকলেই সকলেই হাঁ হাঁ করিয়া সায় দিয়া বলিল "এক রকম কান্না ভূত আছে—তারা কেঁদে কেঁদেই বেড়ায়।" অবশেষে "দুর্গা দুর্গা—রাম রাম" বলিয়া যে যাহার বাড়ী ফিরিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পরদিন সকাল হইতে না হইতেই কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেল। একজন আড্ডাধারী বলিয়া উঠিল—"ভাই ভূততো তা'হ'লে আছে।" অপর একজন বলিল—"নিশ্চয় আছে, খুব আছে; অমন চৌদ্দ হাত ভূত দেখলুম, আর নেই বলি কেমন ক'রে বল?" যাহারা "ভূত নাই" বলিয়াছিল, তাহারা "চৌদ্দ হাত বাবাজি"র উদ্দেশে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিল। বৃদ্ধ পালোয়ান লক্ষ্মণ সর্দ্দার সেখানে বসিয়াছিল, সে সেই কথা শুনিয়া বলিল— "বটে, তোমরা ভূত দেখিয়াছ? আমি একবার দেখিতাম তবে এক আঁচড়েই বুঝিয়া লইতাম সে কোন্ জাতীয় ভূত।" সর্দ্দারের কথা শুনিয়া একজন বলিল—"তামাসা নয় সর্দ্দার খুড়ো, সে কান্না শুন্‌লে তোমারও বুক কেঁপে উঠতো।"

সর্দ্দার খুড়ো আড্ডাঘরের তক্তপোষের উপর প্রচণ্ড এক চড় মারিয়া বলিয়া উঠিল—"আরে থো করনা! ও ব্যবসা আমরা বহুদিন ক'রেছি। ভূত থেকে পাক্‌তে পাক্‌তে ক্রমে আজ সর্দ্দার হ'য়েছি। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে একজন আজ রাত্রে আমার সঙ্গে চল, সে কত বড় চৌদ্দ হাত ভূত—একবার দেখে নেব"।

সেইরূপই ব্যবস্থা হইল। চৌদ্দ হাত ভূত যে রাস্তা দিয়া কাঁদিয়া যাইত, সেই রাস্তার উপর দুইটি পিটুলী গাছ ছিল; সর্দ্দার রাত্রি বারটার কিছু পূর্ব্বে গ্রামের এক পালোয়ানকে সঙ্গে লইয়া তাহারই নীচে উপস্থিত হইল এবং তাহার সঙ্গীকে বলিল—"শ্যামসুন্দর! তুমি একটায় ওঠ, আমি একটায় উঠি; দেখি, আজ ভূতের পো কত কাঁদতে পারেন।"

সর্দ্দার ও শ্যামসুন্দর গাছে উঠিয়া বসিল এবং মজা দেখিবার জন্য ঝোপে-ঝাপে আরও কয়েকজন লুকাইয়া রহিল। রাত দুপুরের সময় হঠাৎ সেই কান্নার সুর উঠিল, সকলেরই দৃষ্টি অমনি সেই দিকে ছুটিল। বাস্তবিকই তখন সাদা ধপ্‌ধপে একটি চৌদ্দ হাত ভূত যেন ডানা মেলিয়া উড়িয়া আসিতেছিল। সেই চেহারা আর সেই ভয়ানক ক্রন্দনের সুর শুনিয়া সর্দ্দার খুড়োরও প্রাণটা একবার ছাঁত্ করিয়া উঠিল। আবার সেই মুহূর্ত্তেই সাহসে বুক বাঁধিয়া ভূত ধরিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে ভূত শ্যামসুন্দরের গাছের নীচে আসিয়া হাজির।

শ্যামসুন্দর ভাবিয়াছিল ভূত আসিতেই সে লাফাইয়া পড়িবে কিন্তু ভূতের চেহারা দেখিয়াতাহার সাহসে কুলাইল না। সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তারপর সর্দ্দার খুড়োর পালা আসিল। যেমন ভূতের আগমন অমনি তাহার উপর সর্দ্দার খুড়ার পতন; সঙ্গে সঙ্গে ভূতের কান্না একেবারে দেশছাড়িয়াপলায়ন করিল। তখন শ্যামসুন্দরও একটু সাহসে ভর করিয়া নীচে আসিয়া ভূতকে পাকড়াও করিল। সর্দ্দার খুড়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"তুই কোন্ জাতের ভূত?"

ভূত বলিল "আঁমি কাঁন্না ভূঁত; হুঁ—হুঁ—ধঁরে নোঁবোঁ।"

"এই যে ধরাচ্ছি" বলিয়া সর্দ্দার ভূতকে একটি বিরাশী সিক্কা ওজনের চপেটাঘাত করিল; শ্যামসুন্দরও দেখাদেখি কাঁপিতে কাঁপিতে একটি ঘুঁসি ঝাড়িল। তখন ভূতটা

ভাঙ্গিয়া পড়িল—অর্থাৎ কাপড়ে ঢাকা একখানা মই মাটিতে পড়িয়া গেল আর তাহার মধ্য হইতে জেলেদের গণেশচন্দ্র বাহির হইয়া পড়িল। সর্দ্দার তাহার কাণ ধরিয়া বলিল—"কি রে গণেশ? তুই এসেছিস্ আমার ওপর চালাকি ক'রতে? জানিস্ আমি এখনও গ্রাম ছেড়ে যাইনি? বড্ড বেঁচে গেছিস্! আর একটু হ'লেই এই কাটারি ছুঁড়ে মাথাটা দোফাঁক ক'রে দিতুম।" ব্যাপার দেখিয়া ঝোপের মধ্য হইতে হৈ হৈ করিয়া কয়েকজন লোক গনেশচন্দ্রকে প্রহার করিতে উঠিল। সর্দ্দার সকলকে নিষেধ করিয়া বলিল—"খবরদার ভূতের গায়ে কেউ হাত তুলো না; এ আমাদের চেনা ভূত—ঘরের ভূত। এগিয়ে আয়, ভূতের মুখখানা দেখে খুসী হ'বি"।

সর্দ্দারের কথায় সকলেই ভূতের মুখ দেখিতে আসিল। দেখিয়াই সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"ওরে, এ যে পদ্মজেলের ছেলে গণেশচন্দ্র রে!" সর্দ্দারও বলিয়া উঠিল—"হাঁ—হাঁ, এ তোদের ভূত। যাক্ দেখ্‌দেখি, কাপড় ঢাকা ও জিনিষটা প'ড়ে গেল কি?"

সকলে কাপড়ের প্যাঁচ খুলিয়া দেখিল প্রকাণ্ড একটা মই। হাসিতে হাসিতে সকলের নাড়ী ছিঁড়িবার উপক্রম হইল। সর্দ্দারও একটু হাসিয়া বলিল—"কেমন, তোরা এই ভূত দেখেছিলি তো? বলিহারী তোদের বুদ্ধিকে আর তোদের সাহসকে।"

জেলেদের গণেশচন্দ্র মাথা চুলকাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"সর্দ্দার খুড়ো! দু' একটা কিল চড় যা মেরেছ সেগুলো আমার ভাল লাগেনি; কিন্তু এই লোক ক'টার ভূতের ভয় দূর হ'ল দেখে বড়ই খুসী হ'লুম।" সর্দ্দার আবার বলিল—"এখনও যদি তোরা ভূতের ভয় রাখিস্ তবে নূতন করে জেনে রাখ্, এও এক রকম ভূত বটে—দুনিয়ায় "মইভূত" ব'লে এক জাতীয় ভূত আছে।"

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর—

১। গণ্ডার ২। বাতাস ৩। পাখা

পুরাতন লেখা।

[যাঁহার ছবি এখানে দেওয়া হইল "সন্দেশে"র পাঠক পাঠিকাদের কাছে তাঁহার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। বাংলাদেশের শিশুদের কাছে তিনি সুপরিচিত। জীবনে তিনি অনেক কাজই করিয়া গিয়াছেন, কারণ তিনি একাধারে সাধক শিল্পী কবি ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। নানা সাধনার মধ্যে তিনি নিজে যে আনন্দ পাইতেন তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহারে কথায় বার্ত্তায় লেখায় বক্তৃতায় তিনি সেই আনন্দ অজস্র বিতরণ করিতেন। বিশেষত শিশুদের কাছে তাঁহার আনন্দের ভাণ্ডার একেবারে অফুরন্ত ছিল। সেই জন্যই শেষ জীবনে যখন তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, যখন আর কাজ করিবার শক্তি রহিল না, তখনও তিনি শিশুদের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তখন তিনি এই "সন্দেশ" বাহির করিয়া নানারকম লেখা ও ছবি দিয়া তাহাদের জন্য নূতন আনন্দের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। বহু দিন হইতেই "সখা" "সাথী" "মুকুল" প্রভৃতি কাগজে তিনি ছেলেদের জন্য লিখিয়া আসিতেছেন—সে সকল লেখা এতদিনে প্রায় লোপ পাইতে চলিল। আমরা সেই সকল পুরাতন লেখা সংগ্রহ করিয়া মাঝে মাঝে সন্দেশে ছাপিব, স্থির করিয়াছি। সে সময়ে যাঁহারা শিশু ছিলেন তাঁহারা এই সকল লেখা পড়িয়া কত আনন্দ পাইতেন সে কথা তাঁহাদের মুখেই আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। ১১ বৎসর আগে তিনি পুরী গিয়াছিলেন সেই সময়কার লেখা হইতে আমরা একটু একটু তুলিয়া দিলাম।]—

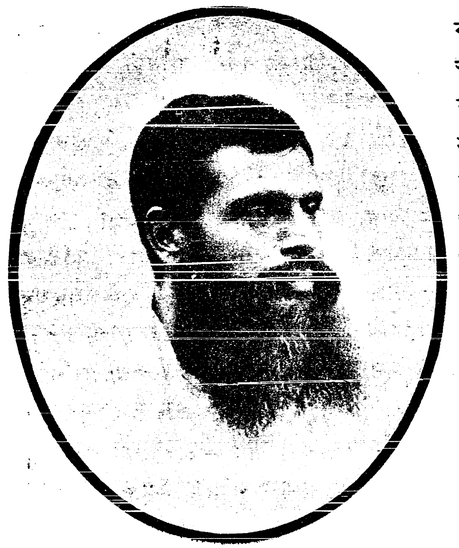

৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।
জন্ম—২৮শে বৈশাখ ১২৭০।
মৃত্যু—৪ঠা পৌষ ১৩২২।

হাঁটিয়া শ্রীক্ষেত্র যাইবার সেই পুরাণো-পথ রেল হইতে বার বার দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিবার যে উহাতে এমন বিশেষ কিছু আছে, তাহা নহে। আমাদের দেশী বিশ্রী-গোছের পাকা রাস্তা যেমন হইয়া থাকে, এও সেইরূপ। তোমরা দেখিলে উহাকে কিছুমাত্র ভাল বলিবে না। তথাপি আমি উহাকে বার বার দেখিয়াও ক্লান্ত হই নাই। আমার যে বড়ই সুন্দর লাগিয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু ঐ পথটাকে দেখিয়া আমার ছেলেবেলার অনেক কথা মনে হইতেছিল। ঐ পথ দিয়া কত লোক শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছেন। ছেলে বেলা তাঁহাদের অনেকের মুখে এই পথের বর্ণনা শুনিয়াছি। মাথা ফাটান রৌদ্রের মধ্যে তপ্ত কাঁকরের উপর দিয়া পথ চলা। পা ফুলিয়া যায়, তাহার তলা ফাটিয়া যায়, পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তথাপি উৎসাহের ত্রুটি নাই। পুরুষদের চাইতে স্ত্রীলোকদেরই উৎসাহ বেশী। একটি বৃদ্ধা গ্রামের কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রসাদ, জগন্নাথের ছবি, সমুদ্রের ফেণা, হোগলার ঠোঙ্গা, হোগলার পাখা প্রভৃতি অনেক আশ্চর্য্য জিনিস লইয়া দেশে ফিরিলে পর বহুদিন পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম করিতে দিইনাই। জগন্নাথের চেহারা কেন ওরূপ হইল? সুভদ্রা ঠাকরুণ ভাইদের মাঝখানে এমন জড়সড় হইয়া আছেন কেন? কালাপাহাড় কি রকম ভয়ানক লোক ছিল? ইত্যাদি কথা শুনিতে শুনিতে আমাদের মুখের হাঁ আর চোখ ক্রমে গোলাকার হইয়া উঠিত! আর শেষকালে সেই বৃদ্ধা যখন '——' ঠাকুর ফুলা পায় খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কিরূপ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার অভিনয় করিয়া দেখাইতেন, তখন ব্যাপার যাহা হইত, সে আর কি বলিব!

সেই '——' ঠাকুর এই পথে শ্রীক্ষেত্র গিয়াছিলেন। এই পথে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু তথাপি কিরূপ করিয়া তিনি এই পথে গিয়াছিলেন তাহা যেন স্পষ্ট মনে হইতেছিল।

আর মনে হইতেছিল, সেই বুড়ো উড়ে পাণ্ডাটির কথা, শিশুকালে যাঁহার সহাস্য মুখখানি দেখিলে আমরা কতই আনন্দিত হইতাম। পাণ্ডার নিজের সম্বন্ধে এমন বিশেষ সংবাদ আমরা কিছু জানিতাম না যাহাতে তাঁহাকে দেখিলে আমাদের ভারি সুখ হইবার কথা। কিন্তু তাঁহার একটি আশ্চর্য্য লম্বা থলে ছিল, আর সেই থলের ভিতরে নানা রকমের সুমিষ্ট 'প্রসাদ' থাকিত! সেই থলে অথবা তাহার ভিতরকার প্রসাদের খাতিরেই শিশুকাল হইতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার কথা মনে করিয়া রাখিয়াছি। সেই

প্রসাদের থলে শুদ্ধ সেই বুড়ো পাণ্ডা নিশ্চয় এই পথে গিয়াছিলেন। তখন তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন কিনা, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ক্লেশ তাঁহার খুবই হইয়াছিল, একথা বলিতে পারি।

পুরীর সমুদ্র তীরে নরিয়ারা।

আমাদের বাড়ী হইতে খানিক পশ্চিমে গেলেই নরিয়া দিগের গ্রাম। তাহারা সারি সারি ঘর বাঁধিয়া বাস করে, পাশাপাশি দু খানি ঘরের মাঝখানে কিছু মাত্র ফাঁক রাখে না। দরজা জানালার ধার অতি অল্পই ধারিয়া থাকে। হাওয়াত ঘরের ভিতর খেলেই না, জিজ্ঞাসা করিলে একজন বলিল "অতটুকু ঘরে আবার কত হাওয়া খেলিবে?" ঘরে, উঠানে, বাগানে, আঁস্তাকুড়ে ঘণ্ট পাকাইয়া তাহার ভিতরে উহারা বাস করে।

ইহারা এক রকম হিন্দু। ইহাদের দেব দেবী আছে, পুরুত আছে, মন্দির আছে। মন্দির বলিতে একটা কিছু কাণ্ড কারখানা মনে করিয়া বসিও না। সকলের চাইতে বড় মন্দিরটি ছাড়া আর কোনটির ভিতরে মানুষ ঢুকিবার জায়গা নাই। অধিকাংশ মন্দিরই বাক্স প্যাঁটরার মতন ছোট ছোট চালা ঘর মাত্র; উহার ভিতরে লাল, কাল, হল্‌দে রঙ্গের ছোট ছোট দেবতারা বড় বড় চোখ মেলিয়া যেন আশ্চর্য্য হইয়া বসিয়া

থাকে। একটি দেবতার আবার ঘর পছন্দ হয় না, সে হাঁড়ির ভিতরে থাকিতে ভালবাসে। মাঝে মাঝে পুরুত আসিয়া ইহাদের পূজা করিয়া যায়। নরিয়ারা ইহাদিগকে খুব মান্য করে, আর ইহাদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা বলে। দুঃখের বিষয়, আমি দেবতাগুলির নাম ভুলিয়া গিয়াছি। এক জন আছে, তাহাকে হাতী ঘোড়া দিয়া পূজা করিতে হয়। উহার মন্দিরের পাশে বিস্তর হাতী ঘোড়া পড়িয়া আছে, ছোট ছোট মাটীর জিনিষ। এক সময়ে ঠিক এই রকম হাতী ঘোড়া আমাদের কুমারেরা গড়িত। ছেলে বেলায় আমরা তাহা দিয়া খেলা করিয়াছি। কিন্তু আজ কালকার খোকাদের হয়ত তাহা পছন্দই হইবে না। নরিয়াদের দেবতা ঐ হাতী ঘোড়া পাইয়াই যারপরনাই খুসী হয়। জানোয়ারগুলির অধিকাংশেরই হাত পা ভাঙ্গা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাঙ্গা হাতী ঘোড়া কেন দিয়াছ?" নরিয়া বলিল, "আমরা কেন ভাঙ্গা

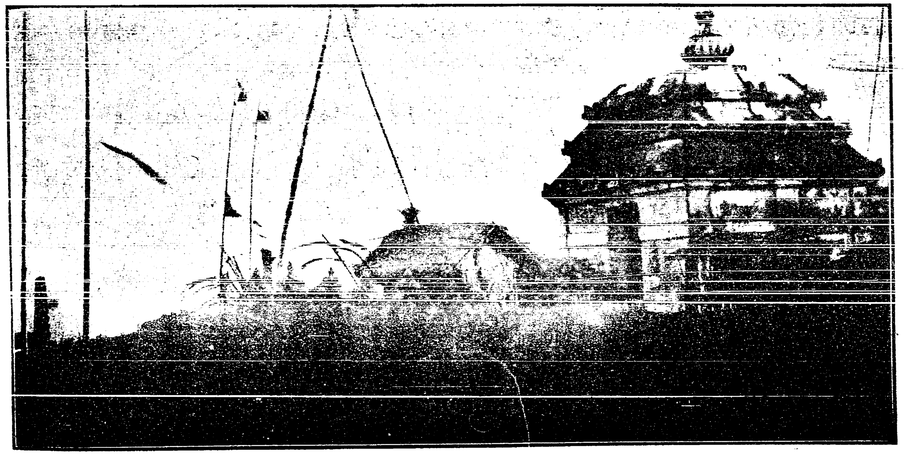

নরিয়াদের মন্দির।

দিব? ঠাকুর উহাতে চড়িয়া চড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিয়াছে।" তখন শুনিলাম, যে রোজ নাকি রাত দুপুরের সময় ঐ দেবতা বেড়াইতে বাহির হয়। এ সকল হাতী ঘোড়া তখন আর ওরূপ ছোট ছোট থাকে না, উহারা সত্য সত্যই বড় বড় হাতী ঘোড়া হইয়া যায়, আর ঠাকুর তাহাদের পিঠে চড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া আইসে।

এ কথা শুনিয়া এক জন বলিল, "আমি ত এই খানেই থাকি; কৈ? আমি ত একদিনও তোমাদের ঠাকুরকে ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইতে দেখি নাই!" নরিয়া বলিল, "দেখিলে কি না তুমি আবার বলিতে আসিতে।" অর্থাৎ উহাদের বিশ্বাস, যে সে সময়ে কেহ ঠাকুরের সামনে পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

❦ ❦ ❦ ❦

রামা বাজারে মাছ কিনিয়াছে, সকলেই তাহার দাম জিজ্ঞাসা করে, তাহাতে রামার রাগ হইল। তখন রামা মাছ মাটিতে রাখিয়া রাস্তায় পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল, আর হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল। বাজারের সমস্ত লোক কাজকর্ম্ম ফেলিয়া রামার কাছে আসিয়া উপস্থিত। সকলেই বলে, "কি হইয়াছে?" "কি হইয়াছে?" রামা যখন বুঝিল যে আর বেশীঅবশিষ্ট নাই, প্রায় সকলেই আসিয়াছে, তখন সে আস্তে আস্তে উঠিয়া গা ঝাড়িল, আর মাছটি উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল, "ওগো, আর কিছু নয়, আমার এই মাছটা সাড়ে সাত আনা হয়েছে, তোমরা সবাই শুনে রাখ! সাড়ে সাত আনা!! সাড়ে সাত আন!!!"

নূতন ধাঁধা।

১। এক খোঁটে দুই ভাই একই ঠাঁই বন্ধ
বিশ্রাম নাহি জানে এ কেমন ধন্ধ!
বড় ভাই তড়বড় চট্‌পট্ চলে সে
ছোট ভাই ঢিমা তালে চলে অতি আলসে।
কথা চলে রাত দিন অদ্ভুত কারবার,
ফিরে ফিরে দেখা হয় ছেড়ে যায় বার বার—

১। কভু থাকি ঘাড়ে পিঠে কভু থাকি পাতা
সকালেতে কত লোকে খায় মোর মাথা।
মুড়োকাটা ধড় পাবে বাজারের দরে
গণ্ডা পুরাতে পার ল্যাজা মুড়া ধ'রে॥

অসুরের দেশ।

শ্মশানের মত দেশে লোক নাই জন নাই আছে কেবল প্রাচীন সহরের কঙ্কাল আর রাত্রের অন্ধকারে সিংহের হুঙ্কার।

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চতুর্থ বর্ষ | মাঘ, ১৩২৩ | দশম সংখ্যা

কাজের লোক।

১ম। বাঃ—আমার নাম "বাঃ"!
ব'সে থাকি তোফা তুলে পায়ের উপর পা!
লেখাপড়ার ধার ধারিনে, বছর ভরে ছুটী,
হেসে খেলে আরাম ক'রে দুশো মজা লুটি।
কারে কবে কেয়ার করি, কিসের করি ডর?
কাজের নামে কম্প দিয়ে গায়ে আসে জ্বর।
গাধার মতন খাটিস্ তোরা মুখটি ক'রে চুণ—
আহাম্মুকি কাণ্ড দেখে হেসেই আমি খুন।
সকলে। আস্ত একটি গাধা তুমি স্পষ্ট গেল দেখা,
হাস্‌ছ যত, কান্না তত কপালেতে লেখা।

২য়। 'যদি' ব'লে ডাকে আমায় নামটি আমার 'যদি'—
আশায় আশায় ব'সে থাকি হেলান দিয়ে গদি।
সব কাজেতে থাক্‌ত যদি খেলার মত মজা—
লেখা পড়া হ'ত যদি জলের মত সোজা—

COLOURED DOCUMENT.

স্যাণ্ডো সমান ষণ্ডা হ'তাম যদি গায়ের জোরে,
প্রশংসাতে আকাশ পাতাল যদি যেত ভ'রে—
উঠে প'ড়ে লেগে যেতাম বাজে তর্ক ফেলে।
কর্‌তে পারি সবি—যদি সহজ উপায় মেলে।

সকলে। হাতের কাছে সুযোগ, তবু 'যদি'র আশায় বসে—
নিজের মাথা খাচ্ছ বাপু নিজের বুদ্ধি দোষে।

৩য়। আমার নাম 'বটে'! আমি সদাই আছি চ'টে—
কট্‌মটিয়ে তাকাই যখন, সবাই পালায় ছুটে!
চস্‌মা প'রে বিচার ক'রে, চিরে দেখাই চুল—
উঠ্‌তে বস্‌তে ক'চ্ছে সবাই হাজার গণ্ডা ভুল।
আমার চোখে ধুলো দেবে সাধ্যি আছে কার?
ধমক শুনে ভূতের বাবা হ'চ্ছে পগার পার!
হাস্‌ছ? বটে! ভাবছ বুঝি মস্ত তুমি লোক,
একটি আমার ভেংচি খেলে উল্টে যাবে চোখ।

সকলে। দিচ্ছ গালি লোকের তাতে কিবা এল গেল?
আকাশেতে থুতু ছুঁড়ে—নিজের গায়েই ফেল।

৪র্থ। আমার নাম 'কিন্তু,' আমায় 'কিন্তু' ব'লে ডাকে,
সকল কাজে একটা কিছু গলদ লেগে থাকে।
দশটা কাজে লাগি কিন্তু আটটা করি মাটি,
ষোল আনা কথায় কিন্তু সিকি মাত্র খাঁটি।
লম্ফ ঝম্ফ বহুৎ কিন্তু কাজের নাইকো ছিরি—
ফোঁস্ ক'রে যাই তেড়ে—আবার ল্যাজ গুটিয়ে ফিরি।
পাঁচটা জিনিষ গড়্‌তে গেলে, দশটা ভেঙে চুর—
বল্ দেখি ভাই কেমন আমি সাবাস বাহাদুর!

সকলে। উচিত তোমায় বেঁধে রাখা নাকে দিয়ে দড়ি,
বেগারখাটা পণ্ডকাজের মূল্য কাণাকড়ি।

৫ম। আমার নাম 'তবু,' তোমরা কেউ কি আমায় চেনো?
দেখ্‌তে ছোট তবু আমার সাহস আছে জেনো।
এতটুকু মানুষ তবু দ্বিধা নাইকো মনে,
যে কাজেতেই লাগি আমি খাটি প্রাণপণে।
এম্নি আমার জেদ্, যখন অঙ্ক নিয়ে বসি,
একুশ বারে না হয় যদি, বাইশ বারে কষি।
হাজার আসুক বাধা তবু উৎসাহ না কমে,
হাজার লোকে চোখ রাঙালে তবু না যাই দ'মে।

সকলে। নিষ্কর্ম্মারা গেল কোথা, পালাল কোন দেশে?
কাজের মানুষ কারে বলে দেখুক এখন এসে।
হেসে খেলে, সয়ে বসে কত সময় যায়,
সময়টা যে কাজে লাগায়, চালাক বলে তায়।

নিরেট গুরুর কাহিনী।

বামুনের ভবিষ্যৎবাণী।

মঠে ফিরিয়া আসিয়া গুরুর অত্যন্ত মন খারাপ হইয়া গেল। তাঁহার পাওনা ঘোড়াটীর অনেক দোষ, তাহা হইলেও সেটাকে যে কিনিতে হয় নাই, ইহাতেই তিনি খুব খুসী ছিলেন। কিন্তু যখন এই ঘোড়ার জন্য তাঁহাকে কেবলই টাকা খরচ করিতে হইতে লাগিল আর নানারকম বিপদ ঘটিতে লাগিল, তখন তাঁহার মনের দুঃখ উথলিয়া উঠিল। তিনি সারাদিনরাত ধরিয়া ঐ কথাই ভাবিতে লাগিলেন। শেষে একদিন নিজের সব শিষ্যদের ডাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বৎসগণ, আমি দেখছি যে পৃথিবীর সব সুখই মিথ্যা। দুঃখ ছাড়া সুখ, মন্দ ছাড়া ভাল এখানে পাওয়া যায় না। যখন বিনা পয়সায় একটা ঘোড়া পেয়েছিলাম তখন আমাদের কত আনন্দই হয়েছিল! কিন্তু হায় হায়! দেখলে ত তার পরদিন থেকেই আমাদের কত দুর্গতিই না হল। এক ফোঁটা মধুর জন্য আমাদের কতখানি ঝালই খেতে হল। পৃথিবীর গতিকই এই। এককনা চাল যদি চাও তা হলে

ও সেটাকে তুঁষের ভেতর থেকে বের করতে হবে, আর যে কোনও ফলই খাওনা, হয় তার ছাল ছাড়াতে হবে নয় তার একটা আঁঠী থাকবে। এ সবই সত্যি বটে, তা হলেও আমি একদিনে এত ভোগ ভুগেছি যে মানুষে তা সইতে পারে না। ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানটা মোটেই আমার পক্ষে ঠিক নয়। আমার কপালে ওটা লেখা নেই, কাজেই বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাহস করে কাজ করতে নেই। তা হলে ঘোড়াটা যার কাছে পাওয়া গেছে তাকেই ফিরিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্।" গুরুর কথা শেষ হইতে না হইতে পাঁচ শিষ্য একেবারে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, "আরে মশায়, অপনি বলেন কি? এও কি একটা কথা হল? ঘোড়াটাত আর আপনার কেনা ঘোড়া নয়, আর ওটাকে আমরা খুঁজে পেতেও আনিনি। আমাদের ঘোড়ার দরকার ছিল দেখে ভগবান ওটাকে পাঠিয়ে দিলেন যে। এখন ভগবানের দেওয়া ঘোড়া ফিরিয়ে দিলে ভয়ানক পাপ হবে। তা ছাড়া এখন আর ভয় কি? সেই দৈবজ্ঞ ত ওর সব দোষ দূর করে দিয়েছে?"

শিষ্যদের এত লম্বা বক্তৃতা শুনিয়া গুরুর একটু সাহস হইল, তিনি তখন বলিলেন, "আচ্ছা তোমরা যা বলছ তাই করা যাক্। কিন্তু একবার ঘোড়াটাকে রাত্রে ছেড়ে দিয়ে যে রকম ভুগেছি, আর ওকে ছাড়া হচ্ছে না। এবার থেকে ওটাকে রাত্রে বেঁধে রাখতে হবে, কিন্তু রাখ্‌ব কোথায় সেইত হচ্ছে ভাবনা।" হাঁদা বলিল, "তার জন্য আবার ভাবনা কি? আমি এখুনি গিয়ে গাছের ডাল কেটে আনছি, দেখবে এখন কেমন তোফা আস্তাবল বানিয়ে দেব।"

এই বলিয়াই হাঁদা বাহির হইয়া পড়িল। কিছুদূরে গিয়া একটা প্রকাণ্ড বটগাছ দেখিতে পাইল। সে তৎক্ষণাৎ সেই গাছে চড়িয়া বসিল এবং যে ডালটাতে বসিয়া ছিল সেইটারই গোড়া দা দিয়া কাটিতে আরম্ভ করিল। একজন বামুন তখন সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, মাথার উপর ধুপধাপ্ শব্দ শুনিয়া উপরে চাহিয়া হাঁদার কীর্ত্তি দেখিতে পাইল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "ওহে, করছ কি? নিজেও যে ডালের সঙ্গে গড়িয়ে পড়্‌বে"। হাঁদা অত্যন্ত চটিয়া গিয়া বলিল, "কে হে তুমি? যত সব অমঙ্গলের কথা বলতে এলে?" বলিয়া একখানা ছুরী তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। ব্রাহ্মণ ভাবিল, "কোথাকার গাধা? মরুক্ গে আমি কেন মার খাই"। সে তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িল।

এ দিকে হাঁদা সেই ডালটাতে আর কয়েক কোপ বসাইতেই, ডালটা ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেও ডালপালা সবশুদ্ধ দড়াম্ করিয়া নীচে গড়াইয়া পড়িল। প্রথমে সে খুব

হাঁউ মাঁউ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, তারপর একটু ঠাণ্ডা হইয়া ভাবিল, "নিশ্চয়ই সেই বামুন একজন দৈবজ্ঞ, তিনি যা বল্লেন ঠিক্ তাই ত হল!" এই ভাবিয়া সে উঠিয়া

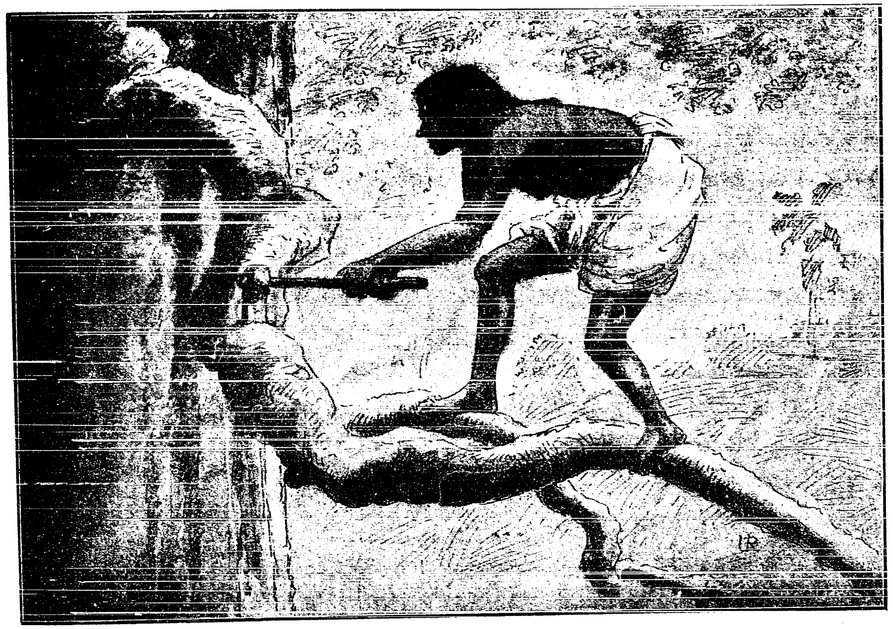

পড়িয়া সেই ব্রাহ্মণের পিছনে ছুটিয়া চলিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ভাবিল বোকাটা না জানি আবার কি করে। হাঁদা তাহার কাছে আসিয়া খুব ভক্তিভরে তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মশায়, আপনি দেখছি একজন মস্ত পণ্ডিত, আপনি যা বল্লেন ঠিক তাই হল। তা আপনি আমায় আর একটা কথা দয়া করে বলে দিন্। আমি গুরু নিরেটের একজন শিষ্য, আমি তাঁকে বড্ড ভালবাসি। তিনি বুড় হয়েছেন, কখন মারা পড়েন, এই আমাদের ভয়। এখন আমায় একটু বলে দিন্ যে তিনি কখন মরবেন, আর মরবার আগে কি কি লক্ষণই বা দেখা যাবে"।

ব্রাহ্মণ হাঁদার হাত ছাড়াইয়া পালাইবার জন্য অনেক ওজর আপত্তি করিতে লাগিল, কিন্তু ছাড়িয়া দিবার পাত্রই হাঁদা নয়। অবশেষে ব্রাহ্মণ বাধ্য হইয়া বলিল, "আচ্ছা বলছি, 'চরণম্ শীতম্ জীবন নাশম্'"। হাঁদা হাত জোড় করিয়া বলিল, "ঠাকুর মশায়, এর মানেটা বলে দিন্"। ব্রাহ্মণ বলিল, "অর্থাৎ কিনা, যে দিনে তোমাদের গুরুর পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, সেই দিনই তিনি মারা যাবেন", এই বলিয়াই সে দৌড় দিল।

হাঁদা তখন খুব খুসী হইয়া ডালটাকে টানিতে টানিতে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, এবং সকলকে সব কথা খুলিয়া বলিল। গুরু অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "সে বামুন যে একজন মস্ত পণ্ডিত তাতে কোনই ভুল নেই, কারণ তিনি তোমার সম্বন্ধে যা বলে ছলেন, তোমারও ত ঠিক তাই হল। আমার সম্বন্ধেও যা বলেছেন, তা নিশ্চয়ই ঘট্‌বে। তা এখন থেকে খুব সাবধান হয়ে থাকতে হবে, পা টা আর ধোওয়া হবেনা, তারপর ভগবানের যা ইচ্ছে।"

রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ।

(পদ্মপুরাণ)

(২)

গতবারের সন্দেশে মহাদেব ও হনুমান আখ্যানে বলা হইয়াছে—হনুমান সঞ্জীবনী ঔষধ আনিয়া সকলকে জীবিত করিল।

শত্রুঘ্ন, পুষ্কল প্রভৃতি বীরগণ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, সঞ্জীবনী ঔষধ ছোঁয়াইবা মাত্র মার মার শব্দে সকলে জাগিয়া উঠিলেন। পুনরায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এবারও বীরমণি শত্রুঘ্নের সহিত যুদ্ধে হারিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ভক্তের দুর্গতি দেখিয়া মহাদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া শত্রুঘ্নের সহিত ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। সে আক্রমনের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুঘ্ন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া হনুমানের উপদেশ মত রামচন্দ্রকে ডাকিতে লাগিলেন—"হে প্রভু! মহাদেব আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমার শক্তি লোপ পাইয়াছে—আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া আমাকে রক্ষা

করুন।" শত্রুঘ্ন মনে মনে স্মরণ করিবা মাত্র রাম যজ্ঞদীক্ষিত মূর্ত্তিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দেখা দিলেন।

স্বয়ং রামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া মহাদেব সসম্মানে অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

ভক্তকে রক্ষা করাই দেবগণের কর্ত্তব্য কার্য্য, সুতরাং মহাদেব বীরমণিকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া রাম কেন তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন? তিনি বরং সন্তুষ্ট হইয়াই বলিলেন—"বীরমণিকে রক্ষা করিতে গিয়া আপনি যে আমার সহিত শত্রুতা করিয়াছেন তাহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। যে আপনার ভক্ত সে আমারও ভক্ত"—এই বলিয়া রাম হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

মহাদেবও তখন বীরমণিকে সুস্থ করিয়া বলিলেন—"তুমি রামের যজ্ঞাশ্ব ফিরাইয়া দিয়া শত্রুঘ্নের শরণ লও।"

বিজয়ী যজ্ঞাশ্ব মুক্তি পাইয়া পুনরায় দিগ্বিজয়ে চলিল। বীরমণিও সৈন্য-সামন্ত লইয়া শত্রুঘ্নের সহিত অশ্ব রক্ষার্থ চলিলেন।

অনেক রাজার রাজ্য অতিক্রম করিয়া অশ্ব হেমকুট পর্ব্বতের নিকটে একটী বাগানের ভিতর গিয়া উপস্থিত। বাগানের মধ্য দিয়া খানিক দূর অগ্রসর হইলে পর হঠাৎ অশ্বের গতি রুদ্ধ হইল। তাহার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, শত চেষ্টা করিয়াও আর অগ্রসর হইতে পারিল না। পুষ্কল আসিয়া কত টানাটানি করিলেন, হনুমান লাঙ্গুল দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কত আকর্ষণ করিল, কিন্তু কিছুতেই অশ্ব নড়িল না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া শত্রুঘ্ন তখন মন্ত্রী সুমতিকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুমতির পরামর্শে তখন সকলে মিলিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর শৌনক মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া শৌনক বলিলেন—"কাবেরী নদীর তীরে একটি বনের মধ্যে বাড়ব নামক এক ব্যক্তি অতি কঠোর তপস্যা করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া মেরু পর্ব্বতে বাস করেন। ক্রমে তিনি অভিমানে মত্ত হইয়া তথাকার মুনিদিগের সহিত বিবাদ আরম্ভ করায় মুনিরাও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া "তুই রাক্ষস হ" এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন। তখন তিনি দয়ালু মুনিদিগের পায়ে ধরিয়া অনেক স্তুতি মিনতি করিলে পর তাঁহারা বলিলেন—"যখন রামের যজ্ঞাশ্বকে তুমি স্তম্ভিত করিবে সেই সময়ে রামের গুণ-কীর্ত্তন শুনিলে পর তোমার শাপ দূর হইবে।" সেই বাড়ব রাক্ষস হইয়া রামের অশ্ব অচল করিয়াছেন—এখন তাঁহার নিকট রামের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া আমাকে মুক্তি কর।"

মুনিবর শৌনকের উপদেশে শত্রুঘ্ন সকলকে লইয়া অশ্বের নিকট ফিরিয়া গেলেন। হনূমান শ্রীরামের গুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিল—"হে বাড়ব! রামের গুণ-কীর্ত্তন শ্রবণের পুণ্যফলে আপনি রাক্ষসদেহ হইতে মুক্ত হউন।" এই কথা বলিবা মাত্র বাড়ব রাক্ষসদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন—যজ্ঞাশ্বও পুনরায় সুস্থ সবল হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমাগত সাত মাস কাল যজ্ঞীয় অশ্ব কত শত শত রাজার দেশ ভ্রমণ করিল! রামের বলবিক্রম স্মরণ করিয়া কেহই তাহাকে ধরিতে সাহস পাইল না। ক্রমে সেই অশ্ব কুণ্ডলনগরে সুরথ রাজার রাজ্যে গিয়া উপস্থিত। সুরথ রাজা মহা পরাক্রমশালী যোদ্ধা, রামের পরম ভক্ত। তিনি মহা আনন্দিত হইয়া হুকুম দিলেন—"অশ্বকে বাঁধিয়া রাখ। আমি বহুদিন হইতে রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতেছি, তিনি যখন স্বয়ং আসিয়া আমায় দেখা দিবেন তখনি যজ্ঞীয় অশ্ব ফিরাইয়া দিব।" রাজাজ্ঞায় সৈন্যগণ অশ্বকে বাঁধিয়া রাখিল।

এদিকে শত্রুঘ্ন অনুচরগণের মুখে এই সংবাদ পাইয়া চিন্তিত হইলেন!

তখন মন্ত্রী সুমতির কথায় শত্রুঘ্ন অঙ্গদকে দূত করিয়া পাঠাইলেন। অঙ্গদ সুরথ রাজার সভায় গিয়া বলিল—"মহারাজ! আপনার লোকেরা রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব বাঁধিয়া রাখিয়াছে; আপনি উহা ফিরাইয়া দিয়া শত্রুঘ্নের শরণ লউন।" রাজা সুরথ বলিলেন—"দূত! তোমার প্রভু শত্রুঘ্নকে গিয়া বল যে আমি জানিয়া শুনিয়াই অশ্ব ধরিয়াছি; শত্রুঘ্নের ভয়ে আমি কখনই তাহা ফিরাইয়া দিব না। রামচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া যখন আমাকে দর্শন দিবেন, তখন আমি স্ত্রী পুত্র পরিবারের সহিত তাঁহার শরণ লইব।"

তখন উভয় দলে ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্রথমেই পুষ্কলের সহিত সুরথপুত্র চম্পকের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যোদ্ধা কেহই কম নয়, আশ্চর্য্য কৌশলে উভয়ে উভয়ের অস্ত্র সকল বিফল করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ ভয়ানক যুদ্ধের পর রাজকুমার চম্পক পুষ্কলকে রামাস্ত্র মারিলেন। পুষ্কলও তাহা কাটিবার জন্য অনেক অস্ত্র ছাড়িলেন বটে কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সেই অস্ত্র তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

তখন শত্রুঘ্ন হনূমানকে বলিলেন,—"শীঘ্র পুষ্কলকে উদ্ধার কর নতুবা এখনি চম্পক তাহাকে রাজপুরীতে লইয়া যাইবে।" তৎক্ষণাৎ হনূমান চম্পকের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে বাধা পাইয়া চম্পক হনূমানকে একসঙ্গে একহাজার বাণ মারিলেন,

কিন্তু হনূমান তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাণ্ড শালগাছ লইয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল। চম্পকের বাণে শালগাছ যখন কাটিয়া গেল তখন হনূমান চম্পকের উপর প্রকাণ্ড একটা হাতী ছুঁড়িয়া মারিল। কিন্তু তিনি হাতীটাও কাটিয়া ফেলিলেন। তখন হনূমান চম্পকের হাত ধরিয়া এক লাফে তাঁহাকে লইয়া শূন্যে উঠিল এবং লাথি মারিয়া আবার তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। হনূমানের প্রচণ্ড লাথি খাইয়াও রামভক্ত চম্পক আবার উঠিয়া তাহার লেজ ধরিয়া বিষম টানাটানি করিতে লাগিলেন। তখন হনূমান তাঁহার দুটি পা ধরিয়া বন্ বন্ শব্দে এমনি ঘুরাইতে লাগিল যে, চম্পক অজ্ঞান হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। এই অবসরে হনূমান পুষ্কলের বাঁধন খুলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিল।

রাজা সুরথ তখন মহা ক্রোধে হনূমানকে আক্রমণ করিলেন। দুইজনই রামের পরম ভক্ত এবং মহা যোদ্ধা, সকলে উৎসুক হইয়া উভয়ের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

রাজা সুরথ হনূমানের বুকে দারুণ এক অস্ত্র মারিলেন, হনূমান তাহা অগ্রাহ্য করিয়া নিকট চীৎকার করিতে করিতে দুই হাতে তাঁহার ধনু ধরিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। চক্ষের নিমেষে সুরথ অন্য ধনু লইলেন তাহাও হনূমান ভাঙ্গিয়া দিল। এইরূপে রাজা ক্রমান্বয়ে আশীটি ধনু লইলেন, হনূমান ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে সমস্ত ধনুই চুরমার করিয়া দিল। রাজা সুরথ তখন মহা ক্রোধে ভীষণ এক শক্তি মারিয়া হনূমানকে ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে জ্ঞানলাভ করিয়া হনূমান সুরথের রথখানাশুদ্ধ এক লাফে শূন্যে উঠিল এবং রথটিকে এমন বেগে মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিল যে সারথীশুদ্ধ রথ একেবারে চুরমার। ইহার পর রাজা যে রথে চড়িতে যান হনূমান তাহাই ভাঙ্গিয়া ফেলে; এইরূপে রাজার পঞ্চাশখানা রথ ভাঙ্গিল। এই অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া রাজা সুরথ বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর পাশুপত অস্ত্র ছাড়িলেন। অস্ত্রের তেজ দেখিয়া ভয়ে সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু হনূমান মনে মনে রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া পাশুপত অস্ত্রও ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সুরথ ব্রহ্মাস্ত্র মারিলেন। হনূমান হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মাস্ত্র লুফিয়া লইল। তখন বেগতিক দেখিয়া রাজা সুরথ মনে মনে রামকে স্মরণ করিয়া ধনুকে রামাস্ত্র জুড়িলেন এবং সেই অস্ত্রে হনূমানকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। হনূমান বলিল—"অন্য কোনও অস্ত্র মারিলে দেখিতাম; কিন্তু কি করিব—আমার প্রভুর অস্ত্রেই বাঁধা পড়িলাম।"

হনূমান বাঁধা পড়িল দেখিয়া পুষ্কল রাগিয়া সুরথকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না—রাজা নারাচ অস্ত্র মারিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। তখন শত্রুঘ্ন আসিয়া সুরথ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সুরথ চক্ষের নিমেষে হাজার হাজার, কোটি কোটি বাণ মারিয়া শত্রুঘ্নকে অস্থির করিয়া ফেলিলেন, বাণে বাণে চারিদিক একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। শত্রুঘ্ন নিরুপায় হইয়া ধনুকে যোগিনীপ্রদত্ত অদ্ভুত মোহনাস্ত্র জুড়িলেন। মোহনাস্ত্র মারিলে আর রক্ষা নাই, যুদ্ধক্ষেত্রে সমুদায় বীরগণেরই মোহ হইবে। সুরথ কিন্তু একটুও চিন্তিত হইলেন না। তিনি নির্ভয়ে শত্রুঘ্নকে বলিলেন—"বীরবর! আমি রামনাম স্মরণ করিয়া তোমার মোহনাস্ত্রকেও অগ্রাহ্য করি।" মোহনাস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া শত্রুঘ্ন যার পর নাই আশ্চর্য্য ও ব্যস্ত হইয়া যে বাণ দ্বারা তিনি লবনাসুরকে বধ করিয়াছিলেন সেই ভীষণ আগুনের মত বাণ ধনুকে সন্ধান করিলেন।

সুরথ নির্ভয়চিত্তে বলিলেন—"এই বাণ শুধু দুষ্টলোকদিগকে বধ করে, রাম ভক্তের সম্মুখেও আসিতে পারে না।" বাস্তবিক সে বাণ রাজার বুকে বিন্ধিয়া কেবল ক্ষণকালের জন্য তাঁহাকে অজ্ঞান করিল। পর মুহূর্ত্তেই চেতনা পাইয়া তিনি ধনুকে মহা অদ্ভুত এক বাণ যুড়িলেন। বাণের মুখ দিয়া ধক্ ধক্ করিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল—শত্রুঘ্ন পথের মধ্যেই সে বাণ কাটিয়া ফেলিলেন বটে, কিন্তু বাণের অগ্রভাগ ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বুকে বিন্ধিল। তিনি রথের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তখন বানররাজ সুগ্রীব সিংহনাদ করিতে করিতে সুরথকে আক্রমণ করিলেন। সুরথ রাজা কত ভয়ানক ভয়ানক বাণ সকল মারিলেন কিন্তু সুগ্রীব হাসিতে হাসিতে অনায়াসে সে সমস্ত লুফিয়া লইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তখন আবার রামাস্ত্র মারিয়া সুগ্রীবকেও তিনি বাঁধিলেন। তখন আর কথা কি! হনূমান, পুষ্কল শত্রুঘ্ন আর সুগ্রীবকে লইয়া তিনি পুরীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

রাজপুরীতে গিয়া হনূমানকে বলিলেন—"বাছা হনূমান! এখন প্রভু রামচন্দ্রকে স্মরণ কর, তিনি আসিয়া তোমাদিগকে উদ্ধার করুন।" হনূমান তখন যোড়হস্তে স্তুতি মিনতি করিয়া রামকে ডাকিতে লাগিল। তখন রামচন্দ্র স্বয়ং সুরথ রাজার পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাম আসিবা মাত্র পুষ্কল ও শত্রুঘ্নের জ্ঞান হইল, হনূমান ও সুগ্রীব বন্ধনমুক্ত হইল। রাজা সুরথ স্ত্রী পুত্র পরিবারের সহিত শ্রীরামের চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিলেন—"প্রভু! আমি যে আপনার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি

সে জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।" রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"তুমি ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কাজই করিয়াছ, আমিও তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

ইহার পর রাজা সুরথ অশ্ব ফিরাইয়া দিলেন। অশ্ব পুনরায় দিগ্বিজয়ে চলিল। সুরথও চম্পককে সিংহাসনে বসাইয়া শত্রুঘ্নের সঙ্গে অশ্ব রক্ষার্থে যাত্রা করিলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

ভাঙা তারা।

(মাওরি দেশের গল্প)

মাতারিকি আকাশের পরী। আকাশের পরী যারা, তাদের একটি করে তারা থাকে। মাতারিকি তার তারাটিকে রোজ সকালে শিশির দিয়ে ধুয়ে মেজে এমনি চক্‌চকে ক'রে সাজিয়ে রাখ্‌ত যে, রাত্রিবেলা সবার আগে তার উপরেই লোকের চোখ পড়্‌ত—আর সবাই বল্‌ত—"কি সুন্দর!" তাই শুনে শুনে আর সব আকাশ পরীদের ভারি হিংসা হ'ত।

তানে হচ্ছেন গাছের দেবতা। তিনি গাছে গাছে রস যোগাতেন, ডালে ডালে ফুল ফোটাতেন, আর তাদের সবুজ তাজা পাতার দিকে অবাক হ'য়ে ভাবতেন। "এ জিনিষ দেখ্‌লে পরে আর কিছুর পানে লোকে ফিরেও চাইবে না।" কিন্তু লোকেরা গাছের উপর দিয়ে বার বার কেবল মাতারিকির তারা দেখ্‌ত, আর কেবল তার কথাই বল্‌ত। তানের বড় রাগ হ'ল। সে বল্ল, "আচ্ছা, তারার আলো আর কত দিন? দুদিন বাদেই ঝাপ্‌সা হয়ে আসবে।" কিন্তু যত দিন যায়, তারা ততই উজ্জ্বল আর ততই সুন্দর হয়, আর সবাই তার দিকে ততই বেশী করে তাকায়। একদিন অন্ধকার রাত্রে যখন সবাই ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে, তখন তানে চুপি চুপি দুজন আকাশ পরীর কানে কানে বল্‌ল "এস ভাই, আমরা সবাই মিলে মাতারিকিকে মেরে তারাটাকে পেড়ে আনি।" পরীরা বল্‌ল "চুপ, চুপ, মাতারিকি জেগে আছেন। পূর্ণিমার জোছনা রাতে আলোয় শুয়ে মাতারিকির চোখ যখন আপনা হ'তে ঢুলে আসবে সেই সময়ে আবার এস।"

এসব কথা কেউ শুনল না, শুনল খালি জলের রাজার ছোট্ট একটি মেয়ে। রাজার মেয়ে রাত্রি হলেই সেই তারাটির ছায়া নিয়ে খেলতে খেলতে জলের নীচে ঘুমিয়ে পড়ত আর মাতারিকির স্বপ্ন দেখত। দুষ্ট পরীর কথা শুনে তার দু'চোখ ভ'রে জল আসল।

এমন সময় দখিন হাওয়া আপন মনে গুণগুনিয়ে জলের ধারে এসে পড়ল। রাজার মেয়ে আস্তে আস্তে ডাকতে লাগল "দখিন হাওয়া শুনেছ? ওরা মাতারিকিকে মারতে চায়!" শুনে দখিন হাওয়া 'হায়' 'হায়' ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল। রাজার মেয়ে বল্‌ল, "চুপ চুপ, এখন উপায় কি বলত?" তখন তারা দুজন পরামর্শ করল যে, মাতারিকিকে জানাতে হবে—সে যেন পূর্ণিমার রেতে জেগে থাকে।

ভোর না হ'তে দখিন হাওয়া রাজার মেয়ের ঘুম ভাঙিয়ে বল্‌ল "এখন যেতে হবে।" সূর্য্য তখন স্নানটি সেরে সিঁদুর মেখে সোণার সাজে পূবের দিকে দেখা দিচ্ছেন। রাজার মেয়ে তার কাছে আবদার করল "আমি আকাশের দেশে বেড়াতে যাব।" সূর্য্য তার একখানি সোণালি কিরণ ছড়িয়ে দিলেন। সেই কিরণ বেয়ে বেয়ে রাজার মেয়ে উঠ্‌তে লাগলেন। সকাল বেলার কুয়াসা দিয়ে দখিন হাওয়া তাঁকে ঘিরে ঘিরে চারদিকেতে ঢেকে রাখল। এমনি করে রাজার মেয়ে মাতারিকির বাড়ীতে গিয়ে সব খবর বলে আসল। মাতারিকি কি করবে? সে বল্‌ল "আমি আর কোথায় যাব? পূর্ণিমার রাতে এইখানেই পাহারা দিব—তার পরে যা হয় হবে।"

রাজার মেয়ে ঝাপ্‌সা মেঘের আড়াল দিয়ে বৃষ্টি বেয়ে নেমে আসলেন।

তারপর পূর্ণিমার রাতে তানে আর সেই দুষ্টু পরীরা ছুটে বেরুল, মাতারিকির তারা ধরতে। মাতারিকি দুহাত দিয়ে তারাটিকে আঁকড়ে ধ'রে প্রাণের ভয়ে ছুটতে লাগল। ছুট্, ছুট্, ছুট্! আকাশের আলোর নীচে, ছায়াপথের ছায়ায় ছায়ায় নিঃশব্দে ছুটোছুটি আর লুকোচুরি। দখিন হাওয়া স্তব্ধ হ'য়ে দেখতে লাগল, রাজার মেয়ে রাত্রি জেগে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল। তারায় তারায় আকাশপরী, কিন্তু মাতারিকি যার কাছেই যায়, সেই তাকে দূর' দূর' ক'রে তাড়িয়ে দেয়।

ছুটতে ছুটতে মাতারিকি হাঁপিয়ে পড়ল—আর সে ছুটতে পারে না। তখন তার মনে হ'ল "জলের দেশে রাজার মেয়ে আমায় বড় ভাল বাসে—তার কাছে লুকিয়ে থাকি।" মাতারিকি ঝুপ্ করে জলে পড়েই ডুব, ডুব, ডুব—একেবারে জলের তলায় ঠাণ্ডা কালো ছায়ার নীচে লুকিয়ে রইল। রাজার মেয়ে আপনি তাকে শেওলা ঢেকে আড়াল করলেন।

সবাই তখন খুঁজে সারা—"কোথায় গেল, কোথায় গেল?" একজন পরী ব'লে উঠ্‌ল "ঐ ওখানে—জলের নীচে।" তানে বল্লেন "বটে! মাতারিকিকে লুকিয়ে রাখছ

কে?" রাজার মেয়ের বুকের মধ্যে দুর দুর করে কেঁপে উঠ্‌ল—কিন্তু তিনি কোনকথা বল্‌লেন না। তখন তানে বল্‌ল "আচ্ছা দাঁড়াও। আমি এর উপায় করছি।" তখন সে জলের ধারে নেমে এসে হাজার গাছের শিকড় মেলে শোঁ শোঁ করে জল টান্‌তে লাগ্‌ল।

তখন মাতারিকি জল ঝেড়ে উঠে আসল। জলের নীচে আরামে শুয়ে তার পরিশ্রম দূর হ'য়েছে, এখন তাকে ধরবে কে? আকাশময় ছুটে ছুটে কাহিল হ'য়ে সবাই বল্‌ছে "আর হলোনা।" তানে তখন রেগে বল্‌ল "হতেই হবে।" এই ব'লে হঠাৎ সে পথের পাশের একটা মস্ত তারা কুড়িয়ে নিয়ে মাতারিকির হাতের দিকে ছুঁড়ে মারল।

ঝন্ ঝন্ ক'রে শব্দ হ'ল, মাতারিকি হায় হায় ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল, তার এতদিনের সাধের তারা সাত টুকরো হ'য়ে ভেঙে পড়্‌ল। তানে তখন দৌড়ে এসে সেগুলোকে দুহাতে ক'রে ছিটিয়ে দিল আর বল্‌ল, "এখন থেকে দেখুক্ সবাই—আমার গাছের কত বাহার!" দুষ্টু পরীরা হো হো করে হাস্‌তে লাগল।

এখনও যদি দখিন হাওয়ার দেশে যাও, দেখবে সেই ভাঙা তারার সাতটি টুকরো আকাশের একই জায়গায় ঝিক্‌মিক্ করে জ্বলছে। ঘুমের আগে রাজার মেয়ে এখনও তার ছায়ার সঙ্গে খেলা করে। আর জোছনা রাতে দখিন হাওয়ায় মাতারিকির দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়।

পেটুক রামু।

পেটুক রামু পেটুক ভারি দিন রাতই ভাবে,
পোলাও লুচি পায়েস কত, কত মিঠাই খাবে।
খাবার কথা ভেবে ভেবে ঘুমের ঘোরে রোজ,
একদিন সে দেখ্‌ছে যেন মামার বাড়ী ভোজ।

কত রকম খাবার পাতে ঠিকানা তার নাই,
কোন্‌টা সে যে ধরবে আগে ভাব্‌ছে রামু তাই।
অনেক ভেবে, মাছের মুড়ো যেমনি তোলা শেষে,
ভাজা মাছটা ফেল্‌ল হঠাৎ ফিক্ ক'রে হেসে।
তাই না দেখে, দইয়ের বাটী দুই পা তুলে যায়,
মিঠাই গুলো মুখের দিকে চগ্‌বগিয়ে চায়।
গা ঝাড়া দেয় মালপুয়া আর বরফি ছিল যত,
চল্‌ল লুচি, গড়গড়িয়ে, গাড়ীর চাকার মত।
দৌড়ে আসে জিবে গজা, দু হাত জিব নেড়ে,
থতমত রামুর পানে, সবাই এল তেড়ে।
ভয়ের চোটে, যেই না রামু উঠ্‌ল ধড়্‌মড়িয়ে,
দুড়ুম্ ক'রে পড়্‌ল নীচে, বিছ্‌না বালিস নিয়ে।*

পুরাতন চিঠি।

[৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত কয়েকখানা চিঠি হইতে উদ্ধৃত]

(১)

কাল সন্ধ্যার সময় পুরী থেকে ফিরে এসেছি। রা— বাবুরা তাঁদের নূতন বাড়ীতে এসেছেন। ম— এখন আর একটু বড় হয়েছে; কিন্তু তেমনি তোৎলা কথা কয়। লোক জন এলে খুব ভাব করে নেয়; বড় মানুষদের মতন তাদের বাড়ীর খবর জিজ্ঞাসা করে। "বাঅ আতেন" "তেয়ে পুয়ে বাঅ আতে?" এই রকম সব কথা জিজ্ঞাসা করে। আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিল। বেহালা দেখেই সে ভারি ব্যস্ত হয়ে গেল; তখনই তাকে বাজিয়ে শুনাতে হবে। একটা বাজালাম শুনে বল্ল "খুব বাঅ, আয়েকটা।" সে নিজেও গান গাইল "হেদ্দি অবাল্ পাতিম্বাই, পাতিম্বাই।" "কে বাদাবে বাদনা।" সে দিন তাদের এক জায়গায় নিমন্তন্ন ছিল, তাই তার সঙ্গে আর বেশী কথা বার্ত্তা হতে পারল না। আমার লোহার বাঁটের ছাতাটা

* শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত নূতন বই "পড়াশুনা" শীঘ্রই ছাপা হইবে। এই ছবি ও কবিতা তাহা হইতে লওয়া হইয়াছে।

তার খুব ভাল লেগেছে। সেটাকে সে একবার খুলে মাথায় দিল, আর বল্ল যে তার নিজের ছাতাটা বিশ্রী।

(২)

আজ সকালে *** ** আর আমি তারের পোলের উপর দিয়ে উশ্রীর ওপারে গিয়েছিলাম। যখন মাঝামাঝি গিয়েছি, তখন **কে ভয় দেখাবার জন্য *** পোলটাকে দোলাতে লাগ্‌ল, আর ** যার পর নাই ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল।

তারপর এপারে আসবার সময় আমি আর ** হেঁটে জল ভেঙ্গে এলাম, আর *** পোলের উপর দিয়ে এল। আমরা বল্‌লাম 'দেখি, কে আগে যেতে পারে।' আমরা

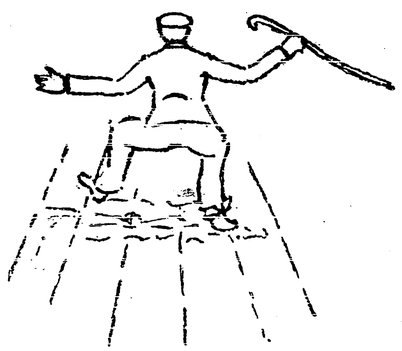

যতক্ষণ জুতো মোজা খুলে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, ততক্ষণ *** পোলের মাথায় উঠে দাঁড়িয়ে রইল। সকলে প্রস্তুত হ'লে আমাদের রেস্ হ'ল। আমি ভেবেছিলাম আমরা ঢের আগে যাব। কিন্তু *** দু পা ফাঁক করে, কোমর বাঁকিয়ে, দুহাত ছড়িয়ে, পোলের উপর দিয়ে এম্‌নি ছুট দিল যে আমরা জল টুকু মাত্র পার হবার অনেক আগেই সে গিয়ে ওপারে উপস্থিত হ'ল। তখন যদি পিছন থেকে তার চেহারা দেখতে! এই এম্‌নি করে ছুটেছিল। আমরা যতক্ষণে এ পারে ফিরে এলাম ততক্ষণে সে ইচ্ছা কর্‌লে আবার গিয়ে ফিরে আসতে পারত। এখনও তার সে ছুটের কথা মনে করলে আমার হাসি পায়।

(৩)

"আগে খেতে বসলেই ইঁদুর আসত। মাঝে কল দিয়ে কয়েকটাকে ধরাতে কয় দিন আসেনি। এখন আবার একটা ছোট ইঁদুর আসতে আরম্ভ করেছে। এটা খুব ছেলেমানুষ, ভাল করে বুদ্ধি টুদ্ধি হয় নি। আমাকে শুঁক্‌তে এসে গোঁফ দিয়ে আমার পায়ে সুড়সুড়ি লাগিয়ে দেয়। প্লেটের কানার উপর দিয়ে উঁকি মেরে আমার ফল খাওয়া দেখে, তারপর সাহস পেয়ে প্লেটের উপরে উঠে বসে। আমি একটু নড়লে চড়লে ভয় পেয়ে ছুটে পালায়; একবার আমার পায়ের তলায় এসে লুকিয়েছিল। ফল টল কিন্তু সে পছন্দ করে না, শুঁকে দেখেই চলে যায়। দৈও খায় না। খায়

খালি ভাত আর একটু আধটু তরকারী। সেদিন তোমার ঠাকুরমা মোচাভাজা পাঠিয়েছিলেন, আমি দাঁতের ব্যথায় সেটা ভালকরে না খেতে পেরে চিবিয়ে ছিবড়ে ফেলেছিলাম। সেই ছিব্‌ড়েটা পেয়ে সে যার পর নাই খুসী হয়েছিল। সেটাকে নিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে মীটসেফের তলায় চলে গেল। আমি যখন একলা ঘরে থাকি, তখনই সে আসে। প্রয়াগের সাড়া পেলেই পালিয়ে যায়।"

(৪)

"আমি যে ঘরে বসে লিখছি, সে ঘরের চালে হনূমান এসেছে। ঘরটা ইঁটের, কিন্তু তার চাল খোলার। হনূরা সেখানে এসে সব খোলা উল্‌টে দেয়, আর হুপ্ হাপ্ করে লাফিয়ে ভেঙ্গে দেয়। তাই সে ঘরের চালে মস্ত মস্ত ফুটো, তার ভিতর দিয়ে আকাশ দেখা যায়। হনূমান আস্‌লে ছেলেরা বাঁশ নিয়ে তাদের তাড়া করে, আর তারা ছুটে রীঠা গাছের দিকে পালিয়ে যায়। বড় বড় দুটো রীঠা গাছ আছে, তার সরু সরু ডাল। হনূরা সেই ডাল দিয়ে পথে হাঁটবার মতন তাড়াতাড়ি চলে যায়। আমরা যেমন করে পান খাই, তেমনি করে রীঠার কচি পাতা ছিঁড়ে খেতে থাকে, আর এক একবার চেয়ে দেখে ছেলের দল আছে কি না।

এখানে মর্কট বাঁদরও আছে। তাকে এখানকার লোকেরা "পাতি মাকড়" বলে। হনূমানেরা মর্কটকে বড় ভয় করে, আর তাদের দেখলে পালিয়ে যায়। মর্কট ছোট, হনূমান অনেক বড়, কিন্তু তবু হনূমানেরা মর্কটদের সঙ্গে পারে না।"

"আমরা যে নক্স্ ভমিকা ঔষধ খাই বাংলাতে তাকে কুচিলা বলে। ওড়িয়ারাও তাই বলে। কুচিলা খেতে ভয়ানক তেতো, আর ভয়ানক বিষ। কিন্তু হনূমানদের তাতে কিছু হয় না। তাদের দেখ্‌লাম দলে দলে কুচিলা গাছে বসে তার ফল খাচ্ছে। কুচিলার ফল দেখ্‌তে ছোট কমলা লেবুর মতন হল্‌দে গোল গোল। এক একটা গাছে অনেক হয়, আর পাকা ফল শুদ্ধ গাছ গুলিকে দেখ্‌তে বেশ সুন্দর দেখা যায়।"

পাগ্‌লা দাশু।

আমাদের স্কুলের যত ছাত্র তাহার মধ্যে এমন কেহই ছিলনা যে, পাগ্‌লা দাশুকে না চিনে। যে লোক আর কাহাকেও জানে না, সেও সকলের আগে "পাগ্‌লা দাশুকে" চিনিয়া লয়। সেবার একজন নূতন দারোয়ান আসিল, একেবারে আন্‌কোরা পাড়াগেঁয়ে

লোক; কিন্তু প্রথম যখন সে পাগ্‌লা দাশুর নাম শুনিল, তখনই সে আন্দাজে ঠিক ধরিয়া লইল যে, এই ব্যক্তিই পাগ্‌লা দাশু। কারণ তার মুখের চেহারায়, কথা বার্ত্তায়, চলনে চালনে বোঝা যাইত যে তাহার মাথায় একটু "ছিট্" আছে।

তাহার চোক দুটি গোল গোল, কাণ দুটা অনাবশ্যক রকমের বড়, মাথায় এক বস্তা ঝাঁকড়া চুল। চেহারাটা দেখিলেই মনে হয়—

ক্ষীণদেহ খর্ব্বকায় মুণ্ড তাহে ভারি
যশোরের কই যেন নরমূর্ত্তিধারী।

সে যখন তাড়াতাড়ি চলে অথবা ব্যস্ত হইয়া কথা বলে, তখন তাহার হাত পা ছোঁড়ার ভঙ্গী দেখিয়া হঠাৎ কেন জানি চিংড়ি মাছের কথা মনে পড়ে।

সে যে বোকা ছিল, তাহা নয়। অঙ্ক কষিবার সময়, বিশেষতঃ লম্বা লম্বা গুণ-ভাগের বেলা, তাহার আশ্চর্য্য মাথা খুলিত। আবার এক এক সময় সে আমাদের বোকা বানাইয়া তামাসা দেখিবার জন্য এমন সকল ফন্দি বাহির করিত যে, আমরা তাহার বুদ্ধি দেখিয়া অবাক হইয়া থাকিতাম।

"দাশু," অর্থাৎ দাশরথি, যখন প্রথম আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি হয় তখন জগবন্ধুকে আমাদের ক্লাসের "ভালছেলে" বলিয়া সকলে জানিত। সে পড়াশুনায় ভাল হইলেও, তাহার মত অমন একটি হিংসুটে ভিজেবেড়াল আমরা আর দেখি নাই। দাশু একদিন জগবন্ধুর কাছে কি একটা ইংরাজি পড়া জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল। জগবন্ধু পড়া বলিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাকে বেশ দু'কথা শোনাইয়া বলিল "আমার বুঝি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই? আজ এঁকে ইংরিজি বোঝাব, কাল ওঁর অঙ্ক কষে দেব, পরশু আর একজন আসবেন আর এক ফরমাইস নিয়ে—ঐ করি আর কি!" দাশু সাংঘাতিক চটিয়া বলিল "তুমি ত ভারি ছ্যাঁচড়া ছোটলোক হে!" জগবন্ধু পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে নালিশ করিল, "ঐ নতুন ছেলেটা আমায় গালাগালি দিচ্ছে।" পণ্ডিত মহাশয় দাশুকে এমনি দু'চার ধমক দিয়া দিলেন যে, সে বেচারা একেবারে দমিয়া গেল।

তারপর কয়দিন দাশু জগবন্ধুর সহিত কথা বার্ত্তা কহে নাই। পণ্ডিত মহাশয় রোজ ক্লাসে আসেন, আর যখন দরকার হয় জগবন্ধুর কাছে বই চাহিয়া ল'ন। একদিন তিনি পড়াইবার সময় "উপক্রমণিকা" চাহিলেন, জগবন্ধু তাড়াতাড়ি তাহার সবুজ কাপড়ের মলাট দেওয়া "উপক্রমণিকা" খানা বাহির করিয়া দিল। পণ্ডিত মহাশয় বইখানি খুলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বইখানা কার?"

জগবন্ধু বুক ফুলাইয়া বলিল, "আমার।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "হুঁ,—নূতন সংস্করণ বুঝি? বইকে-বই একেবারে বদ্‌লে গেছে" এই বলিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন —"যশোবন্ত দারোগা—লোমহর্ষক ডিটেক্‌টিভ নাটক।" জগবন্ধু ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত তাকাইয়া রহিল। পণ্ডিত মহাশয় বিকট রকম চোখ পাকাইয়া বলিলেন, "স্কুলে আমার আদুরে গোপাল, আর বাড়ীতে বুঝি নৃসিংহ অবতার?" জগবন্ধু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় এক ধমক দিয়া বলিলেন, "থাক থাক আর ভালমানুষি দেখিয়ে কাজ নেই—ঢের হ'য়েছে।" লজ্জায়, অপমানে জগবন্ধুর দুই কাণ লাল হইয়া উঠিল—আমরা সকলেই তাহাতে বেশ খুসী হইলাম। পরে জানা গেল যে, এটি দাশু ভায়ার কীর্ত্তি, সে মজা দেখিবার জন্য উপক্রমণিকার জায়গায় ঠিক ঐরূপ মলাট দেওয়া একখানা বই রাখিয়া দিয়াছিল!

দাশুকে লইয়া আমরা সর্ব্বদাই ঠাট্টাতামাসা করিতাম—এবং তাহার সামনেই তাহার বুদ্ধি ও চেহারা সম্বন্ধে অনেক অপ্রীতিকর আলোচনা করিতাম। তাহাতে বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহার ভাব গতিক দেখিয়া মনে হইত যেন সে বেশ আমোদ পাইতেছে। এক এক সময়ে সে নিজেই উৎসাহ করিয়া আমাদের মন্তব্যের উপর রং চড়াইয়া নিজের সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত গল্প বলিত। একদিন সে বলিল "ভাই, আমাদের পাড়ায় যখনই কেহ আমসত্ত বানায় তখনই আমার ডাক পড়ে। কেন জানিস্?" আমরা বলিলাম "খুব আমসত্ত খাস্ বুঝি?" সে বলিল "তা নয়। যখন আমসত্ত শুকোতে দেয় আমি সেই খানে ছাতের উপর বার দুয়েক এই চেহারাখানা দেখিয়ে আসি। তাতেই, পাড়ার ত্রিসীমানার মধ্যে যত কাগ সব ত্রাহি ত্রাহি ক'রে ছুটে পালায়। কাজেই আর আমসত্ত পাহারা দিতে হয় না!"

প্রত্যেক বার ছুটির পরে স্কুলে ফিরিবার সময় দাশু একটা না একটা কাণ্ড বাধাইয়া আসে। একবার সে হঠাৎ পেণ্টেলুন পরিয়া স্কুলে হাজির হইল। ঢলঢলে পায়জামার মত পেণ্টেলুন আর তাকিয়ার খোলের মত কোট পরিয়া তাহাকে যে কিরূপ অদ্ভুত দেখাইতেছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতেছিল—এবং সেটা তাহার কাছে ভারি একটা আমোদের ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "পেণ্টেলুন পরেছিস্ কেন?" দাশু এক গাল হাসিয়া বলিল, "ভাল করে ইংরাজি শিখ্‌ব বলে।" আর একবার সে খামখা নেড়া মাথায় এক পট্টি বাঁধিয়া ক্লাসে আসিতে আরম্ভ করিল এবং আমরা সকলে তাহা লইয়া ঠাট্টা তামাসা করায় যার পর নাই খুসী হইয়া উঠিল। দাশু আদবেই

গান গাইতে পারে না—তাহার যে তালজ্ঞান বা সুরজ্ঞান একেবারেই নাই, এ কথা সে বেশ জানে। তবু সেবার ইনস্‌পেক্টার সাহেব যখন স্কুল দেখিতে আসেন, তখন আমাদের খুসী করিবার জন্য সে চীৎকার করিয়া গান শুনাইয়াছিল। আমরা কেহ ওরূপ করিলে সেদিন রীতিমত শাস্তি পাইতাম, কিন্তু দাশু "পাগ্‌লা" বলিয়া কেহ তাহাকে কিছু বলিল না।

ছুটির পরে দাশু নূতন কি পাগ্‌লামি করে, তাহা দেখিবার জন্য আমরা ব্যস্ত হইয়া স্কুলে আসিতাম। কিন্তু যেবার সে অদ্ভুত এক বাক্স বগলে লইয়া ক্লাসে হাজির হইল তখন আমরা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। আমাদের মাষ্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে দাশু, ও বাক্সের মধ্যে কি এনেছ?" দাশু বলিল, "আজ্ঞে, আমার জিনিষপত্র।" 'জিনিষপত্র'টা কিরূপ হইতে পারে এই লইয়া আমাদের মধ্যে বেশ একটু তর্ক হইয়া গেল। দাশুর সঙ্গে বই, খাতা, পেন্‌সিল, ছুরি সবই ত আছে, তবে আবার জিনিষপত্র কিরে বাপু? দাশুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে সোজাসুজি কোন উত্তর না দিয়া বাক্সটিকে আঁকড়াইয়া ধরিল এবং বলিল "খবরদার আমার বাক্স তোমরা কেউ ঘেঁটো না।" তাহার পর চাবি দিয়া বাক্সটাকে একটুখানি ফাঁক করিয়া সে তাহার ভিতরে চাহিয়া কি যেন দেখিয়া লইল, এবং "ঠিক আছে" বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বিড় বিড় হিসাব করিতে লাগিল। আমি একটুখানি দেখিবার জন্য উঁকি মারিতে গিয়াছিলাম—অমনি পাগ্‌লা মহা ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরাইয়া বাক্‌স বন্ধ করিয়া ফেলিল।

ক্রমে আমাদেব মধ্যে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হইল। কেহ বলিল, "ওটা ওর টিফিনের বাক্‌স—ওর মধ্যে খাবার আছে।" কিন্তু একদিনও টিফিনের সময়ে তাহাকে বাক্‌স খুলিয়া কিছু খাইতে দেখিলাম না। কেহ বলিল, "ওটা বোধ হয় ওর মণি-ব্যাগ —ওর মধ্যে টাকা পয়সা আছে, তাই ও সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখ্‌তে চায়।" আর এক জন বলিল, "টাকা পয়সার জন্য অত বড় বাক্‌স কেন? ওকি ইস্কুলে মহাজনী কারবার খুলবে নাকি?"

একদিন টিফিনের সময়ে দাশু হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বাক্সের চাবিটা আমার কাছে রাখিয়া গেল আর বলিল "এটা এখন তোমার কাছে রাখ দেখো হারায় না যেন। আর আমার আসতে যদি একটু দেরী হয় তবে তোমরা ক্লাসে যাবার আগে ওটা দরোয়ানের কাছে দিয়ে দিও।" এই কথা বলিয়া সে বাক্সটা দরোয়ানের জিম্মায় রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন আমাদের উৎসাহ দেখে কে! এতদিনে সুবিধা পাওয়া গিয়াছে; এখন হতভাগা দরোয়ানটা একটু তফাৎ গেলেই হয়। খানিক বাদে দরোয়ান তাহার রুটি পাকাইবার লোহার উনানটি ধরাইয়া কতকগুলা বাসনপত্র লইয়া কলতলার দিকে গেল। আমরা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, দরোয়ান আড়াল হওয়া মাত্র আমরা পাঁচ সাত জনে তাহার ঘরের কাছে সেই বাক্সের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলাম। তারপর আমি চাবি দিয়া বাক্স খুলিয়া দেখি, বাক্সের মধ্যে বেশ ভারি একটা কাগজেব পোঁট্‌লা নেকড়ার ফালি দিয়া খুব করিয়া জড়ান। তারপর, তাড়াতাড়ি পোঁটলার প্যাঁচ খুলিয়া দেখা গেল তাহার মধ্যে একখানা কাগজের বাক্স—তার ভিতরে আর একটি ছোট পোঁটলা। সেইটি খুলিয়া একখানা কার্ড বাহির হইল তাহার একপিঠে লেখা "কাঁচকলা খাও" আর এক পিঠে লেখা "অতিরিক্ত কৌতূহল ভাল নয়।" দেখিয়া আমরা এ-উহার মুখে চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলাম। সকলের শেষে একজন বলিয়া উঠিল "ছোকরা আচ্ছা যা হোক, আমাদের বেজায় ঠকিয়েছে।" আর একজন বলিল "যেমন ভাবে বাঁধা ছিল তেমনি ক'রে রেখে দাও, সে যেন টের না পায় যে আমরা খুলেছিলাম। তা হ'লে সে নিজেই জব্দ হবে।" আমি বলিলাম "বেশ কথা। ও ছোকরা আসলে পরে তোমরা খুব ভাল মানুষের মত বাক্সটা দেখাতে ব'লো—আর ওর মধ্যে কি আছে, সেটা বা'র ক'রে জানতে চেয়ো।" তখন আমরা তাড়াতাড়ি কাগজ পত্র গুলি বাঁধিয়া আগেকার মত পোঁটলা পাকাইয়া বাক্সে ভরিয়া ফেলিলাম।

বাক্সে চাবি দিতে যাইতেছি এমন সময় হো হো করিয়া একটা হাসির শব্দ শুনা গেল—চাহিয়া দেখি পাঁচিলের উপরে বসিয়া পাগ্‌লা দাশু হাসিয়া কুটিকুটি। হতভাগা এতক্ষণ চুপি চুপি তামাসা দেখিতেছিল আর আমাদের কথাবার্ত্তা সমস্ত শুনিতেছিল! তখন বুঝিলাম, আমার কাছে চাবি দেওয়া দরোয়ানের কাছে, বাক্স রাখা, টিফিনের সময় বাইরে যাওয়ার ভাণ করা, এ সমস্তই তাহার সয়তানী। আসল মৎলবটি, আমাদের খানিকটা নাচাইয়া তামাসা দেখান। খামখা আমাদের আহাম্মক বানাইবার জন্যই সে মিছামিছি একয়দিন ধরিয়া ক্রমাগত একটা বাক্স বহিয়া বেড়াইয়াছে। সাধে কি বলি "পাগ্‌লা" দাশু?

অসুরের দেশ।

যে জাতি শিল্পে বাণিজ্যে বেশ অগ্রসর, যাহারা লেখাপড়ার চর্চ্চা করে, হিসাব করিয়া পাকা দালান ইমারৎ গাঁথিতে জানে, এবং নানারূপ ধাতুও অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবহারে বেশ অভ্যস্ত, মোটের উপর তাহাকে সভ্য জাতি বলা যায়। ইতিহাসের প্রাচীন যুগে যে সকল সভ্য জাতির নাম পাওয়া যায় তাহার মধ্যে একটা জাতির কথা শুনি যাহার নাম অসুর বা আশুর। ইংরাজিতে তাহাকে বলে আসিরিয়া (Assyria)। এই অসুর দেশের নাম প্রাচীন বাইবেল প্রভৃতি পুরাতন পুঁথিতে অনেক স্থানে পাওয়া যায় এবং একশত বৎসর আগে এই দেশের সঙ্গে মানুষের ওইটুকু মাত্র পরিচয় ছিল। মানুষ অসুরের দেশ ও তাহার রাজধানী নিনেভের কাহিনী কেবল পুথিতেই পড়িয়া আসিত কিন্তু তাহার চেহারা কেহ চোখে দেখে নাই। কারণ, যেখানে সহর ছিল সে স্থানে খোঁজ করিতে গেলে কেবল মাটির ঢিপি আর প্রকাণ্ড ময়দান ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইত না।

এই অসুরের সঙ্গে আমাদের পুরাণের অসুরদের কোন সম্পর্ক আছে কি না তাহা আমি জানি না। এখন মেসেপটেমিয়ার যেখানে ইংরাজের সহিত তুর্কীর লড়াই চলিতেছে তাহার প্রায় তিনশত মাইল উত্তরে প্রাচীন অসুরের দেশ ছিল। ইহা কেবল আন্দাজের কথা নয়—বাস্তবিকই সেখানে ময়দান খুঁড়িয়া মানুষে সেই পুরাতন লুপ্ত সহরকে বাহির করিয়াছে। প্রায় সাড়ে চার হাজার বৎসরের পুরাতন সহর, সেখানে এই অসুর জাতি দুহাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া পরে যুদ্ধ বিগ্রহে একেবারে ধ্বংস পায়। সেও প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগেকার কথা—তখনও বুদ্ধের জন্ম হয় নাই।

কথায় বলে "সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।" এক একজন লোক থাকে, তাহাদের অন্নবস্ত্রের অভাব নাই, সংসারে বিশেষ কোন দুঃখ নাই, অথচ তাহাদের কি যে খেয়াল, তাহারা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া একটা কোন হাঙ্গামা লইয়া ব্যস্ত থাকে। উত্তরে দক্ষিণে বরফের দেশে, আফ্রিকার মরু ভূমিতে, পাহাড়ের চূড়ায় তাহারা অস্থির হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপ মাথা-পাগলা লোকের দ্বারা জগতের অনেক বড় বড় আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে। অসুরের রাজ্য আবিষ্কারও এইরূপেই হয়। লেয়ার্ড (Layard) নামে এক ইংরাজ সিংহলে কি একটা ভাল চাকরি পাইয়া এ দেশে আসিতেছিলেন। সোজা পথে জাহাজে চড়িয়া আসিলেই হইত, কিন্তু তাঁহার সখ হইল ডাঙ্গার পথে মেসোপটেমিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেখিয়া তিনি এদেশে আসিবেন।

কিন্তু ওই যে খেয়ালের মাথায় তিনি মেসোপটেমিয়া গেলেন উহাতেই তাঁহার সব কাজ কর্ম্ম উল্টাইয়া গেল। মেসোপটেমিয়ার উত্তরে বেড়াইবার সময় তাঁহার মনে হইল, এই ত সেই প্রাচীন সভ্য জাতির দেশ, এখানে খুঁজিলে কি তাহাদের চিহ্ন পাওয়া যায় না? তাঁহার আর চাকুরি করা হইল না—তিনি কতকগুলি মজুর লইয়া মাটী খুঁড়িতে লাগিলেন! খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাঁহার সঙ্গের টাকা পয়সা সব ফুরাইয়া আসিল, তিনি আবার টাকা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার দেখাদেখি আরও দু'চারটি লোক আসিয়া মাটিখোঁড়া ব্যাপারে যোগ দিল! তখন তুর্কি রাজ-কর্ম্মচারীদের মনে সন্দেহ জাগিল, "এই লোকগুলা খামখা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়া মাটি কাটিতে চায় কেন? নিশ্চয়ই ইহাদের মনে কোন দুষ্ট মৎলব আছে।" সুতরাং তাহারা মাটি কাটা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিল। তারপর যখন মাটির ভিতর হইতে নানারকম অদ্ভুত মূর্ত্তি আর ঘর-বাড়ী বাহির হইতে লাগিল, তখন এ আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া সে দেশী মজুরগুলা এমন ঘাবড়াইয়া গেল যে, তাহারাও কাজ করিতে চায় না। ইহার উপর সে দেশে নানারকম হিংস্র জন্তুর অত্যাচার ও জ্বর-জারির উৎপাত ত ছিলই।

অসুর দেশের নরসিংহমূর্ত্তি।

এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তির মাথাটা যখন বাহির হয় তখন মজুরেরা ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পলাইয়াছিল।

যাহা হউক, অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে—ইংরাজ ও ফরাসি গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে শেষটায় মাটির নীচ হইতে একেবারে অসুরের রাজধানী বাহির হইয়া পড়িল। সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। কবে আড়াই হাজার বছর আগে সে সহর ধ্বংস হইয়াছে, লোকজন কোন্ কালে সে দেশ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, অথচ এতদিন পরে তাহাদের সেই

পুরাতন কীর্ত্তিগুলি আবার কঙ্কালের মত মাটির নীচ হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে।

সেকালের ইতিহাসে জানা যায় যে, নিনেভে সহর শত্রুর হাতে পড়িয়া আগুনে নষ্ট হয়—তাহার প্রমাণ এখনও চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আগুনেও সব নষ্ট করিতে পারে নাই। এখনও কত মূর্ত্তি, কত কারুকার্য্য, আর পাথরে আঁকা কত ছবি আছে, যাহা দেখিলে মনেই হয় না যে এগুলি সেই লুপ্তযুগের জিনিষ। সেই সময়ে যে সকল রং ব্যবহার হইত সেই রংগুলি পর্য্যন্ত এক এক জায়গায় বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। এক একটি ঘরের ছাদ, দেয়াল প্রভৃতি এমন অবস্থায় আছে যে সমজদার লোকে তাহা দেখিয়া বলিতে পারে নূতন অবস্থায় ঘরটি ঠিক

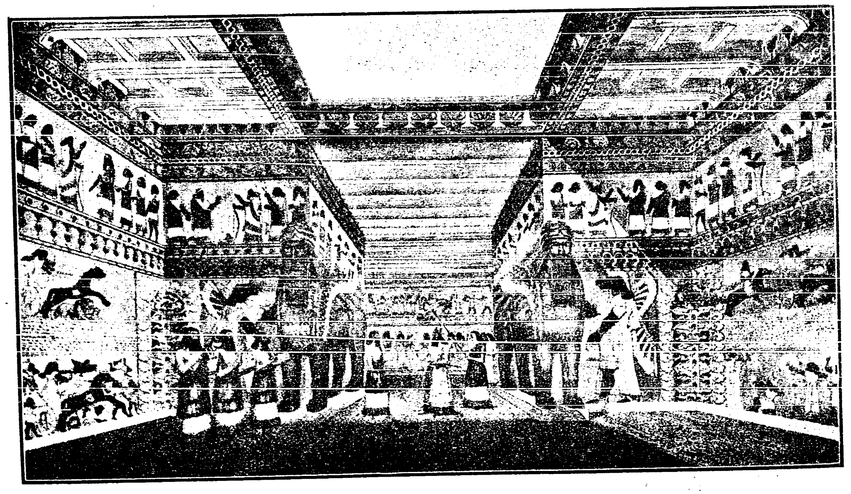

অসুরের রাজপ্রাসাদ।

কি রকম ছিল। এই সকল ছবি ও মূর্ত্তি দেখিলে বোঝা যায় যে, সে দেশের লোকদের বেশ সৌন্দর্য্য জ্ঞান ছিল। ছবির মধ্যে লড়াই ও শিকারের ছবিই খুব বেশী—মাঝে মাঝে রাজা-রাজড়ার ছবিও আছে। ছবি দেখিয়া সে দেশের লোকদের অস্ত্র শস্ত্র, পোষাক ও চেহারা সম্বন্ধে অনেক খবর জানা যায়। অসুরের দল আর তাহাদের

শত্রুর দলের মধ্যে এ বিষয়ে কিরূপ তফাৎ ছিল তাহাও অনেক ছবিতে পরিষ্কার দেখান হইয়াছে। অসুরেরা বড়ই যুদ্ধপ্রিয় ছিল, এবং প্রায়ই অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে লড়াই লইয়া ব্যস্ত থাকিত।

অসুরদের কথা বলিতে হইলে তাহাদের ভাষার কথাও বলিতে হয়। সে ভাষায় এখন আর কেহ কথা বলে না, সে দেশের লোকেরা পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ সংবাদ জানে না—ভাষার একমাত্র চিহ্ন সেকালের অক্ষর। মাটির উপর বাটালি দিয়া তীরের ফলকের মত অদ্ভুত সব আঁচড় কাটিয়া অক্ষর লেখা হইত। সেই মাটি পোড়াইয়া ইঁটের "পুথি" তৈয়ারী হইত। একশত বৎসর আগে, সে অক্ষর পড়িতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে ছিল না। অথচ আজ কাল পণ্ডিতেরা এই সব আঁচড় পড়িয়া তাহা হইতে কত সংবাদ কত ইতিহাস উদ্ধার করিতেছেন! বিদ্যা বুদ্ধিও বাণিজ্যে বাবিলনের লোকেরা অসুরদের চাইতে অনেক বেশী অগ্রসর ছিল সুতরাং তাহাদের ভাষা ধর্ম্ম শিল্প সাহিত্য আইন কানুন প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়েই অসুরেরা বাবিলনের অল্পাধিক অনুকরণ করিত। একটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে, বাবিলনের অক্ষরের পাশে পারস্যের অক্ষরে লেখা একটা যুদ্ধের বর্ণনা দেখিয়া

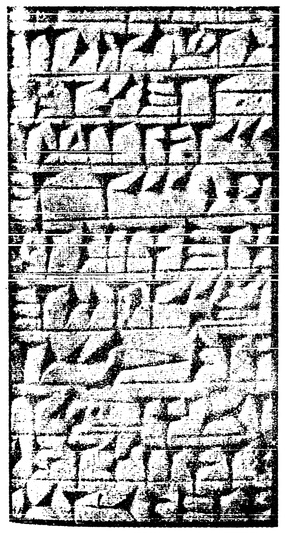

একজন ইংরাজ পণ্ডিত এই দুয়ের তুলনা করিয়া বাবিলনের অক্ষরের সঙ্কেত বাহির

করেন। এইভাবে গ্রীক অক্ষরের সাহায্যে ইজিপ্টের অদ্ভুত ছবিওয়ালা অক্ষরের রহস্য বাহির করা হয়। এই সকল পুরাতন অক্ষরে লেখা ইঁটের পুঁথি, কীর্ত্তিস্তম্ভ বা খোদাই করা পাহাড় প্রভৃতি হইতে অসুরদের ইতিহাসের অনেক কথা জানা গিয়াছে। অনেক রাজার নাম ও তারিখ অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা, ছোট বড় নানা জাতির সহিত সন্ধিও বিবাদের সংবাদ এ সমস্তই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অসুরদের প্রধান অস্ত্র ছিল তীর ধনুক। তাহারা ঘোড়ায় ও রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিত, সঙ্গে পদাতিক সৈন্যও থাকিত। যেমন যোদ্ধা তেমনি শিকারী। আমাদের দেশের মত অসুরের দেশেও সেকালের রাজারা মৃগয়া করিতেন। হিংস্র জন্তু নষ্ট করিয়া প্রজাকে রক্ষা করা রাজারই কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইত।

অসুরে রাজাদের বীরত্বের কথা বলিতে গেলে একজনের কথা বিশেষভাবে বলা উচিত তাঁহার নাম টিগ্‌লাৎ-পিলেসের। তিন হাজার বৎসর আগে ইনি অসুর দেশের

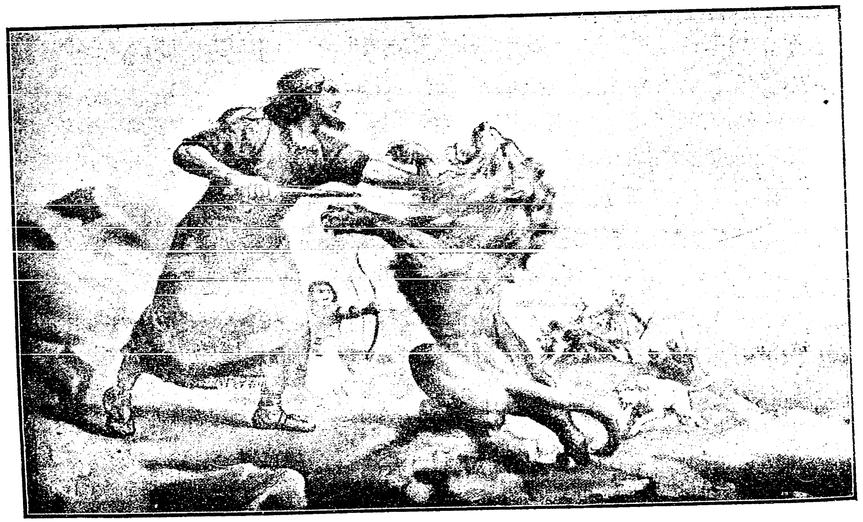

রাজা হইয়া নানা দেশ জয় করেন। তাঁহার শাসনে অসুরের রাজ্য ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইনি যখন উত্তরে দিগ্বিজয় করিতে বাহির হ'ন তখন

বাবিলনের সৈন্যেরা তাঁহার রাজ্য আক্রমন করে এবং রাজ মন্দিরের দেবমূর্ত্তি চুরি করিয়া লইয়া যায়। টিগ্‌লাৎ-পিলেসের ইহার প্রতিশোধের জন্য বাবিলন আক্রমন করেন ও তাহার রাজধানী পর্য্যন্ত লুটিয়া অনেকখানি দেশ অধিকার করিয়া ফেলেন। একদিকে যেমন যোদ্ধা, অন্যদিকে টিগ্‌লাৎ-পিলেসের একজন অসাধারণ শক্তিশালী শিকারী ছিলেন। হাতী সিংহ প্রভৃতি ভয়ানক জন্তু তিনি নিজের হাতে তীর, ধনুক ও তলোয়ার লইয়া শিকার করিতেন। তিনি রথে চড়িয়া প্রকাণ্ড দশটা হাতী ও প্রায় আট শত সিংহ শিকার করেন—ইহা ছাড়া পায়ে হাঁটিয়া যে সকল সিংহ মারেন তাহার সংখ্যাও এক শতের উপর হইবে।

টিগ্‌লাৎ পিলেসের মারা গেলে পর অসুরদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়ে। তাহাদের প্রকাণ্ড রাজ্য ক্রমেই ছোট হইতে থাকে। প্রায় দুই শত বৎসর পরে আরও কয়েকটি শক্তিশালী রাজার আবির্ভাব হয় এবং ইঁহারা আবার দেশকে জাগাইয়া তোলেন। এই সকল রাজাদের মধ্যে অসুর-নসির-পালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রাজত্বকালের নানারূপ চিহ্ন ও পরিচয় খুব প্রচুর পরিমানে পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে দেখা যায় যে ইনি এক দিকে যেমন সৌখিন, অপর দিকে যুদ্ধের সময় তেমনি হিংস্র ও নিষ্ঠুর ছিলেন। দেশ বিদেশের লোক তাঁহার নামে ভয়ে কাঁপিত।

ইঁহার রাজত্বের পর হইতে ক্রমে আবার অসুরদের অবনতি আরম্ভ হয়। তারপর অসুররাজকুলের শেষ যোদ্ধা মহাবীর অসুর-বাণি-পালের সময়ে আর একবার এ দেশ মাথা তুলিয়া উঠে। উৎসাহের চোটে অসুরেরা একেবারে আফ্রিকায় গিয়া ইজিপ্ট জয় করিয়া ফেলিল—দক্ষিণে আরবের মরুভূমিতে সসৈন্যে হাজির হইল। কিন্তু ইহাই তাহাদের শেষকীর্ত্তি। ক্রমাগত যুদ্ধবিদ্রোহের ফলে সমস্ত জাতি যখন অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন প্রবল শত্রুরাও সুযোগ বুঝিয়া চারিদিক হইতে তাহাদের রাজ্য লুটিয়া লইল। অবশেষে পারস্যের দুর্দ্দান্ত সেনাদল আসিয়া তাহাদের রাজধানী ঘিরিয়া ফেলিল। নিনেভে সহরের চারিদিকে প্রকাণ্ড দেয়াল ঘেরা। এই দেয়ালের জোরে অসুরেরা তিনবৎসর ধরিয়া তাহাদের প্রাচীন সহরের জন্য লড়াই করিল—কিন্তু অবশেষে হার মানিতেই হইল। তারপর এতদিনের সাধের সহর শত্রুর হাতে পড়িয়া একেবারে ছারখার হইয়া গেল।

কোথায় বা অসুর রাজ্য—আর কোথায় বা সেই অসুর জাতি। দু'হাজার বছর সারা দেশ কাঁপাইয়া যাহারা রাজত্ব করিল, এখন কেই বা তাহাদের খবর রাখে। অত বড়

নিনেভে সহর, সেও মাটির নীচে কবর চাপা পড়িল। এখন আবার লোকে সেই কবর খুঁড়িয়া তাহার কঙ্কাল বাহির করিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখ শ্মশানের মত দেশ, লোক নাই জন নাই, আছে কেবল মৃত সহরের জীর্ণ কঙ্কাল, আর রাত্রের অন্ধকারে সিংহের হুঙ্কার।

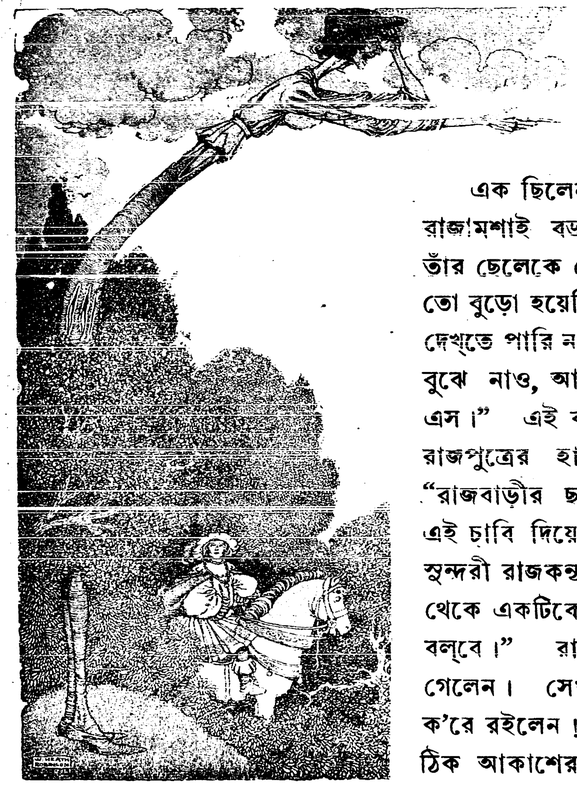

তিন বন্ধু।

এক ছিলেন রাজা—তাঁর ছিল এক ছেলে রাজামশাই বড্ড বুড়ো হয়েছেন; তাই তিনি তাঁর ছেলেকে ডেকে বল্লেন, "দেখ বাবা, আমি তো বুড়ো হয়েছি, কাজ কর্ম্ম আর ভাল ক'রে দেখ্‌তে পারি না। এখন তুমি আমার কাজকর্ম্ম বুঝে নাও, আর একটি সুন্দর লক্ষ্মী বৌ নিয়ে এস।" এই ব'লে তিনি একটা সোণার চাবি রাজপুত্রের হা'তে দিলেন, আর বল্‌লেন, "রাজবাড়ীর ছাতের দক্ষিণ কোণার ঘরটিকে এই চাবি দিয়ে খুলে, তার ভিতরে গিয়ে যে সুন্দরী রাজকন্যাদের ছবি দেখ্‌বে, তাদের মধ্যে থেকে একটিকে পছন্দ ক'রে আমায় এসে বল্‌বে।" রাজপুত্র তখনই সেই ঘরটিতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি একেবারে হাঁ ক'রে রইলেন! ঘরটি গোল আর তার ছাত ঠিক আকাশের মত নীল; তার উপর সোণা রূপোর তারা ঝল্‌ মল্‌ করছে। ঘরের চারিদিকে সোণা দিয়ে বাঁধান বারটি জানালা; তার প্রত্যেকটির উপর চমৎকার পোষাক

পরা একটি সুন্দরী রাজকন্যার ছবি আকা। তার মধ্যে কে যে বেশী সুন্দরী তাই সে আর ঠিক কর্‌তে পার্‌ছে না। এমন সময় সে দেখ্‌ল যে একটি জানালা পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। তাড়াতাড়ি সে পর্দ্দা উঠিয়ে দেখে কি,—একটি অতি সুন্দরী রাজকন্যার ছবি। তার পোষাক কিন্তু একেবারে সাদাসিধে আর মাথায় মুক্তার মুকুট। বেচারার কিন্তু বড় বিষণ্ণ চেহারা;—যেন তার কত দুঃখ।

সেই রাজকন্যাকেই সে পছন্দ কর্‌ল, আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্য সব ছবি কোথায় মিলিয়ে গেল। রাজপুত্র বড়ই আশ্চর্য্য হয়ে, তখনই তার বাবাকে সব কথা জানাল। রাজামশাই তো সব শুনে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়্‌লেন,—"সর্ব্বনাশ! এই রাজকন্যাকে যে দুষ্ট যাদুকরে লোহার বাড়ীতে আটক ক'রে রেখেছে; যে একে ছাড়াতে যায় সেই যে আর ফেরে না! তোমার কপালে যে কত দুঃখ আছে, তা' আর কি বল্‌ব। এখন তো আর কোন উপায় নাই। পছন্দ যখন করেছ, তখন তার খোঁজে যাও!"

তখনই রাজপুত্র একটা খুব তেজী ঘোড়া নিয়ে রওয়ানা হয়ে পড়্‌ল। অনেক দূর গিয়েছে সে, এমন সময় শুন্‌তে পেল, কে যেন বল্‌ছে,—"আরে থামো না! থামো না!" রাজপুত্র অমনি পিছন ফিরে দেখ্‌ল যে এয়া লম্বা একটা লোক তাকে বল্‌ছে, "ওহে, আমাকে তোমার সঙ্গে নাও, দেখ্‌বে তোমার কত কাজ ক'রে দিতে পারি আমি।" রাজপুত্র বল্‌ল, "তোমার নাম কি? আর তুমি কর্‌তেই বা পার কি?" সে বল্‌ল, "আমার নাম ঢেঙারাম। আমি যত ইচ্ছা লম্বা হ'তে পারি। ঐ যে তালগাছের আগায় বাবুইএর বাসা দেখ্‌ছ, ওটিকে আমি এখনই পেড়ে দিতে পারি;—তাতে আমার গাছে চড়্‌বারও দরকার হবে না।" এই ব'লেই সে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তালগাছের মত লম্বা হয়ে গেল আর পাখীর বাসাটি পেড়ে নিয়েই চট্‌ করে আবার বেঁটে হ'য়ে গেল। রাজপুত্র বল্‌ল, "তা' তো দেখ্‌লাম; কিন্তু ওতে আমার কি সাহায্য হবে? এই বনটা পার হবার রাস্তা যদি বল্‌তে পার তবে বুঝব আমার সাহায্য কর্‌লে।" ঢেঙারাম আবার লম্বা হ'তে লাগ্‌ল আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে তালগাছ ছাড়িয়ে কোথায় তার মাথা উঠ্‌ল। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখে বল্‌ল, "ঐ যে রাস্তা দেখা যাচ্ছে।" তারপর সে আবার বেঁটে হয়ে, ঘোড়ার লাগাম ধরে পথ দেখিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। খানিক দূর গিয়ে বল্‌ল, 'ঐ যে আমার বন্ধু যাচ্ছে। ওকে ধরে নিয়ে আসি।" ব'লেই সে চট্‌ করে আকাশের মত লম্বা হয়ে গেল আর এয়া লম্বা দুই পা ফেলে তার বন্ধুর কাছে গিয়ে

উপস্থিত হ'লো। তারপর আর কোন কথাবার্ত্তা না ব'লে তাকে হাতে ধরে উঠিয়ে নিয়ে রাজপুত্রের কাছে চ'লে এল। বন্ধুটির বেশ ষণ্ডামার্ক চেহারা। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তোমার নাম কি? আর কিই বা কর্‌তে পার তুমি?" লোকটি বল্ল, "আমি ভোঁদারাম। আমি নিজেকে ফুলিয়ে প্রকাণ্ড বড় হয়ে যেতে পারি। কিন্তু এই বেলা ঘোড়া ছুটিয়ে পালাও, নইলে আমি এত তাড়াতাড়ি ফুলে উঠ্‌ব যে ভারি বিপদে পড়বে, এই বলেই সে ফুটবলের মত ফুল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। ঢেঙারাম তো আগেই দৌড় দিয়েছে। রাজপুত্রও দেখাদেখি ঘোড়া ছুটিয়ে স'রে পড়্‌তে লাগ্‌লেন। ফুলে ফুলে পাহাড়ের মত বড় হয়ে ভোঁদারাম হঠাৎ আবার ছোট হ'তে আরম্ভ কর্‌ল। পেটে যত বাতাস ভরে ছিল সব ছেড়ে দিতে তার মুখে থেকে এম্নি জোরে বাতাস ছুট্‌তে লাগ্‌ল যে ঝড়ের বাতাস কোথায় লাগে! তা' দেখে রাজপুত্র বল্‌ল, "বেশ, এমন লোক সচরাচর মেলে না। তুমি আমাদের সঙ্গে চল।" এই ব'লে তারা তিনজনে এগুতে লাগ্‌ল।

খানিক দূর গিয়ে রাজপুত্র দেখ্‌ল একটি লোক চোখে পট্টি বেঁধে রাস্তা দিয়ে চ'লেছে। ঢেঙারাম বল্‌ল, "ঐ আমাদের আরেক বন্ধু,"। রাজপুত্র সে লোকটিকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তুমি কেহে? অমন ক'রে যে চেখে বেঁধে রাস্তা দিয়ে চ'লেছ, পথ দেখ্‌বে কেমন ক'রে?"

লোকটি বল্ল, "আমার নাম আগুণেচোখ। তোমরা খোলা চোখে যা দেখ, আমি চোখ বেঁধে রাখ্‌লেই তা' দেখ্‌তে পাই। খোলা চোখে দেখলে যত মোটা জিনিষই হোক না কেন, তার এপার ওপার স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই। ভাল ক'রে কোন্ জিনিষের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাক্‌লে সেটা হয় হাজার টুক্‌রো হয়ে ভেঙে যায়, না হয় পুড়ে ছাই হয়ে যায়।" এই ব'লেই সে চোখের বাঁধন খুলে সাম্‌নের একটা পাহাড়ের দিকে কটমট ক'রে চেয়ে রইল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাহাড়টা ফেটে, ভেঙে চুরমার হয়ে একটা বালির ঢিপি হয়ে গেল, আর তার ভিতর থেকে এক তাল সোণা বের হ'লো। আগুণেচোখ সেই সোণার তালটা রাজপুত্রকে দিল।

রাজপুত্র খুব খুসী হয়ে বল্‌ল, "দেখ তো সেই রাজকন্যা কি কর্‌ছেন, কোথায় তিনি আছেন, আর এখান থেকে কত দূর?"

আগুণে চোখ বল্‌ল, "ঐ যে তিনি একলা সেই লোহার বড়ীতে বন্ধ হয়ে ব'সে ব'সে কাঁদছেন। ওঃ সে যে অনেক লম্বা রাস্তা। এমনি ক'রে ঘোড়ায় চড়ে গেলে যে এক বছরেও সেখানে পৌঁছাতে পার্‌বে না। অবশ্য ঢেঙারাম যদি নিয়ে যায় তবে

সন্ধ্যার আগেই সেখানে পৌঁছে যাব।" অমনি ঢেঙারাম আর তিনজনকে কাঁধে নিয়ে রওয়ানা হ'লো। সন্ধ্যার সময় সেই লোহার বাড়ীর দরজায় তারা পৌঁছে দেখ্‌ল দরজা খোলা রয়েছে। তাই দেখে যেই তারা ভিতরে ঢুকেছে, অমনি দরজা দ্‌ড়াম্ করে বন্ধ হয়ে গেল আর তারা সেই বাড়ীর মধ্যে বন্দী হয়ে গেল। তখন কি আর করে—তারা এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে সব দেখ্‌তে লাগল। চারিদিকে অনেক লোকজন, তাদের খুব জমকাল পোষাক, কিন্তু কেউ নড়ে চড়ে না—সব যেন পাথর হয়ে রয়েছে।

(ক্রমশঃ)

লাল রং।

লাল রং বাজারেতে কিনিতে যে পাই,
প্রাণীদের রক্ত লাল দেখেছ ত ভাই!
পান খেলে লাল ঠোঁট করে টুক্‌টুক্,
কোকিলের চক্ষু লাল, চন্দানর মুখ।
মখমলী পোকা, নাম বীরবৌটী বলে,
আষাঢ়ে পড়িলে জল দেখি দলে দলে।
বাগানেতে নানা জাতি ফুটে লাল ফুল—
লাল বক, লাল জবা, সেঁজুতি পারুল;
অশোক, শিমুল আর ডালিম পলাশ,
কেহ হয় গন্ধহীন, কেহ অল্প বাস;
গোলাপ, করবী ফুল বাঁধুলিকাঞ্চন,
সর্ব্বজয়া কৃষ্ণচূড়া লোহিত বরণ।
কোকনদ, লাল সুঁদি পুকুরের জলে,
লালের বাহার কত দেখি ফুলে ফলে।
কত কীট, কত পাখী দেখি রাঙা বেশ,
বিধাতার রাজ্যে ফিরে, নাহি তার শেষ।
মাথার সীমন্তে লাল সিন্দুরের রেখা,
চরণেতে দেখি লাল আল্‌তার দেখা।
আবীরের লালে লাল দোলের সময়,
ক্রোধে লাল দুই আখি দেখে লাগে ভয়।

প্রবাল বিদ্রুম চূণী রক্ত আভা ধরে,
সকাল, সন্ধ্যায় দেখি রক্তিমা অম্বরে।
রঙে ক'রেছেন যিনি বিচিত্র এ ধরা,
ভক্তি ভরে করি তাঁরে প্রণতি আমরা।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

নূতন ধাঁধা।

(১)

খ্যাত এক মহাজন সবে জান যাঁরে,
সমভাবে দুই ভাগে কাটিলাম তাঁরে—
একভাগ রসে ভরা বাহিরে কঠিন,
আর ভাগ বিবাহেতে সভায় আসীন!
মুড়ো ঘ্যাঁষা ক'রে আরো যদি তারে কাটি
দেখিবে সমাধি এক অতি পরিপাটি॥

(২)

পেট কেটে ছুটে যায় শন্ শন্ তীর,
মুড়ো বাদে একমণ সে কেমন বীর!
দক্ষিণে নাহি পাবে ল্যাজ যদি কাটো,
পূরাপুরি মেপে দেখ অতিশয় খাটো।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর—

১। ঘড়ির দুই কাঁটা।
২। চাদর।

[ধাঁধার উত্তর যাঁহারা দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম আগামী বারে বাহির হইবে।]

ক্রমিক সং
কলিকাতা।

"সেকালের বাদুড়"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চতুর্থ বর্ষ ফাল্গুন, ১৩২৩ একাদশ সংখ্যা

মা ও ছেলে।

বিছানাতে খোকনেরে থুয়ে,
মা তাহার পাশে শুয়ে শুয়ে
স্নেহরসে উছলিত প্রাণ
ধীরে ধীরে গান স্নেহ-গান।
"ঘুমো যাদু! ঘুমো ওরে ঘুমো"—
ব'লে তা'র চোখে খান্ চুমো।

"মা"—বলিয়া খোকা উঠে জেগে'।
"দুষ্টু ছেলে"—মা বলেন রেগে'
"কস্‌নে কথা চুপ্—তা না হ'লে—"
হেসে' খোকা অম্‌নি উঠে ব'লে,—
"বল তুমি কেমন ক'রে ঘুমাই
চোখে যদি খাও মা শুধু চুমা—ই?"

শ্রীগণেশচন্দ্র রায়।

COLOURED DOCUMENT.

নিরেট গুরুর কাহিনী।

ঘোড়ায় থেকে পড়ে যাওয়া।

ব্রাহ্মণের ভবিষ্যৎবাণীর পর কিছুদিন গুরু খুবই সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন জল খাওয়া ছাড়া জলের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই রাখিলেন না। কখন জল পড়িয় পা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে বলা যায় না ত? কিন্তু ঘরে বসিয়া বেশীদিন চলে না, কার শিষ্য যজমানরা কেহই গুরুর বাড়ী আসিয়া টাকা দিয়া যাইত না। কাজেই গুরুকে আবার ঘর ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে শিষ্য বাড়ী ঘুরিতে আরম্ভ করিতে হইল।

একদিন গুরু ঘোড়ায় চড়িয়া রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন, চেলার দল পিছনে হাঁটিয় চলিয়াছে। রাস্তার ধারে একটা গাছ ছিল, তার একটা ডাল রাস্তার উপর ঝুঁকিয় পড়িয়াছিল। গুরু গাছতলায় আসিবামাত্র তাঁহার পাগড়ীটা ডালের ঠোক্কর লাগিয় ধূলায় গড়াইয়া পড়িল। গুরু ভাবিলেন, তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ নিশ্চয় পাগড়ীটা তুলিয়াছে, অতএব তিনি ঘোড়া না থামাইয়া চলিতেই লাগিলেন। অনে দূর চলিয়া যাইবার পর তাঁহার হঠাৎ মাথায় রোদ লাগাতে তিনি ঘোড়া থামাইয় এক শিষ্যকে বলিলেন, "ওহে, আমার পাগড়ীটা দাও ত।" সে খুব নিশ্চিন্ত ভা বলিল, "আপনার পাগড়ী? সেটা ত সেই গাছতলায় পড়ে আছে।" গুরু রাগিয় বলিলেন, "কোন জিনিষ পড়ে গেলে সেটা কুড়িয়ে আনতে হয় তাও জাননা নাকি?" হাবা তাড়াতাড়ি সেই গাছতলায় দৌড়িয়া গিয়া পাগড়ীটা কুড়াইয়া লইল। উহা লইয় ফিরিয়া আসিতে আসিতে সে রাস্তায় আর একটা জিনিষ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিল জিনিষটা গুরুমহাশয়ের ঘোড়ার বটে তবে তুমি আমি তাহা কুড়াইয়া আনিবার কথ স্বপ্নেও ভাবিতাম না। কিন্তু হাবার কথা আলাদা, সে হইল গুরু নিরেটের চেলা, সে জিনিষটা কুড়াইয়া লইয়া গুরুর পাগড়ীর উপর রাখিয়া ফিরিয়া চলিল;—গুরু পড়িয় গেলে জিনিষ কুড়াইয়া আনিতে বলিয়াছেন যে!

হাবা গুরুর হাতে পাগড়ী দিবামাত্র তিনি ব্যাপার দেখিয়া "আরে ছি ছি" বলিয়া চীৎকার করিয়া পাগড়ীটা দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং হাবাকে খুব বকিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সব কজন শিষ্য তখন একজোট হইয়া চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল. "গুরুমহাশয় এ কি? আপনিই না বলেছিলেন যে রাস্তায় যা কিছু পড়ে যাবে, সব কুড়িয়ে নিয়ে আসতে হবে? হাবা ত ঠিক তাইই করেছে, তবে আপনি অত বকছেন

কেন?" গুরু মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, "বলি, কোন জিনিষটা তুলতে হয় আর কোনটা হয়না তা বুঝবার মত বুদ্ধিও কি তোমাদের ঘটে নেই?" শিষ্যগণ মুখ হাঁড়ি করিয়া বলিল, "তাই যদি থাকবে তাহলে আর আমরা চেলা হতে এসেছি কিসের জন্য? নিজেরাই ত এক একজন গুরুমহাশয় হতে পারতাম? তা আপনি কাগজে লিখে দিন যে কি কি জিনিষ পড়ে গেলে কুড়তে হবে তা হলেই আমরা ঠিক ভাবে কাজ করতে পারব।" গুরু অগত্যা তাহাই করিলেন।

আরও খানিক দূর যাইবার পর আর এক বিপদ ঘটিল। বৃষ্টি হইয়া রাস্তাটা খুব পিছল হইয়াছিল, খোঁড়া ঘোড়াটা পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে গুরুও

মাথা নীচের দিকে আর পা উপর দিকে করিয়া এক ডিগ্‌বাজী খাইয়া রাস্তার পাশে এক গর্ত্তে পড়িয়া গেলেন। তিনি সেইখান হইতেই "ওরে বাবারে, গেলুম রে, আমাকে

শিগ্‌গির তোলরে," বলিয়া চেঁচাইতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যেরা তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া গিয়া গর্ত্তের ধারে হাজির হইল। একজন সেই কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল. "পাগড়ী পড়িয়া গেলে তুলিতে হইবে, কাপড় পড়িয়া গেলে তুলিতে হইবে, চাদর পড়িয়া গেলে তুলিতে হইবে, জামা পড়িয়া গেলে তুলিতে হইবে," ইত্যাদি, এবং বাকী কজন চট্‌পট্ গুরুর জামা কাপড় প্রভৃতি গর্ত্ত হইতে তুলিতে আরম্ভ করিল, বাকী রহিলেন কেবল গুরু নিজে। তিনি যতই চীৎকার করেন, "ওরে আগে আমাকে তোল," বুদ্ধিমান চেলারা ততই মাথা নাড়ে, আর বলে, "আপনাকে তোলবার কথা ত কাগজে লেখা নেই। যা লেখা নেই তা আমরা কিছুতেই করছি না, আবার গাল খাই আর কি!" শত চীৎকারে আর বকুনিতেও যখন কিছু হইল না, তখন গুরু তাহাদিগের নিকট হইতে কাগজখানা চাহিয়া লইলেন, আর সেই গর্ত্তের ভিতর বসিয়াই লিখিলেন "আমি যদি পড়িয়া যাই, তাহা হইলে আমাকেও তুলিতে হইবে"।

কাগজখানা হাতে পাইবামাত্রই পাঁচ শিষ্য একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া গুরুকে টানিয়া তুলিল। গুরুর তখন যা অবস্থা! সমস্ত শরীর কাদায় আর ময়লায় ভরিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে কিছু দূরেই একটি পুকুর ছিল, সেইখানে গিয়া তিনি স্নান করিয়া আবার কাপড় চোপড় পরিলেন। তখন চেলারা তাঁহাকে আবার ঘোড়ায় চড়াইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। তাহাদের যে কত বুদ্ধি সেই বিষয়ে গল্প করিতে করিতে শীঘ্রই তাহারা সকলে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।

রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ।

(পদ্মপুরাণ)

যজ্ঞীয় অশ্ব কুণ্ডলনগর হইতে বাহির হইয়া কত রাজার দেশ ঘুরিয়া বেড়াইল, কেহই তাহাকে ধরিতে সাহসী হইল না। অবশেষে একদিন প্রাতঃকালে অশ্ব গঙ্গার তীরবর্ত্তী বাল্মীকি মুনি আশ্রমে গিয়া উপস্থিত।

সীতার বনবাসের সময় তিনি বাল্মীকি মুনির আশ্রমে বাস করিতেন। সেখানে তাঁহার দুইটি যমজ পুত্র জন্মিয়াছিল—বাল্মীকি তাহাদের নাম রাখিলেন লব আর কুশ। তাঁহারই যত্নে এবং শিক্ষার গুণে লব কুশ বড় হইয়া সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং মহা

ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিল। বাল্মীকিদত্ত অভেদ্য ধনু হাতে লইয়া, পিঠে অক্ষয় তূণ ঝুলাইয়া দুটি ভাই ঋষিকুমারদিগের সহিত বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত। যজ্ঞীয় অশ্ব বাল্মীকি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র লব তাহাকে দেখিয়া ভারী আশ্চর্য্য হইল। এমন সুন্দর সজ্জিত অশ্ব কোথা হইতে আসিল? এটি কাহার অশ্ব? লব অশ্বের নিকটে গিয়া দেখিল তাহার কপালে একখানা পত্র ঝুলিতেছে, তখন পত্রখানি লইয়া পড়িবামাত্র লব ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল—"কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমরা কি ক্ষত্রিয় সন্তান নই? আমরা কি যুদ্ধ জানি না? রাম কে? শত্রুঘ্নই বা কে? আমি এই অশ্ব বাঁধিব।" মুনিবালকেরা রামের শক্তি সামর্থ্যের কথা বলিয়া তাহাকে অনেক বারণ করিল কিন্তু লব তাহাদের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া অশ্বকে ধরিল। শত্রুঘ্নের অনুচরগণ অশ্ব উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিলে পর লব বাণ দ্বারা তাহাদের হাত কটিয়া ফেলিলেন। তখন ছিন্নবাহু অনুচরেরা যাতনায় চীৎকার করিতে করিতে শত্রুঘ্নের নিকট গিয়া উপস্থিত।

অনুচরগণের দুরবস্থা দেখিয়া শত্রুঘ্নের রাগ হইবার ত কথাই! তিনি তখনি তাঁহার সেনাপতি কালজিৎকে হুকুম করিলেন, সেনাপতিও সৈন্য লইয়া লবের নিকটে গিয়া উপস্থিত। তাহাকে বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না, লবের বাণে সৈন্যগণ ত মরিলই সঙ্গে সঙ্গে কালজিৎও মারা গেল। তখন পুষ্কল মহা ক্রুদ্ধ হইয়া লবকে মারিতে চলিলেন। লবকে মাটিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পুষ্কল প্রথমেই তাহাকে রথ দিতে চাহিলেন, তাহাতে লব বলিল—"তোমার দেওয়া রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিব কেন? ভাবনা কি! আমি এখনি তোমাকে রথশূন্য করিতেছি, তারপর তুমিও মাটিতে দাঁড়াইয়াই যুদ্ধ করিও।" এই বলিয়া লব চক্ষের নিমেষে পুষ্কলের হাতের ধনু কাটিয়া ফেলিল। অন্য ধনু হাতে লইয়া পুষ্কল গুণ পরাইতে যাইবেন সেই অবসরে লব তাঁহার রথখানিও কাটিয়া ফেলিয়াছে! পুষ্কল তখন মাটিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কেহই কম যোদ্ধা নয়, কত বাণ যে উভয়ে উভয়কে মারিল তাহার সীমাই নাই; বাণের আঘাতে দুজনেরই কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শরীরে রক্তের ধারা বহিল। শেষে লব এমনি ভয়ঙ্কর এক বাণ মারিল যে পুষ্কল কিছুতেই তাহা কাটিতে পারিলেন না, বাণ তাঁহার বুকে গিয়া বিন্ধিল—তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

ইহা দেখিয়া হনূমান প্রকাণ্ড একটা শিমুল গাছ লইয়া লবকে মারিতে উদ্যত হইলে লব তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। ইহার পর হনূমান যে গাছ লয় লব তাহাই কাটিয়া ফেলে। হনূমান যত পাহাড় পর্ব্বত ছুঁড়িতে লাগিল, লবের বাণে সব চূরমার।

মহা ক্রোধে হনূমান তখন তাহাকে লাঙ্গুল দিয়া জড়াইয়া ধরিল। লবের তাহাতে ভয় পাওয়ার কোন কথাই নাই; সে জননী সীতা দেবীকে স্মরণ করিয়া বানরের লেজে এমনি এক কিল মারিল যে বাছা হনূমান তাহাকে ছাড়িয়া না দিয়া আর করে কি! তার পর লব বাণের পর বাণ মারিয়া হনূমানকে একেবারে অস্থির করিয়া দিল। পলায়ন করিলে লজ্জার সীমা থাকিবে না আবার প্রহারই বা কত সহ্য করিবে? নিতান্ত নিরুপায় হইয়া হনূমান ভাবিল,—"ব্রহ্মার বরে আমার ত মরণ নাই কাজেই এখন কপট মূর্চ্ছা দেখাইয়া শুইয়া পড়ি।" এই ভাবিয়া হনূমান রণক্ষেত্রে কপট মূর্চ্ছা দেখাইয়া শয়ন করিল।

হনূমান মূর্চ্ছিত হইলে পর ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া শত্রুঘ্ন আসিলেন যুদ্ধ করিতে। লবের নিকটে আসিয়াই দেখিলেন ঠিক যেন রাম শিশুমূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এ শিশু নিশ্চয় সীতা দেবীর সন্তান। কিন্তু এ সকল চিন্তা করিবার আর বেশী অবসর পাইলেন না, লবের সম্মুখে আসিবা মাত্র তাহার হাজার হাজার তীক্ষ্ণ বাণ তাঁহার শরীরে বিন্ধিল। তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বালক হইলে কি হয়, লবের বাণগুলি সাংঘাতিক। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে শত্রুঘ্নকে মহা ব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাঁহার ধনু কাটিয়া, রথ কাটিয়া বর্ম্ম কাটিল, অবশেষে তাঁহার মাথার মুকুটও কাটিয়া ফেলিল। শেষে লবের দারুণ একটি বাণের আঘাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর শত্রুঘ্নের দারুণ ক্রোধ হইল, তাঁহার চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। যে বাণ মারিয়া লবণাসুরকে বধ করিয়াছিলেন তিনি তখন সেই মহা ভয়ঙ্কর বাণ ধনুকে জুড়িলেন। বাণের আগুনে চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শত্রুঘ্ন বাণ ছাড়িলেন, লব কিছুতেই তাহা নিবারণ করিতে পারিল না। তাহার বুকে আসিয়া বাণ বিদ্ধ হওয়া মাত্র সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ইহা দেখিয়া মুনিবালকেরা কান্দিতে কান্দিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে গিয়া সীতা দেবীকে সমস্ত সংবাদ জানাইল। এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া সীতা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কুশ মহাদেবের পূজা করিয়া বর লইবার জন্য দূরদেশে গিয়াছিল। ঠিক এই সময়ে সেও আসিয়া উপস্থিত। সে ত আর এ সব কথা কিছু জানিত না কাজেই সীতা দেবীকে এরূপ শোক করিতে দেখিয়া সে ভারী আশ্চর্য্য হইয়া মুনিবালকদিগকে ইহার কারণ

জিজ্ঞাসা করিল। তাহাদিগের মুখে সব শুনিয়া কুশের দুঃখও হইল, রাগও হইল। মাকে বলিল—"মা! কেন তুমি দুঃখ করিতেছ? এই যে আমি আসিয়াছি—এখনি আমি ভাই লবকে উদ্ধার করিব।" এইরূপে জননীকে শান্ত করিয়াই কুশ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত।

ততক্ষণে লবেরও জ্ঞান হইয়াছে। সম্মুখে কুশকে দেখিবামাত্র সে এক লাফে শত্রুঘ্নের রথ হইতে মাটিতে পড়িয়া তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত। তখন দুই ভাই মিলিয়া মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কুশ পূর্ব্বে লব পশ্চিমে, মধ্যখানে শত্রুঘ্নের সৈন্যদল, মনে হইল যেন তাহাদের আর এ যাত্রা নিস্তার নাই। প্রথমে শত্রুঘ্ন কুশের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কুশ লবের চাইতেও নিপুণ; শত্রুঘ্ন কত রকম বাণ মারিলেন সে হাসিতে হাসিতে সমস্ত কাটিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে নারায়ণাস্ত্র মারিল। এই মহা ভয়ঙ্কর অস্ত্র শত্রুঘ্নের কিছুই করিতে পারিল না দেখিয়া কুশ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"আপনি নারায়ণ অস্ত্রকেও ব্যর্থ করিলেন, কিন্তু আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এখন আমি তিনটি বাণ মারিয়া আপনাকে জয় করিব—আপনি সাবধান হউন।" এই বলিয়া কুশ আগুনের মত উজ্জ্বল এক অস্ত্র মারিল, শত্রুঘ্ন রাম নাম স্মরণ করিয়া সেটিকে কাটিলেন। কুশ দ্বিতীয় অস্ত্র মারিল তাহাও শত্রুঘ্নের বাণে দুই ভাগ হইয়া গেল। কিন্তু কুশের তৃতীয় বাণকে শত্রুঘ্ন কোন রকমেই ব্যর্থ করিতে না পারায় সে বাণের আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হইলেন।

শত্রুঘ্ন অজ্ঞান হইলে পর রাজা সুরথ আসিলেন যুদ্ধ করিতে। কিন্তু কুশের সঙ্গে তিনি কিছুতেই পারিয়া উঠিলেন না। তাহার এক ভীষণ বাণ খাইয়া তিনিও অজ্ঞান হইলেন। তখন হনূমান রাগে দাঁত কড়মড় করিতে করিতে আসিয়া কুশকে আক্রমণ করিল। দুইজনে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত দারুণ সংগ্রাম করিলে পর কুশ সংহারাস্ত্র মারিয়া হনূমানকে যখন বাঁধিয়া ফেলিল তখন আসিল সুগ্রীব। কিন্তু সুগ্রীব কুশের সঙ্গে কতক্ষণ পারিবে! কুশের বারুণ-পাশে তাহারও হনূমানের দশা হইল।

এদিকে লবও পুষ্কল, অঙ্গদ, বীরমণি প্রভৃতি বীরগণকে পরাজয় করিয়া কুশের নিকটে আসিয়া উপস্থিত। এত বড় বড় যোদ্ধাদিগকে পরাজয় করিয়া তখন দুই ভাইয়ের আনন্দ দেখে কে! তাহারা শত্রুঘ্ন এবং পুষ্কলের সুন্দর মুকুট এবং অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া হনূমান এবং সুগ্রীবের লেজ ধরিয়া টানিতে টানিতে মায়ের কাছে চলিল।

লব কুশকে দেখিয়া সীতা দেবীর কি যে আহ্লাদ হইল! তিনি ছুটিয়া আসিয়া দুই ভাইকে বুকে লইয়া কত আদর করিলেন। পরে যখন হনূমান ও সুগ্রীবের প্রতি তাঁহার নজর পড়িল, তখন তিনি মহা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! হায়, হায়, তোমরা এ কি করিয়াছ? শীঘ্র ইহাদের বাঁধন খুলিয়া দাও। জান না, এ যে হনূমান আর সুগ্রীব! রাবণের লঙ্কা পোড়াইয়া ছারখার করিয়াছিল এ সেই মহাবীর হনূমান—আর ইনি বানররাজ সুগ্রীব। ইহাদিগকে তোমরা কোথায় পাইলে?" জানকীর কথা শুনিয়া লব কুশ আদ্যোপান্ত সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। তখন সীতা দেবীর কি যে দুঃখ! তিনি লব কুশকে বলিলেন—"সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্ বাবা! হায়, হায়, কি উপায় হইবে! এ যে তোমাদের পিতা রামচন্দ্রের অশ্ব ধরিয়াছ! শীঘ্র উহাকে ছাড়িয়া দাও এবং রামচন্দ্রের ভ্রাতা শত্রুঘ্নের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।" সীতাদেবী তখন করযোড়ে সূর্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"হে প্রভু! আপনি দয়া করিয়া শত্রুঘ্ন প্রভৃতি বীরগণকে জীবিত করুন।" সূর্য্যদেব জানকীর প্রার্থনা শুনিলেন, রণক্ষেত্রে সমুদায় বীরগণ জীবন পাইল। তখন সৈন্যগণের সহিত শত্রুঘ্ন ফিরিয়া চলিলেন—বিজয়ী অশ্ব আগে আগে চলিল। অশ্ব লইয়া সকলে অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে পর রামচন্দ্র অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর করিলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

আমরা কথায় বলি "আকাশের মত নীল"। বাস্তবিক কিন্তু আকাশের কোন রং নাই। আমরা যাকে 'আকাশ' বলি সেটাত কেবল ফাঁকা আকাশ মাত্র নয়, তার মধ্যে পৃথিবীর বাতাস আর ধূলো বালি কত কিছু আছে। আমরা যে নীল দেখি, আর সকাল সন্ধ্যায় জমকালো রঙের ঘটা দেখি, এ সমস্তের কারণ ঐ ধূলা। ধূলা আর বাতাস যদি না থাকত আর আকাশটা সত্যসত্যই একেবারে ফাঁকা আকাশ হ'ত, তা হ'লে সেটাকে দেখাত একেবারে ঘুট্‌ঘুটে কালো। তার মধ্য থেকে চন্দ্রসূর্য্য তারা সব দিনদুপরে ঝক্‌ঝক্ করত।

নীহারিকা।

তোমরা আকাশে "কালপুরুষ" দেখিয়াছ? আজকাল, অর্থাৎ এই ফাল্গুন মাসে, প্রথম রাত্রে যদি দক্ষিণমুখী হইয়া দাঁড়াও, তবে প্রায় মাথার উপর এই "কাল পুরুষ" কে দেখিতে পাইবে, আর একবারটি যদি তাহাকে চিনিয়া রাখ, তবে আর কোন দিন ভুলিবে না।

পৃথিবীর যেমন মানচিত্র বা "ম্যাপ্" হয়, আকাশেরও তেমনি মানচিত্র আছে। এই রকমের অনেক মানচিত্রে আকাশের তারার সঙ্গে অনেক অদ্ভুত ছবি আঁকা থাকে; তাহার মধ্যে যদি কালপুরুষ বা Orion এর ছবি খুঁজিতে যাও, তবে হয়ত দেখিবে একটা হাত-পা-শুদ্ধ মূর্ত্তি আঁকা আছে, কিন্তু আকাশে খুঁজিলে অবশ্য সেরকম কোন চেহারা পাইবে না—দেখিবে কেবল ঐ তারাগুলি।

আকাশের গায়ে যে এত হাজার হাজার তারা ছড়ান রহিয়াছে, মানুষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই তাহার মধ্যে নানারকম ছবি ও মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া আসিতেছে।

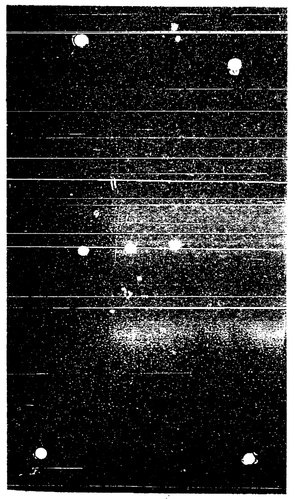

কতগুলা তারা মিলিয়া হয়ত অর্দ্ধচন্দ্রের মত দেখায়, মানুষে বলিল "ওটা ধনুকের মত;" কোনটা হয়ত মুকুট, কোনটা ষাঁড়ের মাথা, কোনটা ভাল্লুক, কোনটা যমজ ভাই, কোনটা যোদ্ধা, এইরূপ নানারকম কল্পনার মূর্ত্তিতে সমস্ত আকাশটিকে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক সময়েই এ সকল কল্পনাকে নিতান্তই আজগুবি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এই কালপুরুষের বেলা বোধ হয় কল্পনাটা বেশ খাটিয়াছে। দুই হাত দুই পা আর মাথা সবই মিলিতেছে, তার উপর আবার কোমর বন্ধ! তলোয়ারটি পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই! এত কথা যে বলিলাম সে কেবল ঐ তলোয়ারটির জন্য। ঐ 'তলোয়ার'টার দিকে একবার ভাল করিয়া দেখ দেখি; তিনটি তারার মধ্যে মাঝেরটি একটু কেমন কেমন নেখায় না? আর সবগুলি তারা পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে হীরার টুকরার মত, কিন্তু এটা যেন কেমন একটু ঝাপসা ঠেকে। শুধু চোখে এই

পর্য্যন্ত; কিন্তু দূরবীণ দিয়া দেখ, আরও তফাৎ দেখিবে। যত বড়ই দূরবীণ কষ না কেন, আর সব তারাগুলিকে কেবলি ঝিকমিকে হীরার মত দেখিবে, কিন্তু এই "তারা"টিকে দেখিবে যেন সাদা মেঘের মত। আকাশে এই রকম মেঘের মত জিনিষ আরও অনেক দেখা যায়—ইহাদের নাম নীহারিকা, ইংরাজিতে বলে Nebula.

পণ্ডিতেরা বলেন এই নীহারিকাগুলা এককালে তারা হইবে এবং এই তারাগুলাও এককালে নীহারিকা ছিল। আমরা যাহাকে সৌরজগৎ বলি—এই সূর্য্য এবং গ্রহ উপগ্রহশুদ্ধ তাহার বিশাল পরিবারটি—এ সমস্তই এককালে কোন এক প্রকাণ্ড নীহারিকার মধ্যে খিচুড়ি পাকাইয়া ছিল। সে যে কত বড় ব্যাপার তাহা কল্পনাও করা যায় না। সেই নীহারিকা আকাশের একটা প্রকাণ্ড কোণ জুড়িয়া জ্বলন্ত বাষ্পের মত দপ্‌দপ্ করিয়া জ্বলিত। তাহার মধে না ছিল চন্দ্রসূর্য্য, না ছিল পৃথিবী।

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কাহারও স্থির হইয়া থাকিবার নিয়ম নাই, একটা কণাপ্রমাণ বস্তু আর একটি কণাকে পাইলে এ উহাকে টানিয়া লয়, দশটা কণা একত্র হইলে পরস্পরের দিকে ছুটিয়া জমাট বাঁধিতে চায়। সুতরাং এত বড় নীহারিকাটি যে স্থির হইয়া থাকিবে, এমন কোন উপায় ছিল না—সে আপনার ভিতরকার টানাটানির মধ্যে পড়িয়া ঘোরপাক খাইতে লাগিল আর তাহার মধ্যখানে প্রকাণ্ড একটা বাষ্পের ঢিপি জমাট হইতে লাগিল। এই জমাট ঢিপিকেই এখন আমরা সূর্য্য বলি।

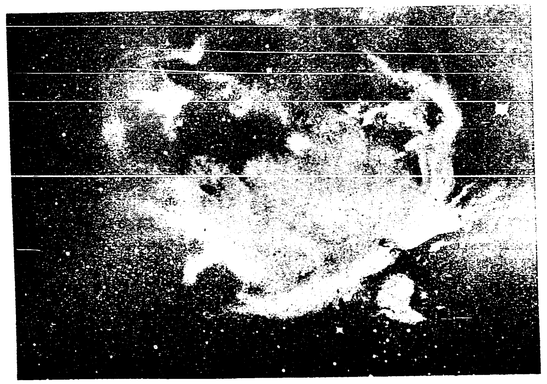

কালপুরুষের নীহারিকার ছবিটা একবার দেখ—ঐ জমাট মেঘের মত জিনিষটার ভিতর হইতে কত ডালপালা বাহির হইয়াছে; ঐ ডালপালাগুলি আবার আল্‌গাভাবে জমাট বাঁধিয়া গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি করিবে। ঘুরন্ত চাকার গা হইতে যেমন করিয়া কাদা ছিটকাইয়া যায়, এক একটা নীহারিকার চক্র হইতে ঠিক যেন সেই রকম জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। দেখিতে অবশ্য সমস্ত

নীহারিকাটি স্থির দেখা যায়—কারণ জিনিষটা এত দূরে যে ঘণ্টায় লক্ষ মাইল বেগে ছুটিলেও এখান হইতে তাহাকে একেবারে স্তব্ধ দেখা যাইবে!

এই আর একটা নীহারিকার ফটোগ্রাফ দেখ। ইহার মধ্যে ঐ জমাটবাঁধা আর ছড়াইয়া পড়ার ব্যাপারটা আরও সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। ছবিতে জিনিষটাকে

"জিবে গজার" মত লম্বা দেখিতেছ, কিন্তু আসলে জিনিষটি প্রায় থালার মত গোল—আমরা তাহার কাণার দিক হইতে ট্যারচা-ভাবে দেখিতে পাই, তাই ঐ রকম লম্বাটে দেখি। মাঝের ঐ ঘন উজ্জ্বল জিনিষটুকু এককালে, হয়ত কোটি কোটি বৎসর পরে, সূর্য্যের মত একটি আগুণের গোলা লইয়া দাঁড়াইবে। আর ঐ যে দুপাশে দুটি ছোটখাট ডেলার মত দেখিতেছ, উহার মধ্যে একটি ঘূর্ণিপাকে ঘুরিতেছে—ভবিষ্যতে সে "গ্রহ" হইয়া থাকিবে; আর একটি ঐ ঘূর্ণীর বাহিরে পড়িয়াছে, সেও হয়ত একটি ছোট্ট সূর্য্য হইয়া কিছুকাল, অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বৎসর, আলো দিয়া তারপর নিভিয়া যাইবে। জ্বলন্ত ধোঁয়ার ঘূর্ণী ক্রমেই ঝাপসা হইয়া কতদূর পর্য্যন্ত ডালপালা ছড়াইয়াছে—সেগুলিও হয়ত আরও কত জায়গায় জমাট বাঁধিয়া আরও কত ছোটখাট গ্রহের সৃষ্টি করিবে।

আকাশে এই রকম নীহারিকা কত যে আছে, তাহার আর অন্ত নাই। কোনটা একেবারে ঝাপসা কুয়াশার মত, কোনটার মধ্যে সবে একটু জমাট বাঁধিতেছে, কোনটা রীতিমত গোলা পাকাইয়া উঠিতেছে। এক একটার চেহারা ঠিক যেন ঘুরন্ত চরকী

বাজির মত, মনে হয় যেন জলন্ত চক্র

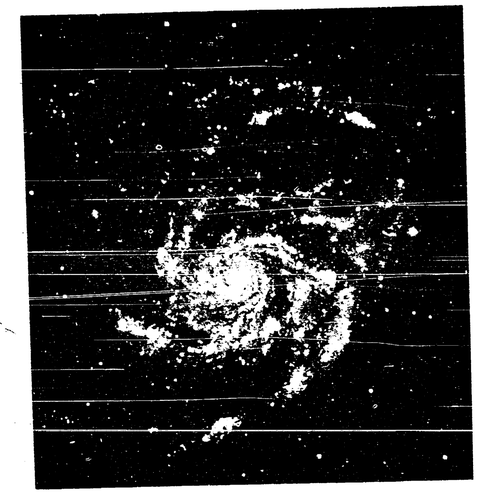

হইতে আগুণ ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। আবার এমন নীহারিকাও আছে যাহাকে এখন দেখিতে ঠিক তারার মতই দেখায়; সে যে এক সময়ে নীহারিকা ছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ এখনও তাহার আশে পাশে অতি ঝাপসা কুয়াশার মত নীহারিকার শেষ নিঃশ্বাসটুকু লাগিয়া আছে। সে এত ঝাপসা যে অনেক সময় খুব বড় দূরবীক্ষণ দিয়াও তাহার কিছু মাত্র ধরা যায় না,—ধরা পড়ে কেবল ফটোগ্রাফের প্লেটে!

ফটোগ্রাফের প্লেটে কেমন করিয়া ছবি তোলে দেখিয়াছ ত? ক্যামেরার ভিতর হইতে সে টুক্ করিয়া একটিবার মাত্র তোমার দিকে তাকায় আর ঐ একদৃষ্টিতেই তোমার চেহারার ছাপটুকু নিজের মধ্যে ধরিয়া লয়। সে একবার যাহা ভাল করিয়া ধরে তাহা আর ভুলিতে চায় না। এক মিনিট খুব ঝাপসা জিনিষের দিকে তাকাইলে মানুষের চোখ শ্রান্ত হইয়া পড়ে—সে তখন আর ভাল দেখে না; কিন্তু ফটোগ্রাফের প্লেট যত বেশী করিয়া তাকায় ততই বেশী দেখিতে পায়। এমনি করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া, সে ঐ অন্ধকারের মধ্যেই অনেক আশ্চর্য্য জিনিষের সংবাদ বাহির করে। এই রকম ফটোগ্রাফ দেখিলে বোঝা যায় যে সমস্ত আকাশটাই প্রায় নীহারিকায় ঢাকা—আকাশের যে দিকে তাকাও সেই দিকেই নীহারিকার জাল।

তিন বন্ধু।

(২)

বাড়ীর চারিদিকে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে তারা খাবার ঘরে এসে উপস্থিত। সেখানে চার জনের জন্য নানারকম সুন্দর খাবার সাজান রয়েছে দেখে তারা পেট ভরে খেয়ে নিল। তারপর তারা শোবার জোগাড় দেখবে ব'লে উঠ্‌তে যাচ্ছে—এমন সময় হঠাৎ দরজা খুলে গেল আর একটা বুড়ো, কুঁজো, বিদ্‌ঘুটে, এয়া লম্বা পাকাদাড়িওয়ালা লোক, একটি অতি সুন্দর রাজকন্যার হাতে ধ'রে ঘরে ঢুক্‌ল। রাজপুত্রকে দেখেই বুড়ো লোকটা বল্‌ল, "বাপু হে, সব জানি আমি! রাজকন্যাকে তো নিতে চাচ্ছ, কিন্তু তিনটি রাত যদি তাকে রক্ষা কর্‌তে পার,—তার আগে যদি সে হারিয়ে না যায়,—তবেই তাকে পাবে; নইলে এই এত গুলি লোকের মত তুমিও পাথর হয়ে যাবে।" এই বলে সে রাজকন্যাকে একটা চৌকিতে বসিয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

রাজপুত্রতো মেয়েটিকে দেখে বড় খুসী। সে তাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু মেয়েটি কিছুই বলে না;—হাসেও না। তারপর যখন রাত বেশী হয়ে এলো তখন ঢেঙারাম লম্বা হয়ে ঘরের চারিদিকে ঘিরে রইল; ভোঁদারাম এয়া মোটা হয়ে ফুলে তার পেট দিয়ে দরজার ছেঁদা বন্ধ ক'রে রইল, যাতে একটি ইঁদুরও না ঢুক্‌তে বা পালাতে পারে; আর আগুণে-চোখ চারদিকে খুব হুসিয়ার হয়ে তদ্বির করতে লাগ্‌ল।

কিন্তু সকলেই বড় ক্লান্ত হয়েছিল; তাই কিছুক্ষণ পরে সকলেই খুব নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে লাগ্‌ল। ভোরের বেলা রাজপুত্রেরই আগে ঘুম ভেঙে গেল, আর সে দেখ্‌ল যে রাজকন্যা ঘরে নাই। তখন যে তার দুঃখটা হ'লো! সে তাড়াতাড়ি আর তিনজনকে জাগিয়ে দিল, আর তখন কি কর্‌তে হবে জিজ্ঞাসা কর্‌ল।

আগুণে-চোখ বল্‌ল, "ভয় কিসের? ঐ যে আমি তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি। এখান থেকে একশ' মাইল দূরে একটা বন আছে। সেই বনে একটা আম গাছ আছে; তাতে একটি আম ফ'লেছে; তারই আঁঠিটি হচ্ছে সেই রাজকন্যা। ঢেঙারাম আমাকে কাঁধে নিয়ে চলুক; আমরা এখনই তাকে আন্‌ছি।"

অমনি ঢেঙারাম আর কথাবার্ত্তা না ব'লে আগুণে-চোখকে কাঁধে তুলে নিল, আর দশ মাইল লম্বা এক এক পা ফেলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সেখানে উপস্থিত হ'লো। তারপর আমের আঁঠি আন্‌তে আর কতক্ষণ লাগে!

সেই আঁঠিটি রাজপুত্রের হাতে দিয়ে আগুনে-চোখ বল্‌ল, "এটাকে মাটিতে ছুঁড়ে মার।" আর রাজপুত্রও কথামত কাজ করা মাত্র রাজকন্যা এসে হাজির!

সূর্য্য উঠ্‌বার একটু পরেই সেই বুড়ো হাস্‌তে হাস্‌তে এসে, দড়াম্ ক'রে দরজা খুলে ঘরে ঢুক্‌ল; কিন্তু সেখানে রাজকন্যাকে দেখে বেচারা এমন চম্‌কে গেল যে আরেকটু হ'লেই সে প'ড়ে যেতো। তারপর রাগে গজ্‌গজ্ কর্‌তে কর্‌তে সে রাজকন্যাকে নিয়ে চ'লে গেল।

সে দিন সন্ধ্যায় আবার বুড়ো এসে রাজকন্যাকে রেখে গেল। রাজপুত্র আর তিন বন্ধু সে রাত্রে জেগে থাক্‌বার জন্য খুবই চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দুপুর রাত্রের আগেই সকলে ঘুমিয়ে নাক ডাকাতে আরম্ভ কর্‌ল। ভোরের বেলা রাজপুত্র আগে জেগে যাই দেখ্‌ল রাজকন্যা নাই, অমনি অস্থির হ'য়ে তাড়াতাড়ী তিন বন্ধুকে জাগিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "আগুণে-চোখ! শীগ্‌গির দেখ, রাজকন্যা কোথায় গেল। সকাল যে হয়ে এল।"

আগুণে-চোখ জেগে উঠে চোখ রগ্‌ড়িয়ে বল্‌ল, "এই যে আমি তাকে দেখ্‌ছি। এখান থেকে দুইশ' মাইল দূরে একটা পাহাড় আছে; সেই পাহাড়ের মধ্যিখানে একটা পাথর আছে; সেইটিই হ'লো রাজকন্যা। ঢেঙারাম যদি আমায় নিয়ে যায় তবে এখনি আমি রাজকন্যাকে আন্‌ব।"

যেমন কথা তেম্‌নি কাজ। ঢেঙারাম তখনই আগুণে-চোখকে কাঁধে নিয়ে কুড়ি মাইল লম্বা এক এক পা ফেলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সেখানে হাজির হ'লো। আগুনে-চোখ

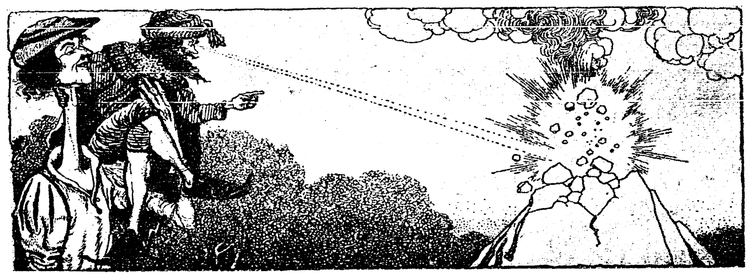

সেই পাহাড়ের দিকে কট্‌মট্ ক'রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সেই পাহাড়টাকে ফাটিয়ে

গুঁড়িয়ে দিল, আর তার ভিতর থেকে সেই পাথরটা বেরিয়ে পড়ল। সেটাকে নিয়ে রাজপুত্রের কাছে দিতেই, রাজপুত্র পাথরটা মাটিতে ফেলে দিল, আর রাজকন্যা এসে হাজির হ'লো!

সেদিন বুড়ো এসে রাজকন্যাকে দেখে যা চটে গেল, কি আর বল্‌ব! দুই হাতে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে বল্‌ল, "আজ রাত্রে দেখ্‌ব, তোর বেশী ক্ষমতা না আমার বেশী ক্ষমতা! হয় তুই মর্‌বি না হয় আমি মর্‌ব।"

সে রাত্রেও রাজপুত্র আর তিন বন্ধু রাজকন্যাকে পাহারা দিতে লাগ্‌ল, কিন্তু সেদিনও দুপুর রাতের আগেই সকলে ঘুমিয়ে পড়ল, আর রাজকন্যাও কোথায় জানি হারিয়ে গেল। ভোরের বেলা রাজপুত্র জেগে যাই দেখ্‌ল রাজকন্যা নাই, অমনি সে আগুণে-চোখকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "শীগ্‌গির দেখ রাজকন্যা কোথায় গেল!"

আগুণে-চোখ কিছুক্ষণ চারিদিকে তাকিয়ে তারপর বল্ল, "এবার তাকে দেখেছি! ঐ যে তিন শ' মাইল দূরে কালো জলের সাগর আছে; তার মাঝখানে, জলের তলায় একটা শামুক আছে; সেই শামুকের মধ্যে একটা আংটি আছে; সেটিই রাজকন্যা। এখনও চেষ্টা কর্‌লে আমি আর ভোঁদারাম ঢেঙারামের ঘাড়ে চড়ে সেখানে গিয়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার ক'রে আন্‌তে পারি।"

এ কথা বলা মাত্র ঢেঙারাম, আগুণে-চোখ আর ভোঁদারামকে কাঁধে নিয়ে, ত্রিশ মাইল লম্বা এক এক পা ফেলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে গিয়ে সেখানে হাজির হ'লো। তারপর ভোঁদারাম নিজের শরীরটি ফুলিয়ে পাহাড়ের চেয়ে বড় করে, চোঁ চোঁ শব্দে সাগরের জল খেতে আরম্ভ কর্‌লে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে জল এত কম হয়ে গেল যে ঢেঙারাম অনায়াসে শামুকটা তুলে এনে তার ভিতর থেকে আংটিটি বার ক'রে নিল।

এদিকে রাজপুত্র তো বড়ই অস্থির হয়ে পড়ল। সকাল হয়ে গেল, তবু তিন বন্ধু ফেরেই না। এমন সময় সেই বুড়ো হাস্‌তে হাস্‌তে দরজা খুলে ঘরে ঢুক্‌ল; কিন্তু কোন কথা বলার আগেই ঠন্ করে জানালার কাঁচ ভেঙে সেই আংটিটা এসে ঘরে পড়ল, আর রাজকন্যা উঠে দাঁড়াল। আগুণে-চোখ সেই তিনশ' মাইল দূর থেকে সব দেখতে পেয়েছিল আর তাই সে ঢেঙারামকে আংটিটা ছুঁড়ে দেবার কথা বলেছিল। ঢেঙারামও প্রকাণ্ড লম্বা হাত বের ক'রে আংটিটাকে সাঁই ক'রে ছুঁড়ে ঠিক ঘরের ভিতরেই ফেলে দিল, আর রাজপুত্রও বেঁচে গেল।

বুড়ো বেচারার যা তখন দুরবস্থা! তার চোখ কপালে উঠে গেছে, দাঁতে দাঁতে লেগে গেছে, আর থর্‌থর্ করে কাপ্‌ছে। কিছুক্ষণ পরে সে ধোঁয়া হয়ে গেল, আর একটা দাঁড়কাক সেই ধোঁয়া থেকে বেরিয়ে 'কা-কা' কর্‌তে কর্‌তে উঠে চ'লে গেল। সে বাড়ীর যত লোকজন পাথর হয়ে ছিল তারাও তখন বেঁচে উঠে রাজপুত্রের কাছে এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াল।

তারপর সকলকে নিয়ে রাজপুত্র খুব ধূমধাম ক'রে বাড়ী ফিরে এল। সেখানে বুড়ো রাজার আর দেশশুদ্ধ লোকের যা আনন্দ!

তিন বন্ধু কিন্তু রাজপুত্রের দেশে ফির্‌ল না; তারা সেই জঙ্গলেই ফিরে গেল, রাজপুত্র ত কত সাধাসাধি কর্‌ল, কিন্তু তারা আর কিছুতেই যেতে রাজি হ'লো না।

মায়া দূর্গ।

(মূর দেশের গল্প)

মূর জাতি যখন প্রবলপরাক্রান্ত ছিল, এবং স্পেন দেশ পর্য্যন্ত মুসলমানের আধিপত্য ছিল, সেই সময়ে উত্তর স্পেইনে একজন ভারী জবরদস্ত মুসলমান যাদুকর ছিল তার নাম আট্‌লান্‌টিস্। গভীর বনের মধ্যে পর্ব্বত গহ্বরে বৃদ্ধ আট্‌লান্‌টিস্ তার যাদুর পুঁথি পত্র নিয়ে নির্জ্জনে বাস করত—সংসারের প্রতি তার কোন একটা মায়া মমতা কিছু ছিল না। দুনিয়ায় আপনার বলতে তার একজন মাত্র ছিল—সেটি তার ভাইপো রোজার। রোজার সম্ভ্রান্ত রাজবংশের ছেলে, অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে খুড়ো আট্‌লাণ্টিসের কাছেই এসে সে আশ্রয় নেয়। বৃদ্ধ আট্‌লান্‌টিসও তাকে এমন ভালবাসত যে মুহূর্ত্তের জন্যও সে তাকে চোখের আড়াল করতে পারত না।

একদিন সে মন্ত্রের পুঁথি নিয়ে গণনা করতে করতে হঠাৎ জান্‌তে পারল যে তার এত আদরের রোজার বড় হয়ে তাকে ছেড়ে চলে যাবে এবং ভারী জবরদস্ত যোদ্ধা হয়ে সে পৃথিবীতে অনেক যশ উপার্জ্জন করবে। বৃদ্ধ যাদুকর তখন ক্ষেপে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করল—"কিছুতেই তা হতে দিব না। দেখা যাবে—রোজারের ভাগ্য আর আমার যাদুবিদ্যা এ দুয়ের মধ্যে কোনটার জয় হয়।"

আট্‌লাণ্টিস্ সেই রাত্রেই ভয়ঙ্কর উঁচু একটা পাহাড়ের উপরে মন্ত্রবলে আশ্চর্য্য এক দূর্গ প্রস্তুত করল। দূর্গের চারিদিক ইস্পাতের উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা—বাড়ী ঘর যা

কিছু সব ইস্পাতে তৈরি। পাহাড়ের চারিদিক ঘিরে নদী। একটা খুব সরু পথ দিয়ে দূর্গে যেতে হয়। পথটা এত সরু যে একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে অতি কষ্টে যেতে পারে; তাও আবার এমনি পিছল যে কখন পড়ে গিয়ে প্রাণটা যায়।

এই আশ্চর্য্য মায়াদূর্গ বানিয়ে যাদুকর রোজারকে সেখানে নিয়ে রাখল। দূর্গে লোক জনের অভাব ছিল না—চাকর, বাকর, সিপাই শান্ত্রী সকলি ছিল, খাবার জিনিষ পত্রের ত কথাই নাই! এই মায়াদূর্গে থেকে রোজারের বাল্যকাল কেটে গেল, ক্রমে সে যখন বড় হয়ে উঠল তখন যাদুকর ভাবল—"তাইত! রোজার এখন বড় হয়েছে, সে রাজপরিবারের ছেলে—এখন ত তার উপযুক্ত সঙ্গী চাই!" সঙ্গীর অভাব রইল না। আট্‌লাণ্টিস্ মন্ত্রবলে রোজারের বয়সী নানা দেশের প্রসিদ্ধ যোদ্ধা এবং সুন্দরী মেয়েদের এনে মায়াদূর্গে তার সঙ্গী করে রাখল। দূর্গের ভিতরেই সকলে কয়েদীর মত বদ্ধ থাকত, কিন্তু তাদের খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদের এমন চমৎকার বন্দোবস্ত ছিল যে তাদের দিনগুলি বেশ সুখেই কাটত।

এদিকে একজনের পর একজন করে যাদুকর কত সম্ভ্রান্ত লোকেদের যে মায়াদূর্গে আনতে লাগল তার সীমাই নাই! সম্রাট্ সার্লেমেনের সকলের চেয়ে বড় যোদ্ধা ছল রোলাণ্ড্। একদিন এই রোলাণ্ডও হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে পড়ল। তখন প্রসিদ্ধ যোদ্ধারা দলবদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করল যে মায়াদূর্গ নাশ করে সকলকে উদ্ধার করতেই হবে। কিন্তু মায়ামন্ত্রের কাছে বলবীরত্ব হার মেনে অনেকের প্রাণ গেল।

সম্ভ্রান্ত মাটাল্‌বেনো পরিবারের মেয়ে ব্রাডামাণ্ট শিশুকাল হতেই উত্তম যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন। কত বড় বড় যোদ্ধাকেও তাঁর কাছে হার মান্‌তে হতো। মায়াদূর্গের যাদুকরের অত্যাচারের কথা শুনে তিনি রাগে জ্বলে উঠ্‌লেন। তখনি বর্ম্ম পরে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে শাদা ধপ্‌ধপে যুদ্ধের ঘোড়ায় চড়ে চল্লেন মায়াদূর্গের উদ্দেশে।

অনেকদূর গিয়ে দেখ্‌লেন একজন যোদ্ধা পথের ধারে বড় বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। তাঁর দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলে পর তিনি বল্লেন—"আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কাল ঘোড়ায় চড়ে কাল চর্ম্ম পরা একজনলোক এসে আমার স্ত্রীকে নিয়েই শূন্যে চলে গেল। আমি চীৎকার করতে করতে পিছনে পিছনে ছুট্‌লাম বটে কিন্তু কোন লাভ হলো না—পরে জান্‌তে পারলাম মায়াদূর্গের সেই হতভাগা যাদুকরই আমার স্ত্রীকে চুরি করে পালিয়েছে।"

ব্রাডামাণ্টি বল্লেন—"মহাশয়! আপনি আপনার স্ত্রীকে উদ্ধার করবার কোন চেষ্টা করেননি কেন?"

"চেষ্টা করেছিলাম বটে কিন্তু দূর্গের সেই পিছল পথ পার হয় কার সাধ্য! কতবার যে চেষ্টা করেছি কিন্তু কোন মতে সে পথ পার হতে পারলাম না।"

ব্রাডামাণ্টি এই কথা শুনে বল্লেন—"আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি সে দুষ্ট যাদুকরকে জব্দ করে সকলকে উদ্ধার করব।"

তখন সেই যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে পথ দেখিয়ে চল্ল। ব্রাডামাণ্টির ঢালের মধ্যে যে চিহ্ন ছিল তা দেখে তাঁকে চিন্‌তে পেরে সেই দুষ্ট যোদ্ধার মনে বেজায় হিংসা হলো। পথে যেতে যেতে কেবলি সে ভাব্‌তে লাগল কি করে তাঁকে মেরে ফেলবে। ব্রাডামাণ্টির ক্ষমতা তার বেশ জানা ছিল সুতরাং বলপ্রয়োগ অসম্ভব—বিশ্বাসঘাতকতা না করলে কাজ উদ্ধার হবে না।

চারদিকে পাহাড়, রাস্তার আশে পাশে ভয়ঙ্কর সব গহ্বর। পথের ধারেই ভয়ানক গভীর অন্ধকার একটা গহ্বর দেখে দুষ্ট যোদ্ধাটি বল্‌ল—"দেখুন! এই পথে যাবার সময় এই গহ্বরে কান্না শুনে আমি চেয়ে দেখেছিলাম ভারী সুন্দরী একটি মেয়ে গহ্বর থেকে উঠবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করছিল আর তখনি বিকট চেহারার একটা লোক তাকে টেনে নিয়ে গহ্বরের ভিতর ঢুকে পড়ল।"

এই কথা শুনে ব্রাডামাণ্টি বল্‌লেন—"সত্যি! তাহলে ত একবার সে মেয়েটিকে উদ্ধারের চেষ্টা না করে চলে যাওয়াটা বড় অন্যায় হবে।" এই বলে তিনি খুব লম্বা একটা গাছের ডাল কেটে এনে সেটাকে গহ্বরের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে বল্লেন—"আপনি ডালটাকে শক্ত করে ধরে রাখুন আমি সেটা বেয়ে বেয়ে নীচে নেমে যাই।" ব্রাডামাণ্টি খানিকটা সবে নেমেছেন অমনি সেই হতভাগা ইচ্ছা ক'রে ডালটা ছেড়ে দিল, ব্রাডামাণ্টিও একেবারে গহ্বরের তলায় পড়ে গেলেন। বিশ্বাসঘাতক লোকটা এইরূপে কার্য্য উদ্ধার করেই সেখান থেকে চম্পট।

সৌভাগ্য বশতঃ ব্রাডামাণ্টি মারা গেলেন না, খানিকক্ষণ পরে জ্ঞান হয়ে তিনি দেখলেন তাঁর বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই, হাত, পা, সব ঠিকই আছে। গহ্বরের তলায় আর একটা গর্ত্ত দেখা যাচ্ছে তার মুখেই একটা খোলা দরজা। সেই দরজা দিয়ে ঢুকে খানিক দূর গিয়েই দেখ্‌লেন গির্জার মতন দেখ্‌তে ভারী সুন্দর একটা প্রকাণ্ড কামরা, সবই পাহাড়ের গা কেটে বানান। হলের ঠিক মাঝখানে কাল মার্ব্বেল পাথরের

প্রকাণ্ড একটা বেদী, ঠিক তার উপরেই সোণার তৈরী একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছে—সমস্ত হলটাকে দিনের মত দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

ব্রাডামাণ্টি ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে চারদিকে দেখ্‌ছিলেন এমন সময় একটি ছোট দরজা খুলে পরম সুন্দরী একটি মেয়ে এসে উপস্থিত। হলে এসেই তিনি বল্লেন—"ব্রাডামাণ্টি! তুমি এসেছ—ভারী সন্তুষ্ট হয়েছি। অনেক দিন থেকে আমরা অপেক্ষা করেছিলাম, কারণ তুমি যে এখানে আসবে তা তোমার জন্মের আগেই ভবিষ্যৎবাণী হয়েছিল।"

ব্রাডামাণ্টি একেবারে অবাক হ'য়ে বল্লেন—"আপনি কে? আমি এ কোথায় এসেছি?"

মেয়েটি বল্ল—"আমি যাদুকরী মেলিসা, আমি তোমার পরম বন্ধু। তুমি যে কাজে এসেছ আমা দ্বারা তার অনেক সুবিধা হবে। যাদুকরদের রাজা প্রসিদ্ধ মার্লিনের নাম শুনেছ? এটা হচ্ছে তাঁরই জীবন্ত সমাধি মন্দির। তিনি এই মন্দির তৈরী করে এখানেই যুগের পর যুগ ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছেন। কেউ যদি তার ভাগ্য জানতে চায় তিনি তখনি তার উত্তর দেন। তোমার নিশ্চয়ই খুব পরিশ্রম হয়েছে এবং ক্ষিদেও পেয়েছে এখন কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে থাক। ভোরবেলা আমি তোমাকে সেই মায়াদূর্গের পথ দেখিয়ে দিব। কি করে তুমি তাকে জব্দ করে সকলকে উদ্ধার করবে তারও উপায় বলে দিব।"

পরের দিন ভোরবেলা মেলিসা একটা গুপ্ত পথ দিয়ে ব্রাডামাণ্টিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ভয়ানক পথ, আশে পাশে দুধারে ভয়ঙ্কর সব গহ্বর। অতি সাবধানে যেতে যেতে মেলিসা বল্‌তে লাগল,—"ব্রাডামাণ্টি! মায়াদূর্গ বড় সাংঘাতিক দুর্গ। ইস্পাতের তৈরী, মানুষের সাধ্য নাই যে যুদ্ধ করে সে দূর্গ জয় করে। কাল পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে যাদুকর ঘুরে বেড়ায়। তার একটা যাদুকরা আশ্চর্য্য ঢাল আছে সে ঢালের দিকে চাইবা মাত্র লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

এই যাদুকরের যাদু নষ্ট করবার একটি মাত্র জিনিষ আছে, সেটা হচ্ছে একটা আংটি। এই আংটি আগে আফ্রিকার রাজার কাছে ছিল, তাঁর কাছ থেকে একটা লোক সেটা চুরি করে নিয়েছে। এই আংটি উদ্ধার করতে পারলেই তুমি মায়া দূর্গ নষ্ট করতে পারবে। এখন সেই আংটিচোরকে কি করে পাবে তাও বল্‌ছি শোন। এই সাম্‌নের মাঠটা পার হয়ে সোজা পথে খানিক দূর গেলেই দেখতে পাবে একটা সরাইখানা। তার

সাম্‌নেই একটা চৌকির উপরে ভয়ানক বিদ্‌ঘুটে চেহারার একটা বাঁটুল লোক বসে আছে—সেই আংটিচোর, তার হাতেই আংটি আছে। যে রকমে পার আংটি উদ্ধার করা চাই—সাবধান! সে যেন তোমার মতলবটা বুঝতে না পারে।”

ব্রাডামাণ্টি এই কথা মত সরাইয়ের সামনে গিয়ে একটা লোককে দেখেই

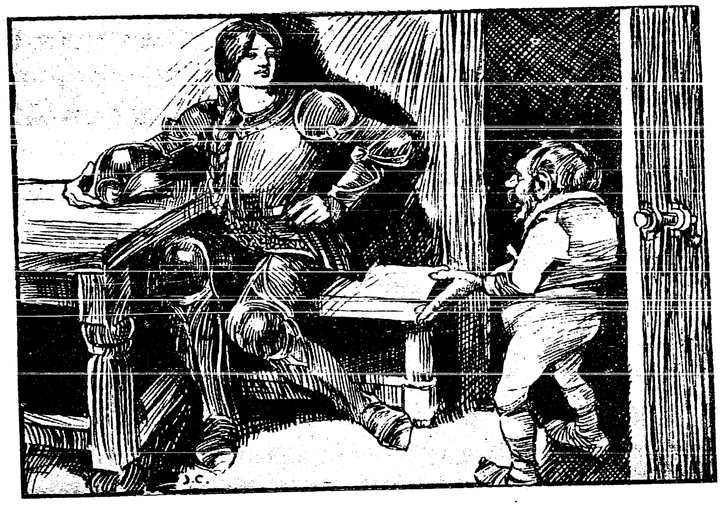

বুঝতে পারলেন এ সেই আংটি চোর। তার আংঙ্গুলে প্রকাণ্ড বড় একটা হীরের আংটি। তখন তার সঙ্গে ব্রাডামাণ্টি গল্প জুড়ে দিলেন—নানা কথার পর বল্লেন,—“কেউ যদি আমাকে মায়া দূর্গের পথটা দেখিয়ে দিত! আমি প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি সেই দুষ্ট যাদুকরকে জব্দ করে সকলকে উদ্ধার করব।”

আংটিচোর সে কথা শুনে ভাবল যে যাদুকর আট্‌লাণ্টিসের হাতে ত এর মরণ নিশ্চয়। বাস্‌, তারপর মজা করে এর জিনিষ পত্র নিয়ে চম্পট দেওয়া যাবে। এই ভেবে সে বল্ল, “মহাশয়! এ সব জায়গার পথ ঘাট আমার বিলক্ষণ জানা আছে, চলুন! আমিই আপনাকে মায়া দূর্গে নিয়ে যাব।”

ব্রাডামাণ্টি তাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে তার সঙ্গে চল্লেন। পথ ক্রমে উঁচু হয়ে পাহাড়ের উপর উঠেছে, অনেক দূর গেলে পর মায়া দূর্গ দেখ্‌তে পাওয়া গেল।

ব্রাডামাণ্টি ভাবলেন—এই হচ্ছে আংটি উদ্ধারের সময়। কিন্তু ছোট্ট বাটুল একটা লোক তার হাতে কোন অস্ত্র নাই—তাকে মেরে ফেলাটা তাঁর কাছে ভাল লাগল না। তখন তিনি হঠাৎ ফিরেই চট্‌ করে তার দুটো হাত ধরে ফেলে চক্ষের নিমেষে আংটিটা কেড়ে নিয়ে নিজের আঙ্গুলে পরলেন। তারপর তাকে তারই ঘোড়ার লাগাম দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে বাস্‌, তিনি চল্লেন মায়া দূর্গে।

পাহাড়ের চারদিক ঘুরে সেই সরু পিছল পথ দিয়ে একেবারে পাহাড়ের উপরে উঠলেন—পিছল পথ মায়া আংটীর গুণে জব্দ হয়ে গেল। পাহাড়ের উপর উঠে দূর্গের দরজায় যে শিঙ্গা ঝুলান ছিল সেটা নিয়ে এমন জোরে ফুঁক্‌লেন যে পাহাড়, বন, প্রান্তর, দূর্গ সমস্ত থর থর করে কেঁপে উঠল।

শিঙ্গা ফুক্‌বা মাত্র সেই কাল পক্ষীরাজ ঘোড়া, পিঠে তার কাল বর্ম্ম পরা সোয়ার, দূর্গের ভিতর থেকে লাফিয়ে এসে ব্রাডামাণ্টির মাথার উপরে শূন্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যাদুকর সোয়ারের হাতে কোন অস্ত্র নাই, এক হাতে তার সেই দারুণ ঢালটি বেগুনি রেশম দিয়ে ঢাকা অন্য হাতে তার যাদুর পুঁথি তা দেখে বিড় বিড় করে সে মন্ত্র পড়্‌ছে।

ব্রাডামাণ্টি এসব গ্রাহ্যও করলেন না। মায়া দূর্গের যাদুকর তখন হঠাৎ ঢালের ঢাক্‌না খুলে দিয়ে উজ্জ্বল চক্‌চকে ঢাল একেবারে ব্রাডামাণ্টির মুখের সাম্‌নে ধরে দিল। আংটির গুণে অবশ্যি তাঁর কোন অনিষ্ট হলো না কিন্তু তবু ব্রাডামাণ্টি চালাকি করে হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেলেন—যেন সত্যি সত্যি তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

তখন যাদুকরের কি যে আহ্লাদ! শিকল নিয়ে ছুটে এসে ব্রাডামাণ্টিকে উপুড় হয়ে দেখ্‌তে লাগল। যাই উপুড় হওয়া অমনি বজ্রমুষ্টিতে ব্রাডামাণ্টি তার হাত ধরে ফেল্লেন, তারপর তারই শিকল দিয়ে তাকে আচ্ছা ক’রে বাঁধলেন।

তাকে বেঁধেই তলোয়ার হাতে নিয়ে তার টুপি খুলে দেখলেন—ধীর গম্ভীর বৃদ্ধের চেহারা!

ব্রাডামাণ্টির প্রাণে মায়া হলো, তিনি বল্লেন—“আপনার মত বৃদ্ধকে মারা গুরুতর অন্যায়। কিন্তু আপনার মায়া দূর্গ আমি নষ্ট করে সমস্ত কয়েদীদের উদ্ধার করব।” এই ব’লে তিনি যাদুর আংটিটি তার চোখের সাম্‌নে ধরলেন। তৎক্ষণাৎ সাপের মাথায় যেন ধূলো পড়ল—আট্‌লাণ্টিস্‌ সকলকে উদ্ধার করে দিল, মায়াদূর্গ চক্ষের

নিমেষে হঠাৎ কোথায় মিশিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে আট্‌লাণ্টিস্‌ও একেবারে অন্তর্ধান—কেহ কোন দিন আর তার ছায়াটিও দেখতে পায় নি।

তারপর সকলে মহা খুসী হ'য়ে কোলাহল করতে লাগল, ব্রাডামাণ্টির সঙ্গে রোজারের বিয়ে হয়ে গেল, আর দেশ বিদেশে জয়জয়কার প'ড়ে গেল।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

পুরাতন লেখা।

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

(১) পাল্‌কী বেহারা।

পুরীতে একটা বড় রাস্তার পাশেই আমার বাসা ছিল, আর সেই রাস্তার সংলগ্ন একটি ঘরে দিনের বেলায় আমি বসিতাম। সুতরাং উড়ে পাল্‌কী বেহারার সঙ্গীত শুনিতে আমার ত্রুটি হয় নাই। এখানকার উড়েরা তেমন গান গাহিতে জানেই না। সেখানে কোন স্থান দিয়া একটা পাল্‌কী গেলে সিকি মাইল পর্য্যন্ত তাহাদের আক্ষেপ শুনিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, যেন তাহারা বড়ই বিপদে পড়িয়াছে, আর সেই বিপদটা যেন তাহাদের পাল্‌কীর ভিতরে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে সওয়ারী ভারি হইলে নাকি ঐরূপ করিয়া তাহারা তাহাকে গালি দেয়। ইহা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে যে পাল্‌কীতে উঠিবামাত্র সকলেই হঠাৎ ভয়ানক ভারি হইয়া যায়। আসল কথা কিন্তু তাহার কিছুই নহে। উহাদের ঐ চীৎকারের ভিতরে একটা শৃঙ্খলা আছে। সামনের এক জন যেন চ্যাঁচাইয়া বলিল, "ওরে বাবারে!" পিছনের একজন যেন উত্তর দিল "কি হ'লোরে!" সামনের লোক বলিল "ওগো মাগো!" পিছনের লোক বলিল "কোথা যাব গো!" 'মাগো' 'বাবা গো' বলে, না আর কিছু যে বলে, তাহাও আমি জানি না, কথাগুলি নাকি বড়ই ঊর্দ্ধশ্বাসে বলে তাহাতেই ঐরূপ মনে হয়। উহাতে বেশ একটা ছন্দ আছে, তাহাতে মনে হয়, যে এক সঙ্গে পা ফেলিবার সুবিধার জন্য ঐরূপ করে, কারণ এক সঙ্গে পা ফেলিয়া চলাতে সওয়ারির আরাম আছে। অনেক সময় এরূপ বুঝা যায়, যে সামনের ব্যক্তি সর্দ্দার, সে ঐ উপায়ে চলার সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। আসল কথাটা যে কি, তাহা উহারাই বলিতে পারে।

(২) সমুদ্রে স্নান।

সমুদ্রে নামিয়া স্নান করিতে গেলেই উহার ঢেউয়ের অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। এই অত্যাচারটি এমন বিধিপূর্ব্বক হইয়া থাকে, যে একবার উহার আস্বাদন পাইলে আর কখনও তাহা ভুলিতে পারা যায়না। ইহাতে আমোদ যথেষ্ট আছে, উপকারও আছে, আবার আশঙ্কাও আছে। ঢেউয়ের বাড়িতে অনেকে গুরুতর আঘাত পায়, এমন কি অনেকের মৃত্যু হয়। অনেক সময় কোন হতভাগ্য লোক ঢেউয়ের টানে পড়িয়া জন্মের মত অদৃশ্য হয়।

অবশ্য এরূপ দুর্ঘটনা অনেক সময় অসতর্কতা আর সাঁতার না জানার দরুণই ঘটিয়া থাকে। ঢেউয়ের সঙ্গে লড়িতে গেলে তাহার আঘাত ত লাগিবেই। তাহার সামনে বেকুবের মতন শরীর পাতিয়া দিলেও বিপদের আশঙ্কা আছে। ঢেউ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে বাম পাশ এবং ঘাড় পাতিয়া লইতে হয়। লাফাইতে আপত্তি না থাকিলে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া শরীরকে উহার সমান উচু রাখিতে পারিলেও ছোট ছোট ঢেউয়ের সময় কাজ চলিয়া যায়। বড় ঢেউ হইলে ডুব দিয়া উহার নীচে চলিয়া যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত। যাহারা সাঁতার জানে না, তাহাদের জলে না নামাই ভাল। সাঁতার না জানিয়া জলে নামার বিপদ এই, যে, অল্প জলও অনেক সময় হঠাৎ অধিক জল হইয়া যায়। তখন সাঁতার ভিন্ন আত্মরক্ষার উপায় থাকে না। তাহা ছাড়া হাজার সতর্ক হইলেও নাড়া চাড়ার হাত এড়াইবার সাধ্য নাই। বড় বড় ঢেউ এক একটা এমন আসে, যে তাহার সামনে আর কিছুতেই গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা যায় না। সে আসিয়া তোমাকে লাটিমের মতন ঘুরাইয়া দিবে, ময়দার মতন থাসিয়া দিবে, তোমার অতিশয় গম্ভীর মুখখানি কখন হাঁ করিয়া ফেলিবে, তাহা তুমি টেরও পাইবে না; ততক্ষণে সের খানেক লোণা জল তোমার উদরস্থ হইয়া অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টার জন্য তোমার মনের শান্তি নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে "যদি এমনি হয়, তবে সে কাজ করিতে যাওয়া কেন?" ইহার উত্তরে অনেক কথা বলা যায়।

প্রথমতঃ যে পুণ্য করিতে আসিয়াছে, সে লাঞ্ছনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। তাহার পুণ্য চাই; লাঞ্ছনা হইলে তাহাতে বরং পুণ্যের দাম বাড়িবে।

স্বাস্থ্যের জন্য যে আসিয়াছে সে অবশ্য জল বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাহাতে স্নান করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে উপকার কম। ঐ নাড়া চাড়ায় উপকার বেশী।

আর ঐ লাঞ্ছনার জন্যই যে আসিয়াছে, তাহাকে ওরূপ প্রশ্ন করা ত স্পষ্টই অনাবশ্যক বোধ হইতেছে। ঐ লাঞ্ছনার ভিতরে ভারি একটা আমোদ আছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের বুড়ারা ঐ জলে পড়িয়া নাকাল হয়, আবার চ্যাঁচাইয়া হাসেও। ঢেউয়ের পর ঢেউ মাথার উপর দিয়া যাইতেছে; শরীরটাকে ধোপার বাড়ী দিবার ফল অনেকক্ষণ যাবৎ হইয়া গেছে; তথাপি তাহারা উঠিতে চাহে না। তাহার কারণ এই, যে এই নাড়াচাড়াতে তাহাদের শরীর মনে এমন একটা স্ফূর্ত্তি আনিয়া দিতেছে, যে অতি অল্প অবস্থায়ই তাহা লাভ করা যাইতে পারে।

আমি জানি, অনেকে ইহার উল্টা কথা বলেন। সমুদ্রে স্নান করিলে নাকি তাঁহাদের গা চট্ চট্ করে আর চুলে নাকে মুখে কাণে বালি ঢোকে, কাজেই সমুদ্রে স্নান সারিয়া আবার ঘরে আসিয়া তাঁহাদের পরিষ্কার জলে গা ধুইতে হয়। হইতে পারে; কিন্তু আমি ওরূপ কোন অসুবিধা ভোগ করি নাই, আর তাঁহাদের কেন যে ওরূপ হয়, তাহারও একটি ভিন্ন অন্য কারণ খুঁজিয়া পাই নাই।

সে কারণটি এই। অনেকে হয়ত সাঁতার জানেন না, অথবা জানিলেও হয়ত তাঁহারা খুব সতর্ক লোক, অধিক জলে নামিতে ইচ্ছা করেন না। ইঁহারা, যেখানে কোমর জলের বেশী হয় না, এইরূপ জায়গায় দাঁড়াইয়া স্নান করেন। ঢেউ যখন আসে, তখন ওখানে ঐ পরিমাণ জল হয়; কিন্তু ঢেউ চলিয়া গেলে সে স্থান একেবারেই শুকাইয়া যায়। এরূপ করাতে আশঙ্কার কারণ খুবই কম; কারণ কোমর জলে যে ডুবিয়া মরিবে, তাহার ডাঙ্গাতেই আর ভরসা কি? আমি অনেককে ঐরূপ করিতে দেখিয়াছি, আর তাঁহাদের দুর্দ্দশাও দেখিয়াছি। ঢেউ আসিয়া অনেক দূর অবধি ডুবাইয়া ফেলিল, আবার হটিয়া গিয়া অনেকটা স্থান খালি করিয়া দিল। তখন ঐ খালি জায়গায় গিয়া একজন দাঁড়াইলেন। সে সময়ে তাঁহার চেহারা ঠিক্ পালোয়ানের মতন। ঢেউ আসিয়া উপস্থিত! তাহার ফলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই চেহারা আগে খুব ওস্তাদ বাজীকরের মতন, তার পরে উল্টান কচ্ছপের মতন হইয়া গেল! ঢেউ ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে, আর স্নানের সখও এক প্রকার মিটিয়াছে; এখন এই সুযোগে ডাঙ্গায় উঠিয়া আসিতে পারিলে হয়। কিন্তু উঠিবার চেষ্টায় কচ্ছপের অবস্থা হইতে প্রথমে ব্যাঙের, তার পরে হাতীর অবস্থায় আসিতে না আসিতেই পিছন হইতে আর এক ঢেউ আসিয়া তাঁহাকে আগে কুমীরের মতন করিয়া ফেলিল, শেষে কলা গাছের মতন করিয়া কূলের কাছে রাখিয়া গেল। সেখান হইতে নিতান্ত ঝড়ের কাকের মতন অবস্থায় ডাঙ্গায় উঠিয়া আসিলেন।

বাড়ী আসিয়া ইঁহার কয় কলসী পরিষ্কার জলের দরকার হইয়াছিল, তাহা জানি না। যাহা হউক, তাহাতে নাকের মুখের আর কাণের বালি অনেক পরিমাণে দূর হইলেও, আর চুলের বালি খানিকটা কমিলেও, পেটের ভিতরে যে বালি ঢুকিয়াছিল, তাহার যে কিছু হয় নাই, একথা নিশ্চয়। বিচারে যত দোষ, সব অবশ্য ঐ সমুদ্রস্নানেরই সাব্যস্ত হইয়াছিল! ডাঙ্গার কাছের ঘোলা জল আর বালিতে যাহারা স্নান করে, তাহাদের কতকটা এইরূপ দশা হয়। ভিতরকার জল পরিষ্কার, সেখানে স্নান করিলে এসকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যাহা হউক, একথা স্বীকার করিতে হয়, যে ধারের বালিতে লুট্‌পাট্ হওয়ার ভিতরেও অনেককে যথেষ্ট আমোদ পাইতে দেখিয়াছি। যাঁহার বর্ণনা উপরে দেওয়া হইয়াছে, তিনি ঐ দুর্দ্দশার ভিতরেও প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছিলেন।

মাটির বাসন।

মাটির বাসন গড়িতে জানে না, এমন জাতি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। নিতান্ত অসভ্য মানুষ যাহারা কাপড় পরিতে জানে না, যাহারা বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের মধ্যেও মাটির বাসনের চল আছে। অতি প্রাচীন কালের মানুষ, যাহারা পাথর শানাইয়া অস্ত্র গড়িত, যাহারা ধাতুর ব্যবহার শিখে নাই, তাহাদের কবর খুঁড়িলে মাটির গেলাস ঘটি বাটি পাওয়া। কেবল তাহাই নয়, এক একটা জিনিষের উপর তাহারা নানারূপ কারুকার্য্য করিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্যবোধের যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত তাহার চিহ্ন মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। যাহারা আগুনের ব্যবহার করিতে জানিত না, তাহারা মাটির বাসন গড়িয়া রোদে শুকাইয়া লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিত; কোন কোন স্থলে বাঁশের বা পাতার ঝুড়ি বানাইয়া তাহার গায়ে মাটি লেপিয়া বাসন বানান হইত, এরূপও দেখা গিয়াছে।

দশ হাজার বৎসর আগে ইজিপ্টদেশে যে মাটির বাসন তৈয়ারি হইত, তাহার সুন্দর সুন্দর নমুনা পাওয়া গিয়াছে। বাসনগুলি সমস্তই হাতে গড়া, কারণ, কুমারের চাকে মাটি গড়িবার কায়দা সে সময়ে তাহাদের জানা ছিল না। কিন্তু একাজে তাহাদের হাত এমন সাফাই ছিল, যে বড় বড় জালার মত পাত্রগুলির গড়নেও কোথাও খুঁৎ ধরিবার যো নাই। বড় বড় জাহাজী নৌকা করিয়া এই সকল বাসন দেশ বিদেশে

চালান হইত এবং তখনকার লোকে আগ্রহ করিয়া তাহা কিনিত। বাসনগুলির উপর চক্‌চকে কালো পালিশ থাকিত, তাহার গায়ে সাদা রঙের কারুকার্য্য।

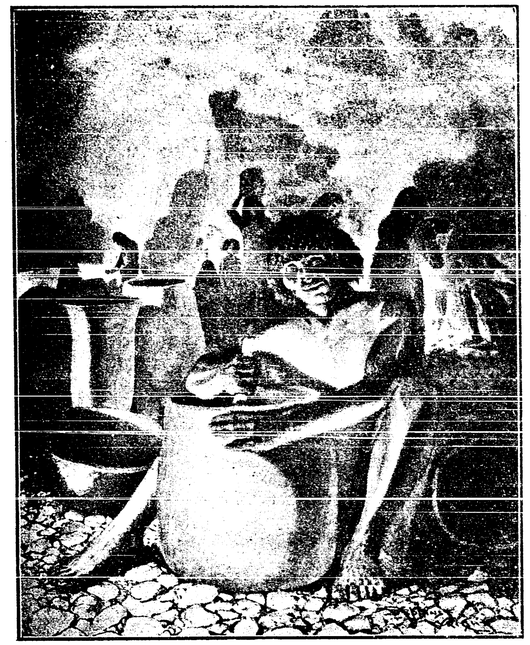

মাটির বাসন নানা রকমের। সাধারণ "মেটে বাসন," যাহা অল্প আঁচে পোড়াইলেই চলে, আমাদের দেশে তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই। গেলাস, ভাঁড়, সরা, মালসা হইতে আরম্ভ করিয়া কুঁজা কলসী জাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে। কিন্তু "সাধারণ মাটির" জিনিষও যে কতদূর সুন্দর হইতে পারে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই নানা দেশের লোকে নানা ভাবে তাহা দেখাইয়া আসিতেছে।

আর এক রকম মাটির জিনিষ হয়, তাহাকে পাথুরে মাটি বলা যায়। এগুলিকে কড়া আগুনে পোড়াইলে পাথরের মত মজবুৎ হয় এবং তখন তাহাকে অসংখ্য প্রকার দরকারী কাজে লাগান যায়। বাড়ী বানাইবার টালি, ড্রেনের পাইপ নানারূপ খেলনা প্রভৃতি কত জিনিষ তৈয়ারি হয়। তাহাতে আবার নানা রকম রং দেওয়া ও ইচ্ছামত পালিশ ধরান চলে।

সাদা মাটির বাসন হইলেই আমরা অনেক সময়ে তাহাকে "চীনে মাটি" বলি—কিন্তু আসল চীনামাটি অতি উঁচু দরের জিনিষ। চীনে মাটির বাসন এক সময়ে কেবল চীনদেশেই তৈয়ারি হইত। প্রায় সাত শত বৎসর আগে মুসলমান সম্রাট সালাদিনের কাছে চীন সম্রাট কতগুলা উপহার পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কতগুলা চীনা বাসন ছিল। তেমন বাসন কেহ চক্ষে দেখে নাই। পাৎলা ঝিনুকের মত স্বচ্ছ, ডিমের খোলার মত হাল্কা, সে আশ্চর্য্য বাসনের কথা চারিদিকে রটিয়া গেল।

এই চীনা বাসনের সঙ্কেত শিখিবার জন্য ছয় শতাব্দী ধরিয়া কত লোকে যে কত রকম চেষ্টা করিয়াছে তাহার আর অন্ত নাই। এই একটি বিদ্যাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় কত লোকে জীবনপাত করিয়াছে—এবং তাহার ফলে কেবল এইটুকু মাত্র জ্ঞানলাভ করিয়াছে যে অমন পাৎলা স্বচ্ছ সুন্দর জিনিষ করা একেবারেই সহজ নয়। জিনিষটা পাৎলা হয়ত স্বচ্ছ হয় না, স্বচ্ছ যদি হয় তবে এমন "ঠুন্‌কো" যে একটু ধরিতে গেলেই ভাঙ্গিয়া যায়! হয়ত আর সবই ঠিক হইল কিন্তু উপরের মোলায়েম পালিশটুকু ধরিল না, হয়ত কোথায় একটি চুল বা এক কণা বালি ছিল কিম্বা চুল্লীর আঁচ ঠিক সমান ছিল না, তাহাতেই বাসনটি পোড়াইবার সময় ফাটিয়া গেল। এই রকম করিয়া লোকে হাজারবার ঠেকিয়া ঠেকিয়া তবে এ বিদ্যা শিখিয়াছে।

গ্রীস প্রভৃতি দেশে এক সময়ে অতি সুন্দর মাটির ঘড়া ও ফুলদানি তৈয়ারি হইত কিন্তু গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পর এই শিল্প নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর বহু বৎসর পর্য্যন্ত ইউরোপে মাটির জিনিষ বলিতে সাধারণ মোটা বাসন পত্রই বুঝিত। তারপর মুসলমানদের দৌলতে যখন এই লুপ্ত শিল্প আবার জাগিয়া উঠে, তখন হইতে দক্ষিণ ইউরোপে, বিশেষতঃ ইটালিতে, নানারূপ শিল্পের বাসন দেখা দিতে লাগিল। তখনও তাহারা চীনা মাটি গড়িতে পারে নাই বটে কিন্তু মাটির উপর সাদা পালিশ চড়াইয়া তাহার চমৎকার নকল করিতে শিখিয়াছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত এই ব্যবসায় ইটালির একচেটিয়া ছিল।

যাহাদের চেষ্টায় ও যত্নে এই শিল্পের ব্যবসায় ইউরোপের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে প্যালিসির নাম বিশেষভাবে করা যায়। বার্ণার্ড প্যালিসির বাড়ী ছিল ফ্রান্স দেশে। সেখানে ছবি আঁকিয়া, কাচ রঙাইয়া ও জরীপের কাজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার দিন যাইত। হয়ত এই ভাবেই তাঁহার সারা জীবন কাটিয়া যাইত; কিন্তু একদিন তিনি একখানা "মাটি"র পেয়ালা দেখিলেন, তেমন জিনিষ আর তিনি কখনও দেখেন নাই—বিশেষত

তার পর যে পালিশ করা এনামেলের কাজ ছিল, তাহাতেই প্যালিসিকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। প্যালিসি তখন একেবারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, ঐ রকম পালিশের সঙ্কেত না শিখিয়া তিনি ছাড়িবেন না।

সেই দিন হইতে তাঁহার আর অন্য চিন্তা নাই, জীবনের আর কোন কাজ নাই তিনি কেবল চুল্লী জ্বালাইয়া ভাঙা পাথর আর মাটির মশলা গলাইতেছেন, আর দেখিতেছেন পালিশ ঠিক হইল কিনা। নিজে লেখাপড়া জানেন না, কোনদিন এ ব্যবস শিখেন নাই, অথচ উৎসাহের তাড়নায় শক্তি সময় ও অর্থ অজস্র ঢালিয়া দিতেছেন—তাহাতে কি যে লাভ হইবে তাহা কেহই বোঝে না। লোকে পাগল বলিতে লাগিল তাঁহার স্ত্রী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বাড়ীর লোকে অস্থির হইয়া পড়িল, কিন্তু তাঁহার দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। দুই বৎসর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর তিন শত মাটি পেয়ালা গড়িয়া তাহার উপর নানারকম মশলার প্রলেপ দিয়া তিনি চুল্লীতে চড়াইলেন চুল্লী জুড়াইলে পর দেখা গেল একটি মাত্র বাসনের গায়ে অতি চমৎকার সাদা পালিশ ধরিয়াছে! তখন প্যালিসির আনন্দ দেখে কে!

এতদিন পর্য্যন্ত তিনি চারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া এক ব্যবসায়ীর চুল্লীতে তাঁহার জিনিষগুলি পোড়াইয়া আনিতেন। এখন হইতে তিনি নিজের বাড়ীতে একটি চুল্লী বানাইতে সঙ্কল্প করিলেন। ইটের পাঁজায় ইট কিনিয়া তিনি নিজে তাহা বহিয়া আনিতেন, এবং আপনার হাতে সাজাইয়া চুল্লী গড়িতেন। তারপর, চুল্লী খাড়া হইলে, তিনি অনেক কাঠ ও কয়লা সংগ্রহ করিয়া চুল্লী জ্বালাইলেন এবং একশত মাটির বাসন বসাইয়া তাহাতে মশলা চড়াইলেন—এই মশলা গলিলে পর বাসনে এনামেলের মত সাদা পালিশ হইবে! কিন্তু মশলা আর গলিতে চায় না! সারারাত কাটিয়া গেল, তারপর দিন গেল রাত গেল, এমনি করিয়া ছয় দিন ছয় রাত্র চুল্লীর পাশে বসিয়া বৃথায় কাটিল। তখন প্যালিসি নূতন মশলা বানাইয়া আবার আগুন চড়াইলেন। প্যালিসির তখন আর দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাই। তিনি আহার নিদ্রা ছাড়িয়া কেবল চুল্লীতে কাঠ যোগাইতেছেন। ক্রমে কাঠ সব ফুরাইয়া আসিল—তিনি বাগানের কাঠের বেড়া ভাঙিয়া আগুনে দিলেন। তাহাও যখন ফুরাইয়া আসিল তখন বাড়ীর টেবিল চেয়ার যাহা সম্মুখে পাইলেন, সব ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া জ্বালানি কাঠ করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে সহরের মধ্যে ছুটিয়া বাহির হইয়াছে, আর সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে যে প্যালিসি পাগল হইয়া বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। শুনিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া দেখিতে আসিল,

ব্যাপারখানা কি। ততক্ষণে প্যালিসির মশলা গলিয়া চমৎকার সাদা পালিশ হইয়া ফুটিয়াছে—তিনি অতি যত্নে সেগুলিকে ঠাণ্ডা করিয়া বাহির করিতেছেন।

প্যালিসি স্থির করিলেন তিনি তাঁহার আবিষ্কারকে ব্যবসায়ে লাগাইবেন। এক কুমারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তিনি ছয় মাসে তাহাকে দিয়া কতগুলি সুন্দর সুন্দর বাসন গড়াইলেন। কিন্তু সেগুলিতে পালিশ ধরাইবার সময় তাঁহার চুল্লী ফাটিয়া ধূলা ও ঝুল পড়িয়া তাঁহার চমৎকার পালিশ করা বাসনগুলিতে দাগ ধরাইয়া দিল। প্যালিসি কিছু বলিলেন না—বাসনগুলি ভাঙিয়া আবার চুল্লী মেরামত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে ধৈর্য্য আর বীরত্বের আর তুলনা হয় না। খোলা বাগানে সারাদিন রোদে ঘামিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া তিনি চুল্লীর তদ্বির করিতেন; বাড়ীর বাহির হইলে লোকে তাঁহাকে দেখিয়া হাসাহাসি করিত; সারাদিন পরিশ্রমের পর যখন তাঁহার শরীর মন অবসন্ন হইয়া আসিত, তিনি বাড়ীতে ঢুকিবামাত্র চারিদিক হইতে সকলে ঠাট্টা বিদ্রূপ নিন্দা ও অভিযোগ করিত। এত রকম অশান্তির মধ্যে ষোল বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্যালিসি আপনার ব্যবসায়কে সফল করিয়া রাজসম্মান লাভ করেন। কিন্তু এখানেও তাঁহার দুঃখের শেষ হয় নাই। ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইবার পরেও শেষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহাকে নানা শত্রুর হাতে অনেক অত্যাচার সহিতে হইয়াছিল। সে সকল অত্যাচার তিনি যেরূপ তেজের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্যালিসির মত বীরেরই উপযুক্ত। সকল বিষয়ে তিনি যাহা সত্য বুঝিতেন, নির্ভীক ভাবে তাহা প্রচার করিতেন; এই জন্য তাঁহার নিজের স্বাধীন ধর্ম্মমত বজায় রাখিতে গিয়া তিনি নানা রকমে লাঞ্ছিত হন এবং অবশেষে আশি বৎসর বয়সে মৃত্যুভয়কে অগ্রাহ্য করিয়া এক অন্ধকার কয়েদখানায় বন্দী অবস্থায় মারা যান।

সেকালের বাদুড়।

"সেকালের জন্তু"র কথা বলিলেই একটা কোন কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারের চেহারা মনে আসে। যে সকল জন্তু এখন দেখিতে পাই না, অথচ যাহার কঙ্কালচিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারি যে সে এককালে পৃথিবীতে ছিল, তাহার চেহারা ও চালচলন সম্বন্ধে স্বভাবতই কেমন একটা কৌতূহল জাগে। তাহার উপর যদি তাহার মধ্যে কোন অদ্ভুত বিশেষত্বের পরিচয় পাই, তবে ত কথাই নাই।

সেকালের "বাদুড়" লিখিলাম বটে, কিন্তু তাহার চেহারা দেখিলে সব সময়ে বাদুড় বলিয়া চিনিবে কিনা সন্দেহ। কারণ, সে সময়ের এক একটা জন্তুকে আজকালকার কোন নামে পরিচিত করা অনেক সময়েই অসম্ভব। মনে কর একটা জন্তু, তার সাপের মত গলা, কচ্ছপের মত পিঠ কুমীরের মত দাঁত তিমির মত ডানা আর গিরগিটির মত মাথা—তখন তাহাকে কি নাম দিবে? সেইজন্য বাদুড় বলিতে খুব সাবধানে বলা দরকার —যেন আজকালকার নিরীহ চামচিকা গোছের কিছু একটা মনে করিয়া না বস।

আজকাল যে সকল বাদুড় দেখিতে পাও, তাহাদের চেহারা ও চালচলনের মধ্যে কত তফাৎ! কোনটার কাণ খরগোসের মত লম্বা, কোনটার কাণ ইঁদুরের মত গোলপানা; কোনটার মুখ শেয়ালের মত, কোনটার মুখ ভেংচিকাটা সঙের মত; কারও নাক পদ্ম ফুলের মত ছড়ান, কারও নাক নাই বলিলেও হয়। কিন্তু সেকালের যে জানোয়ার গুলাকে বাদুড় বলিতেছি তাহাদের মধ্যে আরও অদ্ভুত রকমারি দেখা যাইত। এক একটাকে দেখিয়া মনে হয় যেন বাদুড় পাখী আর কুমীরে মিলিয়া খিচুড়ি পাকাইয়াছে। এগুলিকে সাধরণ ভাবে বলা হয়—টেরোড্যাক্টাইল (Pterodactyl), অর্থাৎ যাহার আঙ্গুলে পাখা।

পাহাড়ের গায়ে যে সব পাথরের স্তর থাকে, তাহারা চিরকালই পাথর ছিল না। অনেক পাথর এক সময় মাটির মতন নরম ছিল। সেই নরম মাটিতে জানোয়ারের কঙ্কাল জমিয়া অনেক সময়ে একেবারে পাথর হইয়া থাকে—এই রকম পাথরকে এক কথায় জীবশিলা বলা যাইতে পারে। এক সময় ছিল, যখন পৃথিবীতে পাখী বা বাদুড় কিছুই দেখা যায় নাই—তখন সরীসৃপের যুগ ছিল। অদ্ভুত কুমীর বা গোসাপ তখন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিয়া পৃথিবীতে দৌরাত্ম্য করিত। সেই অতি প্রাচীন যুগের পাথরে এসকল বাদুড়ের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না—যা কিছু পাওয়া যায় সবই

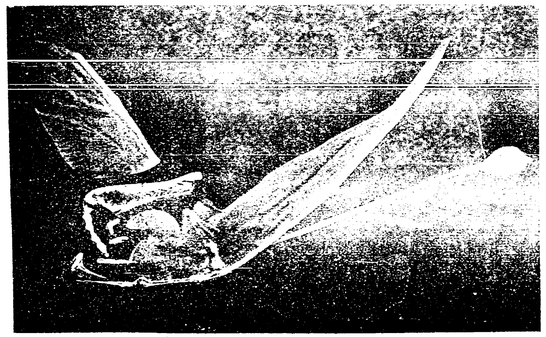

আরও আধুনিক যুগের। "আধুনিক" বলাতে মনে করিওনা যে মাত্র কয়েক শত

বা সহস্র বৎসরের কথা বলিতেছি—সে "আধুনিক" যুগ কয় লক্ষ বৎসর আগেকার তা আমি জানি না। পাথরের মধ্যে কি রকম কঙ্কাল পাওয়া যায় তাহার একটু নমুনা দিলাম। এই বাদুড়টার লম্বা ল্যাজ ছিল, তাহার আগাটুকু বৈঠার মত চ্যাপ্টা।

যতরকম "বাদুড়" পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে সব চাইতে পুরাতনটির চেহারা এবারের রঙিন ছবিতে দেওয়া হইয়াছে। ছবিতে দেখ ইনি সাপের মত লম্বাটে এক কুমীরের সঙ্গে লড়াই বাধাইয়াছেন—মৎলবটা এই যে কুমীরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইবেন। ইনি যে মাংসাশী ছিলেন, ইঁহার দাঁতের মধ্যেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার নাম রাখা হইয়াছে "ডাইমর্ফোডন" (Dimorphodon) অর্থাৎ দ্বিমূর্ত্তিদন্তী।

সবগুলি বাদুড়ই যে প্রকাণ্ড বড় হইতে তাহা নহে, কিন্তু সব চাইতে বড় গুলি যে

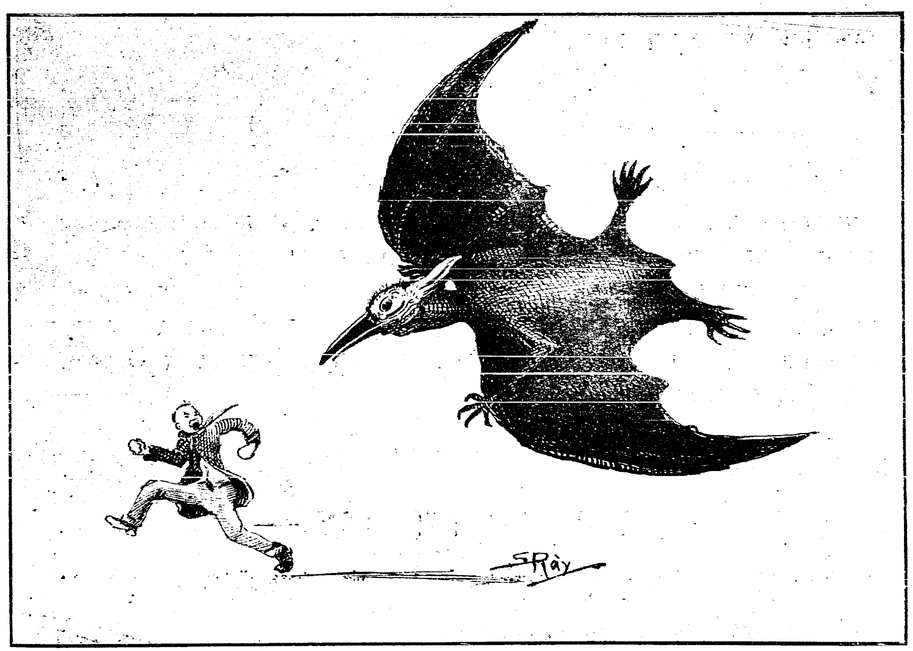

খুবই বড় তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ আমেরিকায় যে সকল বাদুড়ের চিহ্ন পাওয়া

গিয়াছে তাহার একএকটি ডানা মিলিলে ২৫ ফুট চওড়া হয়। ইহাদের মাথার উপরে অদ্ভুত এক প্রকাণ্ড শিং ছিল। এই শিংটা তাহার কি কাজে লাগিত তাহা জানি না, কিন্তু ইহাতে তাহার বিদ্‌ঘুটে চেহারার কোন উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। এত বড় জন্তুটা উড়িলে পরে তাহার ডানা ঝাপটাইবার শব্দ নিশ্চয়ই বহুদূর হইতে শোনা যাইত। ইহারা কোনরূপ শব্দ করিত কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আওয়াজ করিলে সেটা খুব সুমিষ্ট হইত কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইহাদের মুখে নাকি দাঁত থাকিত না কিন্তু তাহাতেও আশ্বস্ত হইবার বিশেষ কোন কারণ দেখি না, কারণ ইহার যে ঠোঁট ছিল তাহাতে সাংঘাতিক ধার! সুতরাং তাহার ঠোকর দুএকটা খাইলে আর বেশী খাইবার দরকার হইত না। মোট কথা, এ জন্তুটা যে সেকালেই লোপ পাইয়াছে এটা আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। তা নহিলে কিরকম অবস্থা হইতে পারিত, তাহা আগের পৃষ্ঠার ছবি দেখিয়া সহজেই অনুমান করিতে পার।

পৌষ মাসের ধাঁধার উত্তর দাতাদের নাম—

অমরেন্দ্রনাথ দে, সুশীলকুমার সেন, হিমাংশুচরণ চৌধুরী, রাজীবলোচন বেনার্জ্জী, প্রকৃতি দেবী, ক্ষেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাপ্রসাদ প্রামাণিক, দেবজ্যোতী বর্ম্মণ, সুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুধীরকুমার মল্লিক, রবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য, রঙ্গপুর বণিক লাইব্রেরী, মায়া দেবী, লতিকা দেবী, ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার বসু, নির্ম্মলকুমার সেনগুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র নাথ, জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ, সুজাতা রায়, গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ, কনকলতা ঘোষ, সুবোধকৃষ্ণ পাল, দাস-ক্ষেমেলি লাইব্রেরী, মুক্তকেশী দত্ত।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর—

১। আকবর ২। বামন

সিন্ধু ঈগলের ডাকাতি

(৩৬১ পৃষ্ঠা দেখ)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চতুর্থ বর্ষ | চৈত্র, ১৩২৩ | দ্বাদশ সংখ্যা

বর্ষ শেষ।

শুন রে আজব কথা, শুন বলি ভাই রে—
বছরের আয়ু দেখ আর বেশী নাই রে।
ফেলে দিয়ে পুরাতন জীর্ণ এ খোলসে
নূতন বরষ আসে, কোথা হ'তে বল সে!
কবে যে দিয়েছে চাবি জগতের যন্ত্রে,
সেই দমে আজও চলে না জানি কি মন্ত্রে!
পাকে পাকে দিনরাত ফিরে আসে বার বার,
ফিরে আসে মাস ঋতু—এ কেমন কারবার॥
কোথা আসে কোথা যায় নাহি কোন উদ্দেশ,
হেসে খেলে ভেসে যায় কত দূর দূর দেশ।
রবি যায় শশী যায় গ্রহ তারা সব যায়,
বিনা কাঁটা কম্পাসে বিনা কল কব্জায়।
ঘূরপাকে ঘুরে চলে, চলে কত ছন্দে
তালে তালে হেলে দুলে চলেরে আনন্দে॥

COLOURED DOCUMENT.

নিরেট গুরুর মৃত্যু।

গর্ত্তে পড়িয়া যাওয়ার গোলমালে গুরু ও তাঁহার চেলারা সকলেই বামনের ভবিষ্যৎ বাণীর কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ঘোড়ায় চড়িবার পর গুরুর হঠাৎ মনে হইল যে তাঁহার পা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, ভয়ে তাঁহার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া উঠিল। তবে বাড়ী আসিয়া পৌঁছান অবধি তিনি আর কিছু বলিলেন না।

বুড়া মানুষ ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া গায়ে ত খুবই ব্যথা হইয়াছিল, তার উপর পা ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়ার ভয়। গুরুর আর সারা রাত ঘুম হইল না, বিছানায় পড়িয়া কেবল ছটফট্ করিতে লাগিলেন। গায়ের ব্যথা যে পড়িয়া গিয়া হইয়াছে, তাহা তাঁহার মাথায় ঢুকিল না, তিনি বুঝিলেন যে,পা যখন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে তখন তাঁহার আর মরিবার দেরী নাই, তাই বোধ হয় এত কষ্ট। ভয়ে গোঁ গোঁ করিয়াই গুরুর রাত কাটিয়া গেল, ভোরবেলাই তিনি সব ক'জন চেলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তাহারা তৎক্ষণাৎ আসিয়া হাজির! গুরুর অবস্থা দেখিয়া তাহারা ত বেজায় ভড়কাইয়া গেল। তাঁহার চোখ কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, মুখ শুক্‌নো, রংও ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে, কথাও মুখ দিয়া ভাল করিয়া বাহির হইতেছে না। হটাৎ একটা মস্ত বড় দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আর দেখ্‌ছ কি? এবার চিতার জোগাড় কর।" পাঁচ চেলা হাঁউমাঁউ করিয়া লাফাইয়া উঠিল "সে কি গুরু ঠাকুর?" গুরু বলিলেন "আর কি? 'চরণম্ শীতং জীবননাশম্' এরি মধ্যে ভুলে গেলে নাকি?" কাল যে গর্ত্তটার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম, সেটা কাদায় জলে ভর্ত্তি, তাইতে কখন যে পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল তা টেরও পাইনি। যখন টের পেলাম, তখন আমার বামনের কথা মনে পড়ে গেল। সেই থেকে সারারাত আমি ঘুমাইনি, আর যন্ত্রনাও কি কম ভোগ করেছি? এখন বেশ বুঝতে পারছি, যে আমার মরণকাল ঘনিয়ে এসেছে; তা আর ভেবে কি হবে? এইবার পোড়াবার যোগাড় দেখ।"

চেলারা ভয় পাইয়াছিল খুবই, কিন্তু গুরুকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য তাহারা নানারকমে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কিছুতেই যখন গুরুর ভয় গেল না, তখন তাহারা ঠিক করিল যে, গুরুকে ভূতে পাইয়া থাকিবে। চট্ করিয়া তাহারা গাঁয়ের ওঝাকে ডাকিয়া আনিল। ওঝা মহারাজ ভূত ঝাড়িতে খুবই ওস্তাদ। সে আসিয়া প্রথমে মন দিয়া সব কথা শুনিল; তারপর দাঁত মুখ খিঁচাইয়া গুরুর খাটের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "বলি, ও

মশায়, হল কি আপনার? কোনো খানে ব্যাথা ট্যাথা হয়েছে নাকি?" গুরু আর কোন উত্তর না দিয়া কেবলি চোখ বুজিয়া বলিতে লাগিলেন "চরণং শীতং জীবননাশম্"। ওঝা চীৎকার করিয়া বলিল, "ও! সেই বামন বেটা বুঝি বলেছে আপনাকে যে পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই আপনি মারা যাবেন? কৈ সে, তাকে একবার দেখিয়ে দিন ত? আমি তার পা গরম করেই তার দফা সারব, তার মাথায় ঢেঁকি পুজো করে দেব, তা হলেই সব আপদ চুকে যাবে। একবার তাকে দেখিয়েই দিন না।"

গুরু তখন চোখ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঢেঁকি পূজো বলে কিছু আছে নাকি? কৈ কখনও ত তার কথা শুনিনি! কি বলত?" ওঝা তখন বলিতে আরম্ভ করিল, "এ পূজোটা এখানে হয়না বটে; তা আমি সব বলছি শুনুন,—এক দেশে এক দোকানদার ছিল, সে রোজ একজন করে অতিথিকে খাওয়াত। যেখানেই সে কোন লোককে দেখতে পেত, তাকে তখুনি বাড়ী এনে হাজির করত। তার ছেলেপিলে ছিল না, বাড়ীতে খালি এক স্ত্রী। সে ত তার স্বামীর জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠ্‌ল, যখন তখন লোক এনে হাজির করছে, আর তাদের রেঁধে খাওয়াতে হচ্ছে। স্বামীকে কিছু বলেও লাভ নেই, সে মোটেই তা শুনবে না, কাজেই গিন্নি শেষে এক মতলব ঠাওরাল। সকালে বাজারে যেতেই সেদিন মুদীর সঙ্গে এক ব্যক্তির দেখা হল। তাকে দেখে মুদী মহা খুসী হয়ে বল্ল, "মশায় যদি দয়া করে আমার বাড়ী আজ পায়ের ধূলো দ্যান," সে লোকটাও তখুনি রাজী হয়ে গেল। মুদী তখন তাকে বল্‌ল, "আমার একটু দেরী আছে, আপনি ততক্ষণ এগিয়ে যান্, আমার গিন্নিকে গিয়ে বল্‌বেন যে আমি আপনাকে পাঠিয়েছি; তা হলেই হবে"। সে লোক ত গিয়ে মুদীগিন্নিকে হাঁকডাক করে খবর দিল, গিন্নিও "তা বেশ বাছা, এস বোসো" বলে তাকে মাদুর বিছিয়ে বসাল। সে বসতেই গিন্নি উঠান ঝাঁট পাট দিয়ে গোবরজল ছড়া দিয়ে পরিষ্কার কর্‌ল, নিজেও হাত পা ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে এল। তারপর ঢেঁকিশালে গিয়ে ঢেঁকিটাকে আচ্ছা করে ছাই দিয়ে ঘষতে সুরু করল, খানিক পরে সেটার সামনে শুয়ে পড়ে খুব ঢিপ্ ঢিপ্ করে প্রণাম করতে লাগল; মন্ত্রও পড়তে লাগল কি সব বিড় বিড় করে। তারপর ছাইগুলো ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়ল। অতিথিটি এতক্ষণ হাঁ করে তার রকম সকম সকল দেখছিল, তাকে উঠতে দেখে সে বল্‌ল "বলি ও গিন্নিমা, এটা কি পূজো গা? এরকম ত কখনও দেখিনি।" মুদী গিন্নি বল্‌ল, "ও আমাদের জাতের একটা নূতন পূজো বাছা, খানিক পরেই বুঝতে পারবে," এই বলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে যেন আপন মনেই বল্‌ল "তোমার মাথায়ই ত পূজো শেষ

করা হবে"। তার মতলবই ছিল যে, লোকটা শুন্‌তে পায়, আর সে তা পেলও। মুদী গিন্নি ঘরে ঢুকতেই "খুব বেঁচে গিয়েছি বাবা" বলে সে ভোঁ করে ছুট্ দিল। সেও পালিয়েছে, আর মুদীও বাড়ী এসে হাজির। সে এসেই হেঁকে বল্‌ল "হ্যাঁ গা গিন্নি, যে লোকটিকে পাঠিয়েছিলাম, সে গেল কোথায়?" গিন্নি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বল্‌ল "আহা যা না ছিরির লোক পাঠিয়েছিলে! এসেই আমাকে বলে কিনা, ঢেঁকিটে আমাকে দাও"। আমি তাকে কত বুঝিয়ে বল্লুম যে মুদী এখুনি বাড়ী আস্‌বে, যা চাইবার তার কাছেই চেও, আমি আর কি করে দেব; মাদুর পেতে বস্‌তেও দিলুম। ওমা সে দেখি রেগে গস্‌গসিয়ে বেরিয়ে গেল।" মুদী বল্‌ল "যত সব তোর বজ্জাতি, ঢেঁকি চাইছিল, তাই দিলিনে কেন তাকে? দেখ্ ত এখন ঘর থেকে না খেয়ে মানুষ চলে গেল। যাই এখন তাকে খুঁজে মরি।" সে ত বেরুল। এদিকে সেই লোকটা করেছে কি, মুদী এলে কি হয় তাই দেখবার জন্যে বাড়ীর কাছের একটা গলিতে লুকিয়ে আছে। মুদীকে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে ছুটে বেরুতে দেখে সে ভাবল "এই রে! নিশ্চয় আমাকে পাক্‌ড়াতে আসছে"; সে ত অমনি দে ছুট্! মুদী তাকে ছুট্‌তে দেখে চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "ওহে থামনা, ঢেঁকি নিয়ে যাও, ঢেঁকি নিয়ে যাও," কিন্তু তাতে লাভ হল এই যে লোকটা ভড়্‌কে গিয়ে আরও জোরে দৌড়ল। মুদী বেচারা মোটা মানুষ, মস্ত ভুঁড়ি তার, সে ছুট্‌তে না পেরে বাড়ী ফিরে এল। এই হচ্ছে ঢেঁকি পূজো। সে লোকটাও যেমন শুধু শুধু ভয় পেয়েছিল, আপনিও দেখি তাই। এখন আপনার মরবার কোনই সম্ভাবনা নেই।"

গুরু তার গল্প শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, "তুমি বেশ লোক বাপু, সাধে লোকে তোমায় মস্ত ঠাট্টাবাজ বলে।" গুরুকে হাস্‌তে দেখে চেলাদের যেন ধড়ে প্রাণ এল, তখন ওঝাও হাত নেড়ে বক্তৃতা করতে লাগল "হাঁ হাঁ, বামন যা বলেছিল তা খাঁটি কথা বটে, তবে কিনা তার মানেটাও ঠিকমত বোঝা চাই। পা যদি ঠাণ্ডা হয় তা হলে মরবে বটে, কিন্তু এটাত দেখতে হবে যে পা খানা শুধু শুধুই ঠাণ্ডা হল না জল টল কিছু লেগে। আপনি জলে পড়ে গেলে যে পা ঠাণ্ডা হবে সে ত জানা কথা, না যদি হত তাহলেই বরং অবাক হবার কথা। আপনি এখন নিশ্চিন্ত হোন্, কোনো ভয়ের কারণ নেই। এর পর যদি কোন দিন বাইরের কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও "চরণং শীতম্" হয়, তাহলে অবশ্য তখন "জীবননাশম্"এর ভয় হবে। এখন কেন শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন?" ওঝার কথাটা গুরু ঠাকুরের বেশ মনে লাগিল, তাঁর ভয়টাও

খানিকটা কমিয়া গেল। তিনি তখন খাওয়া দাওয়া করিয়া উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কদিন এই ভাবে কাটিলে পর, একদিন রাত্রে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। গুরুমশায় ঘুমাইতে ছিলেন, কাজেই তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এমন কি যখন খড়ের চাল ফুটা হইয়া তাঁহার পায়ের কাছে বিছানাতে জল পড়িতে লাগিল, তখনও তাঁহার হুঁস নাই। খানিক পরে বৃষ্টি থামিয়া গেল, গুরু কিন্তু সেই ভিজা জায়গায় পা দিয়া ঘুমাইয়াই রহিলেন। ঠাণ্ডায় যখন তাঁহার পা প্রায় অসাড় হইয়া আসিয়াছে, তখন হটাৎ তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। পা ঠাণ্ডা দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তাহা হইলে ত তাঁহার মরিবার সময় উপস্থিত; কারণ এখন ত বিনা কারণেই পা ঠাণ্ডা হইয়াছে। তিনি খুব জোরে চেঁচাইয়া চেলাদের ডাকিতে লাগিলেন। তাহারা ঘুম ছাড়িয়া হুড়দাড় করিয়া ছুটিয়া আসিল। গুরুর যে মরণ কাল উপস্থিত সে বিষয়ে এবার আর চেলাদেরও সন্দেহ হইল না। এবার ত আর গুরু জলে পড়েন নাই? পা ত আপনা আপনিই ঠাণ্ডা হইয়াছে। আর বিছানাটা যে ঠাণ্ডা সে বোধহয় গুরুর পা লাগিয়াই হইয়াছে। তাহাদের গোলমালে গাঁয়ের লোক আসিয়া জুটিল, তাহাদের বুদ্ধিও ঐ চেলাদেরই কাছাকাছি, একই জাতের লোক ত? তাহারা ঠিক বুঝিল যে গুরুর আর মরিবার দেরি নাই। তাহারা সকলে গুরুর বিছানা ঘিরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আর নিরেট গুরু চোখ বুজিয়া মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন, "চরণং শীতং জীবননাশম্"

ক দিন এই ভাবে কাটিল। না খাইয়া না ঘুমাইয়া গুরু এত কাহিল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি শেষে একদিন মুর্চ্ছা গেলেন। আর কোথা যায়! তাঁহার চেলার দল ষাঁড়ের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, মাথা চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে বলিতে লাগিল "ওগো আমাদের গুরু ঠাকুর আর নেই গো।"

খানিকক্ষণ কাঁদিয়া একজন বলিল, "আর কেঁদে কি হবে? যা হবার তা ত হয়ে গেল, এখন এঁর সৎকারের চেষ্টা দেখতে হবে। আগে স্নান করিয়ে নেওয়া যাক্।

মঠে একটা মস্ত চৌবাচ্ছা ছিল, তাহার কানায় কানায় ভর্ত্তি জল। দুই চেলাতে ধরাধরি করিয়া গুরুকে সেই জলে ঝুপ্ করিয়া ফেলিয়া দিল। তারপর সকলে মিলিয়া খুব করিয়া ঘষিয়া তাঁহাকে স্নান করাইতে লাগিল। জল লাগিবামাত্র গুরুর জ্ঞান হইল, কিন্তু জলের ভিতর থাকাতে তিনি কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না; হাত পাও চেলারা

ধরিয়া রাখিয়াছিল, কাজেই হাত নাড়িবারও জো ছিল না। এইরূপে খানিকক্ষণ থাকিয়া, মূর্খ চেলাদের বুদ্ধির দোষে গুরু নিশ্বাস আটকাইয়া মরিয়া গেলেন।

তখন চেলারা একখানা খাট আনিয়া তাঁহাকে বসাইল, সে দেশের ঐরূপ রীতি। তাহার পর তাঁহাকে ভাল করিয়া ফুল দিয়া সাজাইয়া কাঁধে করিয়া শ্মশানে লইয়া চলিল। যত গাঁয়ের লোক আসিয়া তাহাদের দলে যোগ দিল। চেলারা গান করিতে করিতে চলিল "চরণং শীতং জীবননাশম্"। শ্মশানে পৌঁছিয়া খুব ধূমধাম করিয়া গুরুকে পোড়াইয়া তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

শ্রীসীতা দেবী।

দানের পুণ্য।

"গরীব বুড়ীকে দয়া কর বাবা! সারাদিন খেতে পাইনি, একটি পয়সা দাও—ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।" পথের ধারে একটি বুড়ি এই বলে ভিক্ষা করছিল। একে শীতের দিন তার উপর কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস, মাঝে মাঝে বরফও পড়ছে। ছেঁড়া, কুটি কুটি ময়লা কাপড় বুড়ির গায়ে, তা দিয়ে কি আর শীত নিবারণ হয়? সে বসে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল। তবু সে নিরাশ হয়নি, যে যায় বুড়ী তারই মুখের দিকে তাকায় আর বলে "গরীব বুড়িকে দয়া কর বাবা।"

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল, বুড়ি তখনও ভিক্ষার আশায় বসে রয়েছে; এমন সময় একজন পথিক এসে উপস্থিত। বুড়িকে দেখেই তিনি ভারী দুঃখ করে বল্‌লেন—"আহা! এমন দিনেও কি কেউ বাইরে থাকে? না জানি তোমার কত কষ্ট হচ্ছে!" এই বলে তাকে কিছু না দিয়েই তিনি চল্‌লেন। খানিকদূর গিয়েই তাঁর মনটা জানি কেমন করে উঠ্‌ল, তিনি ভাব্‌লেন—নাঃ, বুড়িকে কিছু দিলে হত! কিন্তু তাঁর হাতে যে মোটা দস্তানা রয়েছে, তা কি এত ঠাণ্ডায় খুলতে ইচ্ছা করে? আর তা না খুল্‌লে পকেট থেকে কি করে পয়সা বার করেন? এই ভেবে ভদ্রলোকটি আর ফিরে তাকালেন না।

কিছু না পেয়ে বুড়ির কষ্ট হলো বই কি! তবু, ভদ্রলোকটির দুটি কথা শুনেই সে সুখী হলো। একটু পরেই জুড়ি হাঁকিয়ে এক মস্ত বড়লোক এসে উপস্থিত। বুড়িকে দেখে তার মনে দুঃখ হলো। ঠাণ্ডার জন্য গাড়ীর দরজার কাচ টানা ছিল, তিনি তখন কাচ নামিয়ে কোচমানকে বলে গাড়ী থামালেন। বুড়ি কিছু পাবার আশায় মহাব্যস্ত হয়ে গাড়ীর দরজার কাছে এসে উপস্থিত। ভদ্রলোক পকেট থেকে একটি টাকা নিয়ে বুড়িকে দিতে গেলেন। হাত বাড়িয়ে দেবার সময় দেখ্‌লেন সেটা টাকা নয়—ভুলে তিনি মোহর তুলেছেন। তিনি মোহরের বদলে টাকা দিতে যাবেন এমন সময় টুক করে হাত থেকে মোহরটি পড়ে গেল। সেই সঙ্গে এমনি জোরে একটা কন্‌কনে ঝাপটা এলো যে, ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি কাচ টেনে দিয়ে গায়ে গরম কাপড় জড়ালেন—তবু তাঁর কাঁপুনি ধরে গেল।

তারপর গাড়ীতে যেতে যেতে কেবলি সেই মোহরের কথা তাঁর মনে আসে, আর এই বলে মনকে প্রবোধ দেন—"আমার ঢের আছে, তা একটা মোহর দিলামই বা—তাতে বরং পুণ্য হবে।"

বাড়ী গিয়ে ধনী লোকটি খাওয়া দাওয়া শেষ করে আগুণের সাম্‌নে বসে আরাম কর্‌ছিলেন, তখন আবার সেই বুড়ির কথা ভেবে মনে মনে বল্‌তে লাগলেন—"বুড়িকে বড্ড বেশী দিয়ে ফেলেছি। যাহোক এখন আর দুঃখ করে কি হবে? টাকাটা বুড়ীর কাজে লাগবে। আমি যে ভারী মহৎ একটা কাজ করে ফেলেছি তাতে আর সন্দেহ কি? দুঃখের বিষয় কেউ সেটা দেখ্‌তে পেলেনা—যাহোক ঈশ্বর আমাকে অবশ্য তার পুরস্কার দিবেন।"

এদিকে আগের সেই পথিকটিও বাড়ী গিয়ে খেতে বসেছেন। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় কতরকমের খাদ্য তাঁর সাম্‌নে কিন্তু সে দিকে তাঁর মন নেই। সেই বুড়ীর চেহারা কেবলই তাঁর চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে। তার সেই ছেঁড়া কাঁথা, জড়সড় ভাব, আর ছল্‌ছল্ চোখ কেবলই তাঁর মনে পড়ছে। আর তাঁর সহ্য হলো না। "আরো একজনের খাবার জায়গা কর, আমি একজনকে নিয়ে আস্‌ছি" চাকরকে এই কথা বলেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

বাইরে তখন ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার—ঠাণ্ডার ত কথাই নাই। তবু তিনি চলেছেন সেই বুড়ীর উদ্দেশে। বুড়ী তখন রাস্তায় উপুড় হয়ে ধনী ভদ্রলোকের দেওয়া টাকাটি খুঁজছে, এমন সময় তিনি গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি খুঁজছ বুড়ী? যে অন্ধকার, চোখে কি কিছু দেখা যায়!" কাঁপতে কাঁপতে বুড়ী তাঁকে সেই টাকার কথা বল্‌লে পর তিনি বল্‌লেন—"খুঁজে আর কি হবে, তুমি চল আমার সঙ্গে—খাওয়া দাওয়া করে আমার বাড়ীতেই আজ শুয়ে থাকবে এখন। আমি তোমাকে আগুন জ্বেলে দিব, গরম কাপড় দিব।"

বুড়ী অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল, যেন তাঁর কথাই বিশ্বাস হচ্ছে না। তারপর তাঁকে শত শত আশীর্ব্বাদ করতে করতে তাঁর সঙ্গে চল্‌ল। বুড়ী ভাল করে চলতে পারে না—তাই সে লোকটি তাকে হাতে ধরে সাবধানে বাড়ী নিয়ে এলেন। সেখানে ভাল খাবার খেয়ে, ভাল কাপড় পরে, আরামে শুয়ে বুড়ী যে ঘুম ঘুমাল তেমন ঘুম সে তার জীবনে কখনও ঘুমায় নি।

সেদিন, স্বর্গের যে খাতায় পুণ্যের হিসাব লেখা হয়, তাতে সেই ভদ্রলোকের অনুতাপের কথা বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল—কিন্তু ঐ ধনী লোকটির মোহরের কোন হিসাব ছিল না।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

সিন্ধু ঈগল।

সমুদ্রের ধারে, যেখানে ঢেউয়ের ভিতর থেকে পাহাড়গুলো দেয়ালের মত খাড়া হ'য়ে বেরোয়, আর সারাবছর তার সঙ্গে লড়াই ক'রে সমুদ্রের জল ফেনিয়ে ওঠে, তারই উপরে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের চূড়ায় সিন্ধু ঈগলের বাসা। সেখানে আর কোন পাখী যেতে সাহস পায় না—তারা সবাই নীচে পাহাড়ের গায়ে ফাটলে ফোকরে বসবাস করে। পাহাড়ের উপরে কেবল সিন্ধু-ঈগল—তারা স্বামী স্ত্রীতে বাসা বেঁধে থাকে।

ঈগলবংশ রাজবংশ—পাখীর মধ্যে সেরা। সিন্ধু-ঈগলের চেহারাটি তার বংশেরই উপযুক্ত—মেজাজটি ও রাজারই মত। সিংহকে আমরা পশুরাজ বলি—সুতরাং ঈগলকেও পক্ষীরাজ বলা উচিত; কিন্তু তা আর বলবার যো নেই, কারণ রূপকথার আজগুবি গল্পে লেখে, পক্ষীরাজ নাকি এক রকম ঘোড়া! যা হো'ক—শুনতে পাই রাজারা নাকি মৃগয়া কর্‌তে ভাল বাসেন। তা'হলে সে হিসাবেও সিন্ধু-ঈগলের রাজবংশী চালের কোন অভাব নাই। চিল কাক সাঁচান শকুন সবাই মরা মাংস খায়—কাজেই সে রকম খাওয়া যতক্ষণ জোটে ততক্ষণ তাদের আর শিকার করা দরকার হয় না। কিন্তু সিন্ধু ঈগলের স্বভাবটি ঠিক তার উল্টা—যতক্ষণ শিকার জোটে ততক্ষণ সে মরা জানোয়ার পেলেও তা ছোঁয় না। কিন্তু

একটি তার বদভ্যাস আছে, সেটাকে ঠিক রাজার মত বলা যায় না; সেটি হ'চ্ছে অন্যের শিকার কেড়ে খাওয়া!

সমুদ্রের ধারে ছোট বড় কত রকম পাখী—তারা সবাই মাছ ধ'রে খায়। নিতান্ত ছোট যারা, তারা ধরে ছোট ছোট মাছ—সে সব মাছের উপর সিন্ধু ঈগলের কোন লোভ নাই। কিন্তু বড় বড় গাংচিল আর মেছো চিল গুলো যে সব বড় বড় মাছ জল থেকে টেনে তোলে, তার দুচারটা যে মাঝে মাঝে সিন্ধু ঈগলের পেটে যায় না, এমন নয়। সমুদ্রের ধারে শিকারের অভাব কি? মাছ খেয়ে যদি অরুচি ধরে, তবে এক আধটা পাখী মেরে নিলেই হয়! তাছাড়া একটু ডাঙার দিকে গেলে ইঁদুর খরগোস এমন কি ছাগলছানাটা পর্য্যন্ত মিলতে পারে। কিন্তু তবু সে অন্যের শিকারে জবর দখল জাহির করতে ছাড়ে না। এই যে ডাকাতি ক'রে কেড়ে খাওয়া, এ বিদ্যায় সিন্ধু ঈগলের বেশ একটু কেরামতি আছে। তারা স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে ডাকাতি করে। সারাদিন তারা আকাশে উড়ে উড়ে বেড়ায়। উড়্‌তে উড়্‌তে কোথায় গিয়ে ওঠে, মনে হয় যেন সে মেঘের রাজ্যে চলে গিয়েছে, পৃথিবীর উপর বুঝি তার কোন দৃষ্টি নেই। কিন্তু ঈগলের চোখ বড় ভয়ানক চোখ। ঐ উঁচুতে থেকেই সে সমস্ত দেখছে—কিছুই তার চোখ এড়াবার যো নাই। ঐ যে কত পাখী জলের ধারে খেলছে আর মাছ ধরছে, তার মধ্যে একটা মেছো-চিল ঘুরে ঘুরে শিকার খুঁজছে—ঈগল পাখীর চোখ রয়েছে তারই উপর।

জলের নীচে একটা মাছ বারবার উঠ্‌ছে আর নাম্‌ছে, চিল কেবল তাই দেখ্‌ছে—মাথার উপরে যে ঈগলরাজ টহল ফিরছেন সে দিকে তার খেয়ালই নাই। একবার মাছটা যেই ভেসে উঠেছে, আর অমনি ছোঁ করে মেছো চিল জলের উপরে পড়েছে! তারপর মাছ শুদ্ধ টেনে তুল্‌তে কতক্ষণ লাগে! চিল ভাব্‌ছে এখন একটু নিরিবিলি জায়গা দেখে ভোজনে বস্‌বে, এমন সময়, চীঁ হিঁ হিঁ হিঁ হীঁ—ভূতের হাসির মত বিকট চীৎকার ক'রে কি একটা প্রকাণ্ড ছায়া তার ঘাড়ের উপর ঝড়ের মত তেড়ে নাম্‌ল! সে আর কিছু নয়, সিন্ধু ঈগল; ঐ মাছটার উপর তার নিতান্তই লোভ পড়েছে। তাড়া খেয়ে চিলের বাছা পালাতে পার্‌লে বাঁচে, কিন্তু পালাবে কোথায়? দুদিক থেকে দুইটা ঈগল ক্রমাগত তেড়ে তেড়ে ছোবল মার্‌ছে; তার একটি ছোবল গায়ে লাগ্‌লে হাড়ে মাংসে আল্‌গা হ'য়ে যায়। তার উপর সেই বিকট আওয়াজ যখন কানের কাছ দিয়ে হেঁকে যায়, তখন বুদ্ধি শুদ্ধি আপনা হতেই ঘুলিয়ে আসে। কাজেই মেছো চিলের মাছ খাওয়া

এবারে আর হ'ল না। সে বার কয়েক ঈগলের ঝাপ্‌টা এড়িয়ে তারপর প্রাণের ভয়ে মাছটাছ ফেলে পালাল।

সিন্ধু ঈগল অনেক সময় সমুদ্র ছেড়ে বড় বড় নদীর ধারে গাছের উপর বাসা বাঁধে। সে বাসাও একটা দেখবার মত জিনিষ। এক একটা বাসা ৫।৭ হাত চওড়া; বছরের পর বছর সেটাকে তারা ক্রমাগতই উঁচু করে একটা রীতিমত সিংহাসন বানিয়ে তোলে। এই বাসা-বানান ব্যাপারটা নাকি দেখতে ভারি মজার। একটা ঈগল অনেক কষ্ট ক'রে কতগুলো ডাল সংগ্রহ ক'রে আন্‌ল—আর একটা হয়ত সেগুলো পচ্ছন্দই করলনা। এম্নি ক'রে যত ডালপালা জোগাড় হয় তার অধিকাংশই খামখা নেড়ে চেড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তখন তা নিয়ে তাদের মধ্যে ভারি একটা ঝগড়া লেগে যায়; তারা বাসা বানান বন্ধ রেখে মুখ ভার ক'রে বসে থাকে। আবার হটাৎ খানিক বাদেই তারা আপোষে ভাব ক'রে বাসা বানাতে লেগে যাবে।

এরা সাধারণত মানুষকে কিছু বলে না—বরং তাড়া করলে বাসাটাসা ফেলে পালায়। তবে, বাসায় যদি ছানা থাকে. তা হলে তাড়াতে গেলে অনেক সময়ে উল্টে তেড়ে আসে। তখন দেখা যায় তাদের তেজ কেমন সাংঘাতিক। একবার এক সাহেবের চাকর তামাসা দেখবার জন্য গাছে উঠে ঈগলের বাসায় উঁকি মারতে গিয়েছিল। তাতে ঈগলেরা তাকে তেড়ে এসে এমনি সাজা দিয়ে ছিল, যে সাহেব বন্দুক নিয়ে ছুটে না আসলে সে দিন তার তামাসা দেখবার সখ একেবারে জন্মের মত ঘুচে যেত।

খৃষ্টবাহন।

(রোমান ক্যাথলিক কাহিনী)

তার নাম অফেরো। অমন পাহাড়ের মত শরীর, অমন সিংহের মত বল, অমন আগুনের মত তেজ, সে ছাড়া আর কা'রও ছিল না। বুকে তার যেমন সাহস, মুখে তার তেমনি মিষ্টি কথা। কিন্তু যখন তার বয়স অল্প, তখনই সে তার সঙ্গীদের ছেড়ে গেল; যাবার সময় বলে গেল "যদি রাজার মত রাজা পাই, তবে তার গোলাম হয়ে থাকব। আমার মনের মধ্যে কে যেন বলে দিচ্ছে, তুমি আর কারও চাকরী ক'রো না; যে রাজা সবার বড়, সংসারে যার ভয় নাই, তারই তুমি খোঁজ কর।" এই বলে অফেরো কোথায় যেন বেরিয়ে গেল।

পৃথিবীতে কত রাজা, তাদের কত জনের কত ভয়। প্রজার ভয়, শত্রুর ভয়, যুদ্ধের ভয়, বিদ্রোহের ভয়—ভয়ে কেউ আর নিশ্চিন্ত নেই। এরকম হাজার দেশ ছেড়ে ছেড়ে অফেরো এক রাজ্যে এল, সেখানে রাজার ভয়ে সবাই খাড়া! চোরে চুরি করতে সাহস পায় না, কেউ অন্যায় করলে ভয়ে কাঁপে। অস্ত্রে শস্ত্রে সৈন্যসামন্তে রাজার প্রতাপ দশদিক দাপিয়ে আছে। সবাই বলে "রাজার মত রাজা।" তাই শুনে অফেরো তাঁর চাকর হ'য়ে রইল।

তারপর কতদিন গেল—এখন অফেরো না হ'লে রাজার আর চলে না—উঠতে বসতে তার ডাক পড়ে। রাজা যখন সভায় বসেন অফেরো তাঁর পাশে খাড়া। রাজার মুখের প্রত্যেকটি কথা সে আগ্রহ ক'রে শোনে! রাজার চলনচালন ধরনধারন ভাবভঙ্গী সব তার আশ্চর্য্য লাগে। আর রাজা যখন শাসন করেন, চড়া গলায় হুকুম দেন, অফেরো তখন অবাক হ'য়ে ভাবে, "যদি রাজার মত রাজা কেউ থাকে, তবে সে এই!"

তারপর একদিন রাজার সভায় কথায় কথায় কে যেন সয়তানের নাম ক'রেছে। শুনে রাজা গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। অফেরা চেয়ে দেখলে রাজার চোখে হাসি নেই, মুখখানি তাঁর ভাবনা ভরা। অফেরো তখন জোড়হাতে দাঁড়িয়ে বল্ল, "মহারাজের ভাবনা কিসের? কি আছে তাঁর ভয়ের কথা?" রাজা হেসে বল্লেন, "এক আছে সয়তান আর আছে মৃত্যু—এ ছাড়া আর কাকে ডরাই?" অফেরো বল্লেন, "হায় হায়, আমি এ কার চাকরী করতে এলাম? এ যে সয়তানের কাছে খাটো হ'য়ে গেল। তবে যাই সয়তানের রাজ্যে; দেখি সে কেমন রাজা!" এই ব'লে সে সয়তানের খোঁজে বেরুল।

পথে কত লোক আসে যায়—সয়তানের খবর জিজ্ঞাসা করলে তারা বুকে হাত দেয় আর দেবতার নাম করে, আর সবাই বলে, "তার কথা ভাই ব'লো না, সেযে কোথায় আছে কোথায় নেই—কেউ কি তা বলতে পারে?" এম্নি ক'রে খুঁজে খুঁজে কতগুলো নিষ্কর্ম্মা কুঁড়ের দলে সয়তানকে পাওয়া গেল। অফেরোকে পেয়ে সয়তানের ফূর্ত্তি দেখে কে! এমন চেলা সে আর কখনও পায়নি।

সয়তান বল্ল, "এস, এস, আমি তোমায় তামাসা দেখাই। দেখবে আমার শক্তি কত?" সয়তান তাকে ধনীর প্রাসাদে নিয়ে গেল, সেখানে টাকার নেশায় মত্ত হ'য়ে লোকে সয়তানের কথায় ওঠে বসে; গরীবের ভাঙা কুঁড়ের ভিতরে গেল, সেখানে এক-মুটো খাবার লোভে পেটের দায়ে বেচারীরা পশুর মত সয়তানের দাসত্ব করে। লোকেরা

সব চলছে ফিরছে, কে যে কখন ধরা পড়ছে, কেউ হয়ত জানতে পারে না; সবাই মিলে মারছে কাট্‌ছে আর কোলাহল কর্‌ছে "সয়তানেরই জয়"।

সব দেখে শুনে অফেরোর মনটা যেন দমে গেল। সে ভাব্‌ল "রাজার সেরা রাজা বটে, কিন্তু আমার ত কৈ এর কাজেতে মন লাগছে না!" সয়তান তখন মুচকি মুচকি হেসে বল্লে, "চলত ভাই, একবারটি এই সহর ছেড়ে পাহাড়ে যাই। সেখানে এক ফকির আছেন, তিনি নাকি বেজায় সাধু! আমার তেজের সামনে তার সাধুতার দৌড় কতখানি তা' একবার দেখতে চাই"।

পাহাড়ের নীচে রাস্তার চৌমাথায় যখন তারা এসেছে, সয়তান তখন হঠাৎ কেমন ব্যস্ত হ'য়ে থমকিয়ে গেল—তারপর বাঁকা রাস্তা ঘুরে তড়্‌বড়্‌ ক'রে চল্‌তে লাগ্‌ল। অফেরো বল্লে, "আরে মশাই, ব্যস্ত হ'ন কেন? সয়তান বল্লে, "দেখছ না ওটা কি"! অফেরো দেখ্‌ল—একটা ক্রুশের মত কাঠের গায়ে মানুষের মূর্ত্তি আঁকা! মাথায় তার কাঁটার মুকুট—শরীরে তার রক্ত ধারা! সে কিছু বুঝতে পারল না। সয়তান আবার বল্লে, "দেখছ না ঐ মানুষটাকে—ও যে আমায় মানে না, মরতে ডরায় না,—বাবা রে! ওর কাছে কি ঘেঁষতে আছে? ওকে দেখলেই তফাৎ হটি"। বলতে বলতে সয়তানের মুখখানা চামড়ার মত শুকিয়ে এল।

তখন অফেরো হাঁফ ছেড়ে বল্লে, "বাঁচালে ভাই! তোমার চাকরী আর আমায় করতে হ'লোনা। তোমায় মানে না, মরতেও ডরায় না, সেই জনকে যদি পাই তবে তারই গোলাম হয়ে থাকি"। এই বলে আবার সে খোঁজে বেরুল।

তারপর যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই সে জিজ্ঞাসা করে, "সেই ক্রুশের মানুষকে কোথায় পাব"?—সবাই বলে, "খুঁজতে থাক, একদিন তবে পাবেই পাবে"। তারপর এক দিন চল্‌তে চল্‌তে সে এক যাত্রীদলের দেখা পেল। গায়ে তাদের পথের ধূলা, হাঁটতে হাঁটতে সবাই শ্রান্ত, কিন্তু তবু তাদের দুঃখ নাই—হাসতে হাসতে গান গেয়ে সবাই মিলে পথ চল্‌ছে। তাদের দেখে অফেরোর বড় ভাল লাগল—সে বল্লে, "তোমরা কে ভাই? কোথায় যাচ্ছ?" তারা বল্লে, "ক্রুশের মানুষ যীশুখৃষ্ট—আমরা সবাই তাঁরই দাস। যে পথে তিনি গেছেন, সেই পথের খোঁজ নিয়েছি"। শুনে অফেরো তাদের সঙ্গ নিল।

সে পথ গেছে অনেক দূর। কত রাত গেল দিন গেল, পথ তবু ফুরায় না—চল্‌তে চল্‌তে সবাই ভাবছে, বুঝি পথের শেষ নাই! এমন সময় সন্ধ্যার ঝাপসা আলোয় পথের

WATER STAINED.

শেষ দেখা দিল। ওপারে স্বর্গ, এবারে পথ, মাঝে অন্ধকার নদী। নৌকা নাই, কূল নাই, মাঝে মাঝে ডাক আসে, "পার হ'য়ে এস"। অফেরো ভাবল "কি ক'রে এরা সব পার হবে? কত অন্ধ কত খঞ্জ, কত অক্ষম বৃদ্ধ, কত অসহায় শিশু, এরা সব পার হবে কি ক'রে"? যাঁরা বৃদ্ধ তাঁরা বল্লেন, "দূত আসবে। ডাক পড়বার সময় হলে, তখন তাঁর দূত আসবে।"

বল্‌তে বল্‌তে দূত এসে ডাক দিল। একটি ছোট মেয়ে ভুগে ভুগে রোগা হ'য়ে গেছে, সে নড়্‌তে পারে না চাইতে পারে না, দূত তাকে বলে গেল,—"তুমি এস, তোমার ডাক পড়েছে"। শুনে তার মুখ ফুটে হাসি বেরুল, সে উৎসাহে চোখমেলে উঠে বসল। কিন্তু হায়! অন্ধকার নদী, অকূল তার কালো জল, স্রোতের টানে ফেনিয়ে উঠ্‌ছে—সে নদী পার হবে কেমন ক'রে? জলের দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভিতরে দুর্ দুর্ ক'রে উঠল। ভয়ে দুচোখ ঢেকে নদীর তীরে একলা দাঁড়িয়ে মেয়েটি তখন কাঁদ্‌তে লাগল। তাই দেখে সকলের চোখে জল এল, কিন্তু যেতেই যখন হবে তখন আর উপায় কি? মেয়েটির দুঃখে অফেরোর মন একেবারে গ'লে গেল। সে হটাৎ চীৎকার ক'রে বলে উঠল, "ভয় নাই—আমি আছি"। কোথা হ'তে তার মনে ভরসা এল, শরীরে তার দশগুণ শক্তি এল—সে মেয়েটিকে মাথায় ক'রে স্রোত ঠেলে আঁধার ঠেলে বরফের মত ঠাণ্ডা নদী মনের আনন্দে পার হ'য়ে গেল। মেয়েটিকে ওপারে নামিয়ে সে বল্ল, "যদি সেই ক্রুশের মানুষের দেখা পাও, তাঁকে বল, এ কাজ আমার বড় ভাল লেগেছে—যত দিন আমার ডাক না পড়ে, আমি তাঁর গোলাম হ'য়ে এই কাজেই লেগে থাকব!"

সেই থেকে তার কাজ হ'ল নদী পারাপার করা। সে বড় কঠিন কাজ! কত ঝড়ের দিনে কত আঁধার রাতে যাত্রীরা সব পার হয়—সে অবিশ্রাম কেবলই তাদের পৌঁছে দেয় আর ফিরে আসে! তার নিজের ডাক যে কবে আস্‌বে তা ভাববার আর তার সময় নাই।

একদিন গভীর রাত্রে তুফান উঠল। আকাশ ভেঙে পৃথিবী ধুয়ে বৃষ্টির ধারা নেমে এল। ঝড়ের মুখে স্রোতের বেগে পথঘাট সব ভাসিয়ে দিল—হাওয়ার পাকে পাগল হ'য়ে নদীর জল ক্ষেপে উঠ্‌ল। অফেরো সে দিন শ্রান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—সে ভেবেছে এমন রাতে কেউ কি আর পার হ'তে চায়! এমন সময় ডাক শোনা গেল। অতি মিষ্টি কচি গলায় কে যেন বলছে, "আমি এখন পার হব"। অফেরো তাড়াতাড়ি উঠে দেখ্‌ল

ছোট্ট একটি শিশু ঝড়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, আর বলছে, "আমার ডাক এসেছে, আমি এখন পার হব।" অফেরো বল্লে, "আহা! এমন দিনে তোমায় পার হ'তে হবে! ভাগ্যিস্ আমি শুনতে পেয়েছিলাম!" তারপর ছেলেটিকে কাঁধে নিয়ে "ভয় নাই" "ভয় নাই" বল্‌তে বল্‌তে সে দুরন্ত নদী পার হ'য়ে গেল।

কিন্তু এই বারেই শেষ পার। ওপারে যেমনি যাওয়া অমনি তার সমস্ত শরীর অবশ হ'য়ে পড়ল, চোখ যেন ঝাপসা হ'য়ে গেল, গলার স্বর জড়িয়ে এল। তারপর যখন সে তাকাল তখন দেখল, ঝড় নেই আঁধার নেই, সেই ছোট শিশুটিও নেই—আছেন শুধু এক মহা-পুরুষ, মাথায় তাঁর আলোর মুকুট। তিনি বল্লেন, "আমিই ক্রুশের মানুষ—আমিই আজ তোমায় ডাক দিয়েছি। এত দিন এত লোক পার করেছ, আজ আমায় পার করতে গিয়ে নিজেও পার হ'লে, আর তারি সঙ্গে সয়তানের পাপের বোঝা কত যে পার করেছ তা তুমিও জান না। আজ হ'তে তোমার অফেরো নাম ঘুচল; এখন তুমি Saint Christofer—সাধু খৃষ্টবাহন! যাও, স্বর্গের যাঁরা শ্রেষ্ঠ সাধু, তাঁদের মধ্যে তুমি আনন্দে বাস কর।"

WATER STAINED.

চুপ রও!

এক ছিল ওস্তাদ দরজী। তার টাকাকড়ি ঘরবাড়ী কিছুরই অভাব ছিল না; তবু সে দরজীর ব্যবসা কর্‌ত। তার ছিল একটি সুন্দরী মেয়ে, সে একেবারে ফুটফুটে ফুলের মত সুন্দর। সে ছাড়া তার আর কেউ নাই। যত রাজ্যের দরজির ছেলে, ওস্তাদের কাছে সবাই আস্‌ত কাজ শিখতে। তার মধ্যে একজন ছিল তার কাজ শিখবার ইচ্ছা মোটেও ছিল না, সব সময়ে সে অন্যমনস্ক থাকত, আর যখন তখন বকর বকর গল্প করত। তাকে ধমক দিয়ে শাসন করে কিছুতেই তার সংশোধন করা যেত না। এর উপর সে যখন একদিন ওস্তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইল, তখন ওস্তাদজী এমন ভয়ানক রেগে গেলেন, যে তিনি তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিলেন, আর বল্লেন, "এই নেও তোমার ছুঁচ আর এই নেও তোমার সুতো। যতদিন তুমি ছয়টি মোহর রোজগার ক'রে আন্‌তে না পার, ততদিন তোমাকে আমার বাড়ীতে ঢুকতে দিব না। যেদিন ছয়টি মোহর আন্‌তে পার্‌বে, সেইদিন আবার এস। তার আগে বিয়ের কথা মুখেও এনো না!"

বেচারী আর করে কি? সকলের কাছে বিদায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে পড়ল। কয়েকদিন ক্রমাগত পথ চলতে চলতে সে এক প্রকাণ্ড জঙ্গলে এসে পড়ল। সেখানে দেখতে দেখতে রাত হয়ে এল, সে কোথায় বা থাকবে কোথায় বা শোবে? শেষটায় একটা গাছের তলায় আগুন জেলে ব'সে রইল। ব'সে থাকতে থাকতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে সে তা টেরও পায়নি—হঠাৎ গভীর রাত্রে চমকে উঠে দেখে তার আশেপাশে ছয় ছয়টা বেঁটে বামন। সে ধড়ফড় করে উঠে বল্‌ল "আপনারা কে?" যেমন বলা অমনি একটা বামন লাফিয়ে তার সামনে এসে বিকট রাক্ষসের মত চেহারা ক'রে প্রকাণ্ড এক কীল উঠিয়ে তাকে মারতে এল! তাই দেখে দরজি ভয় পেয়ে বল্‌লে "রাগ করেন কেন মশাই?—বল্‌তেই পটাপট্ পাঁচ কীল আর তিন থাপ্পড়! দরজীর কান ভোঁ ভোঁ কর্‌তে লাগ্‌ল, সে ভয়ে একেবারে কাঠের মত আড়ষ্ট হ'য়ে চুপ করে বসে রইল।

এমনি করে অনেকক্ষণ বসে থেকে তার বিরক্ত ধ'রে গেল। সে ভাবল একটা কিছু সেলাই করা যাক! এই ভেবে যাই সে তার পুঁটলি থেকে ছুঁচ সুতা বার করেছে অম্নি একটা বামন মহা খুসী হয়ে এক গাল হেসে কোত্থেকে এক ছেঁড়া জামা বার করে তাকে সেলাই করতে দিয়েছে। দরজী আর কি করে? সে দুঘণ্টা ধ'রে খুব যত্ন করে সেই

জামাটা সেলাই করল। তখন বামন ভারি খুসী হয়ে তাকে একটা মোহর দিল। মোহর পেয়ে দরজী যাই তাকে ধন্যবাদ দিতে যাবে অম্নি সে আবার সেই প্রকাণ্ড ঘুসি উঠিয়ে মারতে এসেছে! দরজী ভাবল ভালরে ভাল! আমি মেলা কথা কইতাম, তাই

ওস্তাদজি আমায় ধমকাতেন—এদের দেখছি চড়চাপড় ছাড়া কথা নেই। যা'হোক মোহরটা পেয়ে তার মনটা বড় খুসী হ'ল। সে ভাবল, আর পাঁচটা মোহর হলেই সে ওস্তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে। এই রকম ভাবতে ভাবতে ভোর হ'য়ে এল, বামনরাও যাবার জন্য ব্যস্ত হ'ল। যাবার সময় তারা একটা কুঁজো থেকে সরবৎ ঢেলে দরজিকে খেতে দিল! দরজি বেচারা যেমন এক ঢোক সরবৎ গিলেছে অম্নি তার হাত পা গুটিয়ে ছোট হ'য়ে এল, সে একেবারে বেঁটে বামন হ'য়ে পড়ল; গায়ের জামা কাপড় সব ঢলঢলে ঢিলা হ'য়ে গেল। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে দরজি বেচারা চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌ল, কিন্তু যেমন চীৎকার করা অম্নি আবার সাংঘাতিক এক থাপ্পড়! সে একেবারে চিৎপাত হয়ে পড়ল। তখন বামনরা সবাই মিলে তার দিকে চোখ পাকিয়ে ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে ঈসারা করে বল্‌ল "চুপ রও।"

WATER STAINED.

তারপর খানিক পরামর্শ করে তারা ছয়জনে মিলে তাকে ধরে নিয়ে চল্‌ল। জঙ্গলের শেষে দুর্গের মত প্রকাণ্ড কালো পাহাড়, তারা সেই পাহাড়ের এক গর্ত্তের মধ্যে তাকে নিয়ে গেল। গর্ত্তের ভিতরে চমৎকার ঘরদুয়ার জিনিষপত্র—মনিমুক্তার দালান, তার মধ্যে চমৎকার গান বাজনা চলছে। সেইখানে একটা ঘরে সোণার খাটে রেশমের বিছানায় শুয়ে দরজি বেচারা ঘুমিয়ে রইল। সেকি যেমন তেমন ঘুম! একদিন গেল দুদিন গেল, এম্নি করে সাত দিন গেল, তারপর তার ঘুম ভাঙ্গল।

ঘুম থেকে উঠেই সে দেখে সেই বামনগুলো বসে আছে—কেবল যার জামা সেলাই হয়েছিল সে আসে নি। আবার একজন সেই আগের দিনকার মত একটা ছেঁড়া জামা দিল, আর দরজি তা সেলাই করে আবার একটা মোহর পেল। কিন্তু এবারে সে চালাক হয়েছে—আর সে যখন তখন কথা বলতে যায় না! খালি একবারটি মশায় কামড়েছিল ব'লে "উঃ" ক'রেছিল আর তাতেই এক থাপ্পড়ে তার দম বেরিয়ে এসেছিল। সে দিনও তারা সরবৎ খাইয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেল।

এম্নি ক'রে লম্বা লম্বা ঘুম দিয়ে আর পাঁচ রাত সেলাই ক'রে সে পাঁচ মোহর রোজগার করল; আর একে একে পাঁচ বামন বিদায় হ'ল। তার পর যখন একজন মাত্র বামন বাকী আছে, তখন শেষবার সে সেলাই করছে, আর ভাবছে,—এইবারের মোহর জমা হ'লেই যেমন ক'রে হো'ক্ এই গর্ত্ত থেকে পালিয়ে যাব। এই ভাবতে ভাবতে যখন তার সেলাই শেষ হ'য়েছে—আর বামন তাকে মোহর দিতে যাবে—এমন সময় হটাৎ তার মনে পড়ে গেল, যে তার আর সেই আগের মত চেহারা নাই এখন সে বিদ্‌ঘুটে বেঁটে বামন হ'য়ে গেছে—হয়ত ওস্তাদজি তাকে দেখলে চিনতেই পারবেন না। আর চিনলেই বা কি? সেই মেয়ে হয়ত তাকে আর পছন্দই করবে না! হয়ত সবাই তাকে ঠাট্টা করবে আর তাই দেখে মেয়েটিও হাসতে থাকবে! হায়, হায়, তখন কি হবে?

এই রকম ভাবতে ভাবতে তার দুই চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল, সে হটাৎ "ওরে বাবারে! আমার কি হ'লোরে" বলে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল। কেঁদেই তার মনে হ'ল এইবার বুঝি বামন তাকে থাপ্পড় মারবে। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! মারা দূরে থাকুক বামন নিজেই এবার ভাঙাগলায় খন্ খন্ ক'রে বলে উঠ্‌ল, "কাঁদ্‌ছ কেন? আর একটিবার সরবৎ খেয়ে দেখ দেখি"। দরজি দেখল বামন তাকে তরমুজের মত গোলাপী

রঙের সরবৎ এনে খেতে দিচ্ছে। "যা হয় হবে, খেয়ে ফেলি"—এই ভেবে সে ঢক্ ঢক্ ক'রে সরবৎ গিলে ফেল্ল।—

অমনি বোঁ বোঁ ক'রে তার মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল, কানের মধ্যে ভন্ ভন্ ক'রে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, আর ছায়ার মত কি যেন সব তার চোখের সামনে নাচতে লাগল, ঘর বাড়ী পাহাড় জঙ্গল দেখতে দেখতে কোথায় সব মিলিয়ে গেল। দরজী দেখল সে যেমন ছিল তেমনি আছে, আর তার চোখের সামনে সেই সহর, যেখানে তার ওস্তাদ থাকেন, আর তাঁর মেয়ে থাকে। সে তার পকেটে হাত দিয়ে দেখল, মোহরগুলা সব ঠিক আছে।

তখন আর কথা কি? সে এক দৌড়ে ওস্তাদের বাড়ী গিয়ে তার মোহর দেখিয়ে সকলের তাক্ লাগিয়ে দিল। তারপর বিয়ে আর ধুমধাম আর খাওয়াদাওয়ার ঘটা যে হ'ল সে খুবই আশ্চর্য্য। কিন্তু তার চাইতেও আশ্চর্য্য এই যে সেদিন থেকে তার স্বভাবটি একেবারে বদলে গেল। এখন থেকে যখনই সে মেলা বাজে কথা বল্‌তে যায়, তখনই তার মনে হয় যেন রাক্ষসের মত চেহারা ক'রে বামন তাকে চোখ পাকিয়ে বল্‌ছে—"চোপ্ রও"!

শ্রীইলা রায়।

পুরাতন লেখা।

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

আকাশ।

আমরা নিতান্ত ছোট, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, আমরা খুব বড়। আমরা ভাবি, "আমরা যে মানুষ! আহা, আমাদের মতন আর একটী জন্তু বুঝি হয় না! আমাদের যে পৃথিবী,—ইস্! সে কত খানি বড়!" কিন্তু আমরা যে যথার্থই কত ছোট, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য ঈশ্বর আকাশকে রাখিয়াছেন। দেখ, ওখানে কত সূর্য্য। ঐ সকল সূর্য্যের সঙ্গে কত পৃথিবী আছে! আর, তাহাতে মানুষের মতন, বা, তাহার চাইতে ঢের বেশী বুদ্ধিমান্ জীব থাকা কোন মতেই অসম্ভব নহে। উহারা হয়ত আমাদের চাইতে ঢের বেশী কথা জানে, আর এখানকার দূরবীণের চাইতে অনেক বড় বড় দূরবীণ দিয়া আকাশ দেখে। কিন্তু আমাদের খবর কি তাহারা পাইয়াছে? তাহার ভরসা নিতান্তই কম বলিতে হইবে। উহাদের মধ্যে যাহারা আমাদের একটু কাছে থাকে, তাহারা হয়ত

আমাদের সূর্যকে একটী ছোট তারার মত দেখিতে পায়। কিন্তু ইহার বেশী দেখা সম্ভব নহে। পৃথিবী, চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতির কথা তাহারা কিছুই জানে না।

আর মানুষ? হায়, হায়, আমাদের কথাও তাহারা জানে না! কোন দিন যে জানিবে তাহারও আশা নাই। ডাকিলে ত উহারা শুনিবেই না। পৃথিবীর সকল মানুষ যুটিয়া চ্যাঁচাইলেও শুনিবে না। চিঠি লিখিয়াও জানাইবার উপায় নাই। চিঠি কে লইয়া যাইবে? কোন্ পথে যাইবে? আর যদিই বা লোক মিলে আর পথ হয়; তবে সে চিঠি কয় দিনে পৌঁছাইবে? তোমার চিঠিওয়ালা যদি রেলে চড়িয়া ঘণ্টায় ৬০ মাইল করিয়া যায়, তাহা হইলেও সকলের চাইতে কাছের তারাটীতে সে সাড়ে চারি কোটি বৎসরের কমে পৌঁছাইতে পারিবে না! সেই চিঠির জবাব আসিতে আর সাড়ে চারি কোটি বৎসর লাগিবে।

আদব কায়দা।

যদি বিদেশে যাও, তবে ভাই সে দেশের আদব কায়দা কিঞ্চিৎ শিখিয়া লইও। নচেৎ, তুমি হাজার ভদ্রলোক হও, সেখানকার লোকেরা তোমাকে অসভ্য মনে করিবে। লোকে কথায় বলে, "যে দেশের যে রীতি।" কথাটি অতিশয় উত্তম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রীতিগুলি মাঝে মাঝে কেমন একটু বেখাপ্পা হয়। এক দেশের লোকে নমস্কার করে, অন্য দেশের লোকে সেলাম করে, আর এক দেশের লোকে হাতে ধরিয়া হ্যাঁচ্‌কা টান দিয়া কাঁধে বেদনা ধরাইয়া দেয়। আবার আর এক দেশের লোকেরা ইহার কোনটার মধ্যেই ভদ্রতার লেশ মাত্র দেখিতে পায় না। তাহার দেশের ভদ্রতা হচ্ছে, নাকে নাকে ঘষিয়া দেওয়া। ইহাতে যদি তোমার পছন্দ না হয়, তবে এক সাহেবের কথা শুন। সাহেব আফ্রিকা দেশের এক রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সাহেবকে দেখিবামাত্র রাজা অতিশয় বন্ধুভাবে সাহেবের কাছে আসিয়া তাঁহার হাত খানি টানিয়া লইলেন। সাহেব মনে করিলেন, বুঝি রাজা হেণ্ড্‌শেক্ করিবেন, কিন্তু রাজা তাহার কিছুই করিলেন না। রাজা সাহেবের সেই হাতে অতিশয় যত্নের সহিত যারপরনাই পরিপাটি করিয়া এক গাল অতি সরেস থুথু ফেলিলেন। সাহেব ভারী বুদ্ধিমান লোক, অনেক রাজা রাজড়ার দরবার করিয়াছেন; সুতরাং তিনি একটুও ভড়্‌কাইলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ রাজা মহাশয়ের একখানি হাত টানিয়া লইয়া তাহাতে ঠিক ঐরূপ করিয়া থুথু ফেলিলেন। রাজা মহাশয় বুঝিলেন যে, "লোকটা খুব ভদ্রতা জানে।" সুতরাং তিনি সাহেবের উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন! আর এক দেশের লোকেরা সম্মানিত

অতিথির গালে সাদা আর কালো রং মাখাইয়া তাঁহার সমাদর করে। অতিথির উচিত হয় আবার ঐ রঙের খানিকটা লইয়া গৃহস্বামীর গালে মাখাইয়া দেওয়া। নইলে আমার নমস্কার পাইয়া তুমি আমাকে ফিরিয়া নমস্কার না করিলে আমি যেরূপ মনে করিতে পারি উহারাও তাহাই করে। আমি হয়ত তোমার উপরে চটিয়া তোমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা বন্ধ করিতে পারি - কিন্তু উহারা সম্ভবতঃ সেই অতিথির ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পোড়াইয়া খাইবে।

জানোয়ারের প্রবাস যাত্রা।

গ্রীষ্ম আসিতেছে—তোমরা কতজনে হয়ত এখন হইতেই তাহার কথা ভাবিতেছ! কবে ছুটি হইবে, তারপর কে কোথায় যাইবে, কেমন করিয়া সময় কাটাইবে, ইত্যাদি কত কথা। গ্রীষ্মের সময়ে যে দেশে গরম কম, সেই দেশে যাইতে ইচ্ছা করে, তাই লোকে সিমলা যায় দার্জ্জিলিং যায় শিলং যায়। এরকমে দেশ ছাড়িয়া পালাইবার ইচ্ছা কেবল যে আমাদেরই হয় তাহা নয়, পশুপক্ষী সকলেরই মধ্যে কিছু কিছু দেখা যায়।

শীতের দেশের পাখী, যাহারা হিমালয়ের উত্তরে সারা বছর কাটায়, তাহারা প্রতি বছর শীতকালে আমাদেরই গরম দেশে হাওয়া খাইতে আসে। কোথার হিমালয় আর কোথায় এই বাংলা দেশের দক্ষিণ; অথচ বছরের পর বছর কত হাঁস কত বক এই লম্বা পথ পার হইয়া আসে, আবার শীতের শেষে ঠিক নিয়মমত সময়ে হিমালয় ডিঙাইয়া দেশে ফিরিয়া যায়। কোথা হইতে যে তাহারা এদেশের সন্ধান পায়, আর কেমন করিয়াই বা এতখানি পথ চিনিয়া আসে, তাহা কে বলিতে পারে? এরকম যাওয়া আসা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। গরম দেশের পাখী গ্রীষ্মের ভয়ে ঠাণ্ডা দেশে চলিয়াছে; আবার ঠাণ্ডা দেশের পাখী শীতের তাড়ায় গরম দেশে শীতকাল কাটাইতেছে। আশ্চর্য্য এই যে, এসকল পাখী এমন ভরসার সঙ্গে হিসাবমত চলাফিরা করে যে মনে হয় যেন পথঘাট সবই তাহার জানা আছে। যেখানে পথঘাটের কোন চিহ্ন নাই, রাস্তা চিনিবার কোন উপায়ও নাই, সেই অকূল সমুদ্রের মধ্য দিয়াও তাহারা নির্ভয়ে পথ বুঝিয়া চলে। মেঘ বৃষ্টি কুয়াশায় অন্ধকারে কিছুতেই তাহারা পথ ভুলে না। এইরূপে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পাখী মাস ঋতুর হিসাব রাখিয়া আকাশে পাড়ি দিয়া ফেরে!

এত গেল পাখীর কথা। বড় বড় ডাঙ্গার জন্তু ও যে এইরূপে দল বাঁধিয়া প্রবাস যাত্রা করে, এরকমত কত সময়েই দেখা যায়! জেব্রা জিরাফ হাতী হরিণ বুনোমহিষ ইহারা সকলেই সময় মত এ বন ও বন ঘুরিয়া বেড়ায়। আমেরিকার বাইসনগুলা যখন শীতের সময় বড় বড় দেশ পার হইয়া সবুজ বন আর তাজা ঘাসের সন্ধানে যাত্রা করে তখন তাহারা একেবারে মাইলকে মাইল পথ জুড়িয়া চলে! এক সময়ে এই বাইসনের চলাফেরা আমেরিকায় সহজেই দেখা যাইত কিন্তু নানাকারণে এখন বাইসনের সংখ্যা খুব কমিয়া আসিয়াছে। তাহার মধ্যে মানুষের অত্যাচার খুব একটা বড় কারণ বলিতে হইবে। যখন বড় বড় দল গোঁ ভরে নদীজল ভাঙ্গিয়া মাঠ ঘাট পার হইতে থাকে

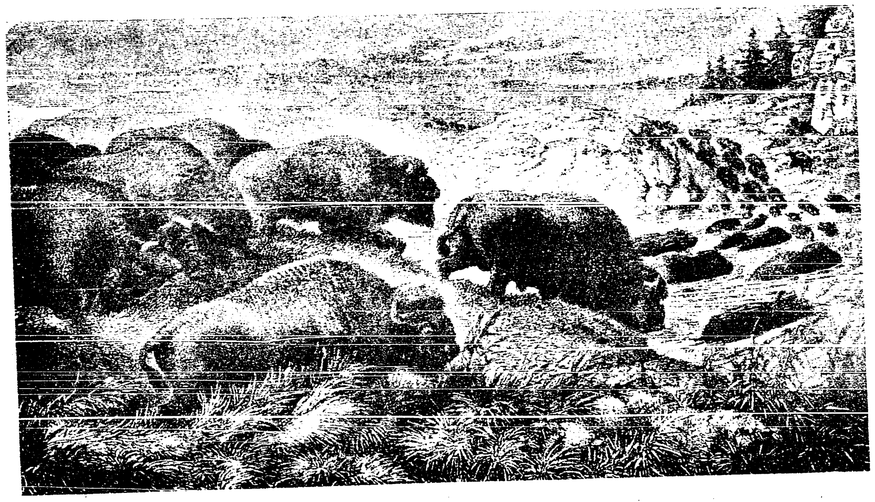

তখন যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা চলিতে পারে না, তাহাদের অনেকে পিছে পড়িয়া যায়। সেই সময়ে নানারকম মাংসাশী জন্তু আসিয়া তাহাদের মারিয়া শেষ করে। কিন্তু তবু মানুষে অত্যাচার না করিলে এখনও তাহারা লাখে লাখে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত! মানুষ কয় বৎসর সেখানে বসবাস না করিতেই পঞ্চাশ লক্ষ বাইসন খাইয়া হজম করিয়াছে! এক এক দল লোক এক একবারে দশ বিশ হাজার বাইসন মারিয়া তবে ছাড়ে।

হাতীরা দল বাঁধিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায় এরূপ অনেক সময়েই দেখা যায় কিন্তু

সেটা কেবল খাবার সংগ্রহের চেষ্টামাত্র। দেশ ছাড়িয়া লম্বা দৌড় দেওয়ার অভ্যাসটা তাহার নাই। অর্থাৎ আজ কাল নাই। হাতীর যাহারা পূর্ব্বপুরুষ, তাহারা যে দেশ বিদেশ বিচরণ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই তাহার ঢের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংলণ্ড বল আমেরিকা বল গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকা বল আর শীতপ্রধান সাইবিরিয়া বল, সকল স্থানেই জীবন্ত হাতী না পাও হস্তী জাতীয় জন্তুর কঙ্কালচিহ্ন পাইবে। আফ্রিকার উত্তরদিকে ইজিপ্টের মধ্যে বহু পুরাতন একটা শূকরের মত জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, পণ্ডিতেরা বলেন সেই নাকি হাতীর একজন পূর্ব্বপুরুষ। বিদেশ ভ্রমণ কাহাকে বলে তাহা এই জানোয়ারের বংশধরেরা খুব ভাল করিয়াই দেখাইয়া গিয়াছে। হাতীর কথা বলিতে গেলে আপনা হইতেই ঘোড়ার কথা মনে আসে। হাতীর মত ঘোড়াও, অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বপুরুষও, এক সময়ে পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে! কিন্তু সে ঘোড়া আর আজকালকার মানুষের পোষা ঘোড়ায় আকাশ পাতাল তফাৎ—ঠিক যেমন নেকড়ে বাঘ আর সৌখিন কুকুরের প্রভেদ।

হরিণের দলবাঁধিয়া চলার কথা বোধ হয় সকলেই জান! বড় বড় শিংওয়ালা হরিণগুলা যখন প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়া নদী পার হইতে থাকে, সে নাকি এক চমৎকার দৃশ্য। নদীর এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত কেবল হরিণের মাথা আর হরিণের শিং! মনে হয় যেন

জীবন্ত সাঁকো ফেলিয়া নদীর স্রোত বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। পাঁচ দশ হাজার হরিণ

এইরূপে এক সঙ্গে বাহির হয়। প্রায়ই দেখা যায় তাহারা এমন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট পথে যাতায়াত করে যে শিকারীরা আগে হইতে আন্দাজ করিয়া সময় মত ঠিক জায়গায় খাপ পাতিয়া বসিয়া থাকে। ছবিতে যে হরিণের দল দেখিতেছ ইহার নাম কারিবু—বাড়ী আমেরিকায়।

কিন্তু জানোয়ারের বিদেশ যাত্রার কথা বলিতে গিয়া যদি কেবল বড় বড় জানোয়ারের কথাই বলি তবে আসল কথাটাই বাদ থাকিয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে যত আশ্চর্য্য কথা শুনিয়াছি তাহার মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগে লেমিঙের কথা।

পাহাড়ের ধারেযেখানে সবুজ গাছ আর কচি পাতার অভাব নাই, সেইখানে গর্ত্ত করিয়া লেমিং বাস করে। দেখিতে তাহারা ইঁদুরের চাইতে বড় নয়, চেহারাও সেইরকম—কেবল লেজ নাই বলিলেই হয়। আর বিশেষ আশ্চর্য্য তাহাদের বংশবৃদ্ধি। যেখানে আজ দেখিবে ক্বচিৎ দুদশটা লেমিং দেখা যায়, বৎসরেক বাদে গিয়া দেখিবে লেমিঙের বংশে পাহাড় ছাইয়া ফেলিয়াছে! সংখ্যায় যত বাড়ে, তত তারা গাছ পালা খাইয়া শেষ করে। শেষে এমন অবস্থা হয় যে আর সব্‌জী জোটে না। পাহাড়কে পাহাড় একেবারে নেড়া হইয়া যায়। তখন ঘোর দুর্ভিক্ষের মধ্যে ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাহারা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায়! মনে হয়, যেন তাহাদের মধ্যে খুব

একটা তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে, যেন তাহারা কোনরূপে পরামর্শ স্থির করিতে পারিতেছে না। তার পর একদিন কি ভাবিয়া তাহারা একেবারে দলেবলে পাগলের মত দেশ ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করে।

সে এক দেখিবার মত জিনিষ। লক্ষ লক্ষ ইঁদুর একেবারে পাহাড় কাল করিয়া নামিতে থাকে। কোথায় যাইবে, কোথায় খাবার মিলিবে, সে খবর কেহ জানে না অথচ একেবার নিরুদ্দেশ অন্ধের মত সকলে হুড়াহুড়ি করিয়া বাহির হয়। বাধা মানে না, বিপদ মানে না, সব হুড়হুড় করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। ঠেলাঠেলিতে পায়ের চাপে কত হাজার হাজার মারা পড়ে, অনাহারে পথের ধারে আরও কত হাজার মরিয়া থাকে। আর নদীর স্রোতে, সমুদ্রের ঢেউয়ে কত যে প্রাণ হারায়, বুঝি তাহার আর সংখ্যা হয় না। যত রাজ্যের মাংসাশী শিকারী পাখী তখন চারিদিক হইতে আকাশ অন্ধকার করিয়া আসিতে থাকে। এম্নি করিয়া অজস্র লেমিং বিনষ্ট হইবার পর যে কয়টি অবশিষ্ট থাকে তাহারাই আবার আর কোনখানে নূতন করিয়া বংশসৃষ্টির সূত্রপাত করে। ক্রমে আবার সেই সংখ্যাবৃদ্ধি, সেই দুর্ভিক্ষ আর সেই প্রলয় কাণ্ড!

ছোটর কথা বলিলাম, এখন আরও ছোটর কথা বলিয়া শেষ করি। পিঁপড়ারা যে বাসা ছাড়িয়া নূতন দেশের সন্ধানে বাহির হয়, ইহা সকল দেশেই দেখা যায়। এ বিষয়ে সকলের চাইতে ওস্তাদ যে পিঁপড়া তাহার নাম ড্রাইভার পিঁপড়া। আফ্রিকার জঙ্গলে ইহারা যখন ঠিক সৈন্যদলের মত পরিষ্কার সার বাঁধিয়া চলিতে থাকে তখন জানোয়ার মাত্রেই তাহাকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া পালায়। যে আহাম্মক জন্তু এরূপ না করে, তাহার কিরূপ দুর্দ্দশা হয়—তাহার গল্প একবার সন্দেশে বলা হইয়াছে।

আর পঙ্গপালের কথা কে না জানে? যে দেশের উপর দিয়া পঙ্গপাল যায়, সে দেশের চাষারা মাথায় হাত দিয়া হায় হায় করিতে থাকে। সে দেশে শস্য আর গাছের পাতা বড় বেশী অবশিষ্ট থাকে না। দশ বিশ মাইল লম্বা পঙ্গপালের দল ত সচরাচরই দেখা যায়; এক একটা দল এত বড় থাকে যে মাথার উপর দিয়া সপ্তাহ খানেক উড়িয়াও তাহার শেষ হয় না! আফ্রিকায় এই রকম বড় বড় কাণ্ড প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সেখানে পঙ্গপালের চাপে পড়িয়া টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া পড়ে, পুকুর বুজিয়া যায়, ড্রেন আটকাইয়া যায়,—এমন কি রেল গাড়ী বন্ধ হইয়া যায়, এমনও দেখা গিয়াছে।

ঘুড়ি ও ফানুষ।

জলের চাইতে হাল্কা জিনিষ যেমন জলে ভাসে, বাতাসের চেয়ে হাল্কা জিনিষ তেমনি বাতাসে ভাসে। আগুণের উপরকার তপ্ত বাতাস, সাধারণ ঠাণ্ডা বাতাসের চাইতে অনেক পাৎলা; তাই সে উপরে উঠে—আর সেই উপরমুখী স্রোতের টানে যত রাজ্যের কয়লা ধূলা সবশুদ্ধ টেনে তোলে। সেই কয়লাধূলাশুদ্ধ ময়লা বাতাসের স্রোতকে আমরা বলি ধোঁয়া।

এই রকম হাল্কা ধোঁয়াকে পাৎলা থলির মধ্যে পুরে আমরা তাকে আকাশে ওড়াই—আর সেই কাগজের থলিকে বলি ফানুষ। সেই ফানুষ যদি খুব বড় হয়, আর মজবুৎ ক'রে তৈরী হয়, তখন তাকে বলি 'বেলুন'।

এ ত গেল হাল্কা জিনিষের কথা। কিন্তু বাতাসের চাইতে ভারি জিনিষও অনেক সময়ে আকাশে ওঠে—যেমন ঘুড়ি। চলন্ত বাতাসের কেমন একটা ধাক্কা দিবার শক্তি আছে, সে বড় বড় ভারি জিনিষকেও ঠেলে তোলে। ঘূর্ণী বায়ুর সময়ে বাতাসের জোর যখন খুব বেড়ে ওঠে, তখন তার ধাক্কায় ঘরবাড়ী পর্য্যন্ত উড়িয়ে নেয়। ঘুড়ির সূতায় যতক্ষণ টান থাকে ততক্ষণ আপনা হতেই বাতাসের ধাক্কায় ঘুড়িকে উপরদিকে ঠেলে রাখে, কিন্তু বাতাস যখন থেমে আসে তখন ঘুড়ির সূতো ধরে ক্রমাগত টান না দিলে সে বাতাসের ধাক্কাও পায় না, কাজেই তার উপর ভর ক'রে উঠতেও পারে না।

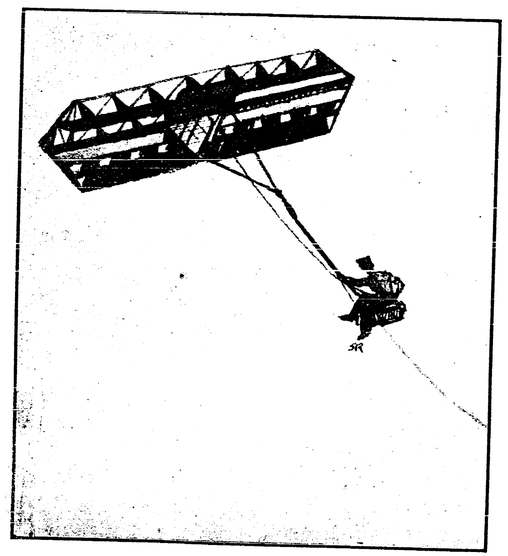

ফানুষকে বাড়িয়ে যেমন প্রকাণ্ড বেলুনের সৃষ্টি হ'য়েছে, তেমনি সাধারণ ঘুড়ির "পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ" হ'চ্ছে মানুষ-তোলা ধাউস্ ঘুড়ি। এরোপ্লেনের সৃষ্টি হবার আগে লোকে এই রকম ঘুড়িতে চ'ড়ে নানা রকম পরীক্ষা ক'রে

দেখেছে। এরকম ক'রে শত্রুর চালচলন দেখবার জন্য নানা রকম ব্যবস্থাও করা হ'য়েছে। এর অসুবিধা এই যে বাতাসের জোর না থাকলে কিছু করবার উপায় নাই। তা ছাড়া ঘুড়ি মাত্রেই এক জায়গায় আটকা থাকে, তার পক্ষে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান সম্ভব নয়। সুতরাং ঘুড়িই বল আর ফানুষই বল সকলেই বাতাসের খেয়ালের অধীন।

মানুষ অনেক কাল হতেই চায়, পাখীর মত আকাশে উড়তে। কেবল ফানুষে চড়ে বা ঘুড়িতে উঠে হাওয়ার ঠেলায় ভেসে বেড়িয়ে তার মন উঠে না। পাখীর নকল ক'রে বড় বড় ডানা বানিয়ে তার সাহায্যে উড়ে বেড়াবার চেষ্টা অনেক দিন হ'তেই চলে আস্‌ছে। হাতে পিঠে ডানা লাগিয়ে লোকে সাহস ক'রে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়েছে—আর তাতে কত জনের প্রাণও গিয়েছে। লিলিয়েন্থেল প্রভৃতি যাঁরা এই বিষয়ে বেশ কৃতকার্য্য হ'য়েছিলেন, তাঁরাও অতিরিক্ত সাহস করতে গিয়ে শেষে মারা পড়েন। তবু লোকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করতে ছাড়েনি। পরীক্ষার ফলে মোটের উপর এইটুকু বোঝা গেছে যে পাখীর মত ডানা ঝাপটিয়ে ওড়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়—তবে বাতাস ভাল থাকলে একটু উঁচু জায়গা থেকে আরম্ভ করে অনেকদূর পর্য্যন্ত হাওয়ায় ভেসে যাওয়া যায়। শুধু ভেসে যাওয়া নয়, অনেক সময় ডাইনে বাঁয়ে এদিক ওদিক একটু আধটু ঘোরা ফিরাও সম্ভব হয়। এ বিষয়ে আমেরিকার দুটি ভাই—অর্ভিল ও উইলবার রাইট—সকলের চেয়ে বাহাদুরি দেখিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের তৈরী ডানার সাহায্যে দশ বিশ মাইল পর্য্যন্ত অনেকবার ঘুরে এসেছেন। কিন্তু এতে ক'রে উপর থেকে নীচে নামা বেশ সহজ বটে, কিন্তু বাতাস ঠেলে উপরে ওঠা এক রকম অসম্ভব বল্লেই হয়। ঘুড়ির যখন সূতো ছিঁড়ে যায়, তখন সে পাথরের মত ধপ্ ক'রে না প'ড়ে কেমন ভেসে ভেসে হেলে দুলে এগিয়ে পড়ে। নানা কৌশল খাটিয়ে নানা

WATER STAINED.

রকম আকারের ঘুড়িকে এইভাবে বাতাসে ভাসিয়ে কত হাজার রকম পরীক্ষা ক'রে দেখা হ'য়েছে ; এবং তার ফলে এটুকু বোঝা গেছে যে জাহাজ যেমন ক'রে জল কেটে এগিয়ে চলে, তেম্নি ক'রে যদি বাতাস কেটে ঘুড়িকে ঠেলে নেওয়া যায় তবে হয়ত তাকে যেদিক ইচ্ছা সেদিকে চালান যেতে পারে। এই চেষ্টার ফলে যে জিনিষ দাঁড়িয়েছে তারই নাম এরোপ্লেন।

এরোপ্লেনের চেহারা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার দরকার নাই কারণ তার ছবি তোমরা অনেক দেখেছ। কিন্তু সেটা যে একটা ঘুড়িমাত্র একথাটা তার পাখীর মত চেহারা দেখে সব সময়ে মনে আসে না। কিন্তু বাস্তবিক সেটা ঘুড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘুড়িকে ওড়াতে হ'লে যেমন সূতো ধ'রে টানা দরকার, এরোপ্লেনকে ঠিক তেমনি বাতাস ঠেলে কলের জোরে টান্‌তে হয়। সুতরাং ঘুড়িতে যত রকম বদভ্যাস আর কেরামতি দেখা যায়, এরোপ্লেনেও প্রায় সেই রকম। ঘুড়ির মত সেও বেখাপ্পা 'গোঁৎ' খেতে চায়, হঠাৎ শূন্যের মাঝে কাৎ হ'য়ে পড়্‌তে চায়, আর এলোমেলো বাতাসে ঘূরপাক খেয়ে উল্টাতে চায়। এত রকম তাল সামলে তবে এরোপ্লেন চালান শিখ্‌তে হয়। ঘুড়িতে যদি বেখাপ্পা জোরে হ্যাঁচকা টান দেও তবে সে যেমন ফস্ করে ফেঁসে যেতে পারে এরোপ্লেনও তেমনি ডানা ভেঙ্গে ধপ্ করে পড়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। যারা এবিষয়ে ওস্তাদ, তাদের কাছে এরোপ্লেনের এসব পাগলামি নিতান্তই সামান্য ব্যাপার ; তারা ইচ্ছা ক'রেই কত সময় এরোপ্লেনশুদ্ধ শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে তামাসা দেখায়, এরোপ্লেনকে নানা রকমে গোঁৎ খাওয়ায়।

ঘুড়ি আর ফানুষে যে তফাৎ, 'এরোপ্লেন' আর 'এয়ারশিপ' বা আকাশ-জাহাজে ঠিক সেই তফাৎ। ফানুষকে অর্থাৎ বেলুনকে ইচ্ছামত এদিক ওদিক চালাবার চেষ্টাতেই আকাশ-জাহাজের সৃষ্টি। গোল বেলুন বাতাসের উল্টোমুখে চলতে গেলে চ্যাপ্টা হ'য়ে যায়, তাই তাকে চমচমের মত ছুঁচাল ক'রে বানায়—তাহ'লে সে সহজেই বাতাস ফুঁড়ে এগুতে পারে। তার পিছনে হাল ও আশে পাশে মাছের ডানার মত ডানা থাকে—তা দিয়ে জাহাজকে ইচ্ছামত ডাইনে বাঁয়ে উপর নীচে চালান যায়। আর থাকে বিদ্যুতের পাখার মত মস্ত একটা ঘুরন্ত জিনিষ ; সেইটার ধাক্কায় বাতাস ঠেলে জাহাজ চলে। এরোপ্লেনেও অবশ্য ঠিক এই রকম পাখা থাকে।

এই যুদ্ধের সময়ে এরোপ্লেন আর এয়ারশিপগুলি কি রকম কাজে লেগেছে তার সম্বন্ধে দু একটি কথা বলি। এরোপ্লেনগুলা চলে ব্যস্তবাগীশের মত ফরফর ক'রে,

এরোপ্লেন আর আকাশ জাহাজের লড়াই।

WATER STAINED.

তারা দিনদুপরে যখন তখন যেখানে সেখানে উড়ে যায় আর নানা রকম খবর আনে। দরকার হ'লে ধাঁ ক'রে শত্রুর শিবিরে বা গোলাবারুদের গুদামে বা অস্ত্রের কারখানায় দুদশটা বোমা ফেলে আসে, অথবা বন্দুক দিয়ে শত্রুর এরোপ্লেন বা জাহাজ আক্রমণ করে। এসব ছোট খাট কাজে এরোপ্লেনেই সুবিধা বেশী। দশ বছর আগে বিলাতের লোকেও এরোপ্লেন জিনিষটাকে একটা আশ্চর্য্য তামাসার ব্যাপার মনে করত, অথচ এখন এই যুদ্ধে কত হাজার হাজার এরোপ্লেন ঘোরা ফিরা করে—কে তার খবর রাখে?

আকাশ-জাহাজগুলা প্রকাণ্ড গম্ভীর জিনিষ, একেবারে ২০।৩০ মণ বোমা নিয়ে ফেরে! তার উপর কামান বন্দুকও সঙ্গে থাকে। তারা আসে যায় অন্ধকার রাত্রে চোরের মত—দিনের বেলা বেরুতে গেলে তাদের আর রক্ষা নেই—কারণ অত বড় জিনিষকে গোলা মেরে ফুঁটো করতে কতক্ষণ? রাত দুপুরে যখন তারা ঘুমন্ত সহরের উপর বোমা ফেলতে থাকে—তখন চারদিক হ'তে বড় বড় 'search light'এর আলোর ধারা আকাশ হাতড়ে তাকে খুঁজে বেড়ায়। একবারটি তার উপর আলো ফেলতে পারলেই যত রাজ্যের কামান তার উপর তাক্ করতে থাকে। তারপর চারিদিক হতে এরোপ্লেনগুলা ভীমরুলের মত ঘিরে আসে! তখন জাহাজটিকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়। ছবিতে দেখ একটা এরোপ্লেন আর একটা বড় জাহাজে লড়াই হচ্ছে। এ রকম অবস্থায় এরোপ্লেনের সর্ব্বদাই চেষ্টা থাকে জাহাজের উপরে উঠবার জন্য। কারণ উপর থেকে বোমা ফেলে তার পিঠ ভেঙ্গে দেওয়াই হ'চ্ছে জাহাজ মারবার সব চাইতে ভাল উপায়। ফানুষ জাহাজ যত উঁচুতে যেমন তাড়াতাড়ি উঠতে পারে, ঘুড়ির নৌকা তেমন পারে না; কাজেই জাহাজ কাছে আসবার আগে থেকেই এরোপ্লেন অনেকখানি উঠে থাকে—যাতে ঠিক সময়ে সে জাহাজের ঘাড়ের উপর নামতে পারে।

আবোল তাবোল।

হুঁকোমুখো হ্যাংলা বাড়ী তার বাংলা
মুখে তার হাসি নাই—দেখেছ?
নাই, তার মানে কি? কেউ তাহা জানে কি?
কেউ কভু কাছে তারে ডেকেছ?
শ্যামাদাস মামা তার আফিঙের ধামাদার—
আর তার কেহ নাই এ ছাড়া;